এম আর আখতার মুকুল
আমি
বিজয়
দেখেছি

বেপরোয়া ও অপ্রতিরোধ্য, দুঃসাহসী অথচ সংযত ও সহিষ্ণু ৬৩ বছর বর্ষীয় 'চির যুবা' এম আর আখতার মুকুল-সেই যে ছোটবেলায় বাঙালি ঘরাণার রেয়াজ মাফিক দু'দু'বার বাড়ি থেকে পলায়ন-পর্ব দিয়ে শুরু করেছিলেন জীবনের প্রথম পাঠ–তারপর থেকে আজ অবধি বহু দুস্তর ও বন্ধুর চড়াই-উৎরাই, বহু উত্থান-পতন ও প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে যেতে হলেও আর কখনও তাকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি; রণে ভঙ্গ দিয়ে পিছ পা হননি কোনও পরিস্থিতিতেই। যা আছে কপালে, এমন একটা জেদ নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছেন অকুতোভয়ে। যার ফলে শেষ পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই তার বিজয়ী মুকুটে যুক্ত হয়েছে একের পর এক রঙ্গিন পালক।

জীবিকার তাগিদে কখনও তাকে এজি অফিসে, সিভিল সাপ্লাই একাউন্টস, দুর্নীতি দমন বিভাগ, বীমা কোম্পানিতে চাকুরি করতে হয়েছে। কখনও আবার সেজেছেন অভিনেতা, হয়েছেন গৃহশিক্ষক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সুদূর লন্ডনে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির কাটার। প্রতিটি ভূমিকাতেই অনন্য সাফল্যের স্বাক্ষর। কখনও হাত দিয়েছেন ছাপাখানা, আটা, চাল, কেরোসিন, সিগারেট, পুরানো গাড়ি বাস -ট্রাকের ব্যবসায়। করেছেন ছাত্র রাজনীতি। ১৯৪৮-৪৯ সালে জেল খেটেছেন। জেল থেকেই স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। অংশগ্রহণ করেছেন ভাষা আন্দোলনে, হাসিমুখে বরণ করেছেন বিদেশের মাটিতে সাড়ে তিন বছরের নির্বাসিত জীবন; যখনই যা- কিছু করেছেন, সেটাকেই স্বকীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল করে তুলেছেন। সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন প্রায় দুই যুগের মতো। কাজ করেছেন বেশ কিছু দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকা ও বার্তা সংস্থায়-বিভিন্ন পদ ও মর্যাদায়। বেশিরভাগ সময় কেটেছে দুর্ধর্ষ রিপোর্টার হিসেবে। সফরসঙ্গী হয়েছেন শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, ইস্কান্দার মীর্জা, আইয়ুব খান, বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দিন, ভুট্টোর মতো বড় নেতাদের। সাংবাদিক হিসেবে ঘুরেছেন দুই গোলার্ধের অসংখ্য দেশ। দেখেছেন বিচিত্র মানুষ, প্রথ্যক্ষদর্শী হয়েছেন বহু রুদ্ধশ্বাস চাঞ্চল্যকর ঘটনা প্রবাহের, সাক্ষী ছিলেন বহু ঐতিহাসিক মুহূর্তের। বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ জীবন। বঙ্গবন্ধুর উষ্ণ সান্নিধ্য ও ভালবাসা তার জীবনের এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি।

জীবনের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্তে ১৯৭১-এর ৯ ডিসেম্বর সদ্য মুক্ত স্বাধীন যশোরের মাটিতে পদার্পণ এবং ১৯ তারিখে সরাসরি মুজিবগর থেকে

সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টারে ঢাকা প্রত্যাবর্তন। আর সবচেয়ে বীরত্বপূর্ণ অধ্যায় : মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্রের অন্যতম স্থপতি এবং নিয়মিত রণাঙ্গন পরিদর্শন শেষে একই সঙ্গে লেখক, কথক ও ভাষ্যকার হিসেবে বেতারে সাড়া জাগানো 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান পরিচালনা। সাধারণ মানুষের মনের কথাকে, সুপ্ত আশা ও স্বপ্নকে তিনি জীবন্ত ও মূর্ত করে তুলে ধরেছিলেন সেদিনের সেই বিপন্ন ও অসহায় কিন্ত বীরত্বব্যঞ্জক মুহূর্তে। চোখা হাস্য পরিহাসে, রঙ্গ রসিকতায় আদি ও অকৃত্তিম ঢাকইয়া বুলিতে দিশাহারা ছিল হানাদার বাহিনীর শিবির।

শত্রুমিত্র সব মহলে সমান জনপ্রিয়। অকৃত্রিম বন্ধুবাৎসল্য, সদালাপি, সারাক্ষণ হাসি-খুশি, চরম আড্ডাপ্রিয়, কাশফুল মাথা এম আর আখতার মুকুল যে-কোনও আড্ডায় মধ্যমণি হয়ে উঠতে সময় নেন না পলকমাত্র। একাই একশ। অতিরিক্ত সিগারেট ফোঁকার ফলে ঈষৎ খুর্খুরে গলায় যেমন আছে জলদগম্ভীর ডাক, তেমন আছে বুক কাঁপানো বাঘের হাঁক। ফুরফুরে মজলিশি মেজাজ, যার সঙ্গে বৈদগ্ধ ও অসামান্য স্মৃতিশক্তির বিরল সমন্বয় তার আলাপচারিতাকে করে তোলে খাপখোলা তরবারির মতো শাণিত ও ঝকঝকে। কুশাগ্র বাক্যবাণ তার প্রধান আয়ুধ হলেও মনে হয় এখনও অনেক অব্যক্ত কথা, অনেক তথ্য, অনেক রহস্য লুকিয়ে রেখেছেন মনের গভীর গোপন চোরা কুঠুরিতে।

সরকারী চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে বই, পত্র-পত্রিকার ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেছেন প্রায় সার্বক্ষণিকভাবে। এসবের মাঝে দুই আদুরে নাতনি কুন্তলা আর কুয়াশা যারা একমাত্র কিছুটা সমীহ আদায় করে নিতে পারে অমন আ[illegible]রে জাঁদরেল দাদুটির কাছ থেকে।

দুই কন্যা কবিতা ও সঙ্গীতা, দুই পুত্র কবি ও সাগর। সুদীর্ঘ ৩৮ বছর ৯ মাস একনিষ্ঠভাবে সংসার ধর্ম পালনের পর তার বিদূষী গৃহিনী ডক্টর মাহমুদা খানম ১৯৯২-এর ১৯ মার্চ জান্নাতবাসী হয়েছেন। বড় ছেলে কবি তার একমাত্র প্রিয় বন্ধু ও সমস্ত সুখ-দুঃখের সঙ্গী। বাপবেটার এমন জুটি বুঝি আর দু'টি হয় না সচরাচর।

কোন সীমিত পরিসরে এম আর আখতার মুকলের কর্মবহুল ও বৈচিত্র্যময় জীবনের বৃত্তান্ত তুলে ধরা এক কথায় অসম্ভব। সিংহ রাশির জাতক এম আর আখতার মুকুল মানেই সংগ্রামী জীবন-সংগ্রামের জীবন। আপোষহীন, অসীম সাহসী এক বীর যোদ্ধা। -*বেলাল চৌধুরী।*

এম আর আখতার মুকুল

আমি বিজয় দেখেছি

অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
anannyadhaka@gmail.com

উৎসর্গ

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে
যাঁরা শহীদ হয়েছেন
যাঁরা লড়াই-এর ময়দানে আহত হয়েছেন
যাঁরা পরবর্তীকালে বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত হচ্ছেন
যাঁরা বীরাঙ্গনা অথচ দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন এবং
যাঁরা প্রতিশ্রুত বিচার লাভে বঞ্চিত হয়েছেন
তাঁদের উদ্দেশ্যে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আনোয়ার হোসেন মঞ্জু (ইত্তেফাক), রাশেদ খান মেনন (রাজনীতিবিদ), শহীদুল ইসলাম (শব্দ সৈনিক), ব্রজেন দাস (সাঁতারু), জাকীউদ্দীন আহমদ (স্বদেশ), আলহাজ্ব মোঃ গিয়াসউদ্দীন বীর প্রতীক (মুক্তিযোদ্ধা সংসদ), জাহানারা ইমাম (লেখিকা), লুৎফর রহমান সরকার (সাহিত্যিক), খায়রুল হক চৌধুরী (জেনিথ প্যাকেজেস্ লিঃ), মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন (শিল্পপতি ও ব্যাংকার), মিজানুর রহমান মিজান (খবর), আনোয়ার হোসেন (আলোকচিত্র শিল্পী), কালাম মাহমুদ (শিল্পী), কে এম আমীর (পদ্মা প্রিন্টার্স), আনোয়ারুল হক আনু (এ্যাডভোকেট), শাহাদাৎ চৌধুরী (বিচিত্রা), কাইয়ুম চৌধুরী (শিল্পী), গাজীউল হক (এ্যাডভোকেট), মোস্তফা সারোয়ার (শিল্পপতি), মোস্তফা আলামা (শিল্পপতি), মাহমুদা খানম রেবা (বাংলা একাডেমী), ফয়েজ আহমদ (ছড়াকার), ডঃ মুস্তফা নূরউল ইসলাম (শিক্ষাবিদ), গাজী শাহাবুদ্দীন (সচিত্র সন্ধানী), খান মোহাম্মদ ইকবাল (শিল্পপতি), শেখ সেলিম (বাংলার বাণী), ফজলে রাব্বী (জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র), ডঃ আনিসুজ্জামান (শিক্ষাবিদ), মেজর (অবঃ) মোঃ রফিকুল ইসলাম, হাজী আরশাদ (এলিট প্রিন্টিং), জি আর মল্লিক (এনা), জাকির হোসেন নিজাম (জেনিথ প্যাকেজের্স লিঃ), জহিরুল ইসলাম (বিএডিসি), জাকীর খান চৌধুরী (মুক্তিযোদ্ধা সংসদ), সন্তোষ গুপ্ত (সংবাদ), মুনির খান (শিল্পী), হাসনাত করিম (স্বদেশ), মোঃ আলম (আলোকচিত্র শিল্পী), গোলাম মুস্তফা (প্রকাশক), মোস্তাক আলী (জেনিথ প্যাকেজেস্ লিঃ), আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (কবি), আনিসুল হক (এ্যাডবিজ লিমিটেড), ডঃ মোশাররফ হোসেন (শিক্ষাবিদ), মতিউর রহমান চৌধুরী (সাংবাদিক), অধ্যাপক ইউসুফ আলী (রাজনীতিবিদ), আমানুল হক (আলোকচিত্র শিল্পী), ডঃ সুজাউদ্দীন (বিএআরসি), বাদল রহমান (চলচ্চিত্র পরিচালক), মরহুম গোলাম মওলা (আলোকচিত্র শিল্পী), হাফিজুল ইসলাম হাবলু, শাহরিয়ার কবির, জিল্লুর রহিম দুলাল, আবুল খয়ের লিটু, রুহুল আমিন বজলু এবং কবি বেলাল চৌধুরী প্রমুখ।
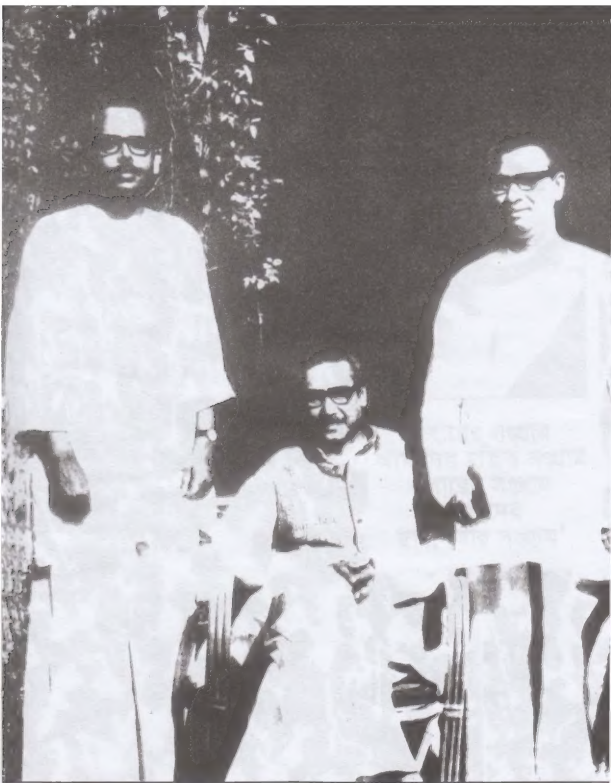
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাজউদ্দীন আহমদ-এর সংগে এম আর আখতার মুকুল : ১লা জানুয়ারি ১৯৭০ ধানমন্ডী ঢাকা

ভূমিকা

প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই নাকি একটি উপন্যাসের উপাদান থাকে। তবে সেই উপাদানকে রূপ দিয়ে থাকেন অল্প কয়েকজন মাত্র। সকলে লেখেন না, অনেকে লিখতে পারেন না। যাঁরা লেখেন, তাঁদের সবাই আবার উপন্যাস লেখেন না। অনেকে উপন্যাস না লিখে আত্মজীবনী লিখে থাকেন। তাতে কখনো কখনো লেখক নিজেই হয়ে ওঠেন উপন্যাসের নায়কের মতো। সত্য ও কল্পনার মিশেল উপন্যাস ও আত্মজীবনী উভয় ক্ষেত্রেই থাকতে পারে। গত পঁচিশ বছরে ইংরেজি ভাষায় এমন সব উপন্যাস বা আত্মজীবনীর আবির্ভাব ঘটেছে যে, কোন কোন পাশ্চাত্য সমালোচকের মতে, ঐ দুই ভিন্ন প্রকৃতির সাহিত্যকর্মের ভেদ এখন অনেক ক্ষেত্রে লোপ পেতে বসেছে।

একটি ধরনের আত্মকাহিনী যদি উপন্যাসের কাছাকাছি হয়ে থাকে, তাহলে আরেক ধরনের আত্মকথাকে বলতে হয় ইতিহাসের সগোত্র। এ-জাতীয় রচনায় ব্যক্তির আত্মবিকাশের কাহিনী যতটা স্থান পায়, তার চেয়ে বেশী রূপ পায় একটা দেশ ও কালের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য। যাঁরা এ দিকটায় জোর দেন, তাঁরা একটা বিশেষ সময় ও এলাকাকে ঘিরে স্মৃতিকথা-রচনায় মনোনিবেশ করেন।

'আমি বিজয় দেখিছি' মূলত এ-জাতীয় গ্রন্থ। এই বইতে এম আর আখতার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা বলেছেন। এ-বিষয়ে লেখকের বিশেষ অধিকার তাঁর আছে। ১৯৭১ সালে যারা স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনতেন– অবরুদ্ধ দেশে বসে ভয়ে ভয়ে বা শরণার্থী শিবিরের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে বসে উৎকণ্ঠা-উদ্বেগে, অথবা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয়ে কিংবা মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে আশা-নিরাশার দোলায়– 'চরমপত্র' নামের অনুষ্ঠানটি তাঁদের কাছে ছিল অবিস্মরণীয়। এ অনুষ্ঠান শত্রুকে অবজ্ঞা করবার শক্তি দিত, প্রত্যয় জোগাত আত্মশক্তিতে, দুঃখের দিনে কৌতুকের হাসি ফোটাতো মুখে। এম আর আখতার সেই 'চরমপত্রে'র লেখক ও পাঠক ছিলেন।

এম আর আখতার শুধু 'চরমপত্রে'র লেখক ও পাঠক ছিলেন না; তিনি স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং মুজিবনগর সরকারের প্রেস ও তথ্য বিভাগের পরিচালক ছিলেন। মুজিবনগর সরকারের প্রশাসনকে ভেতর থেকে অনেকখানি দেখার এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রক্রিয়াকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। তিনি যা দেখেছিলেন ও শুনেছিলেন যেসব দলিল করেছিলেন, যেসব বিষয় অনুমান করেছিলেন এবং প্রাসংগিক যেসব তথ্য পরে তাঁর গোচরীভূত হয়েছিল, তার সবই 'আমি বিজয় দেখেছি' গ্রন্থে স্থানলাভ করেছে।

তবে এই বই হাতে নিলেই বোঝা যাবে যে, ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ও ১৬ই ডিসেম্বরের কালসীমায় বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখেননি লেখক। পটভূমিরূপে এতে উপস্থিত হয়েছে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে শুরু করে অসহযোগ আন্দোলনের কালের ঘটনাবলী। শত্রুপক্ষের পরিকল্পনার কিছু বিবরণও লেখক দিয়েছেন। তার সঙ্গে যুক্ত করেছেন বাংলাদেশে বামপন্থী আন্দোলন-সম্পর্কিত একটি সমীক্ষা। ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে বদরউদ্দিন উমর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির যে ইতিহাস রচনা করেছিলেন, সেই আদর্শ এম আর আখতারের পরিকল্পনাকে প্রভাবান্বিত করে থাকতে পারে। অন্য কারণ থাকাও সম্ভবপর। এদেশের ছাত্র আন্দোলন ও রাজনীতি,

সাহিত্য ও সাংবাদিকতার সঙ্গে দীর্ঘকালের সংযোগ ছিল লেখকের। সেই সংযোগ তাঁর পক্ষে অবিস্মরণীয়। এই বইয়ের মুখবন্ধ পড়লেই বুঝা যায়, সেই স্মৃতিকথা রচনার– হয়তো আত্মজীবনী লেখার– একটা প্রবল ঝোঁক এম আর আখতারের মনের গভীরে কাজ করেছে। তাই অনেক বিষয় এতে তিনি অবতারণা করেছেন, যা প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, কিন্তু যা মুক্তিযুদ্ধের পটভূমির উপকরণ হিসেবে বিবেচ্য।

সচেতনভাবে লেখক যা উপলব্ধি করেছেন, তা হলো, যা তিনি সত্য বলে জেনেছেন, তা উত্তরসূরিদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জরুরি তাগাদা। অভীষ্ট লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য তিনি বহু দলিলপত্রের সাক্ষ্য মেনেছেন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে ঘটনা ও চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। দিয়েছেন নিজের মতামত ও ব্যাখ্যা। সকল স্মৃতিকথার মতো এখানেও বস্তুনিষ্ঠ বিষয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত বিচার আছে। সব ক্ষেত্রে তাঁর মতামত ও বক্তব্যে পাঠকের একমত হবার প্রয়োজন নেই। তবে এই বই থেকে বহু অজানা প্রামাণ্য তথ্যের যে পরিচয় পাঠক পাবেন, তাতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর ধারণা পূর্ণতা লাভ করবে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একযুগের মধ্যে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রধান চরিত্রদের আমরা হারিয়েছি। শুধু যে তাঁদের হারিয়েছি, তাই নয়, মুক্তিযুদ্ধের নীতি ও আদর্শকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জলাঞ্জলি দিয়েছি। হয়তো এও এক কারণ, যার জন্যে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যত লেখা উচিত ছিল, ততটা লিখিনি আমরা। এম আর আখতার মুকুল এই অভাব পূরণের অভিনন্দনযোগ্য উদ্যোগ নিয়েছেন।

এই বই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবে নিজেদের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় পর্বের দিনগুলিকে। সহস্র প্রতিকূলতার মুখেও সেদিন বাংলাদেশের মানুষের স্বপ্ন ও আদর্শ, প্রেম ও সংকল্প, ধৈর্য ও প্রত্যয়, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ বিজয়লাভ করেছিল। লেখকের সৌভাগ্য, সেই বিজয় তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য, প্রত্যক্ষদর্শীর সেই বিবরণ তিনি রচনা করেছেন।

বাংলা বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় — **আনিসুজ্জামান**

৪ নভেম্বর ১৯৮৪

২২তম পুনর্মুদ্রণ সম্পর্কে দুটি কথা

আমার স্থির বিশ্বাস 'আমি বিজয় দেখেছি' বইটি ইতিমধ্যে দেশ-বিদেশে অবস্থানরত বাঙালি গণমানুষের হৃদয় জয়ে সক্ষম হয়েছে। মাত্র ১৮ বছরের ব্যবধানে বইটির ২২তম পুনর্মুদ্রণ এর স্বাক্ষর বহন করে। এজন্য আমি পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং অগণিত পাঠকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সম্প্রতি কাগজ এবং অন্যান্য মুদ্রণ সরঞ্জামের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় অপারগ অবস্থায় 'আমি বিজয় দেখেছি' বই-এর মূল্য বৃদ্ধি করতে হলো। এজন্য আমি প্রকাশকের পক্ষে ক্ষমাপ্রার্থী।

১ নওরতন কলোনি

নিউ বেইলি রোড ঢাকা-১০০০ — **এম আর আখতার মুকুল**

মুখবন্ধ

১৯৮৪ সালে চুয়ান্নো বছরে পা দিয়েছি। আমি এখন প্রৌঢ়ত্বের দ্বারপ্রান্তে। সেই কবে ব্রিটিশ আমলে জন্মগ্রহণের পর যখন বুঝতে শিখলাম, তখন মাস্টারদা'র চট্টগ্রামে স্বাধীনতার প্রথম প্রচেষ্টাকে ভয়াবহ দমননীতির মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করার আত্মপ্রসাদ লাভ করছে ইংরেজ শাসকরা। এরপর দেখলাম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা আর কংগ্রেসিদের অসহযোগ আন্দোলন। এলো তেতাল্লিশের সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ। বাংলার পথে-প্রান্তরে আত্মাহুতি দিলো প্রায় পঞ্চাশ লাখ আদম সন্তান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যখন পরিসমাপ্তি তখন আমি দিনাজপুরে সবেমাত্র কলেজের চৌহদ্দিতে ঢুকেছি। তরুণ তাজা মন নিয়ে অবাক বিস্ময়ে কৃষকদের প্রাণের দাবি তেভাগা আন্দোলনের সর্বাত্মক চেহারাটা উপলব্ধি করলাম।

এলো ছেচল্লিশের সাধারণ নির্বাচন। মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমির জন্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। স্লোগান দিলাম 'হাত মে বিড়ি মু মে পান লড়কে লেংগে পাকিস্তান'। শুরু হলো ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ঠিকভাবে সব কিছু বোঝার আগেই এক হাজার মাইল ব্যবধানে দুটো অংশ দিয়ে গঠিত পাকিস্তান নামে একটা রাষ্ট্রের নাগরিক হলাম। বাঙালি হিন্দু শরণার্থী আর অবাঙালি মুসলিম মোহাজেরদের ভয়াবহ দুর্দশার পাশাপাশি ভারত থেকে আগত বিত্তশালী মুসলিমদের 'শরাফত' আর 'খান্দানী'র দাপট ভোগ করলাম। আরবি হরফে বাংলা, উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার হুমকি শুনলাম। আটচল্লিশের প্রথম ভাষা আন্দোলনের সময় মনের গহনে সন্দেহের বীজ বপন হলো। তাহলে কী আমরা সাম্রাজ্যবাদের জগদ্দল পাথর থেকে বেরিয়ে উপনিবেশবাদের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়েছি?

এরপর এই বেড়াজাল ছিন্ন করতে আমাদের আরও ২৩ বছর সময়ের প্রয়োজন হয়েছে। উনপঞ্চাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নপদস্থ কর্মচারী ধর্মঘট এবং রাজশাহী ও দিনাজপুরে ছাত্র-বিক্ষোভ, পঞ্চাশে দাঙ্গা-বিরোধী বক্তব্য পেশ, একান্নতে বিপিসির (প্রস্তাবিত সংবিধান সম্পর্কিত লিয়াকত আলীর খসড়া মূলনীতি সম্পর্কিত রিপোর্ট) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বাহান্নোতে ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নোতে সাধারণ নির্বাচন ও ৯২ ক ধারা, ছাপ্পান্নোতে স্বায়ত্তশাসনের দাবি, আটান্নোতে আইয়ুবের সামরিক শাসন, বাষট্টিতে শিক্ষানীতি-বিরোধী ছাত্র বিক্ষোভ, ছেষট্টির ছ'দফা, আটষট্টির 'ষড়যন্ত্র মামলা', উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের ঘূর্ণিঝড়, সাধারণ নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের ঐতিহাসিক বিজয় ও স্বাধিকার আন্দোলন, একাত্তরে গণহত্যার প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধ...এসব কিছু হয় অন্তরঙ্গ আলোকে দেখেছি, না হয় নিজেই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছি।

এরপর স্বাধীন বাংলাদেশে মাত্র একযুগের মধ্যে নানা উত্থান-পতন দেখলাম। বঙ্গবন্ধুর মহানুভবতায় ক্ষমা প্রদর্শন, চাকরিতে ধারাবাহিকতা ও সিনিয়রিটি প্রদান, মুক্তিযোদ্ধাদের বেকারত্ব, ব্যুরোক্রেসির অভিজ্ঞতার বড়াই, যুদ্ধবন্দি ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ছাড়াই মুক্তি, মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও পরবর্তীকালের অর্থমন্ত্রীর পদত্যাগ, মার্কিনি অসহযোগিতায় রংপুরের দুর্ভিক্ষ, প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির প্রবর্তন, বিতর্কিত বাকশালের সৃষ্টি, সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর হত্যা, দক্ষিণপন্থীদের ক্ষণস্থায়ী অভ্যুত্থান, আটাত্তরে জাতীয়তাবাদী স্লোগানের আড়ালে দক্ষিণ ও মধ্যবিত্ত-সুলভ বামপন্থীদের মেরুকরণ, একাশিতে জিয়া হত্যা ও সাত্তারের নির্বাচন, বিরাশির শুরুতে ব্যাপক দুর্নীতি ও অরাজকতা

এবং সামরিক বাহিনীর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর– এ সব কিছুই কালের নীরব সাক্ষী হিসাবে অবলোকন করলাম।

এতসব অভিজ্ঞতার আলোকে অনুভব করলাম আমাদের উত্তরসূরিদের জন্য অন্ততপক্ষে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং তৎকালীন (১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত) রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট লিপিবদ্ধ করা বাঞ্ছনীয় হবে। তাই 'আমি বিজয় দেখেছি' বইটি লিখেছি। সুদূর লন্ডনে অবস্থানকালে এই বইটি লিখতে শুরু করেছিলাম এবং তা সম্পূর্ণ করতে প্রায় পাঁচ বছরের প্রয়োজন হয়েছে।

মূল বইয়ের উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা কিভাবে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলো তারই প্রতিবেদন। মিত্র বাহিনী গঠন করে ভারত আমাদের সপক্ষে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলো একাত্তরের ৩রা ডিসেম্বর.....তার আগে সহযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয়। পূর্ববর্তী সময়ে লড়াইয়ের পুরো কৃতিত্বই হচ্ছে মুজিবনগর সরকারের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে বীর বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের। সেদিন বাংলাদেশের প্রতিটি সেক্টরে যেভাবে মুক্তিযোদ্ধারা লড়াই করেছিলো তার বিস্তারিত তথ্য বাঙালি জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকার কথা। আমি এ ব্যাপারে বুদ্ধিজীবী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

এই বইতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনাকালে ব্যক্তি[illegible]র অপারগতা প্রকাশ করছি। পুস্তকটির পরিশিষ্টে পঞ্চাশ দশক থেকে শুরু করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সময়ে বামপন্থী দলগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে মূল্যায়ন করার প্রচেষ্টা করেছি এবং ঐতিহাসিক তথ্যাদি উপস্থাপনা করেছি।

'আমি বিজয় দেখেছি' বইটির অংশবিশেষ সাপ্তাহিক স্বদেশ পত্রিকায় (৭৭টি সংখ্যায়) 'চরমপত্রের স্মৃতিচারণ' নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য সাপ্তাহিক স্বদেশ-এর কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কভার ডিজাইন ও অঙ্গসজ্জা পরিকল্পনার কৃতিত্ব শিল্পী কালাম মাহমুদের। লেখার ব্যাপারে আমার সহধর্মিণী মাহমুদা খানম রেবা আমাকে বরাবর উৎসাহিত করেছে। বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক বেলাল চৌধুরী বইটির মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য সার্বিক তত্ত্বাবধায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শিল্পী মুনির খানকেও এ প্রসঙ্গে ধন্যবাদ জানাতে হয়।

বাংলাদেশের মুক্তবুদ্ধি চিন্তাবিদদের অগ্রণী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক ডক্টর আনিসুজ্জামান 'আমি বিজয় দেখেছি' বই-এর সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করে ভূমিকা লিখেছেন বলে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পরিশেষে শুধু এটুকু বলবো যে, 'আমি বিজয় দেখেছি' বইটি আমাদের উত্তরসূরিদের মনের খোরাক মিটাতে এবং অনেক অনেক বিভ্রান্তির অবসান করতে সক্ষম হলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো।

অগ্রহায়ণ ১৩৯১
রমনা ঢাকা বাংলাদেশ

এম আর আখতার মুকুল
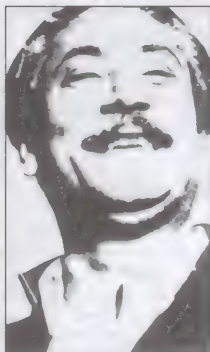
এবারের সংগ্রাম
আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম
আমাদের
স্বাধীনতার সংগ্রাম'

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সকলে জানেন এবং বোঝেন আমরা জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম?

নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এদেশের ইতিহাসকে গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনীতিক, রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবেন। কিন্তু দুঃখের সংগে বলছি বাংলাদেশের করুণ ইতিহাস, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। এই রক্তের ইতিহাস মুমূর্ষু মানুষের করুণ আর্তনাদ– এদেশের ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আয়ুব খাঁ মার্শাল ল জারি করে ১০ বছর আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আয়ুব খাঁর পতনের পরে ইয়াহিয়া এলেন। ইয়াহিয়া খান সাহেব বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন– আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সংগে দেখা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আমাদের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না। রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে সভা হবে। আমি বললাম ঠিক আছে আমরা এসেমব্লিতে বসবো। আমি বললাম, এসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করবো– এমনকি এও পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজনের মতেও যদি তা ন্যায্য কথা হয়, আমরা মেনে নেবো।

ভুট্টো সাহেব এখানে ঢাকায় এসেছিলেন আলোচনা করলেন। বলে গেলেন, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সংগে আমরা আলোচনা করলাম– আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো। সবাই আসুন, বসুন। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেমব্লি। তিনি বললেন, যারা যাবে, তাদের মেরে ফেলে দেওয়া হবে। আর যদি কেউ এসেমব্লিতে আসে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত সব জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেমব্লি চলবে। আর হঠাৎ মার্চের ১লা তারিখে এসেমব্লি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, যাবো। ভুট্টো বললেন, যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে এলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষের, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। দেশের মানুষ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলো।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। আমি বললাম, আমরা জামা কেনার পয়সা দিয়ে অস্ত্র পেয়েছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। আজ সেই অস্ত্র আমার দেশের গরিব-দুঃখী মানুষের বিরুদ্ধে– তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু– আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আমি বলেছিলাম জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। দেখে যান কিভাবে আমার গরিবের ওপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপর গুলি করা হয়েছে। কিভাবে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। কি করে মানুষ হত্যা করা হয়েছে। আপনি আসুন, আপনি দেখুন। তিনি বললেন, আমি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ডাকবো।

আমি বলেছি কিসের এসেমব্লি বসবে? কার সংগে কথা বলবো? আপনারা যারা আমার মানুষের রক্ত নিয়েছেন, তাদের সংগে কথা বলবো? পাঁচ ঘন্টা গোপন বৈঠকে সমস্ত দোষ তারা আমাদের বাংলার মানুষের ওপর দিয়েছেন, বলেছেন, দায়ী আমরা।

২৫ তারিখে এসেমব্লি ডেকেছেন। রক্তের দাগ শুকায় নাই। ১০ তারিখে বলেছি, রক্তে পাড়া দিয়ে, শহীদের ওপর পাড়া দিয়ে, এসেমব্লি খোলা চলবে না। সামরিক আইন মার্শাল-ল 'উইথড্র' করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ঢুকতে হবে। যে ভাইদের হত্যা করা হয়েছে, তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারবো কি না। এর পূর্বে এসেমব্লিতে আমরা বসতে পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশ কোর্ট-কাচারি, আদালত, ফৌজদারি আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেজন্য যে সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলি আছে, সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট ও সুপ্রিম কোর্ট, হাই কোর্ট, জজ কোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা– কোন কিছুই চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, এরপর যদি একটি গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়– তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। সৈন্যরা, তোমরা আমাদের ভাই। তোমরা ব্যারাকে থাকো, তোমাদের কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু আর তোমরা গুলি করবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগ থেকে যদ্দূর পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আওয়ামী লীগ অফিসে সামান্য টাকা- পয়সা

পৌঁছে দেবেন। আর সাতদিন হরতালে শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে ততদিন ওয়াপদার ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো– কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখুন। শত্রু পেছনে ঢুকেছে আমাদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান যারা আছে আমাদের ভাই–বাঙালি অ-বাঙালি তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের ওপর। আমাদের যেন বদনাম না হয়।

মনে রাখবেন, রেডিও যদি আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবে না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, তাহলে কর্মচারীরা টেলিভিশনে যাবেন না। দু'ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নিতে পারে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বাংলাদেশের নিউজ বাইরে পাঠানো চলবে।

এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা চলছে– বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবে। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলুন এবং আমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাহআল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। 'জয় বাংলা।'

(বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রেক্ষাপট

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত লেখক রবার্ট পেইন তাঁর চাঞ্চল্যকর 'ম্যাসাকার' (নির্দয় হত্যাকাণ্ড) পুস্তকে লিখেছেন, "... ... ... মাঝরাত নাগাদ তিনি (মুজিব) বুঝতে পারলেন যে, ঘটনাপ্রবাহের দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। তাঁর টেলিফোনটা অবিরাম বেজে চলছে, কামানের গোলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে আর দূর থেকে চিৎকারের শব্দ ভেসে আসছে। তখনও তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, কিন্তু তিনি জানতেন যে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্-এর ব্যারাকগুলো এবং রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টার আক্রান্ত হয়েছে। এর একমাত্র অর্থ হচ্ছে, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বাঙালি সশস্ত্র বাহিনীর ঘাঁটিগুলো নিশ্চিহ্ন কোরতে বদ্ধপরিকর। তাই সে রাতেই ২৬শে মার্চ তিনি দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন। সর্বত্র বেতারযোগে পাঠাবার জন্য তিনি টেলিফোনে নিম্নোক্ত বাণীটি সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসে জনৈক বন্ধুকে ডিক্‌টেশন দিলেন :

চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা মরহুম এম এ হান্নানের কাছে এই বাণী যথাসময়ে পৌঁছেছিলো।

"The Pakistani Army has attacked police lines at Rajarbagh and East Pakistan Rifels Headquarters at Pilkhana at midnight. Gather strength to resist and prepare for a War of Independence" MASSACRE by Robert Payne (Page 24) : The Macmillan Company New York. (পাকিস্তান সামরিক বাহিনী মাঝরাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং পিলখানায় পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্-এর হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করেছে। প্রতিরোধ করবার জন্য এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য শক্তি সঞ্চয় করুন) 'ম্যাসাকার' : রবার্ট পেইন (পৃঃ ২৪) : দি ম্যাকমিলান কোম্পানি, নিউইয়র্ক।

২৫শে মার্চ দিবাগত রাতে হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যা শুরু হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানিয়ে তাঁর এই সর্বশেষ বাণী প্রেরণ করলেন, তখন ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুসারে ২৬শে মার্চ শুরু হয়ে গেছে। এজন্যই ২৬শে মার্চ হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস।

এ ব্যাপারে একাত্তরের মার্চ মাসে চট্টগ্রামে অবস্থানরত দু'জন সামরিক অফিসার মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম এবং মেজর (বর্তমান অবসরপ্রাপ্ত লে. জেনারেল) মীর শওকতের ভাষ্য হচ্ছে, চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা মরহুম এম এ হান্নানের কাছে বঙ্গবন্ধুর উল্লিখিত বার্তা যথাসময়ে পৌঁছেছিলো এবং তিনি চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা সংবলিত বাণীর বরাত দিয়ে এক ভাষণ প্রচারিত করেন।

এরপর পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটলে অবস্থার মোকাবেলায় স্টাফ আর্টিস্ট বেলাল মোহাম্মদের নেতৃত্বে জনা কয়েক দুঃসাহসী বেতারকর্মী বন্দরনগরীর অপর প্রান্তে কালুরঘাটস্থ ট্রান্সমিটারে সংগঠিত করলেন 'বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র'। ২৬শে মার্চ সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে এই ঐতিহাসিক বেতারকেন্দ্রের স্বল্পকালীন অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানেই বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রেরিত স্বাধীনতা বাণীর বাংলা অনুবাদ পাঠ করলেন অধ্যাপক আবুল কাশেম সন্দ্বিপ। তখন বাংলাদেশের সর্বত্র শুরু হয়েছে রক্তাক্ত লড়াই।

পরদিন অর্থাৎ ২৭শে মার্চ এই বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের সান্ধ্যকালীন অধিবেশনের অনুষ্ঠান আবার ইথার তরংগে ভেসে এলো। এবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রচার করলেন তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান (পরবর্তীকালে লে. জেনারেল এবং প্রয়াত রাষ্ট্রপতি)। ইংরেজিতে প্রদত্ত ভাষণটি ছিলো নিম্নরূপ :

"The Government of the Sovereign State of Bangladesh. On behalf of our Great Leader, the Supreme Commander of Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman, we hereby proclaim the independence of Bangladesh. And that the Government headed by Sheikh Mujibur Rahman has already been formed. It is further proclaimed that Sheikh Mujibur Rahman is the sole leader of the elected representatives of Seventy Five Million People of Bangladesh, and the Government headed by him is the only legitimate government of the people of the Independent sovereign State of Bangladesh, which is legally and constiutionally formed, and is worthy of being recognised by all the governments of the World. I therefore, appeal on behalf of our Great Leader Sheikh Mujibur Rahman to the Governments of all the democratic countries of the World, specially the Big Powers and the neighbouring countries to recognise the legal government of Bangladesh and take offective steps to stop immediatly the aweful genocide that has been carried on by the army of occupation from Pakistan.

... ... The guiding principle of the new state will be first neutrality, second peace and third friendship to all and enmity to one. May Allah help us. Joy Bangla."

[বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে এসবই হচ্ছে ঐতিহাসিক ও বাস্তব তথ্য]
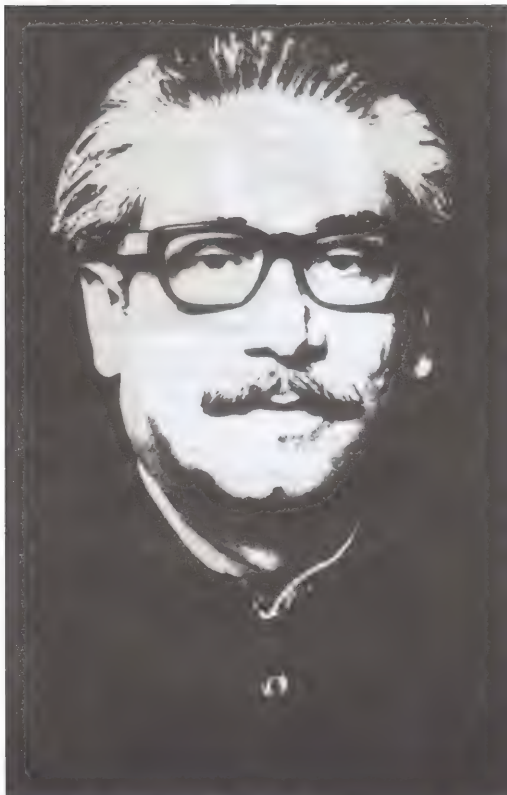
বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মুজিবনগরে গঠিত সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান মওলানা ভাসানী

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

তাজউদ্দিন আহমেদ

একনজরে নির্বাসিত মুজিবনগর সরকার

স্থাপিত : ১০ই এপ্রিল ১৯৭১
শপথ গ্রহণ : ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১
অস্থায়ী সচিবালয় : মুজিবনগর
ক্যাম্প অফিস : ৮ থিয়েটার রোড, কলকাতা
রাষ্ট্রপতি : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
(পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ছিলেন)
উপ-রাষ্ট্রপতি : সৈয়দ নজরুল ইসলাম
(অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি)
প্রধানমন্ত্রী : তাজউদ্দিন আহমেদ
অর্থমন্ত্রী : এম মনসুর আলী
স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী : এম কামরুজ্জামান
পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী : খন্দকার মোশতাক আহমদ
প্রধান সেনাপতি : মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী
চিফ অব স্টাফ : আবদুর রব
বিমানবাহিনী প্রধান : এ কে খন্দকার

[১৯৭১ সালে এম এ জি ওসমানী এবং আবদুর রব দু'জনেই অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই দু'জনকেই জেনারেল (অবঃ) পদে উন্নীত করেন।]

বিশেষ দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ

তথ্য, বেতার ও প্রচার : আবদুল মান্নান এমএনএ
সাহায্য ও পুনর্বাসন : অধ্যাপক ইউসুফ আলী এমএনএ
ভলান্টিয়ার কোর : ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম এমএনএ
বাণিজ্য বিষয়ক : মতিউর রহমান এমএনএ

অস্থায়ী সচিবালয়ে বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মচারীবৃন্দ

সেক্রেটারি জেনারেল : রুহুল কুদ্দুস
অর্থ সচিব : খন্দকার আসাদুজ্জামান
ক্যাবিনেট সচিব : তওফিক ইমাম
প্রতিরক্ষা সচিব : আবদুস সামাদ
পররাষ্ট্র সচিব : মাহবুবুল আলম চাষী (নভেম্বর পর্যন্ত)
: এফতেহ্

তথ্য সচিব : আনোয়ারুল হক খান
সংস্থাপন সচিব : নুরুল কাদের খান
স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশ প্রধান : আবদুল খালেক
কৃষি সচিব : নুরুদ্দীন আহমদ
বহির্বিশ্বে বিশেষ দূত : বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
নয়া দিল্লিতে মিশন প্রধান : হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী
কলকাতায় মিশন প্রধান : হোসেন আলী [মরহুম]
পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান : ড. মোজাফ্‌ফর আহমদ
পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ : ড. মোশাররফ হোসেন
: ড. আনিসুজ্জামান
: ড. সারোয়ার মুর্শেদ
: ড. স্বদেশ রঞ্জন
বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির প্রধান : ড. এ আর মল্লিক
ইয়থ ক্যাম্প-এর পরিচালক : উইং কমান্ডার (অবঃ) এস আর মির্জা
পরিচালক, তথ্য ও প্রচার দফতর : এম আর আখতার মুকুল
পরিচালক, চলচ্চিত্র বিভাগ : এ খয়ের
পরিচালক, আর্টস ও ডিজাইন : কামরুল হাসান [মরহুম]
রিলিফ কমিশনার : শ্রী জে জি ভৌমিক
পরিচালক, মেডিক্যাল বিষয়ক : ডাক্তার টি হোসেন
সহকারী পরিচালক, মেডিক্যাল : ডাক্তার আহমদ আলী

মন্ত্রিসভার সদস্যদের ব্যক্তিগত স্টাফ

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির একান্ত সচিব : কাজী লুৎফুল হক [মরহুম]
প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব : ড. ফারুক আজিজ খান
পি আর ও : আলী তারেক
স্টাফ অফিসার : মেজর নূরুল ইসলাম
[পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল (অবঃ)]
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একান্ত সচিব : মামুনুর রশিদ
পি আর ও : রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী
অর্থমন্ত্রীর একান্ত সচিব : সা'দত হোসাইন
কলকাতার মিশনে তথ্য অফিসার : জোয়াদুল করিম
: আমিনুল হক বাদশা

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর একান্ত সচিব	কামাল সিদ্দিকী [ড.]
পি আর ও	কুমার শংকর হাজরা
প্রধান সেনাপতির দু'জন এডিসি	ক্যাপ্টেন নূর
	লে. শেখ কামাল [মরহুম]
প্রধান সেনাপতির পি আর ও	মোস্তাফা আল্লামা
উপ-সচিব, দেশরক্ষা	আকবর আলী খান
উপ-সচিব, সংস্থাপন	ওয়ালীউল ইসলাম
উপ-সচিব, স্বরাষ্ট্র	খোরশেদুজ্জামান চৌধুরী
ট্রান্সপোর্ট অফিসার	এম এইচ সিদ্দিকী
বেতারকেন্দ্রের অনুষ্ঠানের দায়িত্বে	আশফাকুর রহমান খান
	শহীদুল ইসলাম, টি এইচ শিকদার
	বেলাল মোহাম্মদ ও তাহের সুলতান
বাংলা সংবাদের দায়িত্বে	কামাল লোহানী
ইংরেজি সংবাদের দায়িত্বে	আলী জাকের
ইংরেজি সংবাদ পর্যালোচনা	আলমগীর কবীর [মরহুম]
উর্দু অনুষ্ঠানের দায়িত্বে	জাহিদ সিদ্দিকী [মরহুম]
সঙ্গীতের দায়িত্বে	সমর দাস ও অজিত রায়
নাটকের দায়িত্বে	হাসান ইমাম, রণেন কুশারী ও
	মোস্তফা আনোয়ার
ও বি ও সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান	আশরাফুল আলম
প্রকৌশলীর দায়িত্বে	সৈয়দ আবদুস শাকের
	রেজাউল করিম চৌধুরী

বিভিন্ন জোনের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

দক্ষিণ-পূর্ব জোন	অধ্যাপক নুরুল ইসলাম চৌধুরী এমএনএ [মরহুম]
	জহুর আহমদ চৌধুরী এমএনএ
উত্তর-পূর্ব জোন	দেওয়ান ফরিদ গাজী এমএনএ
	শামসুর রহমান খান
পূর্ব জোন	এম এ রব এমএনএ
উত্তর জোন	মতিউর রহমান এমএনএ ও এ রউফ এমএনএ
পশ্চিম জোন	আজিজুর রহমান ও আশরাফুল ইসলাম এমএনএ
দক্ষিণ-পশ্চিম জোন	এম এ রউফ চৌধুরী এমএনএ
	ফনী মজুমদার এমপিএ [প্রয়াত]

জোনাল অফিসে কর্মরত বেসামরিক অফিসারবৃন্দ

এস এ সামাদ (শিলং, দঃ-পূর্ব জোন-১), কে আর আহমদ (আগরতলা, দঃ-পূর্ব জোন-২), ডা. কে এ হাসান (আগরতলা, পূর্ব জোন), এস এইচ চৌধুরী (আগরতলা, উঃ-পূর্ব জোন-১), মোঃ লুৎফর রহমান (তুরা, উঃ-পূর্ব জোন-২) ফয়েজ উদ্দীন আহমদ (কুচবিহার, উত্তর জোন), এ খসরু (গঙ্গারামপুর, পশ্চিম জোন), শামসুল হক (কৃষ্ণনগর দঃ-পশ্চিম জোন) এবং এ মোমিন (বারাসাত, দক্ষিণ জোন)

একাত্তরের ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের আম্রকাননে (নতুন নামকরণ মুজিবনগর) গণপ্রজাতন্ত্রী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম মুক্তিবাহিনীর প্রদত্ত গার্ড অব অনারের অভিবাদন গ্রহণ করেন। সেদিন জনা তিরিশেক পুলিশ ও আনসারের সমন্বয়ে গঠিত মুক্তিবাহিনীর একটি প্লাটুনের দেয়া এই গার্ড অব অনারের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঝিনাইদহের তৎকালীন এসডিপিও মাহবুব উদ্দিন আহমেদ। উল্লেখ্য যে, মুজিবনগর মন্ত্রিসভার এই প্রকাশ্য শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত ছিলেন মেহেরপুরের তদানীন্তন এসডিও তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী। সার্বক্ষণিক সহযোগিতায় ছিলেন ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের অধ্যাপক শফিকুল্লাহ। এঁদেরই নেতৃত্বে এতদাঞ্চলে শুরু হয়েছিলো এক ভয়াবহ পাল্টা আক্রমণ।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের নির্দেশে তৎকালীন পরিষদ সদস্য জনাব আব্দুল মান্নান ও ডা. আহসাবুল হক এবং ছাত্রনেতা নুরে আলম সিদ্দিকী ছাড়াও হেডকোয়ার্টারের বেশ কিছু সংখ্যক সামরিক ও বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে এবং এই তিন অফিসারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশ-বিদেশের শতাধিক সাংবাদিকের উপস্থিতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রিসভার ঐতিহাসিক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্ভব হয়েছিলো। পরবর্তীতে তৌফিক-ই-এলাহী, মাহবুবউদ্দীন, প্রকৌশলী কমল সিদ্দিকী বীর প্রতীক এবং শফিউল্লাহ ৮ নম্বর সেক্টরে প্রথমে মেজর আবু ওসমান চৌধুরী এবং পরে মেজর এম এ মঞ্জুরের অধীনে পৃথক পৃথক সাব-সেক্টর কমান্ডার হিসাবে লড়াইয়ের ময়দানে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছিলেন। উপরন্তু এঁরাই আবার ৯ই ডিসেম্বর মিত্রবাহিনীর সহযোগিতায় বিদেশী সাংবাদিকসহ মুজিবনগর মন্ত্রিসভার সদস্যদের সদ্যমুক্ত যশোর শহরে আগমনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

রণাঙ্গনের ১১টি সেক্টর

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ব্যাপক ও জোরদার করার উদ্দেশ্যে নির্বাসিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ রণাঙ্গনকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করেছিলেন। প্রতিটি সেক্টরে একজন করে অধিনায়ক নিযুক্ত করে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিলো। তবে যুদ্ধের মৌলিক নীতি নির্ধারণ ও সার্বিক দায়িত্ব ছিলো মুজিবনগর সরকারের। নিচে সেক্টরগুলোর নাম ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কমান্ডারদের নাম দেয়া হলো।

এক নম্বর সেক্টর : ১ মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-জুন)

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম : ২ মেজর মোহাম্মদ রফিক (জুন-ডিসেম্বর)

এবং ফেনী নদী পর্যন্ত

দুই নম্বর সেক্টর : ১ মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর)

নোয়াখালী জেলা, কুমিল্লা জেলার আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত এবং ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশ : ২ মেজর এ টি এম হায়দার (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)

তিন নম্বর সেক্টর : ১ মেজর কে এম শফিউল্লাহ্ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর)

আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন থেকে পূর্ব দিকের কুমিল্লা জেলা, সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা এবং ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমা ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ : ২ নুরুজ্জামান (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)

চার নম্বর সেক্টর : ১ মেজর সি আর দত্ত

সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, খোয়াই, শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন থেকে পূর্ব ও উত্তর দিকে সিলেট-ডাউকি সড়ক

পাঁচ নম্বর সেক্টর : ১ মেজর মীর শওকত আলী

সিলেট জেলার পশ্চিম এলাকা। এবং সিলেট-ডাউকি এলাকা এবং সিলেট ডাউকি সড়ক থেকে সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ সড়ক থেকে ময়মনসিংহ জেলার সীমানা

ছয় নম্বর সেক্টর ১ উইং কমান্ডার এম বাশার

ব্রহ্মপুত্র নদের তীরাঞ্চল ছাড়া সমগ্র রংপুর জেলা ও দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও

সাত নম্বর সেক্টর : ১ মেজর কাজী নুরুজ্জামান

সমগ্র রাজশাহী জেলা, ঠাকুরগাঁও মহকুমা ছাড়া দিনাজপুর জেলার বাকি অংশ এবং ব্রহ্মপুত্র নদের তীরাঞ্চল ছাড়া সমগ্র বগুড়া ও পাবনা জেলা

আট নম্বর সেক্টর
সমগ্র কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা এবং ফরিদপুরের অংশবিশেষ ছাড়াও দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত খুলনা জেলার এলাকা
: ১ মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (আগস্ট পর্যন্ত)
: ২ মেজর এম এ মঞ্জুর (আগস্ট থেকে ডিসেম্বর)

নয় নম্বর সেক্টর
সাতক্ষীরা দৌলতপুর সড়কসহ খুলনা সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল এবং বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা
১ মেজর এ জলিল (ডিসেম্বরের অর্ধেক পর্যন্ত)
২ মেজর এম এ মঞ্জুর (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

দশ নম্বর সেক্টর
অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ এবং সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম ও চালনা
: মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিংপ্রাপ্ত নৌ-কমান্ডাররা যখন যে সেক্টরে এ্যাকশন করেছেন, তখন সেসব সেক্টর কমান্ডারদের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করেছে।

এগারো নম্বর সেক্টর
কিশোরগঞ্জ ছাড়া সমগ্র ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইল জেলা
: ১ মেজর আবু তাহের (৩রা নভেম্বর পর্যন্ত)
: ২ ফ্লাইট লে. এম হামিদুল্লাহ (স্বাধীনতা পর্যন্ত)

অতিরিক্ত টাঙ্গাইল সেক্টর
টাঙ্গাইল জেলা ছাড়াও ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার অংশ
: ১ স্বঘোষিত কমান্ডার কাদের সিদ্দিকী (মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এই বাহিনী মুজিবনগর সরকারের আনুগত্য স্বীকার করে। সদস্য সংখ্যা প্রায় পনেরো হাজারের মতো এবং এ্যাকশন ও লড়াইয়ের সংখ্যা প্রায় তিন শতাধিক)

বিমানবাহিনী প্রধান : গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার

ব্রিগেড আকারে তিনটি ফোর্স গঠন

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে আরো জোরদার করার জন্য প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের উদ্যোগে মুজিবনগর সরকার ১১টি সেক্টর ও টাঙ্গাইলের অতিরিক্ত সেক্টর ছাড়াও জুন মাস নাগাদ ব্রিগেড আকারে তিনটি ফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে প্রধান সেনাপতি এম এ জি ওসমানী তিনটি ফোর্স গঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মুক্তিবাহিনীর তিনজন শ্রেষ্ঠ সেক্টর কমান্ডারের নাম অনুসারে এই তিনটি ফোর্সের নামকরণ করা হয় 'জেড' ফোর্স, 'এন' ফোর্স এবং 'কে' ফোর্স। তিনজন কমান্ডার হচ্ছেন যথাক্রমে জিয়াউর রহমান, কে এম শফিউল্লাহ এবং খালেদ মোশাররফ। নিম্নে এই তিনটি ফোর্সের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

নাম	অধিনায়কের নাম	দায়িত্বকাল
১ 'জেড' ফোর্স	: লে. কর্নেল জিয়াউর রহমান	জুলাই-ডিসেম্বর
২ 'এস' ফোর্স	: লে. কর্নেল কে এম শফিউল্লাহ	সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর
৩ 'কে' ফোর্স	: ১ লে. কর্নেল খালেদ মোশাররফ ২ নভেম্বর মাসে খালেদ মোশাররফ যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত হলে মেজর আবু সালেক অস্থায়ীভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।	সেপ্টেম্বর-নভেম্বর

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সামরিক অফিসারদের তালিকা

[বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর সুদীর্ঘ প্রায় ত্রিশ বছর গত হয়েছে কিন্তু আজও পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের একটা পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করা হয়নি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। রণাঙ্গনের এক নম্বর সেক্টরের এককালীন কমান্ডার মেজর (অবঃ) রফিক-উল-ইসলাম (বীর উত্তম) সম্প্রতি তাঁর প্রকাশিত 'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে' পুস্তকে বিভিন্ন সেক্টরের বাঙালি সামরিক অফিসারদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন। সেটাকেই ভিত্তি করে এখানে কিছুটা বিস্তারিতভাবে সামরিক অফিসারদের একটি তালিকা এবং সেক্টরভিত্তিক কমান্ডারদের নাম, সময়কাল উপস্থাপন করা হলো। -লেখক]

হেডকোয়ার্টার

জেনারেল (অবঃ) এম এ জি ওসমানী (সশস্ত্র মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি)
এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার, বীর উত্তম
মেজর জেনারেল আবদুর রব, বীর উত্তম (মরহুম)
মেজর জেনারেল (অবঃ) নুরুল ইসলাম
কর্নেল (অবঃ) এ টি এম সালাউদ্দিন, বীর প্রতীক
উইং কমান্ডার শামসুল আলম, বীর উত্তম
লে. ক. (অবঃ) এম এ ওসমান চৌধুরী
লে. ক. এনামুল হক (মরহুম)
লে. ক. এম আবদুল মালেক মোল্লা
স্কোয়াড্রন লিডার (অবঃ) বদরুল আলম, বীর উত্তম
মেজর ফজলুর রহমান
মেজর (অবঃ) ফাত্তাহ চৌধুরী
ফ্লা. লে. মতিউর রহমান, বীরশ্রেষ্ঠ (শহীদ)
মেজর শামসুল আলম, বীর প্রতীক

ক্যাপ্টেন এস মঈনুদ্দিন আহমদ, বীর প্রতীক

লে. শেখ কামাল ('৭৫-এর সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত)

এক নম্বর সেক্টর ও 'জেড' ফোর্স

লে. জে, জিয়াউর রহমান, বীর উত্তম, পি এস সি, ফোর্স কমান্ডার, জেড ফোর্সের অধিনায়ক ('৮১তে চট্টগ্রামে বিদ্রোহী সামরিক অফিসারদের হাতে নিহত)

ব্রিগেডিয়ার মহসীনউদ্দীন আহমদ, বীর বিক্রম, পি এস সি, (প্রাক্তন ১ নম্বর সেক্টর) ('৮১তে সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড)

ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) এ জে এম আমিনুল হক, বীর উত্তম (প্রাক্তন ২ নম্বর সেক্টর)

কর্নেল (অবঃ) সাফায়াত জামিল, বীর বিক্রম (প্রাক্তন ১ নম্বর সেক্টর)

কর্নেল (অবঃ) আনোয়ার হোসেন, বীর প্রতীক

কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদ, বীর বিক্রম (প্রাক্তন ১ নম্বর সেক্টর)

কর্নেল আমিন আহমদ চৌধুরী, বীর বিক্রম, পি এস সি

কর্নেল (অবঃ) বি জি পাটোয়ারী, বীর প্রতীক, পি এস সি

লে. কর্নেল মাহবুবুল আলম, বীর প্রতীক

লে. কর্নেল (অবঃ) মোদাচ্ছের হোসেন খান, বীর প্রতীক

লে. কর্নেল এস এম ফজলে হোসেন

লে. কর্নেল সাদেক হোসেন

লে. কর্নেল এস আই এম বি নূরুন্নবী খান, বীর বিক্রম (চাকরিচ্যুত)

লে. কর্নেল (অবঃ) এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী, বীর বিক্রম

লে. কর্নেল আবদুল হালিম

লে. কর্নেল এম জিয়াউদ্দীন, বীর উত্তম (রিলিজড)

মেজর (অবঃ) এ কাইউম চৌধুরী

মেজর (অবঃ) আনিসুর রহমান

মেজর (অবঃ) সৈয়দ মনিবুর রহমান

মেজর (অবঃ) মনজুর আহমেদ, বীর প্রতীক

মেজর ওয়ালিউল ইসলাম, বীর প্রতীক (প্রাক্তন ১ নম্বর সেক্টর)

মেজর হাফিজুদ্দিন, বীর বিক্রম

স্কোয়াড্রন লিডার (অবঃ) লিয়াকত, বীর উত্তম

মেজর (অবঃ) ওয়াকার হাসান, বীর প্রতীক
ক্যাপ্টেন মাহবুবুর রহমান, বীর উত্তম (শহীদ)
ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন মমতাজ, বীর উত্তম (শহীদ)
লে. রফিক আহমদ সরকার (শহীদ)
লে. ইমদাদুল হক, বীর উত্তম (শহীদ)
মেজর (অবঃ) রফিক-উল-ইসলাম, বীর উত্তম, সেক্টর কমান্ডার
মেজর জেনারেল শামসুল হক, এ এম সি পরে হেডকোয়ার্টার বি ডি এফ
ব্রিগেডিয়ার হারুন আহমেদ চৌধুরী, বীর উত্তম
লে. (অবঃ) খুরশিদউদ্দিন আহমেদ
লে. ক. আবু ইউসুফ মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, বীর বিক্রম, পি এস সি (১৯৮১তে সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড)
এয়ার কমডোর সুলতান মাহমুদ, বীর উত্তম, পি এস সি (পরে হেডকোয়ার্টার বি ডি এফ)
উইং কমান্ডার শাখাওয়াত হোসেন
মেজর (অবঃ) এনামুল হক
মেজর (অবঃ) শমসের মবিন চৌধুরী, বীর বিক্রম
মেজর (অবঃ) কামরুল ইসলাম
মেজর লতিফুল আলম চৌধুরী
মেজর শওকত আলী, বীর প্রতীক (চাকরিচ্যুত)
মেজর ফজলুর রহমান
মেজর রকিবুল ইসলাম
ক্যাপ্টেন আফতাব কাদের, বীর উত্তম (শহীদ)
ক্যাপ্টেন শামসুল হুদা (মৃত)
ক্যাপ্টেন মনসুরুল আমিন (চাকরিচ্যুত)

সেক্টর নম্বর ২ এবং 'কে' ফোর্স

মে. জে. খালেদ মোশাররফ, বীর উত্তম, সেক্টর কমান্ডার ('কে' ফোর্সের অধিনায়ক)
ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) এম এ মতিন, বীর প্রতীক
কর্নেল আনোয়ারুল আলম
কর্নেল (অবঃ) শওকত আলী
কর্নেল আইনুদ্দিন, বীর প্রতীক
কর্নেল এম আশরাফ হোসেন, পি এস সি
লে. ক. গাফ্‌ফার, বীর উত্তম (অবঃ)
লে. কর্নেল (অবঃ) বাহার

লে. কর্নেল এ টি এম হায়দার ('৭৫-এর সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত)
লে. ক. মাহবুবুর রহমান, বীর উত্তম ('৮১-তে সামরিক বিদ্রোহে নিহত)
লে. ক. হারুনুর রশীদ, বীর প্রতীক
লে. ক. ফজলুল কবীর
লে. ক. ফজলুল কবীর, বীর প্রতীক
লে. ক. ফজলুল কবীর
লে. ক. (অবঃ) আকবর হোসেন, বীর প্রতীক
লে. ক. (অবঃ) জাফর ইমাম, বীর বিক্রম
লে. ক. দিদারুল আলম, বীর প্রতীক (চাকরিচ্যুত)
লে. ক. শহীদুল ইসলাম, বীর প্রতীক
লে. ক. এ টি এম আবদুল ওয়াহাব, পি এস সি
লে. ক. (অবঃ) মোখলেছুর রহমান
লে. ক. মোস্তফা কামাল
লে. ক. (অবঃ) জয়নুল আবেদীন
মেজর মালেক
মেজর সালেক চৌধুরী, বীর উত্তম (মরহুম)
মেজর (অবঃ) এ আজীজ পাশা
মেজর (অবঃ) বজলুল হুদা
মেজর (অবঃ) দিদার আনোয়ার হোসেন
মেজর সৈয়দ মিজানুর রহমান (চাকরিচ্যুত)
মেজর (অবঃ) হাশমী মোস্তাফা কামাল
মেজর জামিলউদ্দীন এহসান, বীর প্রতীক
মেজর জিলুর রহমান
ক্যাপ্টেন (অবঃ) হুমায়ুন কবীর, বীর প্রতীক
ক্যাপ্টেন (অবঃ) আখতার, বীর প্রতীক
ক্যাপ্টেন (অবঃ) সেতারা বেগম, বীর প্রতীক
ক্যাপ্টেন (অবঃ) মমতাজ হাসান, বীর প্রতীক
লে. (অবঃ) শাহ্রিয়ার হুদা
লে. আজিজুল ইসলাম, বীর বিক্রম (শহীদ)

সেক্টর নম্বর ৩ এবং 'এস' ফোর্স

মেজর জেনারেল (অবঃ) কে এম শফিউল্লাহ, বীর উত্তম, পি এস সি, সেক্টর কমান্ডার (পরবর্তীকালে এস ফোর্সের অধিনায়ক)

ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) নূরুজ্জামান, বীর উত্তম
মেজর জেনারেল মঈনুল হোসেন চৌধুরী, বীর বিক্রম
ব্রিগেডিয়ার এ এস এম নাসিম, বীর বিক্রম, পি এস সি
কর্নেল আবদুল মতিন, বীর প্রতীক, পি এস সি
কর্নেল মতিউর রহমান, বীর প্রতীক
কর্নেল সুবেদ আলী ভুঁইয়া, পি এস সি
কর্নেল আজিজুর রহমান, বীর উত্তম, পি এস সি
লে. ক. গোলাম হেলাল মোর্শেদ খান, বীর বিক্রম, পি এস সি
লে. কর্নেল এজাজ আহমেদ চৌধুরী
লে. ক. ইব্রাহিম, বীর প্রতীক
লে. ক. (অবঃ) আবদুল মান্নান, বীর বিক্রম
মেজর মনসুর আমিন মজুমদার
মেজর আবুল হোসেন
মেজর শামসুল হুদা বাচ্চু
মেজর নজরুল ইসলাম, বীর প্রতীক
মেজর (অবঃ) নাসিরুদ্দিন
মেজর কামাল
মেজর সাঈদ আহমেদ, বীর প্রতীক
মেজর সৈয়দ আবু সাদেক
ক্যাপ্টেন মঈন
ক্যাপ্টেন আহমেদ আলী
লে. (অবঃ) আনিস হাসান
লে. কবিরুদ্দিন (চাকরিচ্যুত)
লে. সেলিম হাসান (শহীদ)

সেক্টর নম্বর ৪

মেজর জেনারেল (রিলিজড্) সি আর দত্ত, বীর উত্তম, সেক্টর কমান্ডার
কর্নেল আবদুর রব, পি এস সি
লে. ক. (অবঃ) শরিফুল হক ডালিম, বীর উত্তম
স্কোয়াড্রন লিডার (অবঃ) কাদের
লে. ক. (অবঃ) খায়রুল আলম
লে. ক. (অবঃ) এ এম রশিদ চৌধুরী, বীর প্রতীক
লে. ক. (অবঃ) সাজ্জাদ আলী জহির, বীর প্রতীক

লে. ক. (অবঃ) এ এম হেলালুদ্দিন, পি এস সি
মেজর (অবঃ) আব্দুর জলিল
মেজর (অবঃ) নিরঞ্জন ভট্টাচার্য (অবঃ)
মেজর (অবঃ) জহুরুল হক, বীর প্রতীক
মেজর ওয়ারলউজ্জামান
লে. আতাউর রহমান

সেক্টর নম্বর ৫
লে. জে. (অবঃ) মীর শওকত আলী, বীর উত্তম, পি এস সি, সেক্টর কমান্ডার
মেজর (অবঃ) মোসলেমউদ্দীন
মেজর তাহেরুদ্দিন আখুঞ্জি
মেজর এস এম খালেদ (চাকরিচ্যুত)
মেজর আবদুর রউফ, বীর বিক্রম
মেজর মাহবুবুর রহমান
ক্যাপ্টেন হেলাল

সেক্টর নম্বর ৬
এয়ার ভাইস মার্শাল এম কে বাশার, বীর উত্তম (বোমারু বিমান দুর্ঘটনায় নিহত)
এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) সদরুদ্দিন, বীর প্রতীক
কর্নেল নওয়াজেসউদ্দিন, পি এস সি (৮১তে সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড)
লে. ক. নজরুল হক, বীর প্রতীক
লে. ক. (অবঃ) সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান
লে. ক. মতিউর রহমান, বীর বিক্রম, পি এস সি (মরহুম)
মেজর মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্
মেজর মাসুদুর রহমান, বীর প্রতীক
মেজর মেজবাহ্উদ্দিন আহমেদ, বীর বিক্রম
মেজর আবদুল মতিন
লে. সামাদ, বীর উত্তম (শহীদ)
ফ্লা. লে. ইকবাল

সেক্টর নম্বর ৭
লে. কর্নেল (অবঃ) কাজী নুরুজ্জামান, বীর উত্তম, সেক্টর কমান্ডার
ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী, বীর বিক্রম, পি এস সি
কর্নেল এম আবদুর রশিদ, বীর প্রতীক, পি এস সি (৮১তে সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড)
মেজর নাজমুল হক (মরহুম)
মেজর বজলুর রশিদ (চাকরিচ্যুত)

মেজর আবদুল কাইয়ুম খান (চাকরিচ্যুত)
মেজর (অবঃ) এ মতিন চৌধুরী
মেজর আমিনুল ইসলাম
মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম
মেজর (অবঃ) আউয়াল চৌধুরী
ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, বীরশ্রেষ্ঠ (শহীদ)
ক্যাপ্টেন (অবঃ) কায়সার হক
ক্যাপ্টেন (অবঃ) ইদ্রিস

সেক্টর নম্বর ৮

মেজর জেনারেল এম এ মঞ্জুর, বীর উত্তম, পি এস সি, সেক্টর কমান্ডার ('৮১তে সামরিক বিদ্রোহ ঘটাতে গিয়ে নিহত)
ব্রিগেডিয়ার শামসুদ্দিন আহমেদ
কর্নেল এস হুদা, বীর বিক্রম (মরহুম)
লে. কর্নেল এ আর আজম চৌধুরী, বীর প্রতীক
লে. কর্নেল মুস্তাফিজুর রহমান, বীর বিক্রম
মেজর এন শফিউল্লাহ, বীর বিক্রম
মেজর অলিক কুমার গুপ্ত, বীর প্রতীক
মেজর ফজলুর রহমান
মেজর মুজিবুর রহমান
স্কোয়াড্রন লিডার ইকবাল রশীদ
মেজর (অবঃ) মোহাম্মদ মোতালেব
মেজর রওশন ইয়াজদানী, বীর প্রতীক ('৮১তে সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড)
ফ্ল. লে. জামালুদ্দিন চৌধুরী
ক্যাপ্টেন তৌফিক-ই-এলাহি চৌধুরী
ক্যাপ্টেন আবদুল ওয়াহাব
ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম

সেক্টর নম্বর ৯

মেজর (অবঃ) এম এ জলিল, সেক্টর কমান্ডার
মেজর জিয়াউদ্দিন (চাকরিচ্যুত)
মেজর (অবঃ) শাহজাহান, বীর উত্তম
মেজর (অবঃ) মেহেদী আলী ইমাম, বীর বিক্রম
মেজর আহসানউল্লাহ (চাকরিচ্যুত)
ক্যাপ্টেন (অবঃ) শচীন কর্মকার
মেজর সৈয়দ কামালুদ্দীন
মেজর সৈয়দ (অবঃ) নুরুল হুদা

সেক্টর নম্বর ১১
কর্নেল এম আবু তাহের, বীর উত্তম, সেক্টর কমান্ডার (সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড)
লে. ক. আবদুল আজিজ, পি এস সি
উইং কমান্ডার (অবঃ) হামিদুল্লাহ্, বীর প্রতীক
মেজর নূরুন নবী
মেজর তাহের আহমেদ, বীর প্রতীক
মেজর (অবঃ) মোঃ আসাদুজ্জামান
মেজর (অবঃ) মাহবুবুর রহমান
মেজর গিয়াস আহমেদ ('৮১তে সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড)
মেজর মইনুল ইসলাম (চাকরিচ্যুত)

অতিরিক্ত সেক্টর
কাদেরিয়া বাহিনী
ব্রিগেডিয়ার (স্ব-ঘোষিত) কাদের সিদ্দিকী
(১৯৭৫ সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর বিদেশে অবস্থান)
[জামালপুর, নেত্রকোনার অংশবিশেষ, সমগ্র ময়মনসিংহ (কিশোরগঞ্জ ছাড়া) ও টাঙ্গাইল জেলা (আরিচা-নগরবাড়ী থেকে ফুলছড়ি-বাহাদুরাবাদ পর্যন্ত যমুনা নদীর সর্বত্র) এবং মানিকগঞ্জ ও ঢাকা জেলার উত্তরাঞ্চল এলাকায় প্রায় ১৭ হাজার কাদেরিয়া বাহিনী সংগঠন করে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বহু সংখ্যক লড়াইয়ে জয়লাভের দাবিদার এই কাদের সিদ্দিকী। এঁর অপর কৃতিত্ব হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই বরাবর অবস্থান এবং পাকিস্তানি বাহিনীর বিপুল সমরাস্ত্র দখলপূর্বক লড়াই। উপরন্তু সমস্ত সেক্টর কমান্ডারদের মধ্যে একমাত্র কাদের সিদ্দিকীই একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর সর্বপ্রথম স্বীয় বাহিনীসহ ঢাকায় প্রবেশ করেন। -লেখক]

বাংলাদেশ বিমানবাহিনী (স্থাপিত : ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৭১)
১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর দুঃসাহসিক ভূমিকার বিবরণ দেয়ার প্রাক্কালে কি রকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই বিমানবাহিনী স্থাপিত হয়েছিলো, তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উপস্থাপিত করা বাঞ্ছনীয়। প্রাপ্ত নথিপত্রের ভিত্তিতে সংক্ষেপে এটুকু বলা যায় যে, ১৯৭১ সালে মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকারের নেতৃত্বে ঢাকায় অবস্থানকারী বাঙালি পাইলট ও টেকনিশিয়ানরা এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, প্রয়োজন দেখা দিলে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তাই অবিলম্বে এ ব্যাপারে প্রস্তুতি গ্রহণ অপরিহার্য।

এ কে খন্দকারের তখন পোস্টিং ছিল পাকিস্তান এয়ারফোর্সের তেজগাঁও এয়ারবেস-এ। এই সংকটপূর্ণ সময়ে জনাব খন্দকারকে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসেন উইং কমান্ডার এম কে বাশার, স্কোয়াড্রন লিডার এম সদরুদ্দীন, ফ্লা. লে. সুলতান মাহমুদ, ফ্লা. লে. এম হামিদুল্লাহ্, ফ্লা. লে. মতিউর রহমান এবং কিছুসংখ্যক

টেকনিশিয়ান। একাত্তরের মার্চ মাসে বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালি পাইলট অফিসার বাৎসরিক ছুটি কাটাবার জন্য বাংলাদেশে অবস্থান করেছিলেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক এইসব পাইলটদের সংগে যোগাযোগ করার দায়িত্ব ফ্লা. লে. মতিউর রহমানের ওপর অর্পিত হয় এবং তিনি অনতিবিলম্বে এই কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে পালন করেন।

ফলে পাকিস্তান এয়ারফোর্সের মোট ১৮ জন দক্ষ পাইলট এবং প্রায় ৫০ জন টেকনিশিয়ান ও একজন কুক মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সম্মতি দান করেন। এরপর একটা নির্দিষ্ট দিনে ডিফেক্ট' করে সীমান্তবর্তী এলাকার নির্দিষ্ট স্থানে জমায়েত হওয়ার জন্য এঁদের খবর দেয়া হয়। পাকিস্তান এয়ারফোর্সের এই ১৮ জন পাইলট অফিসাররা হোচ্ছেন :

১ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার
২ উইং কমান্ডার এ কে এম বাশার
৩ স্কোয়াড্রন লিডার এম সদরুদ্দীন
৪ ফ্লা. লে. সুলতান মাহমুদ
৫ ফ্লা. লে. এম লিয়াকত
৬ ফ্লা. লে. এম হামিদুল্লাহ
৭ ফ্লা. লে. মতিউর রহমান
৮ ফ্লা. লে. শাখাওয়াত হোসেন
৯ ফ্লা. লে. ইকবাল রশীদ
১০ ফ্লা. লে. আশরাফুল ইসলাম
১১ ফ্লা. লে. আতাউর রহমান
১২ ফ্লা. লে. ওয়ালীউল্লাহ
১৩ ফ্লা. লে. এম রউফ
১৪ ফ্লা. লে. এম কামাল
১৫ ফ্লা. লে. এম কামাল
১৬ ফ্লা. লে. মীর ফজলুর রহমান
১৭ ফ্লা. লে. শামসুল আলম
১৮ ফ্লা. লে. বদরুল আলম

নির্দিষ্ট দিনে সীমান্তের নির্দিষ্ট স্থানে পি এ এফ– মোট ১৭ জন 'ডিফেক্ট' করা অফিসার ও ৫০ জন্য টেকনিশিয়ান একত্রিত হলেন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে বৈমানিক সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ছিলেন এবং যিনি প্রস্তুতি পর্বে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করেছিলেন সেই ফ্লা. লে. মতিউর রহমান অনুপস্থিত। পরে জানা যায় যে, গ্রামের শ্বশুরবাড়িতে তিনি স্ত্রী ও সন্তানদের কাছে বিদায় গ্রহণ করতে গেলে আত্মীয়-স্বজনরা তাঁকে এই ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য চাপ দেয় এবং তাঁর যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত করে। এরপর বলতে গেলে কড়া প্রহরায় মতিউর রহমানকে তাঁর পরিবারসহ ঢাকায় এনে করাচিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

ফ্লা. লে. মতিউর রহমান করাচিতে যাওয়ার পওে 'ডিফেক্ট' করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকেন। ১৯৭১ সালের ২০শে আগস্ট তারিখে

ইনস্ট্রাক্টর হিসাবে একটি জঙ্গি বিমানে জৈনক অবাঙালি 'ক্যাডেটকে' শিক্ষাপ্রদানকালীন দুঃসাহসিক দক্ষতা প্রদর্শন করে 'রাডারের' দৃষ্টি এড়িয়ে সীমান্ত অতিক্রমের প্রচেষ্টা করেন। কিন্তু উক্ত 'ক্যাডেট' পরিস্থিতি উপলব্ধি করে তাঁকে বাধা দান করে। ফলে পশ্চিম পাকিস্তান-ভারত সীমানার মাত্র কয়েক মিনিট ফ্লাইট সময়ের মধ্যে এসেও বিমানটি বিধ্বস্ত হলে উভয়ে নিহত হন। শহীদ ফ্লা. লে. মতিউর রহমানই হচ্ছেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম বীরশ্রেষ্ঠ। এদিকে গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দকারের নেতৃত্বে পাকিস্তান এয়ারফোর্স থেকে 'ডিফেক্ট' করা ১৭ জন বৈমানিক এবং ৫০ জন টেকনিশিয়ান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মুজিবনগর সরকারের কাছে রিপোর্ট করেন। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে এদের গোপনে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং শত্রুর ওপর আঘাত হানার জন্য রানওয়ে ও প্রয়োজনীয় বিমানের অভাব দেখা দেয়। এই প্রেক্ষাপটে এসব বৈমানিকরা আপাতত স্থলবাহিনীর সাথে কাঁধ মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। ইতিমধ্যে বিমানবাহিনীর আরও কয়েকজন অফিসার মুজিবনগরে হাজির হন। এঁরা হচ্ছেন ফ্লা. লে. এম জামালউদ্দীন চৌধুরী, ফ্লা. সার্জেন্ট ফজলুল হক, ক্যাডেট অফিসার এম এ কুদ্দুস এবং ক্যাডেট অফিসার এম মাহমুদ প্রমুখ। এরই ফলে আমরা দেখতে পাই যে, ১১টা সেক্টরের মধ্যে ৬ নম্বর সেক্টরের প্রধান হিসাবে উইং কমান্ডার এম বাশার এবং ১১ নম্বর সেক্টরের অস্থায়ী প্রধান হিসাবে (নভেম্বরে মেজর আবু তাহের গুরুতররূপে আহত হওয়ার পর) ফ্লা. লে. এম হামিদুল্লাহ মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতা প্রদর্শন করেছেন।

এছাড়া এক নম্ব সেক্টরে সুলতান মাহমুদ (পরে হেডকোয়ার্টার) ও শাখাওয়াত হোসেন, চার নম্বর সেক্টরে এম কাদের, ছয় নম্বর সেক্টরে এম সদরুদ্দীন ও এম ইকবাল, আট নম্বর সেক্টরে ইকবাল রশীদ ও জামালউদ্দীন চৌধুরী, নয় নম্বর সেক্টরে ফজলুল হক এবং 'জেড' ফোর্সে এম লিয়াকত সুদক্ষ সৈনিক হিসাবে মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন লড়াই ও এ্যাকশনে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। উপরন্তু মুজিবনগর সরকারের হেডকোয়ার্টারের গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার, ফ্লা. লে. শামসুল আলম, ফ্লা. লে. বদরুল আলম অবসরপ্রাপ্ত উইং কমান্ডার মীর্জা বিশেষ গুরুত্বপূর্ব দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও বাংলাদেশ বিমানবাহিনীকে পুনর্গঠনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

ফলে মুজিবনগর সরকার আমাদের বিমানবাহিনীর জন্য বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের অপর ধারে আসামের জোড়হাটের নিকটবর্তী ডিমাপুরে জংগলাকীর্ণ ও দুর্গম এলাকায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলের একটি পরিত্যক্ত রানওয়ের কর্তৃত্ব লাভ করে। এরপর গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক বৈমানিকরা এই রানওয়ের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করে তাঁদের প্রশিক্ষণ শুরু করলো। এই তারিখটা হচ্ছে ১৯৭১ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর। এজন্যই স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশ বিমানবাহিনী প্রতি বছর ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে বার্ষিকী উদযাপন করে থাকে।

যা হোক, বিমান বাহিনীর নিজস্ব প্রশিক্ষণ শুরু হবার প্রাক্কালে পি আই এ থেকে 'ডিফেক্ট' করা ছ'জন বাঙালি পাইলট এসে এই প্রশিক্ষণে যোগদান করলো। এঁরা হচ্ছেন : ১ ক্যাপ্টেন শরফুদ্দিন, ২ ক্যাপ্টেন খালেদ, ৩ ক্যাপ্টেন শাহাব, ৪ ক্যাপ্টেন আকরাম, ৫ ক্যাপ্টেন মুকিত এবং ৬ ক্যাপ্টেন সাত্তার।

মাত্র আট সপ্তাহকাল দুরূহ প্রশিক্ষণের মাতৃভূমি থেকে বহু দূরে এক দুর্গম এ্যাকশনের জন্য তৈরি হলো বাংলাদেশ বিমানবাহিনী। তাঁদের কাছে তখন মুজিবনগর

সরকারের সংগ্রহ করা একটি অটার প্লেন, একটি ডাকোটা বিমান আর একটি এ্যালুয়েট হেলিকপ্টার। এসবে বসানো হলো ৩০৩ ব্রাউনিং মেশিনগান আর বোঝাই করা হলো কিছু সংখ্যক রকেট ও ২৫ পাউন্ডের বোমা। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদস্যদের মনে তখন দুর্জয় শপথ। হানাদার বাহিনীর কবল থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতেই হবে। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্যকে ছিনিয়ে আনতেই হবে।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। বাংলার আকাশে সর্বপ্রথম উড্ডীন হলো আমাদের বিমান বাহিনী। এরা ব্রজপথে সোচ্চার হলেন, "বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত।" মোট চারটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান এঁরা বেছে নিলো এ্যাকশনের জন্য। এগুলো হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর এলাকা, চট্টগ্রাম তৈল শোধনাগার, ভৈরব বাজারে হানাদার ১৪ ডিভিশনের (মেজর জেনারেল আবদুল মজিদ কাজীর নেতৃত্বাধীন) ট্যাকটিক্যাল হেডকোয়ার্টার এবং নারায়ণগঞ্জ বন্দর এলাকা। সমরবিশারদরা বিএএফ-এর নৈপুণ্য ও দক্ষতায় এ সময় স্তম্ভিত হয়েছিলো। এর মধ্যে ভৈরব বাজারের 'এ্যাকশন' ছিলো সবচেয়ে দুর্ধর্ষ ও বেপরোয়া। এ সময় ভৈরবের 'কিং জর্জ দি ফিফথ' ব্রিজের একাংশ ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে পাকিস্তানি ১৪ ডিভিশন মেঘনা নদীর পশ্চিম পাড়ে সুদৃঢ় ঘাঁটি করে অবস্থান করছিল। কিন্তু ১০/১১ ডিসেম্বর তারিখে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর কয়েক দফা হামলার ফলে ১৪ ডিভিশন আত্মরক্ষার জন্য এতোই ব্যস্ত হয়ে পড়লো যে এই সুযোগে মিত্রবাহিনীর পক্ষে মাত্র মাইল দশেক দক্ষিণে মেঘনা নদী অতিক্রম করে হেলিকপ্টারে রায়পুর-নরসিংদী এলাকায় নিরাপদে সৈন্য অবতরণ করানো সম্ভব হয়েছিলো।

সংক্ষেপে এটাই হচ্ছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ভূমিকা। অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে দেশ স্বাধীন হবার মাত্র ছ'সপ্তাহ পরে বাংলাদেশ বিমানের টেস্ট ফ্লাইটের সময় দু'জন মুক্তিযোদ্ধা বৈমানিক যথাক্রমে ক্যাপ্টেন শরফুদ্দিন ও ক্যাপ্টেন খালেদ নিহত হন। দুর্ঘটনায় নিহত অপর দুঃসাহসিক বৈমানিক ছিলেন ক্যাপ্টেন নাসির (সবুজ ভাই)।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদান রাখার জন্য নিম্নোক্ত বৈমানিকদের স্বীকৃতি হিসাবে বিভিন্ন ধরনের পদকে ভূষিত করা হয়।

ফ্লা. লে. মতিউর রহমান, বীরশ্রেষ্ঠ (শহীদ)
এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার, বীর উত্তম
এয়ার ভাইস মার্শাল এম কে বাশার, বীর উত্তম (মরহুম)
এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) সদরুদ্দীন, বীর উত্তম
এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদ এ সি এস পি, বীর উত্তম
গ্রুপ ক্যাপ্টেন শামসুল আলম, বীর উত্তম
উইং কমান্ডার (অবঃ) হামিদুল্লাহ, বীর উত্তম
স্কোয়াড্রন লিডার (অবঃ) লিয়াকত, বীর উত্তম
স্কোয়াড্রন লিডার (অবঃ) বদরুল আলম, বীর উত্তম

বাংলাদেশ বিমানের খেতাবপ্রাপ্ত পাইলটদের নাম

ক্যাপ্টেন শরফুদ্দীন, বীর উত্তম (মরহুম)
ক্যাপ্টেন খালেদ, বীর উত্তম (মরহুম)

ক্যাপ্টেন শাহাব, বীর উত্তম
ক্যাপ্টেন আকরাম, বীর উত্তম
ক্যাপ্টেন মুকিত, বীর উত্তম এবং
ক্যাপ্টেন সাত্তার, বীর প্রতীক

সব শেষ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৭১ ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনীর প্রধান লে. জেনারেল এ এ কে নিয়াজী যখন ৯৩ হাজার সৈন্যসহ আত্মসমর্পণের দলিলে দস্তখত করেন, তখন সেই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান এ কে খন্দকার নির্বাসিত মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ তৎকালীন পূর্ব বাংলায় আকস্মিকভাবে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর হামলা শুরু হওয়ার পর স্থল ও বিমান বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের মতো নৌবাহিনীর বাঙালি কর্মচারীরাও ডিফেক্ট করে সীমান্ত এলাকায় জমায়েত হয়েছিলো। প্রয়োজনীয় জাহাজ ও টাগবোটের অভাবে ১৯৭১ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত এসব নৌ-সেনা বিভিন্ন সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে লড়াই করেছিলো। এঁদের মধ্যে আর্টিফিসার মোহাম্মদ রুহুল আমিন ২ নম্বর সেক্টরে খালেদ মোশাররফের অধীনে অনেক ক'টা স্থলযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

পাকিস্তানি নৌবাহিনী থেকে 'ডিফেক্ট' করা এ ধরনের 'এন-সাইন' অফিসারের সংখ্যা ছিলো প্রায় ৪০ জনের মতো। (দি লিবারেশন অব বাংলাদেশ : মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং, পৃঃ ৩৬)। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের শেষার্ধে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের উদ্যোগে মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশ নৌবাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঐ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের নিকট থেকে দুটো টাগবোট সংগ্রহ করে গানবোটে রূপান্তরিত করা হয়। তারপর এতে ৪০ এম এম 'বফরস্' বসিয়ে নদীর মোহনা অঞ্চলে যুদ্ধের উপযোগী করে তোলা হয়। এর আগেই 'ডিফেক্ট' করা নৌবাহিনীর 'এন-সাইন' অফিসারদের মুজিবনগরে এনে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু এঁদের মধ্যে সিনিয়ার অফিসার না থাকায় 'মিত্র বাহিনী' থেকে ক্যাপ্টেন এম এন সামন্ত নামে জনৈক অফিসারের সার্ভিস গ্রহণ করা হয়।

এ সময় বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর নয় নম্বর সেক্টরের তত্ত্বাবধায়নে চালনা বন্দরে সারিবদ্ধভাবে নোঙর করা ১১টি বাণিজ্যিক জাহাজে নৌ-কমান্ডোদের দুঃসাহসিক ও ভয়াবহ এ্যাকশনের সংবাদ আন্তর্জাতিক বিশ্বে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলো। এই এ্যাকশনের পর চালনা বন্দর কার্যত অকেজো হয়ে পড়ে। বন্দর সংলগ্ন অগভীর সমুদ্রে জাহাজগুলো ডুবে থাকায় এরপর আর কোন জাহাজের পক্ষে চালনা বন্দরে যাতায়াত সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য হয়, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যুগোস্লাভিয়ার প্রকৌশলীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে পুনরায় চালনা বন্দর চালু করতে সক্ষম হয়।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর খুলনা অঞ্চলের লড়াই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যে দুর্ধর্ষ নবম ডিভিশনকে মার্চ মাসে বিপুল অর্থ ব্যয় করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিমানযোগে আনা হয়েছিলো, ৩রা ডিসেম্বর সর্বাত্মক

লড়াই শুরু হবার মাত্র ৭২ ঘন্টার মধ্যে যশোরে অবস্থানরত সেই বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল এম এইচ আনসারী কোন রকম যুদ্ধ ছাড়াই মাগুরায় পশ্চাদপসরণ করলে এক নাটকীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়।

নবম ডিভিশনের কর্তৃত্বাধীন ঝিনাইদহে অবস্থানরত ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুরের অধীনে ৫৭ ব্রিগেড এবং যশোরে অবস্থানরত ব্রিগেডিয়ার এম হায়াতের অধীনে ১০৭ ব্রিগেড, জেনারেল আনসারীর হেডকোয়ার্টার স্থানান্তরের মুভমেন্ট দেখার পর অবিলম্বে যথাক্রমে পাক্শী ও খুলনার দিকে পশ্চাদপসরণ করতে শুরু করলো।

ঠিক এমনি সময়ে ৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ নৌবাহিনীর দুটো গানবোট এম ভি পদ্মা ও এম ডি পলাশ খুলনা নৌ-ঘাঁটি দখলের জন্য এগিয়ে এলো। এ দুটো গানবোটকে সহযোগিতার জন্য মিত্র বাহিনীর গানবোট 'পানভেল'কে নিয়োজিত করা হলো। কিন্তু কেউই জানতো না যে, যশোর ঘাঁটির পতনের সংবাদ পেয়ে খুলনায় পাকিস্তানি নৌ-ঘাঁটির প্রধান কমান্ডার গুল জরীন সমরাস্ত্রে সজ্জিত গানবোট 'যশোর' নিয়ে ১৬ই ডিসেম্বর রাতে পলায়ন করেছে। সম্ভবত ভারত মহাসাগরে অবস্থানরত মার্কিনি সপ্তম নৌবহর সংক্রান্ত প্রোপাগাণ্ডার দরুন কমান্ডার গুল জরীন এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

১০ই ডিসেম্বর দুপুর ১২টা নাগাদ যখন বাংলাদেশ গানবোট 'পদ্মা' ও 'পলাশ' এবং ভারতীয় গানবোট 'পানভেল' অত্যন্ত সন্তর্পণে খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছাকাছি এলাকায় হাজির হলো, তখন বিপদ দেখা দিলো। নীলাকাশের অনেক উঁচুতে হাজির হলো তিনটা জঙ্গি বিমান। শত্রু বিমান হিসাবে চিহ্নিত করে অবিলম্বে গোলা বর্ষণের অনুমতি চাওয়া হলো। কিন্তু এই অভিযানের কমান্ডিং অফিসার মিন বাহিনীর ক্যাপ্টেন এম এন সামন্তের খবর হচ্ছে ৬ই ডিসেম্বর সকাল ১০টার পর পাকিস্তান এয়ারফোর্স পূর্ব রণাঙ্গনে 'গ্রাউনডেড' হয়ে গেছে। তাই আকাশের এই তিনটি জঙ্গি বিমান নিশ্চিতভাবে ভারতীয় বিমান। ক্যাপ্টেন সামন্ত বিমানগুলির প্রতি গোলা বর্ষণের অনুমতি দিলেন না।

আকস্মিকভাবে বিমান তিনটি অত্যন্ত নিচুতে এসে গানবোটগুলোর ওপর দিয়ে দক্ষিণ দিকে উড়ে গেলো। এরপর ঘুরে এসেই আচমকা শুরু করলো বোমাবর্ষণ। প্রথম হামলাতেই বিধ্বস্ত হলো এম ভি পদ্মার ইঞ্জিন রুম আর হতাহত হলো বহু নাবিক। এ সময় কমান্ডিং অফিসার সব ক'টা গানবোটকে থামাতে বললো এবং নাবিক আর অফিসারদের 'জাহাজ ত্যাগ করার' নির্দেশ দান করলো। 'পলাশ' গানবোটের আর্টিফিসার মোহাম্মদ রুহুল আমীন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অপূরণীয় ক্ষতি হতে দেখে উপস্থিত নাবিকদের কমান্ডারের নির্দেশ অমান্য করে জাহাজ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানালেন আর কামানের ক্রুদের গোলাবর্ষণের অনুরোধ করলেন। 'পলাশ'কে চালু রাখার জন্য রুহুল আমীন স্বয়ং দৌড়ে ইঞ্জিন রুমে চলে গেলেন। কিন্তু নাবিক কিংবা কামানের ক্রুরা মূল অধিনায়কের নির্দেশ অমান্য করলো না। কয়েক মিনিটের মধ্যে জঙ্গি বিমানগুলো ফিরে এসে এবার হামলা করলো এমভি পলাশ-এর ওপর। বাংলাদেশের বীর সন্তান ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর গৌরব মোহাম্মদ রুহুল আমিনের দেহ থেকে বাঁ হাতের কব্জিটা উড়ে গেলো। বাকি সবাই পানিতে লাফিয়ে পড়লো। আহত রুহুল আমিন এই অবস্থাতেও পলাশ গানবোটটা তীরে ভিড়াতে সক্ষম হলো। ধীরে ধীরে পলাশ গানবোট অল্প পানিতে কাত হয়ে রইলো। রুহুল আমিনের দেহ থেকে তখন অবিরাম রক্ত ঝরে পড়ছিল। তীরে নামার সংগে সংগে স্থানীয় একদল

রাজাকার তাঁকে আটকে করে ওখানেই পিটিয়ে হত্যা করে লাশটা পুঁতে রাখলো।

দেশ স্বাধীন হবার পর তাঁকে সম্মানিত করা হলো মরণোত্তর বীরশ্রেষ্ঠ পদকে। তাঁর স্মৃতিকে চির জাগ্রত রাখার মহান উদ্দেশ্য তেজগাঁও ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় অন্যতম সড়কের নামকরণ করা হয়েছে শহীদ রুহুল আমিন সড়ক। কিন্তু দুঃখজনকভাবে বলতে হয় যে, বছর কয়েক পরে খুলনার রুজভেল্ট জেটিতে অযত্নে রক্ষিত ভগ্নপ্রায় 'পদ্মা' ও 'পলাশ' গানবোট দুটোকে লোহা-লক্কড় হিসাবে নিলামে বিক্রি করা হয়েছে। জাতীয় ঐতিহ্য হিসাবে এগুলোকে সংরক্ষিত করে রাখা যেতো না কি?

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর গানবোট দুটোর ওপর একাত্তরের ১০ই ডিসেম্বর হামলাকারী বিমান সম্পর্কে পরবর্তীকালে কিছুটা বিতর্কিত তথ্য পাওয়া গেছে। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, ১৯৭১ সালে পুরামাত্রায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র ৬০ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ঢাকায় অবস্থানরত পাকিস্তান এয়ারফোর্স 'গ্রাউন্ডেড' (অকেজো) হয়ে গিয়েছিলো এবং ভারতীয় বিমানবাহিনী তেজগাঁও বিমানবন্দর এবং নির্মিয়মান কুর্মিটোলা বিমানবন্দরের রানওয়ে বিধ্বস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলো। এ সময় পাকিস্তান বিমানবাহিনীর মাত্র ১৪টি জঙ্গি বিমান এবং পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর আটটি হেলিকপ্টার অবশিষ্ট ছিলো।

পাকিস্তান ইস্টার্ন কমান্ডের জনসংযোগ অফিসার মেজর সিদ্দিকের মতে "১৫ই ডিসেম্বর দিবাগত গভীর রাতে ৪ নম্বর এ্যাভিয়েশন স্কোয়াড্রনের অফিসার কমান্ডিং লে. কর্নেল লিয়াকত বোখারীকে সর্বশেষ ব্রিফিংয়ের জন্য ডেকে পাঠানো হলো। তাঁকে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হলো যে, আট জন পশ্চিম পাকিস্তানি নার্স এবং ২৮টি পরিবারকে এই রাতেই পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর দিয়ে বর্মার আকিয়াবে নিয়ে যেতে হবে।....

১৬ই ডিসেম্বর ভোর রাতের অন্ধকারে দুটো এবং সকালে আলো ফোটার পর তৃতীয় হেলিকপ্টার ঢাকা ত্যাগ করলো। এসব হেলিকপ্টারে করে আহত মেজর জেনারেল রহিম খান এবং আরো কয়েকজনকে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু নার্সদের তাদের হোস্টেল থেকে 'সময় মতো সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি' বলে নেয়া হলো না। সবগুলো হেলিকপ্টারই নিরাপদে বর্মায় অবতরণ করেছিলো এবং যাত্রীরা শেষ পর্যন্ত করাচি পৌছেছিলো (উইনেস টু সারেন্ডার : মেজর সিদ্দিক সালিক পৃঃ ২০৯, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচি)।

ভারতীয় সেনাপতি মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং-এর মতে, "আত্মসমর্পণ নাটকের ব্যাপক বিভ্রান্তি ও হৈচৈয়ের মধ্যে লে. কর্নেল লিয়াকত বোখারীর কমান্ডের অধীনে পাকিস্তানি আর্মি এ্যাভিয়েশন স্কোয়াড্রনের হেলিকপ্টার (৪টি এম আই এবং ৪টি এ্যালুয়েটস) আহত জেনারেল রহিম খান এবং বিশিষ্ট সামরিক ব্যক্তিবর্গের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ১৫ই ডিসেম্বর রাতে বর্মার আকিয়াবে চলে যায় এবং এখান থেকেই এরা পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে গিয়েছিলো। (দি লিবারেশন অব বাংলাদেশ ১ম খণ্ড : মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত লিং, পৃঃ ২২৫, বিকাশ পাবলিশিং হাউস)।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, ঢাকাস্থ পি এ এফ ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর থেকে কার্যত অকেজো হওয়ার পর তেজগাঁও বিমানবন্দরের রানওয়ের পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে যে অবশিষ্ট ১৪টি এফ ৮৫ স্যাবার বিমান লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো, জেনারেল নিয়াজীর নির্দেশে ১৫ই ডিসেম্বর রাতে এবং ১৬ই ডিসেম্বর সকালে সেগুলো সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করা হয়। আত্মসমর্পণের পর অক্ষত অবস্থায় যাতে এসব জঙ্গি বিমান স্বাধীন বাংলাদেশের বিমান বাহিনীর হাতে না পড়ে তার জন্যই এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিলো।

এই অবস্থায় এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, ১০ই ডিসেম্বর খুলনার নীলাকাশে যে তিনটা জঙ্গি বিমান দৃষ্টিগোচর হয়েছিলো সেগুলো পি এ এফ বিমান ছিলো না– সেগুলো ছিলো ভারতীয় বিমান বাহিনীর জঙ্গি বিমান। অভিজ্ঞ নৌ-অফিসার ক্যাপ্টেন এম এন সামন্ত প্রথম নজরেই বুঝতে পেরেছিলেন যে এ তিনটি জঙ্গি বিমান নিশ্চিতভাবে ভারতীয়। এজন্যই তিনি বিমানগুলোর প্রতি গানবোটের কামান থেকে গোলাবর্ষণের অনুমতি দেননি। উপরন্তু যখন ভুল বোঝাবুঝির জের হিসাব 'মিত্রবাহিনী' জঙ্গি বিমানগুলো হামলা শুরু করলো, তখন ক্যাপ্টেন সামন্ত পাল্টা হামলার বদলে বাংলাদেশের নৌ-সেনা ও অফিসারদের গানবোট পরিত্যাগ করে নদীতে লাফিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন।

এই প্রেক্ষাপটে একথা বললে অন্যায় হবে না যে, যথাযথ বেতার যোগাযোগের অভাবে ভারতীয় জঙ্গি বিমানগুলো সেদিন ১০ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ নৌবাহিনীর দু'টো গানবোট 'পদ্মা' ও 'পলাশ' এবং ভারতীয় গানবেট 'পানভেল'কে পাকিস্তানি গানবোট মনে করে দুঃখজনকভাবে হামলা করে নিমজ্জিত করেছিলো।

সংক্ষেপে এটাই হচ্ছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্মকথা। ১৯৭১ সালের ১০ই ডিসেম্বর খুলনায় নদীবক্ষে বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিনসহ বেশ কিছু সংখ্যক নৌ-সেনার আত্মাহুতির মাঝ দিয়ে আমাদের নৌবাহিনীর যাত্রা হলো শুরু।

নোয়াখালীর এক সাধারণ গৃহস্থের সন্তান শহীদ রুহুল আমিন ১৯৫৩ সালে জুনিয়ার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে পাকিস্তান নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৬৫ সালে তিনি পদোন্নতি লাভ কোরে পি এন এস 'কারসাজ'-এ আর্টিফিসার নিযুক্ত হন। ১৯৬৮ সালে বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন চট্টগ্রাম এলাকায় অবস্থানরত পি এন এস 'বখতিয়ার'-এ বদলি হন। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর হামলার পর তিনি 'ডিফেক্ট' করে সীমান্ত এলাকায় গমন করেন এবং ২ নম্বর সেক্টরে যোগ দেন।

মুজিব বাহিনী

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে লড়াইয়ের ময়দানে মুজিব বাহিনীর আবির্ভাব ঘটে। বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিশেষ করে দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং রাজধানী ঢাকার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি এলাকায় মুজিব বাহিনী অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ওপর আঘাত হানে। প্রকাশ, গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত এবং তুলনামূলকভাবে উন্নত ধরনের সমরাস্ত্রে সজ্জিত এই মুজিব বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিলো প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক। মুজিব বাহিনীর চার নেতা হচ্ছেন যথাক্রমে সর্বজনাব সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজুলল হক মণি, তোফায়েল আহমেদ এবং আবদুর রাজ্জাক। বর্তমানে এঁদের মধ্যে 'জাসদের' জন্মদাতা সিরাজুল আলম খান, বাহ্যত প্রকাশ রাজনীতির বাইরে রয়েছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা শেখ ফজলুল হক মণি ১৯৭৫ সালের ১৪ই আগস্ট দিবাগত রাতে সস্ত্রীক নিহত হয়েছেন। বর্তমানে তোফায়েল আহমেদ হচ্ছেন আওয়ামী লীগের অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা এবং আবদুর রাজ্জাক আওয়ামী লীগ পরিত্যাগ করে পৃথক সংগঠন 'বাকশালে'র সম্পাদক।

যতদূর জানা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিব বাহিনীর এই চার নেতার অবস্থান ছিলো পূর্ব রণাঙ্গনের সীমান্তবর্তী এলাকায়। একাত্তরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে

এই যে, মুজিব বাহিনীর সৃষ্টি সম্পর্কে এবং প্রস্তুতি পর্বে মুজিবনগর সরকার এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। উপরন্তু এই বাহিনী কোন সময়েই নির্বাসিত মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে আনুগত্য ঘোষণা করেনি। অথচ এঁরাও ছিলেন দেশপ্রেমিক এবং এঁরা হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সত্তরের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে সেদিন এই মুজিব বাহিনীর নেতৃবৃন্দ ছাত্রলীগের মাধ্যমে ছ'দফাকে ভিত্তি করে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাপকভাবে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রচার করেছিলো। উপরন্তু সংগ্রামের পথকে বেছে নেয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের ওপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করেছিলো। সেদিন এঁরাই এক রকমভাবে বলতে গেলে পাকিস্তানের সমরিক জান্তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের সূচনা কোরেছিলো।

এসব নেতৃবৃন্দের নিরলস প্রচেষ্টায় ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চে পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে সর্বপ্রথম 'আমার সোনার বাংলা' জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। এছাড়া এই সমাবেশে সবুজ পটভূমিকায় রক্তিম বলয়ে বাংলাদেশের সোনালি মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন ছিলো এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

এই প্রেক্ষাপটে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের আদর্শে উজ্জীবিত এক শ্রেণীর তরুণ যুবক এবং ছাত্রলীগের নেতা ও কর্মীদের সমবায়ে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে গঠিত হয় এই 'বিতর্কিত মুজিব বাহিনী'। কারো কারো মতে মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে আটক থাকায় যুদ্ধের মেয়াদ দীর্ঘায়িত হলে ভিন্ন নেতৃত্বের অভ্যুদয়ের আশংকা থাকায়, সে ধরনের একটা পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য মুজিব বাহিনী গঠন করা হয়েছিলো। আবার অনেকের মতে, মুজিব বাহিনীর নেতৃবৃন্দ মুজিবনগর সরকারের কর্মকাণ্ডের প্রতি বিশেষ আস্থাবান ছিলেন না এবং আওয়ামী লীগের দক্ষিণপন্থী উপদলের প্রতি সন্দিহান ছিলেন বলেই এই বাহিনী গঠন করেছিলেন।

তবুও একটা কথা বলা চলে যে, মুজিব বাহিনীর সৃষ্টির আসল ইতিহাস আজও পর্যন্ত রহস্যের অন্তরালেই রয়ে গেল। স্বাধীনতা লাভের এতোগুলো বছর পরেও এ ব্যাপারে বিশেষ আলোকপাত হয়নি। এছাড়াও মুজিবনগর সরকার এবং তার সেক্টর কমান্ডারদের অজান্তে যখন মুজিব বাহিনীর সদস্যরা বাংলাদেশের পশ্চিম রণাঙ্গন দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করছিল তখন মুক্তিবাহিনী ও মুজিব বাহিনীর মধ্যে যে ক'টা সংঘর্ষ হয়েছিলো সেসব ঘটনা তো বিস্মৃতির অন্তরালেই রয়ে গেলো! আমাদের উত্তরসূরিদের জন্য এসব ইতিহাস লেখার কি এখনও সময় আসেনি?

মেহেরপুরের আম্রকাননে মুজিবনগর সরকারের প্রকাশ্যে শপথ গ্রহণ : ১৭ এপ্রিল ১৯৭১

মুজিবনগর ও রণাংগন থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকা এবং

মুজিবনগর সরকারের প্যাড ও প্রচারপত্রের নমুনা

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এবং তিন ফোর্সের কমাণ্ডারবৃন্দ
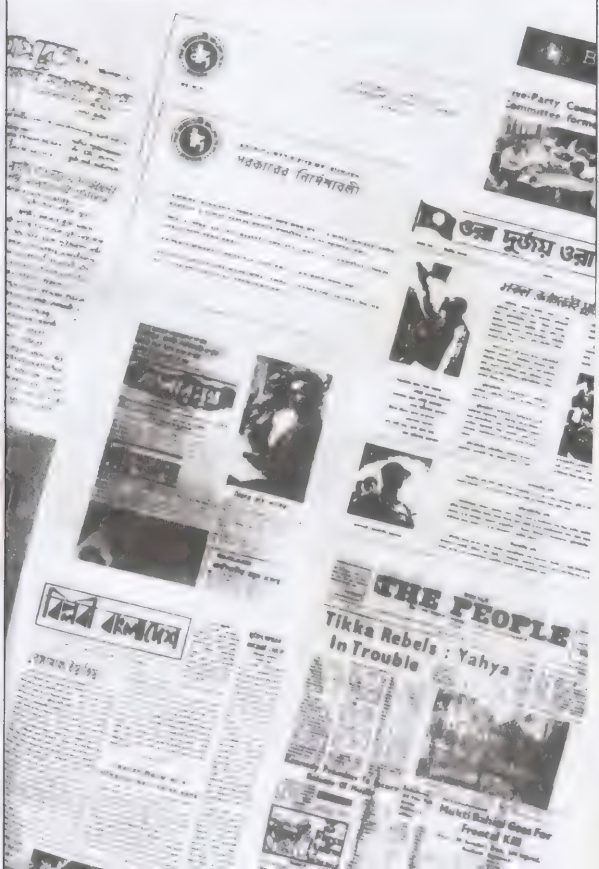
এম এ জি ওসমানী

কে এম শফিউল্লাহ

জিয়াউর রহমান

খালেদ মোশাররফ

১৬ ডিসেম্বর—পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের প্রাক্কালে অস্ত্র সমর্পণের দৃশ্য

১৬ ডিসেম্বর তারিখের আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানী সৈন্যদের তালিকা

নিয়মিত সামরিক বাহিনী
ক অফিসার ঃ ১,৬০৬
খ জে সি ও ঃ ২,৩৪৫
খ জোয়ান ঃ ৬৪,১০৯
খ নন্‌-কমব্যাট ঃ ১,০২২

আধা-সামরিক বাহিনী
ক অফিসার ঃ ৭৯
খ জে সি ও ঃ ৪৪৮
খ জোয়ান ঃ ১১,৬৬৫

নৌ-বাহিনী
ক অফিসার ঃ ৯১
খ পেটী-অফিসার ঃ ৩০
খ নৌ-সেনা ঃ ১,২৯২

বিমান বাহিনী
ক অফিসার ঃ ৬১
খ ওয়ারেন্ট অফিসার ঃ ৩১
খ এয়ারম্যান ঃ ১,০৪৯

অন্যান্য
সশস্ত্র পুলিশ এবং
বেসামরিক অফিসার ও ব্যক্তিবর্গ ঃ ৭,৭২১
মোট ঃ ৯১,৫৪৯

[সূত্র ঃ দি লিবারেশন অব বাংলাদেশ ঃ মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং]
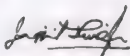
আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক দলিল

INSTRUMENT OF SURRENDER

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.
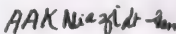
The PAKISTAN Eastern Command shall come under orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrenders. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

Jagjit Singh	AAK Niazi Lt-Gen
(JAGJIT SINGH AURORA) Lieutenant-General General Officer Commanding in Chief India and BANGLA DESH Forces in the Eastern Theatre	(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI) Lieutenant-General Martial Law Administrator Zone B and Commander Eastern Command (Pakistan)
16 December 1971.	16 December 1971

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনীর নিকট ৯১.৫৪৯ জন সৈন্যসহ আত্মসমর্পণের পর স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক দলিলের প্রতিলিপি

ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর শীতের পড়ন্ত বিকেল ৪টা ৩১ মিনিটে (বাংলাদেশ সময়) পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর পক্ষে লেঃ জেনারেল এ এ কে নিয়াজী মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করলেন। অনুষ্ঠানে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন গ্রুপ ক্যাপটেন এ কে খন্দকার (বাম দিক থেকে প্রথম)

১০ জানুয়ারি ১৯৭২–পাকিস্তানের বন্দীশালা থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের পদাতিক বাহিনীর প্রধান কে এস শফিউল্লাহ এবং বিমানবাহিনীর প্রধান এ কে খন্দকার

কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ১৯৭২ সালে সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
পেছনে দাঁড়িয়ে তৎকালীন কর্ণেল কে এস শফিউল্লাহ, লেঃ কর্ণেল খুরশিদ এবং কর্ণেল জিয়াউর রহমান

১

আজ থেকে প্রায় এগারো বছর আগেকার কথা। আমি তখন দারা-পুত্র-কন্যাসহ মুজিবনগর নির্বাসিতের জীবনযাপন করছি। মুজিবনগর সরকারের তথ্য ও বেতার দফতরের পরিচালক হিসাবে বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ও পোস্টার ইত্যাদি ছাপানো, বাংলাদেশের যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে খবর সংগ্রহ এবং বিদেশী সাংবাদিকদের ব্রিফিং দেয়া ছাড়াও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নীতি-নির্ধারণ ও প্রশাসনিক ব্যাপারে সহায়তা করা তখন আমার অন্যতম দায়িত্ব। অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে প্রতি রাতে 'চরমপত্রে'র স্ক্রিপ্ট লিখে পরদিন এতো কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তা রেকর্ডিং করতে হতো। 'চরমপত্রে'র প্রতিটি স্ক্রিপ্ট লেখা ও পাঠ করার জন্য পারিশ্রমিক ছিলো সাত টাকা পঁচিশ পয়সা।

আমি তখন গ্যাস্ট্রিক আলসারের রুগী। মাঝে মাঝে ব্যথায় কাটা মুরগির মতো দাপাদাপি করতাম। ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানতে দিতাম না। কিন্তু জীবন সঙ্গিনীর কাছ থেকে লুকাবার উপায় ছিলো না। বাজারের পয়সা বাঁচিয়ে আমার জন্য হরলিকসের ব্যবস্থা করেছিলো। তবুও প্রতি রাতে এ ধরনের একটা স্ক্রিপ্ট লেখা এক ভয়াবহ ব্যাপার। সারাদিন পরিশ্রমের পর আবার রাত সাড়ে তিনটা থেকে লেখা এক অমানুষিক কাজ। মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলতাম, 'আমার দ্বারা আর লেখা হবে না'। মহিলা জবাবে বলতেন, 'মনে রেখো তোমার এই চরমপত্র শুনে উৎসাহিত হবার জন্য কয়েক লাখ মুক্তিযোদ্ধা রণাঙ্গনে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে আর বাংলাদেশের সাত কোটি মানুষ অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে।'

এমন এক অবস্থায় উপর্যুপরি এক[illegible]টা স্ক্রিপট লেখার পর একদিন বিশ্রাম নিলাম। মনে হলো, কষ্ট করে লিখতেও তো পারতাম। মাঝে মাঝে যশোর-খুলনা এলাকায় ঘাঁটি পরিদর্শনের সময় কিশোর মুক্তিযোদ্ধাদের চাহনিতে অগ্নি শপথের যে স্ফুলিঙ্গ দেখেছি, সেসব চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। এর পর আর কোন দিন লেখা কামাই করিনি।

সামনে পবিত্র ঈদ। মনটা গুমরে কেঁদে উঠলো। জীবন সঙ্গিনীকে ডেকে বললাম, 'অন্তত ঈদের দিনটাতে ছেলেমেয়েদের ভালো কিছু রান্না করে খাওয়াবার ব্যবস্থা করো।' মুজিবনগর সরকার থেকে বেতন পাই সর্বসাকুল্যে পাঁচশ' টাকা। তার মধ্যে বাড়ি ভাড়া দিতে হয় আড়াইশ'। কয়লার খরচ বাঁচাবার জন্য এক বেলা রান্না করে দু'বেলা খাই। তবুও আমার কথায় ঈদের আগের দিন আমার সহধর্মিণী আধা সের ময়দা আর একটা মুরগি কিনে আনলো। চমৎকার রান্না করে রেখে দিলো। পরদিন ছেলেমেয়েদের মুখে লুচি আর মুরগির গোশ্‌ত দিবে।

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ অধ্যাপক দিলীপ মুখার্জীর নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ-ভারত শিক্ষক সহায়ক সমিতির' চারজন কর্মকর্তা বাসায় এসে হাজির। গিন্নীকে বললাম, 'ক'টা লুচি ভেজে মুরগির গোশ্‌ত দিয়ে ওদের পরিবেশন করো।' ঘণ্টাখানেক কথাবার্তার পর ওঁরা চলে গেলেন।

রাত দশটা নাগাদ আমরা শোয়ার ব্যবস্থা করছি। এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। খুলনা সেক্টরের প্রধান মেজর জলিল স্বয়ং। সঙ্গে নেভি কমান্ডো খুরশীদ। ওঁদের সেক্টরের কিছু খবর দিতে এসেছেন। কথায় কথায় পরিষ্কার বললেন, 'আমরা ক্ষুধার্ত'। গিন্নী আমার সঙ্গে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। আমি চোখের ইশারায় সম্মতি দিলাম।

দু'জনে খুব তৃপ্তির সঙ্গে লুচি আর মুরগি খেয়ে রাতেই রণাঙ্গনের দিকে চলে গেলো। আমি রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াতেই গিন্নী বললো, 'অনেক কষ্টে তোমার তিন ছেলেমেয়ের জন্য কয়েকটা টুকরো রয়েছে। লাখ লাখ মানুষ যখন অভুক্ত রয়েছে, তখন আমাদের ভাগ্যে ভালো খাবার না-ইবা জুটলো!

একাত্তরের সেপ্টেম্বর। এর মধ্যেই আমাদের বেশ কয়েক ব্যাচ মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং শেষ করে বিভিন্ন সেক্টরে শক্তি বৃদ্ধি করেছে। উপরন্তু হাজার হাজার ছেলে ট্রেনিং-এর প্রতীক্ষায় বিভিন্ন ক্যাম্পে রয়েছে। মাঝে মাঝে এসব ক্যাম্প পরিদর্শন ছাড়াও মুক্ত এলাকার অবস্থা দেখতে যেতাম। প্রায়ই খবর পেতাম স্থানীয় লোকদের সমর্থনের অভাব আর মুক্তিযোদ্ধাদের বেপরোয়া সাহসের বহিঃপ্রকাশের ফলে প্রতিপক্ষের মনোবল দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। সন্ধ্যার পর বাংকার থেকে বেরুনো বন্ধ হয়ে গেছে। তাই ব্যক্তিগতভাবে আমি খুবই আশাবাদী হয়ে উঠলাম।

এমনি এক সময়ে ডক্টর দিলীপ মালাকার নামে এক সাংবাদিক ভদ্রলোক আমাকে আমন্ত্রণ জানাতে এলেন। 'এপার বাংলা ওপার বাংলার গুণীজনদের সংবর্ধনা'– স্থান শ্যামবাজার পাঁচ রাস্তার মোড়ে এক নাট্যশালায়। গুণীদের নাম জানতে চাইলাম। সাহিত্যিক গজেন মিত্র ও জরাসন্ধ, বেতার কথক বীরেন ভদ্র, ফুটবল খেলোয়াড় শৈলেন মান্না, চলচ্চিত্র অভিনেত্রী ছায়াদেবী আর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের চরমপত্রের লেখক ও কথক।

ভর সন্ধ্যায় সস্ত্রীক যখন শ্যামবাজারে পাঁচ রাস্তার মোড়ে হাজির হলাম তখন এলাকার ট্রাফিক চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। চারদিক লোকে লোকারণ্য। অনেক কষ্টে ডক্টর মালাকারকে খুঁজে বের করলাম। তিনি বাকি সবার সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সবচেয়ে চমৎকৃত হলাম ছায়া দেবীর সংগে পরিচিত হয়ে। এককালে উপ-মহাদেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান নিউ থিয়েটার্সের প্রখ্যাত নায়িকা ছায়া দেবী। আমাকে 'চরমপত্রে'র ব্যাপারে খুবই উৎসাহিত করলেন।

হঠাৎ একটা দেয়ালের দিকে নজর গেলো। বিরাট অক্ষরে লেখা "বাংলাদেশের যুদ্ধের অছিলা করে চীনের বিরুদ্ধে কথা বললে জিহ্বা উপড়ে ফেলবো।" একটু দূরে আর একটা দেয়ালে লেখা "তাই তাই তাই, বর্ধমানে যাই; বর্ধমানে গিয়ে দেখি, সিপিএম নাই।" বুকটা দুরু দুরু করে কেঁপে উঠলো। বুঝতে কষ্ট হলো না, এই এলাকায় নকশাল, সিপিএম আর নব কংগ্রেস সবাই সহঅবস্থান করছে। সুতরাং সাধু সাবধান!

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা ছ'জনে গিয়ে মঞ্চে বসলাম। আমি সর্বকনিষ্ঠ বলে সবার শেষে আমার বক্তৃতার পালা। এর মধ্যে আমাদের সবার গলায় চন্দন কাঠের মালা আর একটা করে পশমী শাল উপহার দেয়া হয়েছে। কিন্তু হলের মধ্যে গণ্ডগোল থামার কোন লক্ষণই দেখতে পেলাম না। মাইক হাতে ডক্টর মালাকার প্রখ্যাত বেতার কথক ও আবৃত্তিকার বীরেন ভদ্রকে বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানালেন। গণ্ডগোল আরও বেড়েই চললো। একটা ষণ্ডাগোছের ছোকরা চেয়ারে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলো, "মশায় ফাইজলামি রাখার আর জায়গা পাচ্ছেন না। ওই 'চরমপত্র' ছোকরাকে একবার মাইকে দাঁড় করিয়ে দিন। মাইরি বলছি, এরপর আমরা চলে যাবো।" ডক্টর মালাকার আরও দু'বার বীরেনদাকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু গণ্ডগোল থামার কোন লক্ষণই নেই। অনুষ্ঠানের কর্মকর্তারা শলাপরামর্শ করে আমাকে প্রথমে বক্তব্য রাখার অনুরোধ করলো। আমি ঘোর আপত্তি জানালাম। শেষে ওদের একজন বললেন,

'অনুষ্ঠান শুরু হতে আর দেরি হলে বোমা ফাটতে পারে'। আমি রাজি হয়ে বাকি পাঁচজনের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলাম। সবাই হাসিমুখে সম্মতি জানালেন। কেবল বীরেন বাবু বললেন, 'যাও যাও ছোকরা আর মশকরা করো না।'

কোন রকম ঘোষণা ছাড়াই সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরিহিত অবস্থায় মাইকের সামনে প্রায় মিনিটখানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। গণ্ডগোল থামার কোন লক্ষণই নেই। হঠাৎ আমার সেই ট্রেড মার্কা গলায় চিৎকার করে উঠলাম। "ঠাস্ কইরা একটা আওয়াজ হইলো। ডরাইয়েন না-ডরাইয়েন না। আমাগো ঢাকার কুর্মিটোলার মাইদ্দে পিঁয়াজী সা'বে চেয়ার থনে পইড়া গেছিলো।" এটুকু বলেই দম নিয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠলাম, "এ্যাঁ, এ্যাঁ এদিককার কারবার হুন্‌ছেন নি? কইলকাত্তার শ্যাম বাজারের পাঁচ রাস্তার মোড়ে বহুত্ গেন্‌জাম শুরু হইছে। ঢাক নাই তরায়াল নাই নিধিরাম সরদার।" এরপর চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সমস্ত হলটা নিশ্চুপ হয়ে গেলো।

এবার স্বাভাবিক গলায় বক্তৃতা দিতে শুরু করলাম। হ্যাঁ, ঠিকই বুঝতে পারছেন আমি হচ্ছি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের 'চরমপত্রে'র লেখক ও কথক। পরম করুণাময়ের কৃপায় গলার স্বর বদলাবার ক্ষমতা আমার রয়েছে। তাই চরমপত্রের অনুষ্ঠানে আমি গলায় ভিন্ন স্বর ব্যবহার করে থাকি। এখন আমি স্বাভাবিক গলায় কথাবার্তা বলছি। সবার কাছে আমার একটা অনুরোধ। আমি দু'বার আপনাদের সামনে হাজির হবো। প্রথমে স্বাভাবিক গলায় কিছু বক্তব্য উপস্থাপিত করবো। এরপর আমন্ত্রিত গুণী ব্যক্তিবর্গের বক্তৃতা। আবার সবার শেষে দরকার হলে সমস্ত রাত আমি 'চরমপত্র' পাঠ করে শোনাবো। লক্ষ্য করলাম আমার প্রস্তাবের তেমন কোন বিরোধিতা হলো না। তাই আমি একটু নিশ্চিত হয়ে মূল বক্তব্য উপস্থাপিত করলাম।

মনে রাখবেন আজকে আমরা যাঁরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দান করছি তাঁদের অনেকেই এই কোলকাতা শহরেই বছর পঁচিশকে আগে 'হাত মে বিড়ি মু মে পান, লড়কে লেংগে পাকিস্তান' করে গেছি। তাঁরাই আবার পাকিস্তান ভেঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশ করার জন্য একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মৃত্যুর সংগে পাঞ্জা লড়ছি। কিন্তু কেনো?

১৯৪২-৪৩ সালের কথা। আমি তখন ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের ছাত্র। আমার প্রিয় বন্ধু ছিলো হর্ষব্রত গুহ রায়। আমরা দু'জনে ছিলাম হরিহর আত্মা। আমার ডাক নাম মুকুল। তাই হর্ষের বাড়ির কেউ চিন্তাই করতে পারেনি যে, আমি মুসলমান। গরমের ছুটির দুপুরে ওদের বাসায় ওর দিদিদের সংগে লুডু আর ক্যারাম খেলতাম। একদিন কথায় কথায় ব্যাপারটার প্রকাশ পেলো। মেজদি বললেন, 'তোকে দেখলে তো চমৎকার বাঙালি ছেলে মনে হয়। আসলে তুই দেখছি মুছলমান!' হর্ষদের বাড়ির পিছন দিয়ে বাসায় ফেরার সময় দেখলাম আমি যে কাঁসার গ্লাসে জল খেয়েছিলাম, সেই গ্লাসটা পিছনের কচু ক্ষেতে পড়ে আছে। এরপর ওদের বাসায় বিশেষ আর যাইনি। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ন ছিলো।

আর একদিনের কথ আমি জীবন ভুলতে পারবো না। হর্ষ আর আমি দু'জনে ময়মনসিংহের বড় বাজারের এক দোকানে মেঠাই খেলাম। হর্ষ দোকানের ভিতর গিয়ে কাঁসার গ্লাসে জল খেলো। আর আমি মুছলমান, তাই রাস্তার পাশ দু'হাত পাতলুম। ঠাকুর মশায় নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে কাঁসার ঘটি থেকে জল ফেললো।

বেশি দিন আগের কথা নয়। চল্লিশ দশকে অবিভক্ত বাংলার সমাজ জীবনের চিত্রটা এরকম ছিলো। কিন্তু আজ যখন হিন্দু বাঙালি বামুনের ঘরে মাঝে মধ্যে খাওয়া-

দাওয়া করছি, তখন আপনাদের জাত যায় না। কী আশ্চর্য, এমন একটা সময় ছিলো যখন বাঙালি বলতে হিন্দু সমাজকে বোঝাতো।

আমরা ছিলাম তখন মুসলমান আর নেড়ের দল। কিন্তু মাত্র কয়েক দশকের ব্যবধানে বাঙালি বলতে ওপার বাংলার পদ্মা-যমুনা-মেঘনা বিধৌত এলাকার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজকে বোঝাচ্ছে। কারণ আমরাই তো বাহান্নো সালে বাংলা ভাষার দাবিতে ঢাকার রাজপথে গুলি খেয়েছি। রবীন্দ্রনাথের মর্যাদা রক্ষার জন্য আবার আমরাই শত প্রলোভন আর নির্যাতন উপেক্ষা করে শোভাযাত্রা করেছি। অথচ তখন আপনাদের একাংশ রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলো– রবীন্দ্র প্রস্তর মূর্তি ভেংগেছিলো। তাই আজকের দিনে আপনারা বাঙালি হিন্দু হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন। শুধুমাত্র বাঙালি হিসাবে আপনাদের দাবি খুবই দ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ধৃষ্টতা হলেও বলতে হচ্ছে, আপনারা প্রথমে ভারতীয়– তারপর হয়তোবা বাঙালি। বিশাল ভারতবর্ষে আপনারা হচ্ছেন মাত্র ন'পারসেন্ট।

তাহলে বাংলা ভাষার সীমানাটা কোথায় চিহ্নিত হবে? ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, নিউজিল্যান্ড কিংবা অস্ট্রেলিয়া সব কটা দেশের ভাষা ইংরেজি। কই, ওদের মধ্যে তো ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে তেমন বিতর্ক হয় না? শেক্সপিয়ার, শেলি, কিটস, মিল্টন, বায়রন এসব কবির কাব্যগ্রন্থ সবারই যৌথ সম্পত্তির মতো। কিন্তু আধুনিক যুগে সব ক'টা দেশেই নিজস্ব কবি-সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছে। সবাই নিজস্ব পরিবেশে এমনকি নিজস্ব উচ্চারণে ইংরেজি সাহিত্যের চর্চা করছে। কেউই আপত্তি করছে না।

ঠিক তেমনিভাবে কবি আলাওল ও বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এমনকি সুকান্ত পর্যন্ত উভয় বাংলার যৌথ সম্পত্তির মতো। এরপর শাখা স্রোতস্বিনীর মতো কবি বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আর শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্য প্রতিভা আপনাদের নিজস্ব সম্পদ। অন্য দিকে কবি ফররুখ আহমদ, আহসান হাবিব, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান থেকে কবি নির্মলেন্দু গুণ পর্যন্ত বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ। আমাদের রিসার্চের ছাত্ররা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণার সময় বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় আর শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ওপর যেমন পড়াশোনা করবে, তেমনিভাবে আপনাদের গবেষকরাও বাংলাদেশের ফররুখ আহমদ, শামসুর রাহমান ও হাসান হাফিজুর রহমানের কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে রিসার্চ করবে।

অন্যদিকে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও স্বাভাবিকভাবে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রতিফলন ঘটবে। সময়ের বিবর্তনে যেমন ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইংরেজি ভাষার মধ্যে তফাৎ সৃষ্টি হয়েছে, তেমনিভাবে বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার মধ্যেও ভাষার ক্ষেত্রে কিছুটা তফাৎ সৃষ্টি হতে বাধ্য। ভৌগোলিক অবস্থান, ধর্মীয় প্রভাব, বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ এসব কিছুর প্রভাবেই ভাষা তার স্বকীয়তা লাভ করে। কোলকাতা আর ঢাকাকেন্দ্রিক ভাষায় কিছুটা ফারাক সৃষ্টি হতে বাধ্য। স্রোতস্বিনী নদীর মতো ভাষা তার আপন গতিতে এগিয়ে যাবেই। শত প্রচেষ্টাতেও এর যাত্রাপথ পরিবর্তন করা যাবে না।

শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এই একই অবস্থা। সাধারণ মানুষ নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের তাগিদে কখন কোন্ শব্দ গ্রহণ করবে তা ড্রইং রুমে বসে নির্ধারণ করা যাবে না। বাংলাদেশে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে চেষ্টা করেও 'তাহজীব' ও 'তমদ্দুন' শব্দ দুটি চালু করা যায়নি। ময়মনসিংহকে 'মোমেনশাহী' করা সম্ভব হয়নি। অথচ বাংলাদেশে

'স্নান' শব্দের বদলে 'গোসল' এখন বহুল প্রচারিত। আর 'খোদা হাফেজ' কথাটা দিব্বি চালু হয়ে গেছে। 'ছিনতাই' ও 'হাইজ্যাক' শব্দ দুটো সবার অলক্ষ্যেই আমাদের ভাষায় সংযোজিত হয়েছে। 'আব্বা' আর 'মা' দুটো শব্দই আমাদের ওখানে চালু রয়েছে। শেষ পর্যন্ত কোন্‌টা টিকবে, নাকি দুটোই থাকবে কেউ বলতে পারে না।

এতগুলো কথা বলে একটু দম ফেললাম। বুঝলাম আর গণ্ডগোল হবার আশংকা নাই। তাই সাহস করে বক্তৃতা আর একটু লম্বা করলাম। এবার নতুন প্রসঙ্গে অবতারণা করলাম।

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, ভারতের কাঠামোতে পশ্চিম বাংলা আর পাকিস্তানের কাঠামোতে পূর্ব বাংলার মধ্যে তুলনামূলকভাবে আমরা পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্তরা কিন্তু অনেক বেশি আরাম-আয়েশের মধ্যে ছিলাম। এই কথাটা আমরা প্রায় ২৪ বছর পর মুজিনগরে এসে বুঝতে পারছি। আপনাদের এখানে মধ্যবিত্ত সমাজটা ক্ষয়িষ্ণু; আমাদের এখানে মধ্যবিত্ত সমাজ সবেমাত্র পূর্ণতার পথে।

করাচি-লাহোর-ইসলামাবাদের মহারথীরা পশ্চিম বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভাবধারার অনুপ্রবেশের ভয়ে আমাদের কোলকাতা যাতায়াত করতে দেয়নি। তাই এর আগে আমরা আপনাদের সঙ্গে আমাদের অবস্থার তুলনা করতে পারিনি। উল্টো পাকিস্তানের সঙ্গে একাত্মতাবোধের নামে আমাদের শিক্ষক, ডাক্তার, প্রকৌশলী, ছাত্র, রাজনীতিবিদ, অফিসার সবাইকে অবিরাম পশ্চিম পাকিস্তান সফর করিয়েছে। তাই আমরা করাচি-লাহোর-পিন্ডির মধ্যবিত্তের সঙ্গে নিজেদের অবস্থার তুলনা করে প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পেরেছি যে, আমরা বঞ্চিত ও নিগৃহীত। অথচ আমরাই হচ্ছি পাকিস্তানের শতকরা ছাপ্পান্ন ভাগ। মুক্তিযুদ্ধে শরিক হওয়ার পিছনে আমাদের অনেকের মধ্যেই এই মনোভাব কাজ করেছে।

বাঙালি মুসলমান এক অদ্ভুত জাত। আমরা বাংলাদেশে একদিকে যেমন নবান্ন, একুশে ফেব্রুয়ারি, নববর্ষ এবং রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করি; অন্যদিকে তেমনি ঈদের নামাজ ও জুমার নামাজ আদায়ে আমাদের প্রচুর উৎসাহ রয়েছে। পাকিস্তানি মহারথীরা আমাদের কথাবার্তায় খুশি হয়ে [illegible] পিঠ চাপড়ে বলে 'ইয়ে বাঙালি হোনেছে কেয়া হুয়া, ইয়ে তো সাচ্চা মুসলমান মালুম হোতা হায়?' আমরা তখন খুশি হই না। মনে মনে বলি, 'বেটা আমাকে ইসলাম শেখাতে চায়।' ঠিক তেমনি আপনারা যখন আমাদের পিঠে চাপড় মেরে বলেন, 'আরে এ মুসলমান হলে কি হয়, এ তো রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসে'। প্রকাশ না করলেও আমরা তখন বিরক্ত বোধ করি। মনে মনে বলি, বাহান্নো সালে বাংলা ভাষার জন্য গুলি খেয়েছি, আর মশাই আমাকে বাঙালিত্ব শেখাতে এসেছেন?

আমার বক্তব্য শেষ করার মুহূর্তে আপনাদের কাছে আর মাত্র একটা কথা উপস্থাপিত করবো। বাংলাদেশের এই ভয়াবহ দুর্দিনে আপনারা আশ্রয় দিয়েছেন– আপনজন ভেবে কাছে টেনে নিয়েছেন। এজন্য আপনাদের জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, আপনারা যাঁরা সাতচল্লিশ, পঞ্চাশ, আটান্নো, বাষট্টি কিংবা পঁয়ষট্টি সালে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে এসেছেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আবার তারা এককালের জন্মভূমিতে ফিরে যেতে পারবেন। তবে হ্যাঁ, একাত্তরে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যারা দানবীয় আক্রমণের মুখে বাস্তুচ্যুত হয়ে চলে এসেছেন, দেশ স্বাধীন হবার পর তাঁরা স্বদেশে পুনর্বাসিত হবেন। বাস্তব ক্ষেত্রে যা ঘটতে যাচ্ছে, সেই নির্মম সত্য কথাটা আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করলাম। অলীক স্বপ্ন দেখলে শুধু মানসিক যন্ত্রণাই বৃদ্ধি পাবে।

আমার মনে হয় বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আপনারা যদি সীমান্তের এপার থেকে আমাদের আশীর্বাদ করেন, তাহলে বন্ধুত্ব অটুট থাকবে। কাছে গেলেই সে বন্ধুত্ব ফাটল ধরতে বাধ্য। সব জাতিরই একটা নিজস্ব ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক পরিবেশ, চিন্তাধারা ও স্বকীয়তা রয়েছে। এ ব্যাপারে কেউ গার্জিয়ান মেনে নিতে রাজি নয়। তাই বিশ্বের কোথাও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে সত্যিকার অর্থে বন্ধুত্ব নেই। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে একশ' বছর ধরে লড়াই হয়েছিলো। আজও পর্যন্ত ফরাসিরা বলতে কুণ্ঠাবোধ করে না যে, ইংরেজরা এখনও সভ্য হতে পারেনি। ফরাসিদের চোখে জার্মানরা হচ্ছে বর্বর। পাক-ভারত কিংবা পাক-আফগানের সম্পর্কের উন্নতি কোন দিনই হলো না। মধ্যপ্রাচ্যে পাশাপাশি এতোগুলো মুসলিম দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের অভাব কেনো? মনে হয় মাতব্বরি জিনিসটা সবারই অপছন্দ।

পরিশেষে সভার উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান, বিশেষ করে 'চরমপত্র' ও 'জল্লাদের দরবার' আপনাদের কাছে ভালো লাগে বলে আমরা গর্ব অনুভব করছি। সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় যে জনপ্রিয় বেতার অনুষ্ঠান করা যায় 'চরমপত্র' ও জল্লাদের দরবার' তার প্রমাণ। সবাই আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করছি বুদ্ধিজীবী আর সাধারণ মানুষের মধ্যে দূরত্বটা কতদূর। ওদের বোধগম্য ভাষাকে পর্যন্ত আমরা এতোদিন জাতে উঠতে দিইনি।

আমার বক্তৃতা শেষ হবার পর কিছুটা গুঞ্জন শুনতে পেলাম। বাকি পাঁচ জনের বক্তব্যের সময় আর কোন অসুবিধা হলো না। এরপরে প্রায় ঘণ্টাখানেক 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান করলাম। রাত প্রায় একটায় বাসায় ফেরার সময় কেনো জানি না বার বার মনে হলো ১৯৫৮-৫৯ সালে আইয়ুবের সামরিক শাসনের আমলে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের জন্য 'ইস্রাফিল' অনুষ্ঠানের স্ক্রিপ্ট লিখেছিলাম। আর আজ আমি সেই লোকই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান করছি। সাতচল্লিশ সালে 'হাত মে বিড়ি মু মে পান লড়কে লেংগে পাকিস্তান' করে আবার একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে শরিক হয়েছি।

২

শেষ পর্যন্ত রাত্রি তাঁর স্বামী আর বছর বারোর মেয়েটার হাত ধরে মানিকগঞ্জের দিকে ফিরে গেলো। আমরা কাকডাকা সকালে আরিচা ঘাটের উপর দাঁড়িয়ে ওদের এক্কা গাড়ির দিকে তাকিয়ে রইলাম। একরাশ ধুলো উড়িয়ে এক ঘোড়ার এক্কা গাড়িটা রাস্তার বাঁকটাতে গিয়ে আমাদের চোখের আড়াল হয়ে গেলো। মাথাটা ঘুরিয়ে বিশাল যমুনা নদীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। কেনো জানি না বার বার রাত্রির ক্রন্দনরতা মুখচ্ছবিটাই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আর তাঁর শেষ কথা ক'টা আমার মনকে নাড়া দিলো। আমি কারো বাড়িতে ঝি-গিরি করে খাবো, তবু ঢাকা ছেড়ে যেতে পারবো না। আমাকে ঢাকায় ফিরে যেতেই হবে। আমার অশ্রু– আমার কাজল, ওরা দু'জনেই তো ঢাকায় রয়ে গেলো।

ঢাকার সেগুনবাগিচায় যেখানটায় আমরা মাসখানেক আগে উঠে এসেছি, সেখানটায় রাত্রির সঙ্গে আমাদের আলাপ। দিন কয়েকের মধ্যেই এ আলাপ নিবিড় হয়ে দাঁড়ালো। রাত্রি আমার সহধর্মিণীর প্রিয় বান্ধবীতে পরিণত হলো।

রাত্রি ও তাঁর স্বামী দু'জনাই ব্যাংকে চাকরি করে। আমাদের পাশেই ছোট্ট একটা বাসায় ছিমছামভাবে ওরা থাকে। দুটো ছেলে আর একটা মেয়ের কেউই ওদের কাছে থাকে না। একদিন কথায় কথায় রাত্রি বললো, 'জানেন আমার দু'বার বিয়ে হয়েছে?

আমার তিনটে ছেলেমেয়ে; দুটো ওদের বাবার সঙ্গে মনিপুরী পাড়ায় থাকে। আর মেয়েটাকে রেখেছি কুমুদিনীতে।

প্রতি রোববার ছেলে দুটো মা'র কাছে এসে দিনটা কাটিয়ে যায়। কি অদ্ভুত আর অপূর্ব ছেলে দুটোর ব্যবহার। দিনভর মা'র সেবা করে আর দেশ-বিদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের গল্প শোনায়। অশ্রু ক্লাস নাইন আর কাজল ক্লাস এইটে পড়ে। কুমুদিনী স্কুল বন্ধ হওয়ায় মেয়েটা এখন মা'র কাছেই থাকে। মেয়েটার লেখাপড়ার সমস্ত দায়িত্বই মা'র। একদিন কথায় কথায় রাত্রিকে বললাম, 'আপনারা তো কপোতীর মতো বেশ আছেন। দু'জনেই চাকরি করে কামাই করছেন আর বিকেলের চায়ের কাপ হাতে মুখোমুখি প্রেমালাপ চলছে।'

রাত্রি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো। 'আমার ভাগ্যের কথা বলছেন? প্রথমে যে লোকটাকে স্বামী হিসাবে পেলাম, সে একটা আস্ত শয়তান। আর এখন যাঁকে পতি হিসাবে দেখছেন, উনি আমার কাছে লজিং থাকেন। থাকা-খাওয়া আর বাসা ভাড়ার সব কিছুই আধা-আধা। পুরুষ জাতটার প্রতি আমার ঘেন্না ধরে গেছে। তবুও বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের স্বামী না থাকলেই বিপদ। ছেলে থেকে বুড়ো-সবাই সময়-অসময়ে ঘুরঘুর করে। তাই ওকে স্বামী হিসাবে রেখেছি।'

একাত্তরের ২৫ মার্চ রাত থেকে ঢাকায় শুরু হলো এক নারকীয় হত্যাকাণ্ড। সাতাশ তারিখ থেকে প্রতিদিন ঘণ্টা কয়েকের জন্য কারফিউ প্রত্যাহার হওয়ার ফাঁকে আমাদের পাড়ার প্রায় সবগুলো বাঙালি পরিবারই দলে দলে গ্রামের দিকে চলে গেলো। বিকেল থেকেই সমস্ত ঢাকা নগরীটা একটা প্রেতপুরী মনে হতো। মাঝে মাঝে ট্যাংকগুলো বিকট আওয়াজ করে সেগুনবাগিচার মাঝ দিয়ে যাতায়াত করতে লাগলো। রাতের অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় লাল কাপড় বাঁধা কমান্ডো বাহিনীর লোকেরা আর্মির সহযোগিতায় পাড়ায় পাড়ায় হামলা চালালো। পাঁচ দিন পাঁচ রাত ধরে আমরা সবাই ঘরের মেঝেতে উপুড় হয়ে রইলাম। যে কোন মুহূর্তে মেশিনগানের গুলিতে বাড়িঘর ঝাঁঝরা করে দিতে পারে কিংবা হয় দরজা ভেঙ্গে কমান্ডোরা বাড়িতে ঢুকে পড়তে পারে। মনে হতো আমরা যমদূতের প্রতীক্ষায় মৃত্যুগুহায় বসে রয়েছি। শেষ পর্যন্ত আমাদের পাড়ায় আইনজীবী সালাম খান, ব্যবসায়ী জহুরুল ইসলাম আর প্রকৌশলী জব্বার সাহেবের মতো বড়লোকেরা ছাড়া সবাই চলে গেলো। মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে আমরা দুটো বাঙালি পরিবার রয়ে গেলাম। রাতে আমাদের পাড়ায় হামলা হলো।

পরদিন কারফিউ প্রত্যাহারের পর লাশ দুটোকে দেখে শিউরে উঠলাম। সুদীর্ঘ একুশ বছর পর ঢাকা ত্যাগের পরিকল্পনা করলাম। যেভাবেই হোক আজ বিকেল চারটায় কারফিউ শুরু হবার আগেই এই মৃত্যুগুহা থেকে বেরিয়ে মৃত্যুপুরীর মাঝ দিয়ে অজানার পথে পাড়ি জমাতে হবে। এর মধ্যেই বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের আহ্বান শুনেছি আর আন্দাজ করতে পেরেছি যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকাতে লড়াই চলছে। তাই স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে একাত্মতা প্রকাশের জন্য উন্মুক্ত হয়ে উঠলাম। কিন্তু উপায় কি। কোথায় এবং কিভাবে আমরা সংগঠিত হচ্ছি কিছুই তো জানি না। চিন্তা করে কোন কিনারাই করতে পারলাম না। হঠাৎ আমার জন্মদাতার উপদেশ মনে হলো। ব্রিটিশ আমলে পুলিশে চাকরি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'যে রাস্তা চিনিস না– সে রাস্তায় কোন দিন যাবি না। আর যে বিষয় জানিস না, সে বিষয়ে আলাপ হলে সেখানে কোন মন্তব্য করবি না।'

তাই রাত্রিদের সঙ্গে যখন ঢাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ হলো, আমি বললাম,

কুমিল্লা পর্যন্ত এর আগে অনেকবার যাতায়াত করেছি। কিন্তু আগরতলার রাস্তা চিনি না। এর চেয়ে চলুন যমুনা নদীর ওধারে উত্তরবঙ্গে। মনে হয় আমি এখনও যেতে পারি। তা ছাড়া ওখানকার রাস্তাঘাট আমার জানা আর থাকা-খাওয়ারও বিশেষ অসুবিধা হবে না।'

শেষ পর্যন্ত আমার পরামর্শ সবাই মেনে নিলো। উনত্রিশে মার্চ সকাল দশটার দিকে তৎকালীন স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট লুৎফর রহমান সরকার আমাদের খবরা-খবর নিতে এসেছেন। ভদ্রলোক আমার স্ত্রীর দিক দিয়ে আত্মীয়। তাঁর গাড়িতে আমাদের নয়ারহাট পর্যন্ত পৌঁছাতে রাজি হলেন। এমন সময় দূর থেকে মনে হলো একজন ফকির ভিক্ষা করতে আমাদের বাসার দিকে এগিয়ে আসছে। ফকির পিঠে আর একজনকে বহন করে আনছে। একটু কাছে আসতেই পিঠের মানুষটাকে চিনতে পারলাম। আমার প্রিয় বন্ধু প্রখ্যাত কবি ফয়েজ আহমেদ। কামানের গোলায় আহত। বেচারার উরুদেশের কিছুটা মাংস উড়ে গেছে। ধরাধরি করে ফয়েজকে ঘরের মেঝেতে শোয়ালাম। এই মুহূর্তে অন্তত প্রাথমিক চিকিৎসা না করলে সেপ্‌টিক হতে পারে। আমার স্ত্রী এক সময় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থায় ট্রেনিং নিয়েছিলো। সেই ট্রেনিং কাজে দিলো। স্বামী-স্ত্রী মিলে আহত স্থানটা ডেটল পানি দিয়ে ধুয়ে বোতলের বাকি ডেটলটুকু ঢেলে তুলা দিয়ে ব্যান্ডেজ করলাম। বললাম, আজকেই তোকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। এরপর ধোপার ধোয়া হাওয়াইন শার্ট আর লুংগি পরতে দিলাম, আর সংক্ষেপে তার কাহিনী শুনলাম।

পঁচিশে মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা বন্ধ হয়েছে আন্দাজ করতে পেরে আর জয়দেবপুরের লড়াইয়ের খবরে অজানা আশংকায় অস্থির হয়ে সন্ধ্যার আগেই বাসায় ফিরে এলাম। সহধর্মিণী খোঁটা দিয়ে বললো, কি ব্যাপার, শরীর খারাপ করেনি তো? আমি পেশায় সাংবাদিক ছিলাম। নিয়মিতভাবে অনিয়ম জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। তাই সহধর্মিণী প্রায়ই আমার সম্পর্কে নানা উক্তি করতো। অন্যদিন জবাব দিলেও আজ নিশ্চুপ রইলাম।

আমার বন্ধু চিরকুমার ফয়েজ সেদিন ইত্তেফাক অফিসে যাওয়ার পরেই জানতে পারলো কুর্মিটোলায় আর্মি মুভমেন্ট শুরু হয়েছে। ইত্তেফাক থেকে একটু আশ্রয়ের জন্য দৌড়ে অবজারভারে এলো। কিন্তু সবাই তাঁকে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলো। কাছেই মর্নিং নিউজ অফিস। সেখানে যেতেই অনেকে আঁতকে উঠলো। শেষ পর্যন্ত প্রেস ক্লাবের লাল বিল্ডিংয়ের দোতলায় এসে আশ্রয় নিলো। রাত এগারোটার মতো। বেচারা তখন সোফার মধ্যে সবেমাত্র শোয়ার ব্যবস্থা করছে। এমন সময় বিকট আওয়াজ করে একটা ট্যাংক এসে প্রেস ক্লাবের মাঠে পজিশন নিয়ে ক্লাবের লাল দালানটার দিকে গোলা নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে দোতলায় যে রুমটাতে ফয়েজ সাহেব আশ্রয় নিয়েছিলো, তার একটা দেয়ালের অর্ধেকটা উড়ে গেলো। আর একটা ইসপ্লিন্টার ভদ্রলোকের উরুদেশের কিছু মাংস উড়িয়ে নিলো। চারদিক তখন ইট-সুরকির ধুলায় অন্ধকার আর বারুদের গন্ধে ভরপুর। ফয়েজ সাহেব উপায়ন্তরহীন অবস্থায় টয়লেটে আশ্রয় গ্রহণ করলো। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয় মনে করে রক্তাক্ত অবস্থায় মেথর যাতায়াতের কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে হামাগুড়ি দিয়ে আরও খানিক দূর এগিয়ে কাঁটাতারের পাশটায় গাছের পিছনে আশ্রয় নিলো। তাঁর আন্দাজ ঠিকই ছিলো। জনাকয়েক আর্মি প্রেস ক্লাবের প্রতিটা ঘর সার্চ করলো। অব্যক্ত ব্যথায় কুঁকড়ে পড়ে রইলো ফয়েজ। ঘণ্টা কয়েক পর ভোরের আলো ফুটবার

আগেই বেচারা হামাগুড়ি দিয়ে সচিবালয়ের পিছনের মসজিদের পাশে গিয়ে হাজির হলো। কয়েকজন নামাজি তাঁকে দেখতে পেয়ে ধরাধরি করে মসজিদের ভিতর দিয়ে সচিবালয়ের চত্বরে নিয়ে গেলো। এভাবে পড়ে থাকাটা নিরাপদ নয় মনে করে ফয়েজ সাহেব আবার হামাগুড়ি দিয়ে দ্বিতীয় নয়-তলা ভবনের পাঁচতলায় একটা বাথরুমে আশ্রয় নিলো। তিন দিন তিন রাত পর অনেক কষ্টে নেমে সেকেন্ড গেট দিয়ে বেরিয়ে একজন দিনমজুরের কাছ থেকে পাঁচ টাকা দিয়ে একটা পুরনো লুংগির ব্যবস্থা করলো। ফুলপ্যান্টের বেশ খানিকটা অংশ নেই। তাই অর্ধউলঙ্গতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই লুংগির ব্যবস্থা করতে হলো। এরপর লোকটাকে বললো, 'তোমাকে আরও পাঁচ টাকা দেবো। আমাকে তোমার পিঠে করে ইগলু আইসক্রিমের গলি দিয়ে এগিয়ে আমার বন্ধুর বাসায় পৌঁছে দিতে পারো?' লোকটা রাজি হলো।

ফয়েজের সব কাহিনী শোনার পর জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন কোথায় যাবি? সরকার সাহেবের গাড়িতে পৌঁছবার ব্যবস্থা করতে পারি।' ফয়েজ চলে যাবার পর আমরা আবার বৈঠকে বসলাম। আরও একটা গাড়ির ব্যবস্থা করা দরকার। রাত্রির এক পরিচিত ভদ্রলোক আফজাল চৌধুরী তাঁর গাড়ি দিয়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলো। আমরা দুটো পরিবার ঢাকা ছাড়ার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করলাম। একটা বস্তায় সের দশেক চাল-ডাল আর একটা স্যুটকেসে কিছু কাপড়-জামা নিলাম। কয়েক প্রস্থ পোশাকি কাপড়-জামা ছাড়া বলতে গেলে বাসার সমস্ত জামা-কাপড় মায় বিছানার চাদর পর্যন্ত কাছেই একটা লন্ড্রিতে দিলাম। কপাল গুণে দোকানটির দরজার একটা পাল্লা খোলা পেয়েছিলাম।

মীরপুরের ব্রিজ দিয়ে পার হওয়াটা নিরাপদ হবে কি না তা বোঝার জন্য বেলা বারোটা নাগাদ আফজালের সঙ্গে এলাকার অবস্থা পরীক্ষা করতে গেলাম। ব্রিজের দু'পাশটার বিরাট রকমের গর্ত। একদল লোক গর্তগুলো ভরাট করছে আর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে কিছু সৈন্য টহল দিয়ে পাহারা দিচ্ছে। আন্দাজ করলাম ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে গর্তগুলো ভরাটের কাজ শেষ হবে।

বেলা চারটায় কারফিউ। সোয়া তিনটা নাগাদ দুটো গাড়িতে আমরা জনবারো লোক মীরপুর ব্রিজ দিয়ে অজানার পথে পা বাড়ালাম। ব্রিজের দু'দিকে তখনও নিয়মিত আর্মি চেকিং পয়েন্ট বসেনি। তবে সৈন্যরা টহল শুরু করেছে। কোন রকম ঝামেলা ছাড়াই আমাদের গাড়ি দুটো সাভারের দিকে এগিয়ে গেলো। আমিনবাজারের বাঁক ঘুরতেই গাড়ির জানালা দিয়ে ঢাকা শহরটাকে শেষ বারের মতো দেখলাম। সাভারের বাজারের পর মাইল খানিকও যায়নি। এমন সময় আফজালের গাড়ি খারাপ হয়ে গেলো। এখন উপায়?

সমস্ত মালপত্র, মহিলা আর বাচ্চাদের সরকার সাহেবের গাড়িতে দিয়ে বললাম, তোমরা নয়ারহাটের ওপারে গিয়ে অপেক্ষা করো, আমরা পরে আসছি। আমি ও আফজাল বহু চেষ্ট করেও গাড়িটা ঠিক করতে পারলাম না। হঠাৎ দেখলাম দূরের রাস্তায় একটা মিলিটারি কনভয় আসছে। আফজাল চিৎকার করে উঠলো, 'গাড়ির মায়া করে আর লাভ নেই। আসুন ঠেলা দিয়ে গাড়িটা রাস্তার পাশের গাড়ায় ফেলেই দি।' আফজালের কথামত গাড়িটা ধাক্কা দিয়ে গাড়ায় ফেলে চারজন দু'ভাগে রাস্তার দু'পাশ দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই সৈন্য বোঝাই কনভয়টা রেডিওর ট্রান্সমিটার ভবনের দিকে এগিয়ে গেলো। আফজাল ঢাকাগামী একটা ট্রাক থামিয়ে ড্রাইভারের পাশটাতে বসে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলো। আমরা তিনজন পায়ে

হেঁটে নয়ারহাটের দিকে রওয়ানা হলাম।

কপাল গুণে আমরাও একটা ট্রাক পেলাম। দশ টাকা দিয়ে নয়ারহাট এলাম। ফেরি পার হয়ে দেখি সবাই আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে। ভাবলাম সরকার সাহেবের গাড়ির ড্রাইভারকে অনুরোধ করে মানিকগঞ্জ পর্যন্ত নিতে পারবো। কিন্তু সে কিছুতেই রাজি নয়। আমিনবাজারে গিয়ে রাত কাটাবে। পরদিন কারফিউ ছাড়লে ঢাকায় ঢুকবে। গাড়িটা ঢাকার দিকে ফিরে গেলো। অজানা আশংকায় বুকটা কেঁপে উঠলো।

হঠাৎ একটা যাত্রীবাহী বাস মানিকগঞ্জের দিক থেকে এসে হাজির হলো। কন্ডাক্টর চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'এই বাস আর গাং পার হইবো না। সব্বাই নাইম্যা পড়েন। ঢাকার দিকে বহুত গণ্ডগোল। আমরা আবার আরিচা ফেরত যামু।' মাথাপিছু দু'টাকা টিকিট করে ঠিক করে আমরা সবাই বাসটাতে চেপে বসলাম। বাসেই জানতে পারলাম ডিজেল-পেট্রোলের দারুণ অভাব। দু-একদিনের মধ্যেই সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

আরিচায় যখন এসে নামলাম তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। সবাইকে বাস থেকে নামিয়ে দৌড়ালাম ঘাটে ফেরির খোঁজ করতে। ঘাট শূন্য। একটি ফেরিও নেই। শুনলাম চারটা ফেরি ওপারে গোয়ালন্দের কাছাকাছি লুকিয়ে রাখা হয়েছে মুক্তিবাহিনীর জন্য। হাসবো না কাঁদবো বুঝতেই পারলাম না।

এখন উপায়? স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে রাত কাটাবো কোথায়? স্কুলের উপরের ক্লাসের জনাকয়েক ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করছে। তাদের একজন পরামর্শ দিলো কাছেই একটা হাই স্কুল আছে, ওখানটায় থাকার ব্যাস্থা করতে পারেন। ছেলেটার কথামতো স্কুলে গিয়ে দেখলাম আরও কয়েকটা পরিবার সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। আমরাও স্কুলটাতে থাকার ব্যবস্থা করে ঘাটের হোটেল থেকে খাবার নিয়ে এলাম।

সারাদিনের ধকলের পর পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ করে ঘুম ভেঙ্গে গেলো। পাশেই রাত্রি আর তাঁর স্বামী দুজনের উচ্চস্বরে ঝগড়া চলছে। থামাথামির কোন লক্ষণই নেই। রাত্রির বক্তব্য সে তাঁর আগের পক্ষের ছেলে দুটোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না। অশ্রু আর কাজলকে মৃত্যুপুরীর মধ্যে রেখে সে কেমন করে পলাতক হবে? তাই যেভাবেই হোক সে আবার ঢাকায় ফিরে যাবে। দরকার হলে কারো বাড়িতে ঝিগিরি করে খাবে। ভোর রাতে দুজন একমত হলো ওরা ঢাকায় ফিরে যাবে।

মালপত্র ধরাধরি করে আমরা কাকডাকা ভোরে আরিচাঘাটে এলাম। ওদের জন্য অনেক কষ্টে একটা এক ঘোড়ার এক্কা গাড়ি ভাড়া করা হলো। একরাশ ধুলো উড়িয়ে ওরা মানিকগঞ্জের দিকে চলে গেলো। আমি বিশাল যমুনা নদীর দিকে মাথাটা ঘুরালাম। সামনে অজানা যাত্রাপথ।

প্রায় আট ঘণ্টা পর বিশাল যমুনা নদী অতিক্রম করে নগরবাড়ি পৌঁছলাম। ঝগড়া করেও কোন লাভ হলো না। মাঝিরা কিছুতেই নৌকা নগরবাড়ি ঘাটে ভিড়ালো না। মাইলখানেক দূরে চরে নামিয়ে দিলো। মাথার উপর প্রচণ্ড খাঁ খাঁ রোদ আর পায়ের নিচে উত্তাপ বালি। হাতে স্যুটকেস বহন করে এই মাইলখানেক পথ অতিক্রম করে বড় রাস্তার ধারে এসে পৌঁছলাম। এলাকাটা হিন্দুপ্রধান। ছেলেমেয়েদের জন্য গুড়মুড়ি আর পানির ব্যবস্থা করে খবরাখবর নেয়ার চেষ্টা করলাম। দলে দলে লোকজন পায়ে হেঁটে নিজেদের গ্রামের বাড়ির দিকে যাচ্ছে। একটা পরিবারের সঙ্গে আলাপ হলো।

খুলনার খালিশপুর থেকে এসেছেন। গন্তব্যস্থল সিরাজগঞ্জের এক গ্রামে।

এমন সময় এক যাত্রীবাহী বাস এলো। সামনে লেখা নগরবাড়ি-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তবু সাহস করে ড্রাইভারকে পরিস্থিতি জিজ্ঞেস করলাম। বললো, 'পাবনায় খুব গণ্ডগোল হচ্ছে, তাই বগুড়ায় যাবো।' খুশিতে মনটা ভরে উঠলো। অনেক কষ্টে সবাই বাসে উঠলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর আঠারো মাইল রাস্তা অতিক্রম করে বাঘাবাড়ি এলাম। কিন্তু বাসের পক্ষে আর এগিয়ে ঘাট পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব নয়। গ্রামের লোক রাস্তা কেটে রেখেছে। বড় বড় কাটা গাছও রাস্তা জুড়ে পড়ে আছে।

আবার পদব্রজে যাত্রা। বাঘাবাড়ি ঘাট পার হতেই দেখি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলের একটা বাস দাঁড়িয়ে। গন্তব্যস্থল উল্লাপাড়া। চলন্ত অবস্থায় বাসটার গিয়ার আকস্মিকভাবে পরিবর্তন হয় বলে গিয়ার দড়ি দিয়ে বেঁধে বছর চৌদ্দর একটা ছোকরা ওটা চেপে ধরে আছে। অর্থাৎ বাসটা স্টার্ট দেয়ার পর থার্ড গিয়ার এলেই দড়ি দিয়ে বেঁধে ধরে রাখাটাই ছোকরার কাজ।

উল্লাপাড়া রেলওয়ে ক্রসিংয়ের কাছে বাসটা এসে থেমে গেলো। আর এগুনো সম্ভব নয়। মালগাড়ি দিয়ে রেলওয়ে ক্রসিংটা ব্লক করে রাখা হয়েছে। অনেক কষ্টে দুই মালগাড়ির ফাঁক দিয়ে মালপত্র নিয়ে সবাই মিলে পার হলাম। কপাল গুণে একটা বেবিট্যাক্সি পেলাম। ঠিক হলো আমাদের দুই দফায় উল্লাপাড়া ডাকবাংলোতে পৌছে দিবে। পারিশ্রমিক কুড়ি টাকা।

বাংলোতে মালপত্র রেখে বেশ কিছুক্ষণ ধরে গোসল করে যখন বারান্দার চেয়ারে এসে বসলাম, তখন কাছেই মসজিদে মাগরেবের আজান হচ্ছে। রাতের খাবারের জন্য চৌকিদারের খোঁজ করলাম। কিন্তু ওকে আর পাওয়া গেলো না। চৌকিদারের বাড়ি ঢাকার কালিয়াকৈর। আমাদের কথাবার্তায় তার বুঝতে বাকি নেই যে, ঢাকায় ভয়াবহ গণ্ডগোল চলছে। তাই কাউকে কিছু না বলেই সন্ধ্যায় ঢাকার দিকে রওয়ানা হয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো রাতের খাওয়া লংগরখানায় সারতে হবে। কাছেই উল্লাপাড়া বাজারে এই লংগরখানা। রাত আটটা নাগাদ লংগরখানায় আমাদের জন্য পাত পড়লো। গরম ভাত আর ডাল। তরকারির কোন ব্যবস্থা নেই। মুশকিল বাধলো আমার তিন সন্তানকে নিয়ে। ওরা তিনজন থালায় ভাত নিয়ে তরকারির আশায় বসে রয়েছে। ওদের বলা হলো শুধু ডাল দিয়েই খেতে হবে। তিনজনেই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। একটা পা ছোট এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে সবই লক্ষ্য করছিলো। বললেন, 'বাচ্চারা তো কিছুই পেটে দিলো না। কাছেই আমাদের বাসা। ওখানেই চারটা খাওয়ার ব্যবস্থা করবো আর রাতটাও আমাদের বাসায় কাটাতে পারেন। মনে হয় অসুবিধা হবে না।'

রাত ন'টা নাগাদ ভদ্রলোকের বাসায় পৌছলাম। চারদিকে আম-কাঁঠালের গাছ আর মধ্যে চমৎকার দোতলা দালান। আমাদের ৭-৮ জন মানুষের জন্য বাড়ির বৌ-ঝিরা আবার রান্না চড়ালো।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে যখন শুতে গেলাম, তখন ইংরেজি ক্যালেন্ডারে তারিখ পরিবর্তন হয়ে গেছে। কিছুতেই ঘুম এলো না। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তা করে কোন কিনারাই করতে পারলাম না। এরপর দেশের কথা চিন্তা করলাম। সুদূর অতীতে ফিরে গেলাম। ১৯৪৬-৪৭ সালের কথা। আমি তখন দিনাজপুর কলেজের ছাত্র। একদিকে পাকিস্তান আন্দোলনের জোয়ার আর একদিকে ভয়াবহ দাংগা। দিনাজপুর লেজলার

পার্শ্ববর্তী এলাকাই হচ্ছে ভারতের বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া জেলা। ভয়াবহ দাংগার ফলে মাত্র ২-৩ হপ্তার মধ্যে প্রায় ৩০-৩৫ হাজার বিহারি মুসলমান প্রাণভয়ে দিনাজপুরে এলো। আমরা মুসলিম লীগের পাণ্ডা হিসাবে রিলিফ কমিটি গঠন করে চাঁদা উঠিয়ে নদীর পাড়ে এদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করলাম। কী আশ্চর্য মাত্র ২৪ বছরের ব্যবধানে অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনে, এরাই আজ আমাদের নিশ্চিহ্ন করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু কেনো?

আমাদের পূর্ব পুরুষের অনেকেই তো এই গাংগেয় বদ্বীপ এলাকায় বহিরাগত? যুগের পর যুগ ধরে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মুসলমানরা এই এলাকায় আগমন করে বসতি করেছে। কিন্তু তেমন আপত্তি তো কখনই হয়নি? ব্রিটিশ-পূর্ব যুগে মুসলিম পীর, ফকির, দরবেশ ও আউলিয়ারা দলে দলে এই বাংলায় আস্তানা করে পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন। বাংলাদেশের প্রতিটা জেলাতেই সুফি দরবেশদের দরগা ও খানকা শরীফ এর প্রমাণ বহন করছে। কই, তখন তো স্থানীয় অধিবাসীরা উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদ করেনি। বরং সাদরে গ্রহণ করার ভূরি ভূরি নজির রয়েছে। তাহলে বর্তমান অবস্থার জন্য নিশ্চয়ই এর পিছনে বিরাট কারণ রয়েছে।

অতীতে যাঁরাই এই এলাকায় আগমন করেছেন, তাঁরাই স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। নদীমাতৃক বাংলায় ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে স্বীকার করে গর্ব অনুভব করেছেন এবং অনন্য সাধারণ অবদান রেখে গেছেন।

সুফি সাধকরা পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচারের সময় শুধু এ-কথাটাই বলেছেন যে, 'এক মহান আল্লাহতায়ালার অস্তিত্বে বিশ্বাস করো, পবিত্র কোরান হচ্ছে আল্লাহর প্রেরিত বাণী, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করো আর রসুলে করিম হচ্ছেন আল্লাহর প্রেরিত শেষ পয়গম্বর।' এইসব সাধক কোন সময়েই স্থানীয় ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের প্রতি বৈরী মনোভাব প্রকাশ করেননি। বরং স্থানীয় ভাবধারার সঙ্গে একাত্মতাবোধ ঘোষণা করে ইসলামী তমদ্দুন ও তাহজীবের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা করে গেছেন। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে সুফি সাধকদের অবদান উজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। এরই পাশাপাশি এইসব সুফি, পীর, ফকির, দরবেশ ও আউলিয়া ছাড়াও যুগের পর যুগ ধরে যাঁরাই এই বাংলার মাটিতে পা দিয়েছেন, তারাই এই বাংলাকে দ্বিধাহীনচিত্তে মাতৃভূমি হিসাবে গ্রহণ করেছেন– কোন দিনই ফিরে যাওয়ার কথা চিন্তা করেননি। কালের আবর্তে এরাই বাঙালি জাতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে আজও পর্যন্ত গ্রাম-বাংলায় মুসলমানরা নবান্ন, সংক্রান্তি প্রভৃতি উৎসব পালনের যেমন আগ্রহী, ঠিক তেমনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়, মিলাদ বা ওয়াজ মাহফিল আয়োজনে কার্পণ্য করেন না। তাই তো সাতচল্লিশ সালের প্রাক্কালে উচ্চ বর্ণের অমুসলিমদের অনেকেই পরিস্থিতির মোকাবেলায় দেশত্যাগ করলো।

সাম্প্রতিক ইতিহাসেও দেখা যায় যে, এই বাঙালি মুসলমানরা বাংলা ভাষার ওপর হামলা যেমন প্রতিহত করেছে, ঠিক তেমনিভাবে নাস্তিক দর্শনও প্রত্যাখান করেছে। বাঙালি মুসলমানকে ধার্মিক বলা চলে, কিন্তু ধর্মান্ধ বলে চিহ্নিত করা যায় না। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

এরকম এক প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান আমলে বহিরাগতদের ক্ষেত্রে বিচ্যুতি দেখা দিলো। ক্ষমতাসীন সরকারগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় বহিরাগত বিহারি মুসলমানদের জন্য এমন সব ব্যবস্থার সৃষ্টি হলো, যার ফলে এরা স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সমন্বয় সাধন তো দূরের কথা নিজস্ব স্বকীয়তা পর্যন্ত বজায় রাখলো।

সুদীর্ঘ চব্বিশ বছরেও এঁরা বাঙালি জাতির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হলো না। এদের বসবাসের জন্য সৈয়দপুর, লালমনিরহাট, পার্বতীপুর, সান্তাহার, মীরপুর আর মোহাম্মদপুরের মতো এলাকায় পকেট তৈরি করা হলো। উর্দুর মাধ্যমে স্কুলে শিক্ষার ব্যবস্থা হলো। বাংলা ভাষা না শিখেও আর বাঙালি সমাজে ওঠাবসা না করেও এঁরা দিব্বি দিন গুজরান করলো। সবার অলক্ষ্যে স্থানীয় অধিবাসী আর বিহারি মুসলমানদের মধ্যে অদৃশ্য দেয়ালের সৃষ্টি হলো। সুষ্ঠু নেতৃত্বের অভাবে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে স্বাভাবিকভাবেই অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনে এরা ক্রীড়নকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে অশুভ ভবিষ্যৎকে বরণ করলো। ফলে এদের ভয়াবহ কাফফারা দিতে হলো। আজও পর্যন্ত এর জের চলছে। দেড় হাজার মাইল দূরের এক মরীচিকাময় মাতৃভূমির দিকে এরা তাকিয়ে রয়েছে। অথচ স্বাধীন বাংলাদেশে অবাঙালিদের প্রতি কারো তো বিদ্বেষ নেই।

আফ্রিকার কেনিয়া, উগান্ডা প্রভৃতি এলাকায় বসবাসকারী ভারতীয় ও পাকিস্তানি ব্যবসায়ীদের একই অবস্থার মোকাবেলা করতে হয়েছে। যুগের পর যুগ ধরে কেনিয়া, উগান্ডা প্রভৃতি এলাকায় বসবাস করেও এরা স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে একাত্মতাবোধ ঘোষণা করতে পারেনি। সাদা চামড়ার লোকেরা (সবাই নন) আমাদের যেমন ঘৃণা করে, এরা আফ্রিকার কালো মানুষদের আরও বেশি ঘৃণা করে। তাই স্বাভাবিকভাবেই এরা আবার বাস্তুচ্যুত হয়ে পাসপোর্টের বদৌলতে ব্রিটেনে পাড়ি জমিয়েছে আর সেখানে অহরহ সাদা চামড়ার ঘৃণ্য দৃষ্টি কুড়াচ্ছে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। স্ত্রীর ডাকে ধড়মড় করে লাফিয়ে উঠলাম। মুখ-হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে নিলাম। বাড়ির মালিক ভদ্রলোক জানালেন বগুড়ার অদূরে আঁড়িয়াবাজারে লড়াই চলছে। মোটরসাইকেলে লোক পাঠিয়েছেন খবর নিতে। ভালো খবর না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের যেতে দেবেন না।

৩

বেলা ৯টা নাগাদ সঠিক খবর এলো। আগের দিন আঁড়িয়াবাজার লড়াইয়ে আমাদের জয় হয়েছে। আজকের দিনে যেখানটায় বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট একাত্তরে এই জায়গাটার নাম ছিল আড়িয়াবাজার। বগুড়া শহরের দক্ষিণে এখানটায় সে আমলে প্রস্তাবিত ক্যান্টনমেন্টের জন্য বেশ কিছু জমি একোয়ার করে জনা পঁচিশেক পাকিস্তানি সৈন্যের একটা ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছিলো। আঁড়িয়াবাজার লড়াইয়ের একটা পূর্ব ইতিহাস রয়েছে। একাত্তরের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে হঠাৎ করে এক প্লাটুন পাকিস্তানি হানাদার সৈন্য রংপুর থেকে বড় রাস্তা বরাবর বগুড়া শহরের উত্তর উপকণ্ঠে মহিলা কলেজে আস্তানা গাড়লো। উদ্দেশ্য বগুড়া শহর দখল করা। ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হয়ে এরা শহরে প্রবেশের চেষ্টা করলে বগুড়া কটন মিল এলাকায় প্রতিরোধের মোকাবেলার সম্মুখীন হয়। শহরের কিছু তরুণ যুবক রাস্তার দু'পাশের বাড়ির ছাদে পজিশন নিয়ে দোনলা বন্দুক আর রাইফেল থেকে গুলিবর্ষণ করে। ফলে সৈন্যরা কয়েকটা বাড়ি সার্চ করলো। এসময় সৈন্যরা মোনেম খাঁ মন্ত্রিসভার প্রাক্তন মন্ত্রী ফজলুল বারীকে হত্যা করে। জনাব বারী এসবের কিছুই জানতেন না। তিনি দোতলায় নিজের বাসভবনে একটা ছোট কক্ষে জনৈক স্কুল মাস্টারের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। বারী সাহেবের সঙ্গে এই মাস্টার ভদ্রলোকও জান্নাতবাসী হলেন।

বগুড়া শহরে প্রবেশের মুখে এধরনের প্রতিরোধ এবং সন্ধ্যা হওয়ায় সৈন্যরা আর অগ্রসর না হয়ে আবার মহিলা কলেজের ক্যাম্পে প্রত্যাবর্তন করলে। পরদিন ভোরে

শহরবাসী হতবাক হয়ে গেলো। মহিলা কলেজের ক্যাম্পে অবস্থানকারী কোন পাকিস্তানি সৈন্য নেই। রাতের অন্ধকারেই ওরা মহাস্থান হয়ে রংপুরের পাথে পশ্চাদপসরণ করেছে। কিন্তু মহাস্থান, গোলাপবাগ, পীরগঞ্জ সর্বত্র প্রতিরোধের মুখে এবং গ্রামবাসীদের পাল্টা আক্রমণে এরা আর গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌঁছতে পারেনি।

এরকম ঘটনায় বগুড়া শহরের তরুণ সমাজে তখন উত্তেজনা। সিদ্ধান্ত হলো এবার আঁড়িয়াবাজার আক্রমণ করতে হবে। দলে দলে ট্রাক বোঝাই হয়ে বাঙালি তরুণরা আঁড়িয়াবাজারে হাজির হলো। কয়েক হাজার গ্রামবাসী এঁদের সমর্থনে এগিয়ে এলো। ঘন্টা দুয়েক উভয় পক্ষে গুলি বিনিময়ের পর পাকিস্তানি সৈন্যরা সাদা পতাকা প্রদর্শন করলো। বগুড়ার প্রখ্যাত ডাক্তার টি আহমেদের কিশোর পুত্র মাসুদ এই লড়াইয়ে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল। সাদা পতাকা দেখার সঙ্গে সঙ্গে মাসুদ 'সারেন্ডার' 'সারেন্ডার' চিৎকার করে রাইফেল হাতে এগিয়ে গেলো। চকিতে একটা গুলি মাসুদের মস্তিষ্ক বিদীর্ণ করলো।

পঁচিশজন পাকিস্তানি সৈন্য ও এঁদের পরিবারবর্গকে বন্দি করে আর মাসুদের লাশ সঙ্গে নিয়ে সবাই বগুড়া শহরে ফিরে এলো। চারদিকে বিষাদের ছায়া। বগুড়া জেলে প্রথমে সৈন্যদের পরিবারবর্গকে ঢোকানো হলো; তারপর এক লোমহর্ষক ঘটনা। উত্তেজিত জনতা জেল গেটেই পঁচিশজনকে হত্যা করলো। এসব ঘটনা অবশ্য পরিচিতদের মুখে শুনেছি।

যাক যা বলছিলাম। উল্লাপাড়া থেকে তিনটা রিকশা ভাড়া করলাম চান্দাইকোনা পর্যন্ত। চুক্তি হলো যেসব জায়গায় রাস্তা কাটা আছে কিংবা গাছ কেটে রাস্তা বন্ধ আছে, সেসব জায়গায় রিকশাওয়ালাদের সঙ্গে আমাদেরকেও দরকার হলে কাঁধে করে রিকশা পার করার ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে।

আশ্রয়দাতাদের কাছে বিদায় নিয়ে রওয়ানা হলোম চান্দাইকোনার পথে। সম্মুখে পরিচিত ও জানা পথ। অথচ এ যাত্রায় মনে হলো সবই অজানা। প্রায় আট-দশবার নেমে রিকশা কাঁধে করে পার করতে হলো। চান্দাইকোনাতে রিকশা বদল করে অন্য তিন রিকশায় যখন বগুড়ার পথে রওয়ানা হলাম তখন কেবল দুপুর গড়াতে শুরু করেছে। চান্দাইকোনার পর কিছুটা বিরলবসতি এলাকা। তাই কাটা রাস্তার সংখ্যা একটু কম মনে হলো।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে আঁড়িয়াবাজার পার হলাম। নির্জন-নিঝুম। আশপাশের মাটির ঘরগুলোতে অসংখ্য গুলির চিহ্ন। কাঁটাতারে ঘেরা এলাকায় দূরে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে। মনে হলো জনাকয়েক লোক ট্রাকের আশপাশে আনাগোনা করছে। পরে জেনেছি আঁড়িয়াবাজারের ম্যাগাজিন লুট হয়েছিলো।

সন্ধ্যায় এসে বগুড়া শহরে হাজির হলাম। কোথাও কোন বৈদ্যুতিক আলো নেই। লোকজনের চলাচল একেবারে কম। মনে হলো আমরা একটা ভৌতিক শহরে এসে হাজির হয়েছি। জলেশ্বরীতলায় পৈতৃক বাসভবনে জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। সবাই গ্রামে চলে গেছে। মালতীনগরে সবাই পলাতক।

কোন রকমে রাতের খাওয়া শেষ করলাম। ছোট্ট বাড়িটার সানবাঁধানো বারান্দায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় বসে রইলাম। মনে হলো আমার পাশে পাশে অসংখ্য অশরীরী আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিঝুম রাতের ঘন অন্ধকারে পাশের পায়ে চলা পথ দিয়ে কেউ যাতায়াত করলেই চমকে উঠছি। এমন সময় একটা রিকশায় অ্যাডভোকেট গাজীউল হক এসে হাজির হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা একই সঙ্গে পড়েছি। স্বভাবসুলভ

উচ্চস্বরে প্রাণখোলা হাসি দিয়ে বললো, 'তুই এসেছিস, ভালোই হলো। আমরা বগুড়ার সিভিল অ্যাডমিনেস্ট্রেশন চালাবার জন্য একজন লোক খুঁজছি। কাল সকালেই সার্কিট হাউসে কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব নে। আমি রয়েছি মুক্তিবাহিনীর চার্জে।'

আমি এক দৃষ্টিতে ওঁকে তাকিয়ে দেখলাম। পরনে খাকি পোশাক আর কোমরে রিভলবার। ছেচল্লিশ সালে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে আবার দুজনেই বায়ান্নো সালে ঢাকায় ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারীদের অন্যতম ছিলাম। কী আশ্চর্য! একাত্তরে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বগুড়াতে দুজনের আবার দেখা হলো। এবার বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াই। গাজীর কাছ থেকে অনেক খবর পেলাম। দিনাজপুর জেলার পুরোটাই আমাদের দখলে। তবে সৈয়দপুর, রংপুর এলাকা পাকিস্তানিদের হতে। সিরাজগঞ্জে সেখানকার এসডিও শামসুদ্দীন সাহেব নেতৃত্ব দান করছেন। নওগাঁ-সান্তাহার এলাকার বাঙালি-অবাঙালিদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়েছে। এখনও সান্তাহার শহরের যেখানে-সেখানে লাশ পড়ে আছে। সান্তাহারে যাওয়া সম্ভব নয়। ট্রেন নাই, আর রাস্তা সব কাটা।

গাজী আরও বললো, 'বগুড়া শহর থেকে অধিকাংশ পরিবারই গ্রামাঞ্চলে চলে গেছে। সর্বত্র লবণ, জ্বালানি তেল ও ওষুধ ইত্যাদির দারুণ অভাব। এই পরিস্থিতি আমাদেরই সামলাতে হবে।'

গাজীউল চলে যাবার পরও অন্ধকার বারান্দায় বসে রইলাম। চিন্তা করে কোন কিনারাই করতে পারলাম না। কাছেই একটা বাসা থেকে করুণ সুরে একটানা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। আমার জীবনসঙ্গিনী খাবার জন্য ডাকতে এলে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে বললো, 'জানো না দিনকয়েক আগে সানুকে ওরা মহিলা কলেজের ওখানে মেরে ফেলেছে?'

গেলো বছর সানু বিকম পাস করেছিলো। বাপ-মা'র কত সাধ সানু চাকরি করে অভাবের সংসারে সাহায্য করবে। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার। দু'বেলায় প্রায় আঠারোটা পাত পড়ে। এরপর আবার দুটো মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। যখন সানুকে ঘিরে সবাই একটু আশার আলো দেখছিলো, তখনই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। সানুকে মারার পর ওরা লাশটাকে পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিলো।

হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে আমার সম্বন্ধী বাসায় ফিরলো। প্রশ্ন করলাম, শহরের খবর কি? বললো, 'কি দুনিয়া? আঁড়িয়াবাজার ক্যাম্পের পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের স্ত্রী গর্ভবতী ছিলো। একটু আগে রাত দশটায় জেলখানার হাসপাতালে বাচ্চা হলো– ছেলে। আর এদিকে ক্যাপ্টেনের পচা লাশ এখনও করোতোয়া নদীর পাড়ে পড়ে রয়েছে।'

আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

পরদিন বগুড়া সার্কিট হাউসে বৈঠক হলো। যাঁরা শহরে রয়ে গেছেন, তাঁদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়রা বৈঠকে অংশ নিলেন। স্থির হলো সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে হবে। এ ব্যাপারে একটা কমিটি গঠন করে আমার ওপর দায়িত্ব দেয়া হলো।

বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্ব নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা সমস্যার সম্মুখীন হলাম। অনেক কষ্টে টেলিফোন বিভাগের কিছু কর্মচারী সংগ্রহ করে বগুড়া-নওগাঁ, বগুড়া-সিরাজগঞ্জ আর বগুড়া-জয়পুরহাট লাইন চালু করলাম। আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরে সবারই মনোবল বৃদ্ধি পেলো। দিন দুয়েক পরে সার্কিট হাউসে জনাকয়েক লোক এসে অনুমতি চাইল। এঁরা সব বিদ্যুৎ বিভাগের

কর্মচারী। বললো, হুকুম পেলে শহরে প্রতিদিন ঘণ্টা কয়েকের জন্য বিদ্যুৎ চালু করার ব্যবস্থা করতে পারি। আমরা সরেজমিনে বিদ্যুৎ অফিস পরিদর্শন করে কর্মচারীদের উৎসাহিত করলাম।

এদিকে তীব্র লবণ সংকট। খবর পেলাম সরকারি গুদামে লবণের ভালো স্টক রয়েছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কিভাবে বণ্টন করা হবে। দুজন ষণ্ডাগোছের লোককে ডেকে হুকুম করলাম যেভাবে পারো আজকের মধ্যে জেলা অথবা মহকুমা ফুড কন্ট্রোলারকে এই সার্কিট হাউসে নিয়ে আসতে হবে। ওরা মাগরিবের সময় জেলা ফুড কন্ট্রোলারকে নিয়ে এসে হাজির করলো। একগাল হেসে ভদ্রলোকের সঙ্গে হাত মিলালাম, বললাম, 'আপনার সহযোগিতা চাচ্ছি।'

ঘণ্টাখানেক আলাপের পর বুঝলাম যে, সরকারি অনুমোদিত ডিলার রয়েছে। এদের খবর দিলে ট্রেজারি চালানের মারফত টাকা জমা দিয়ে এঁরা গুদাম থেকে লবণ রিলিজ করতে পারবে। রাত আটটার দিকে বগুড়া শহর ও শহরতলিতে ঢোল দেয়ার ব্যবস্থা করলাম। পরদিন সাকল ন'টা থেকে স্টেট ব্যাংকের বগুড়া শাখায় চালান জমা নেয়া হবে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বেচ্ছাসেবকরা সুকানপুকুর, সোনাতলা, গাবতলী, কাহালু, মহাস্থান ও শিবগঞ্জ এলাকায় লবণের ডিলারদের কাছে খবর পাঠিয়ে দিলো। স্টেট ব্যাংকের বগুড়া শাখার তৎকালীন ম্যানেজার মজিদ মোল্লা সাহেব চালান জমা নেয়ার ব্যবস্থা করলেন। পরদিন দুপুর নাগাদ বিভিন্ন এলাকায় লবণ বিক্রি শুরু হলো। একই পদ্ধতিতে হাইস্পিড ডিজেল আর চিনি বিক্রির ব্যবস্থা চালু হলো।

এরপর দেখা দিলো পেট্রোল সংকট। দক্ষিণে শেরপুর থেকে উত্তরে গোলাপবাগ পর্যন্ত সমস্ত পাম্পের পেট্রোল আর ডিজেল 'সিজের' ব্যবস্থা হলো। বাস ও ট্রাক চলাচল বন্ধ। স্পেশাল পারমিট ছাড়া পেট্রোল ও ডিজেল ব্যবহার নিষিদ্ধ। কেবলমাত্র হোন্ডা মোটরসাইকেলের জন্য অর্ধ গ্যালন করে পেট্রোল বরাদ্দ হলো। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এসব ছোট ধরনের মোটরসাইকেল বাংলাদেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। একদিকে খরচ কম আর অন্যদিকে পায়ে চলা রাস্তা দিয়েও হোন্ডা-মোটরসাইকেল দিব্যি যাতায়াতে সক্ষম। ফলে জরুরি খবর সরবরাহ থেকে পুত্র-পরিজন অন্যত্র স্থানান্তর সবই এই মোটরসাইকেলে সম্ভব হয়েছে।

এতোসব দৌড়াদৌড়ির মধ্যে আমার জন্মদাতার সঙ্গে পর্যন্ত দেখা করতে পারলাম না। গণ্ডগোল শুরু হওয়ার পর বগুড়া থেকে মাইল বারো দূরে কাহালুর গ্রামাঞ্চলে বাহাত্তর বছরের এই বৃদ্ধ আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। দিন কয়েক পরে একদিন সাইকেলে রওয়ানা হলাম। কিন্তু দারুণ ঝড়-বৃষ্টির জন্য নামাজগড় গোরস্থান থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হলাম। এরপর জীবনে আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি।

নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে কোলকাতায় 'হিজরত' করার পর যখন অনিশ্চিত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলাম, তখন খবর পেলাম মার্কিনি সংবাদ সংস্থা ইউপিআই-এর সংবাদদাতা হিসাবে ঢাকায় আমার যে চাকরি ছিলো তা অক্ষুণ্ন রয়েছে। মুজিবনগরস্থ অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের কার্যকলাপ সংক্রান্ত খবর পাঠানো আমার মুখ্য দায়িত্ব। ইউপিআই-এর কোলকাতাস্থ সংবাদদাতা অজিত দাশের সঙ্গে আমার খুবই হৃদ্যতা। এর মধ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করার জন্য দারুণভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে একাত্তরের পঁচিশে মে তারিখে পঁচিশ মিটার ব্যান্ডে ৫০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন এই বেতার কেন্দ্র চালু হলো।

টাঙ্গাইলে অ্যাডভোকেট ও রাজনৈতিক নেতা জনাব আব্দুল মান্নান এই বেতার

কেন্দ্রের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন। বেতার কেন্দ্র চালু হবার প্রাক্কালে তিনি বললেন, 'মুকুল সাহেব, এতোদিন তো খালি চাপাবাজিই করলেন। এখন বুঝবো রেডিওতে আপনি কেমন অনুষ্ঠান করেন?' বিনীতভাবে জবাব দিলাম, 'নীতিগতভাবে উর্ধ্বতন মহল থেকে কোন অসুবিধা না করলে, মনে হয় আমার অনুষ্ঠান সবারই পছন্দ হবে।'

দিন কয়েকের মধ্যেই আমার 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান সম্পর্কে নানা মহল থেকে মন্তব্য পেতে শুরু করলাম। চারদিকে চরম উত্তেজনা। মুজিবনগর সরকারের নিজস্ব বেতার কেন্দ্র নিয়মিতভাবে চালু হয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আবালবৃদ্ধবনিতা সবারই মনোবল দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে আর হাজার হাজার যুবক মুক্তিযুদ্ধে শরিক হওয়ার জন্য বিভিন্ন ক্যাম্পে হাজির হচ্ছে।

এমন এক সময়ে ১০ জুনের বিকালে এক নম্বর চৌরংগী টেরাসে অজিত দাশের অফিসে গিয়ে দেখি আমার নামে দুটো চিঠি। একটা লন্ডন থেকে আমার শ্যালকের লেখা আর দ্বিতীয়টা টোকিও থেকে ইউপিআই-এর জেনারেল ম্যানেজারের লেখা। ইউপিআই-এর চিঠিটা পড়ার জন্য প্রথমে খুললাম।

> *'...একটা বিদ্রোহী বেতার কেন্দ্র থেকে তোমার প্রোপাগাণ্ডামূলক অনুষ্ঠানে পাকিস্তান সরকার ঘোর আপত্তি জানিয়েছে। তাই হয় এই অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ করো নচেৎ ইউপিআই-এর সংবাদদাতার চাকরি থেকে তোমার ইস্তফা দেয়া বাঞ্ছনীয়। – আর্নেস্ট অলব্রাইট।'*

মাথাটা ঝিমঝিম করে ঘুরে উঠলো। চাকরি না থাকলে এই অচেনা-অজানা কোলকাতা মহানগরীতে এতগুলো মুখের আহার যোগাবো কোথা থেকে? দুরু দুরু বক্ষে দু'নম্বর চিঠিটা খুললাম। লন্ডন থেকে আমার শ্যালক লিখেছে।

> *'... অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে জানাচ্ছি যে, গত ১১ই মে বগুড়ার কাহালু গ্রামাঞ্চলে সেনাবাহিনীর অতর্কিত হামলায় আপনার আব্বা নিহত হয়েছেন।'*

দুটো ভয়াবহ দুঃসংবাদের পর মনে হলো আমাকে এখন হিমাচলের মতো কঠোর হয়ে সবকিছুই নীরব-নিথরভাবে সহ্য করতে হবে। আমি ভেঙে পড়লে পুরো সংসারটাই শেষ হয়ে যাবে। চুপচাপ উঠে গিয়ে অজিত দাশের টাইপ রাইটারে টাইপ করলাম।

> *"আমি দুঃখিত যে, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রোপাগাণ্ডা অনুষ্ঠান 'চরমপত্র' বন্ধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অনুগ্রহ করে আমার এই টেলিগ্রামকেই পদত্যাগপত্র হিসাবে গ্রহণ করুন। গত এগারো বছর ধরে আপনাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।– আখতার"*

আবার বগুড়ার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আরও দিন পনেরোর মতো বগুড়ায় থাকলাম। এর মধ্যে শহর প্রায় জনমানব শূন্য হয়ে গেছে। অনেকেই যার যার অস্থাবর মালামাল নিয়ে গ্রামাঞ্চলে পাড়ি জমিয়েছে। ষোলই এপ্রিল তারিখে বেলা দু'টার সময় নওগাঁ থেকে একটা ফোন পেলাম। যে কোন সময়ে হিলি এলাকা পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দখল করে নিতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে সপরিবারে সীমান্ত অতিক্রমের সিদ্ধান্ত নিলাম। একটা টয়োটা জিপ যোগাড় করে আমরা দুইটি পরিবার বেলা তিনটা নাগাদ মহাস্থানের ওপর দিয়ে ক্ষেতলাল হয়ে জয়পুরহাটের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম।

যা বলছিলাম। বগুড়ার বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্ব নিয়ে শহরের আশপাশে যেখানেই গেছি, সেখানেই দেখি কিশোর-যুবকের দল ট্রেনিং নিচ্ছে। প্রাণপ্রিয়

বাংলাদেশকে স্বাধীন ও মুক্ত করতে হবে। মাত্র কিছুদিন আগেও যাদের 'ডাল-ভাতের' বাঙালি হিসাবে আখ্যায়িত করা হতো, সেই তরুণ সমাজের হাতে এখন আগ্নেয়াস্ত্র সোভা পাচ্ছে। এঁদের চোখে-মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। কিন্তু এঁরা সবাই এককেন্দ্রীয় কমান্ডারের অধীনে নয়– এঁদের সবার চিন্তাধারাও এক নয়। অজানা আশংকায় মনটা ভরে উঠলো।

দিন কয়েক পরে এক লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের খবরে শিউরে উঠলাম। বিশেষ রাজনৈতিক দলের উৎসাহী সদস্য বলে জনৈক ভদ্রলোককে উত্তেজিত জনতা দিনেদুপুরে তাঁর বাড়ির আঙ্গিনায় হত্যা করেছে। তাঁর স্ত্রী বীভৎস হত্যাকাণ্ড দেখার পর আত্মহত্যা করেছেন। অনেক কষ্টে একজন পুলিশের দারোগাকে সংগ্রহ করে জনাকয়েক সশস্ত্র ভলান্টিয়ারস মোটরসাইকেলে ঘটনাস্থলে পাঠালাম। একটা প্রাথমিক রিপোর্ট সংগ্রহ করে যেনো লাশ দুটো দাফনের অনুমতি দেয়া হয়। সান্তাহারের কাছেই এক গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনা।

সন্ধ্যা নাগাদ ওঁরা ফিরে এলো। কিন্তু সান্তাহার সম্পর্কে যে রিপোর্ট দিলো তা ভাষায় প্রকাশ করা মুশকিল। নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় আর ট্রেন ও রাস্তা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বলে এই রেলওয়ে শহরের কোন খবরই নিতে পারিনি। দিন তিনেক ধরে এই সান্তাহারে মধ্যযুগীয় নারকীয় হত্যাকাণ্ড হয়েছে। এখন লাশের দুর্গন্ধে শহরে ঢোকা যায় না।

পরদিন বগুড়া শহরের শেষ প্রান্তে আমার খালাতো ভাইয়ের বাসায় দাওয়াত খেতে গেলাম। বয়সে আমার থেকে বেশ বড়। নাম আবদুল গনি। কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর হিসাবে সারা জীবন চাকরির পর নিজের বাড়িতেই অবসর জীবনযাপন করছেন। হাতে অঢেল সময়। তাই চুক্তিতে রেলওয়ের একটা সমবায় দোকান চালাবার দায়িত্ব নিয়েছেন। আইয়ুব মার্শাল ল'র আমলে জীবনে একবার মাত্র ঢাকায় এসেছিলেন। আমি তখন দৈনিক ইত্তেফাকের চিফ রিপোর্টার। অভয় দাস লেনে আমার বাসাতেই উঠেছিলেন। ঢাকায় এসেছিলেন স্ত্রীর পেটের টিউমার অপারেশনের জন্য। আমি দৌড়াদৌড়ি করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে ভাবীর অপারেশনের ব্যবস্থা করেছিলাম। সুদীর্ঘ নয় বছর ধরে ভদ্রমহিলা এই টিউমারের ব্যথা নিয়ে দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছিলেন। অপারেশনের পর তিনি সুস্থ ও সবল হয়ে বগুড়ায় সংসারধর্ম পালন করছেন। নাম রেজা। নিকট আত্মীয় ছাড়া আর কেউ বুঝতেই পারে না যে, রেজা হচ্ছে সতীন-পুত্র। ছিমছাম ছোট্ট একটা সংসার। দুপুরে খাওয়ার পর অনেক গল্প করলাম। বিদায় নেয়ার আগে সাবধান থাকার জন্য গনি ভাইকে উপদেশ দিলাম।

৪

দেশ স্বাধীন হবার পর মুজিবনগর থেকে দেশে ফিরে বগুড়ায় গেলাম আব্বার কবর জিয়ারতের জন্য। নামাজগড় গোরস্থানের একাংশ উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা 'আখন্দ পরিবার গোরস্থান'। আব্বা বেঁচে থাকতে সারা জীবন পুরানো খবরের কাগজ বিক্রি করে যে টাকা জমিয়েছিলেন, সেই টাকা দিয়ে পারিবারিক গোরস্থানটুকু কিনেছিলেন। আব্বার হুকুম আমরা যে যেখানেই মারা যাই না কেনো আমাদের লাশ যেন এই পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। আব্বার কবর জিয়ারতের পর ভাবলাম কাছেই তো সেই খালাতো ভাইয়ের বাড়ি– দেখা করলে খুশি হবেন।

বাড়িতে বেশ ক'বার কড়া নাড়লাম। কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে কেনো জানি না বুকটা কেঁপে উঠলো। পাড়ার কয়েকটা ছেলে এসে আমার চারপাশে জড়ো হলো। একজন ভাইয়ের কথা বলতে এলো। ধীরে ধীরে সেই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা শুনলাম।

এপ্রিল মাসের শেষের দিকে বগুড়া পুরো শহরটাকে ওরা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিলো। রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন যেসব নিরীহ লোক তখনও শহরে বসবাস করছিলো তাঁরা আত্মাহুতি দিলো। মনে হয় তখন আক্রমণকারীদের মিশনই ছিলো বাঙালি মাত্রই নিশ্চিহ্ন করতে হবে। তাই তো বগুড়া নবাব স্টেটের এককালীন ম্যানেজার ও বগুড়া মুসলিম লীগের সভাপতি ও পৌরসভার চেয়ারম্যান মরিস সাহেবের বাড়ি লুট হলো ও তাঁর বৃদ্ধা মাতা নিহত হলো। আজীবন মুসলিম লীগার ডক্টর কসিরউদ্দিন আর মোনেম খাঁ মন্ত্রিসভার অন্যতম মন্ত্রী ফজলুল বারী নিহত হলো।

মোদ্দা কথায় আক্রমণকারীরা কোন বাছবিচার করেনি। এমন এক সময়ে ওদের চেলা-চামুণ্ডারা আমার প্রৌঢ় খালাতো ভাই আর তাঁর পুত্রকে ধরে বাড়ির সামনে তালগাছটার নিচে জবাই করলো। কালের নীরব সাক্ষী হিসাবে ভাবী জানালা দিয়ে স্বচক্ষে এই বীভৎস হত্যাকাণ্ড দেখলো। সমস্ত ঘটনা শোনার পর যখন মাথা তুললাম, দেখলাম দরজার একটা পাল্লা ধরে আমার ভাবী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। চুল উষ্কখুষ্ক আর তার চোখ রক্তিমবর্ণ। উনি এখন অর্ধ উন্মাদিনী। নানাভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলাম। বললাম, 'আপনি একটা দরখাস্ত করলে, সরকারের কাছ থেকে কিছু টাকা খেসারত হিসাবে ব্যবস্থা করে দিতে পারি।' আমার প্রস্তাব শুনে ভদ্রমহিলা অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলেন। আমার নাম ধরে বললেন, '[illegible], আমার ছেলে আর স্বামীর রক্ত বিক্রি করা টাকার দরকার নেই। আল্লার দোয়ায় যেটুকু আছে, তাই দিয়ে জীবনের বাকি ক'টা দিন কাটিয়ে দিতে পারবো। আর শোন, তুমি একদিন ঢাকায় আমার অপারেশন করিয়ে জীবনে বাঁচিয়েছিলে। তাই তোমাকে কিছু বললাম না। তোমাদের আর কেউ যেনো অন্তত আমার কাছে এ ধরনের প্রস্তাব না আনে।' আমি উত্তরে কিছু একটা বলতে গিয়ে ধমক খেলাম। বললেন, 'তোমার আব্বাকেও তো ওরা হত্যা করেছে, কই তোমরা তো খেসারতের জন্য দরখাস্ত করনি?' আমি আর কোন জবাবই দিতে পারলাম না। এক গ্লাস সরবত খেয়ে বিদায় নিলাম।

যাক যা বলছিলাম। আবার এপ্রিল মাসের ঘটনায় ফিরে যাই। ভাইয়ের বাসায় খাওয়া-দাওয়ার পর বেলা তিনটা নাগাদ সার্কিট হাউসের কন্ট্রোল রুমে এসে বসলাম। এমন সময় নওগাঁ থেকে ফোন এলো। 'দু-একদিনের মধ্যে হিলির বর্ডার বন্ধ হয়ে যেতে পারে। পাকিস্তানি সৈন্যরা রংপুর থেকে পার্বতীপুর হয়ে হিলির দিকে এগিয়ে আসছে।' সঙ্গে সঙ্গে প্রমাদ গুনলাম। ঢাকা থেকে এত কষ্ট স্বীকার করে এক রকম পায়ে হেঁটে ১৩৫ মাইল দূরে এই বগুড়া শহরে এসেছি। আর মাত্র ৩০/৪০ মাইল যেতে পারলেই ওপারে আশ্রয় পেতে পারি। তাড়াহুড়া করে একটা নতুন টয়োটা জিপ যোগাড় করে মালতীনগর থেকে আমার পরিবারকে উঠালাম। আগেই কথা ছিলো যে, খন্দকার আসাদুজ্জামান ও আমরা একসঙ্গে ওপারে যাবো। জামান সাহেব উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। ছুটিতে পিতার সঙ্গে দেখা করার জন্য টাঙ্গাইলে নিজ জন্মভূমিতে গিয়েছিলেন। তারপর প্রচণ্ড লড়াইয়ে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারসহ সামান্য আশ্রয়ের জন্য নৌকায় যমুনা নদী পেরিয়ে এই বগুড়া শহরে হাজির হয়েছেন। এক ডাক্তার ভদ্রলোকের বাসায় আপাতত তাঁর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা দুটো পরিবার

একসঙ্গে একই জিপে মহাস্থান হয়ে রওয়ানা হলাম।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ ক্ষেতলাল পৌঁছলাম। সামনে ছোট নদী। পানি খুব বেশি নয়। তবে জিপ পার হওয়া মুশকিল। প্রাইভেট গাড়ি, জিপ আর পথচারী পারাপারের জন্য একটা কাঠের ব্রিজ রয়েছে। কিন্তু তার মাঝের একটা অংশ নেই। কে বা কারা খুলে নিয়ে গেছে। স্থানীয় লোকদের সঙ্গে আলাপের জন্য আসাদ সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে জিপ থেকে নামলাম। আমার মোটা শরীর, বড় গোঁফ আর বড় চুল দেখে ওরা আমাকে অবাঙালি বলে কানাঘুষা করছে। বুকের রক্ত হিম হয়ে এলো। ভাগ্যিস বগুড়ার স্থানীয় উচ্চারণে আমি পারদর্শী। আমার স্বভাবসুলভ রসিকতা ও কথাবার্তায় ওদের ধারণা পাল্টালো এবং কিছুটা আপন হলো। এরপর জানতে পারলাম যে, ওরা এক ভয়ংকর মিশনে রয়েছে। যেসব অবাঙালি জয়পুরহাট-পাঁচবিবি এলাকা থেকে বগুড়া হয়ে ঢাকার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে তাদের এখানে নদীর পাড়ে শেষ করা হচ্ছে। তবে মহিলা ও বাচ্চাদের ওরা অক্ষত অবস্থায় একটা বাড়িতে আটক রেখেছে। সন্ধ্যার পর মশাল হাতে গ্রামবাসীরা এসে দিন কয়েক ধরে এই কাজ করছে।

অনেক কষ্টে ওদের বুঝাতে সক্ষম হলাম যে, আমরা অক্ষত অবস্থায় যেতে পারলে প্রবাসী সরকার গঠনের সুবিধা হবে। মাইলখানেক দূরে একটা বাড়িতে কাঠের ব্রিজের একাংশ লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো। আমাদের অনুরোধে সেই অংশটা গ্রামবাসীরা এনে ফিট করলো। আমরা সবাই হেঁটে পার হবার পর অত্যন্ত সন্তর্পণে জিপটা পার হলো।

এরপর যখন জিপে উঠলাম, তখনও আমার স্ত্রী ও মিসেস আসাদ অবিরাম সূরা পড়ছেন। যখন পাঁচবিবি অতিক্রম করলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মরহুম মওলানা ভাসানীর শ্বশুরবাড়ির পাশ দিয়ে একরাশ ধুলো উড়িয়ে আমাদের জিপটা জয়পুরহাট সুগার মিলের দিকে এগিয়ে চললো। রাত আটটা নাগাদ সুগার মিলের রেস্ট হাউসে পৌঁছলাম। আমার এক প্রাক্তন সাংবাদিক বন্ধু মিলের ম্যানেজার। তাই তিনি আতিথেয়তায় কার্পণ্য করলেন না।

সারাদিন পরিশ্রমের পরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বেশ হৈচৈ-এ ঘুম ভেঙ্গে গেলো। রাত তখন এগারোটা বেজে গেছে। বগুড়া থেকে দুটো জিপে করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয়রা ছাড়াও জনাকয়েক সরকারি কর্মচারী এসেছেন। এঁদের মধ্যে সিরাজগঞ্জের এস ডি ও শামসুদ্দীন সাহেবও রয়েছেন। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য আমরা সবাই বৈঠকে বসলাম। রাত দেড়টা পর্যন্ত আলোচনা করেও মতৈক্যে পৌঁছতে পারলাম না।

নানা দুশ্চিন্তায় রাত পর্যন্ত কিছুতেই ঘুম এলো না। ঢাকা থেকে সপরিবারে বেরুবার সময় পকেটে মাত্র দুশো টাকা ছিলো। কাউকে ঘুণাক্ষরে বুঝতে দেইনি। বগুড়ায় নানা ডামাডোলে টাকা সংগ্রহ করা আর হয়নি। ভেবেছিলাম ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে কিছু টাকা নেবো। ওর ব্যবসায়ে আমার জীবনের সঞ্চয়ের জমি আর গাড়ি বিক্রি করা বেশ কিছু টাকা বিনিয়োগ করা আছে। বগুড়ায় এসে দেখি ছোট ভ্রাতা পুত্র-পরিজনসহ গ্রামাঞ্চলে শ্বশুরালয়ে আশ্রয় নিয়েছে। হঠাৎ করে বগুড়ার সাতমাথায় ওর শ্বশুরের সঙ্গে দেখা। নিজের করুণ অবস্থা বর্ণনা করে তাঁর মারফত একটা চিঠি পাঠালাম। দিন দুয়েক পরে উত্তর এলো– সঙ্গে একশো টাকা। হাসবো না কাঁদবো বুঝতেই পারলাম না। এমন সময় পত্রবাহক করুণ কণ্ঠে জানালো, সে হচ্ছে মহাজনের টাউনের বাসায় নাইট গার্ড। তার পাওনা বেতন ত্রিশ টাকা, এই টাকা থেকে নিতে বলেছে। আমি ছোক্‌রাকে পুরো একশ' টাকার নোটটাই দিয়ে বিদায় দিলাম। ঘটনার

কথা সহধর্মিণীকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দিলাম না। শুধু মনে পড়লো বছর কয়েক আগে ভয়াবহ গ্যাস্ট্রিক আলসার রোগে আমার এই ভ্রাতাই যখন ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালে মৃত্যুর মুখোমুখি তখন অপারেশনের প্রাক্কালে আমার নিজের দেহের রক্ত দিয়ে সাহায্য করেছিলাম আর আমার স্ত্রী দিনরাত ছায়ার মতো হাসপাতালে উপস্থিত থেকে সেবা করেছিলো। কী অদ্ভুত আর অপূর্ব প্রতিদান!

উপায়ন্তরহীন অবস্থায় বগুড়া সিটি মেডিক্যাল স্টোরসের মালিক এবং আমার ভায়রা আমজাদ ভাইয়ের কাছে হাত পাতলাম। বললাম, 'অন্তত হাজারখানেক টাকা ধার দিন। কবে শোধ করবো জানি না।' ভদ্রলোক দোকানের ক্যাশ থেকে এক হাজার টাকা দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'আপনি না বগুড়ার সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কন্ট্রোলে রয়েছেন? ব্যাংক, ট্রেজারি সবকিছুই তো আপনার হাতে?'

আমি কোন জবাবই দিতে পারিনি। নীরবে টাকাগুলো গুনে একটা কাষ্ঠ হাসি দিয়ে বললাম, 'সাবধানে থাকবেন। আর পারেন তো দোয়া করবেন যেনো সৎ পথে থাকতে পারি।' মুজিবনগরে যাওয়ার হপ্তাখানেক পরে জানতে পেরেছিলাম যে, বগুড়া স্টেট ব্যাংক থেকে কয়েক কোটি টাকা লুট হয়েছে।

যাক যা বলছিলাম, জয়পুরহাট সুগার মিলের রেস্ট হাউসের বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে লাগলাম। পকেটে মাত্র এক হাজার টাকা। ওপারে অচেনা-অজানা দেশে এই পাঁচটা মুখের অন্ন সংস্থান করবো কিভাবে? মনে পড়লো উনিশ বছর আগেকার কথা। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন ক্লাসের ছাত্র। থাকি ব্যারাক ইকবাল হলে। ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছি। গুলিবর্ষণের দিন কয়েক পরে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর একটা ইউনিট সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের বিরাট দরজা ভেঙে সমস্ত হল সার্চ করেছে আর বেপরোয়াভাবে ছাত্রদের গ্রেফতার করেছে। ইকবাল হলে কর্তৃপক্ষ তালা বন্ধ করেছে। চারদিকে শুরু হয়েছে ত্রাসের রাজত্ব। অনেক কষ্টে গেন্ডারিয়া স্টেশন থেকে রাত দশটায় বাহাদুরাবাদ মেলে উঠলাম। পরদিন সকালে বাহাদুরাবাদ ঘাটে রংপুরের একদল ছাত্রের সঙ্গে দেখা। সবাই যার যার গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু আমার তো যাবার কোন জায়গা নেই।

নিজ জেলা বগুড়ায় গেলেই গ্রেফতার হবো। এ কয়দিনে নিশ্চয়ই খবর হয়ে গেছে। রংপুর শহরে গেলে অপরিচিত ছাত্রের চেহারা দেখলেই পুলিশের হেফাজতে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর দিনাজপুরে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। পুরো কলেজ জীবনটাই দিনাজপুরে কাটিয়েছি। ছেচল্লিশের সাধারণ নির্বাচন, সাতচল্লিশের পাকিস্তান আন্দোলন, আটচল্লিশের প্রথম ভাষা আন্দোলন আর রেলওয়ে ধর্মঘট সব কিছুতেই সক্রিয়ভাবে আংশগ্রহণ করেছি। তাই লালমনিরহাটে ট্রেনটা পৌছবার পর কাউকে না বলে ট্রেন থেকে নেমে গা-ঢাকা দিলাম। ঘণ্টাখানেক পর আরেকটা ট্রেন এলো। গন্তব্যস্থল পাটগ্রাম সীমান্ত স্টেশন।

হঠাৎ খেয়াল হলো ভারত-পাকিস্তান যাতায়াতের জন্য তখন পাসপোর্ট প্রথা কার্যকর ছিল না। তাহলে আপাতত ওপারে যাওয়াই শ্রেয়। দেশ বিভাগের সময় র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে জলপাইগুড়ি জেলার যে পাঁচটা থানা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো তার মধ্যে পাটগ্রাম থানা অন্যতম। যাতায়াতের সুবিধার জন্য পাটগ্রামকে রংপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই থানারই ছিটমহল হচ্ছে দহগ্রাম ও আংগরপোতা। সন্ধ্যার একটু আগে পাটগ্রামে পৌছে জানতে পারলাম আমার প্রিয় বন্ধু কমরেড সুলতানের এক ভাই ডা. সোলায়মান এই পাটগ্রামেই প্র্যাকটিস করছেন।

স্টেশনে নেমে খোঁজ করতেই ডাক্তার সাহেবের ঠিকানা পেলাম। ছোট শহর এই পাটগ্রাম। হেঁটেই ভদ্রলোকের বাসায় গেলাম। ছোট ভাইয়ের বন্ধু বলে এক রকম রাজসিক আদর পেলাম। রাতে ঘুমাবার আগে ডাক্তার সাহেবকে পাটগ্রামে আসার কারণ বললাম। মুখটা তাঁর ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। এক সময় জলপাইগুড়িতেই ডাক্তারী করতেন। বহু ধকল সহ্য করে এখন পাটগ্রামে আস্তানা করেছেন। কোনরকম ঝামেলাহীন অবস্থায় বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে আগ্রহী। পরিষ্কার বললাম, 'জানাজানি হলে আপনারই অসুবিধা হবে। তাই কাল সকালেই ওপারে যাওয়ার সব ব্যবস্থাই করে দিন। আর গোটা বিশেক ভারতীয় মুদ্রা দিতে হবে। আমাদের কাছে কোন টাকা-পয়সা নেই।'

পরদিন ভোর ন'টা নাগাদ তিনটা যাত্রীবাহী বগি নিয়ে একটা উল্টো ইঞ্জিন আমাদের ঠেলে মূল জংশনে নিয়ে এলো। ডা. সোলায়মান আমার অনুরোধ রেখেছিলেন। এখনও পরিষ্কার মনে আছে, মূল জংশনে নেমে দু'আনার মটর-ভাজা কিনে সোজা মাঠের পাশে গাছতলায় গিয়ে বেতের স্যুটকেসটা পাশে রেখে সটান হয়ে ঘাসের উপর শুয়ে পড়লাম।

হঠাৎ সম্বিত ফিরে এলো। উনিশ বছর আগে ওপারে যাওয়ার সময় পেট ছিলো মাত্র একটা। তাতে সুবিধা ছিলো অনেক– যাঁহাই রাত হুঁহাই কাত্। কেউ কিছু বলার নেই। কিন্তু এবার তো নিদেনপক্ষে পাঁচটি মুখের আহার যোগাতে হবে। আবার কোন-না-কোনভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে। অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত ওপার বাংলায় আমাদের কপালে কি ধরনের অভ্যর্থনা আর ব্যবহার অপেক্ষা করছে কে জানে! এর ওপর আবার ওখানে নকশালদের কার্যকলাপে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দারুণভাবে বিঘ্নিত। উপরন্তু ওপার বাংলার পথে-ঘাটে এক লাখের মতো সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের কছে শুধু একটা খবর এসেছে যে, সীমান্ত অতিক্রম করার সময় কোন রকম হয়রানি করা হবে না।

পরবর্তী কার্যপদ্ধতি নির্ধারণের জন্য পরদিন সকাল ন'টা নাগাদ সুগার মিলের রেস্ট হাউসের ড্রইংরুমে আমাদের বৈঠক বসলো। ঘণ্টাখানেক আলোচনার পর এ মর্মে সিদ্ধান্ত হলো যে, খন্দকার আসাদ ও আমার পরিবারের সদস্যবর্গ এই রেস্ট হাউসেই আপাতত অবস্থান করবে এবং আমি গার্জিয়ান হিসাবে থাকবো। বাকি সবাই হিলিতে বিএসএফ-এর সঙ্গে আলাপ করতে যাবেন। আমি বললাম, 'ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর নতুন টয়োটা জিপ আর টাংকি ভর্তি তেল রেখে যেতে হবে।' আমাদের জন্য পেট্রোলের ব্যবস্থা করে ওরা জনচৌদ্দ লোক দুটো জিপে হিলির দিকে চলে গেলেন। আমি মিসেস আসাদকে বললাম, 'আসুন আমরা সব মালপত্র জিপে তুলে তৈরি থাকি। বলা যায় না, কখন আবার রওয়ানা হবার হুকুম হয়!'

৫

সমস্ত দুপুর আর বিকাল বেলা খুবই অস্থিরতার মধ্যে কাটালাম। কপাল ভালো যে, জয়পুরহাট সুগার মিলের সঙ্গে হিলির টেলিফোন যোগাযোগ অক্ষুণ্ন ছিলো। সন্ধ্যা বেলায় সেই বহু প্রতীক্ষিত ফোন এলো।

খোন্দকার সাহেবের কণ্ঠ। কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'মুকুল সাহেব সবাইকে নিয়ে এক্ষুণিই রওয়ানা হয়ে যান। ওরা পার্বতীপুর থেকে রেললাইন বরাবর এগিয়ে আসছে। আমরা কামানের গোলার আওয়াজ পেয়েছি। সবাই প্রায় তৈরি ছিলো। মিনিট দশেকের

মধ্যে রওয়ানা হলাম। বিকেলে বেশ বৃষ্টি হওয়ায় উত্তরাঞ্চলের ধুলোর রাস্তাগুলো ভয়াবহ রকমের কাদার রাস্তায় রূপান্তরিত হয়েছে। জয়পুরহাট শহরের এলাকা ছেড়ে একটু এগুতেই শুনলাম, আমাদের বেঙ্গল রেজিমেন্টের যে প্লাটুন এখানে আস্তানা গেড়েছে তাঁরা তিলিগামী এই রাস্তা বরাবর কারফিউ জারি করেছে।

মাথায় বজ্রাঘাতের মতো মনে হলো। আজ রাতে হিলি সীমান্ত পার না হতে পারলে যদি পাকিস্তানি সৈন্য এর মধ্যে হিলি পর্যন্ত অ্যাডভান্স করে তাহলে তো আর ওপারে যেতেই পারবো না। কোথায় ঢাকা আর কোথায় হিলি? কত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আর কত কষ্টকে হাসিমুখে বরণ করে প্রায় ১৮ দিন পরে ১৭৫ মাইল দূরে এই সীমান্তে এসেছি। অথচ মাত্র একটা ভুলের জন্য কি ওপারে যেতে পারবো না?

জিপের শুধুমাত্র সাইড লাইট জ্বালিয়ে প্রায় এক হাঁটু কাদার মধ্যে ধস্তাধস্তি করে মাইলখানেক যাওয়ার পরেই বেঙ্গল রেজিমেন্টের জনা তিনেক সশস্ত্র জোয়ান আমাদের অ্যারেস্ট করলো। অনেক অনুরোধ-উপরোধেও কোন ফল হলো না। বললাম, 'দেখুন আমি হচ্ছি সাংবাদিক। আমার পরিচয়পত্র রয়েছে। আর এঁরা দশজনের দুজন মহিলা ও বাকি সবই তো শিশু?' প্রায় আধঘন্টা পরা ওঁদের হাবিলদার এলো। তাঁরও একই জবাব, কারফিউ-এ মধ্যে যেতে দেবো না। এমন সময় আরো একজন জোয়ান এসে স্যালুট দিয়ে হাবিলদার সাহেবকে বললো ফোন এসেছে। মিনিট কয়েক পর হাবিলদার সাহেব এসে আমাদের জিপের নম্বর মিলিয়ে আমার হাতে একটা ছোট কাগজ দিয়ে বললো, 'আপনাদের জন্য ক্লিয়ারেন্স এসেছে। এই কাগজটা হচ্ছে স্পেশাল পারমিট। যাওয়ার সময় হেড লাইট জ্বালাবেন না।' হঠাৎ আমার হাত ধরে হাবিলদার সাহেব আরো বললো, 'জানেন লাকসামের গ্রামে আমার বাড়ি। আইজ পরায় দুই মাস হয় বউ-পোলাপানের কোন খবর পাই না।'

আমি কোন জবাবই দিতে পারলাম না। রাত বারোটা নাগাদ হিলের রেলওয়ে গুমটির পাশে এসে আমাদের জিপটা দাঁড়ালো। এই রেলওয়ে গুমটিই হচ্ছে আমাদের সীমানা। পথে কেউ কোন কথাবার্তা পর্যন্ত বলেনি। খোন্দকার সাহেব ছাড়াও বগুড়া ও সিরাজগঞ্জের বেশ কিছু গণ্যমান্য লোকজন ও অফিসার ওখানে দাঁড়িয়ে। মালপত্র নামিয়ে সবার সঙ্গে যখন রেললাইনের ওপাশটায় পা ফেললাম তখন ইংরেজি ক্যালেন্ডারের তারিখ পরিবর্তন হয়ে গেছে।

ওপারে যাওয়ার মুহূর্তে আমাদের সঙ্গের আগ্নেয়াস্ত্রগুলো বেঙ্গল রেজিমেন্টের ছোট্ট ক্যাম্পটাতে জমা দিলাম। ড্রাইভাররা তিনটা জিপ আবার চালিয়ে ফেরত যাবে। আমরা সবাই মিলে চাঁদা করে ওদের বকশিশ দিয়ে বিদায় দিলাম। এমন সময় সিরাজগঞ্জের তৎকালীন এসডিও শামসুদ্দিন সাহেব আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিদায় নিয়ে একটা ফিরতি জিপে চড়ে বসলেন। বললাম, 'কী ব্যাপার আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন না?' মুখে একগাল দাড়ির মধ্যে হাসি ফুটিয়ে তিনি জবাব দিলেন, 'আমি যাবো কেমন করে? বাঘাবাড়ির চরে আমি পজিশন নিয়ে আমাদের জোয়ানদের রেখে এসেছি। ওরা তো আমার পথের দিকে তাকিয়ে রয়েছে?'

রেললাইনের ওপারে গিয়ে মাথাটা পিছন ফিরে তাকিয়ে রইলাম। মিনেট খানেকের মধ্যেই জিপের পিছনের ছোট্ট লাল আলো দুটো চোখের আড়াল হয়ে গেলো। এই মহানুভব মহাপ্রাণের সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। শুনেছি মাস কয়েক পরে ভদ্রলোককে আটক অবস্থায় পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

হিলি স্টেশনের কাছেই রেলওয়ে গুমটির ওপাশটায় দাঁড়িয়ে যখন হাতঘড়ির দিকে তাকালাম তখন রাত একটা। তারিখ ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১ সাল। বুকের ভিতরটা হুহু করে কেঁদে উঠলো। আমরা এখন হিন্দুস্তানের মাটিতে। বিদেশী রাষ্ট্রের আশ্রয়ে। অচেনা-অজানা-অনাত্মীয়ের দেশে পরিবার-পরিজন নিয়ে সসম্মানে বাঁচতে পারবো কি? পিছনে যে জন্মভূমি ফেলে এলাম সেখানে আর কোন দিন ফিরতে পারবো কি? চিন্তার কোন কিনারাই করতে পারলাম না। আবার মাথাটা ঘুরিয়ে প্রাণভরে বাংলাদেশটাকে শেষবারের মতো দেখলাম। ঘন অন্ধকারের মধ্যে সারি সারি বৃক্ষের অস্তিত্ব উপলব্ধি করলাম। দূর থেকে ভেসে আসছে কুকুরের একটানা ঘেউ ঘেউ চিৎকার।

জনৈক ভারতীয় বাঙালি ভদ্রলোক আমাদের গাইড হিসাবে এগিয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। প্রথমেই গেলাম পুলিশ চেকিংয়ের জন্য। বলা হলো পুলিশের কাছে নাম ও পিতার নাম আর আদি বাসস্থান লেখাতে হবে। ছোট্ট একটা ঘর। সেখানে কোন বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা নেই। গেঞ্জি গায়ে খুবই শুকনো এক ভদ্রলোক বিরাট একটা খাতা ও কলম নিয়ে বসে। পাশে একজন সিপাই পাঁচ ব্যাটারির একটা টর্চলাইট জ্বালিয়ে বিরাট খাতার উপর ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

কাছে গিয়ে আমার পরিবারের সবার নাম বলতে শুরু করলাম। গেঞ্জি গায়ে শুকনো ভদ্রলোক আমাদের নাম-ধাম লিখতে লিখতে বাঙাল ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন, ভাইগ্যাই যদি পড়বেন, তা হইলে এই গণ্ডগোলডা বাজাইলেন ক্যান? আমি কোন জবাবই দিলাম না। এবার ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, 'এলায় যে আপনারা ভাগতাছেন, আপনাগো মনের অবস্থাটা কি? মানে কিনা আপনাগো মনটা কেমন হাউ-হাউ করতাছে?' এবারও আমি কোন জবাব দিলাম না। গুমোট গরমে তখন অস্থির হয়ে উঠেছি। কিন্তু ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা। কলমটা খাতার উপর রেখে মাথা তুলে বললেন, 'বুঝছেন, আমাগো বাড়িও বর্ডারের হেই মুড়া– মানে বরিশাল। পঞ্চাশ সালের রায়টে বউ-পোলাপান লইয়া ভাগছি। এলায় বুঝছেন আপনারা যখন আমাগো খেদাইছিলেন, তখন আমাগো মনডা এই রকমই করছিলো। হে ভগবান কত কিছু দেখাইলা। এইবার তো দেখতাছি হিন্দু-মুসলমান হগলই ভাগতাছে।' আমি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

রাত দুটা নাগাদ হিন্দুস্তান-হিলির ডাকবাংলোতে পৌঁছলাম। সবার শোয়ার জায়গা করে একটা চেয়ারে বসে চোখ বুজলাম। কিন্তু মশার যন্ত্রণায় ঘুমাতে পারলাম না। কোনমতে রাত কাটিয়ে কাক-ডাকা ভোরে একটু প্রাতঃভ্রমণ করলাম। হঠাৎ দেখি আমাদের গাইড ভদ্রলোক একগাল হাসি দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে সুপ্রভাত জানালেন। পেশায় আমি সাংবাদিক খবরটা তিনি ভালো করেই জানেন। অনেক গল্প করলেন। কিন্তু আমি দায়সারাভাবে উত্তর দিলাম। শেষে তিনি এক ঘটনার কথা বললেন।

দিন কয়েক আগে মোটরসাইকেলে ওপার থেকে দুই ছোকরা এসে হাজির। কিছু খাওয়ার জন্য একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে অর্ডার দিলো। খাবার যখন টেবিলে এলো তখন দুজনেই কোমর থেকে দুটো রিভলভার বের করে টেবিলে রেখে খেতে শুরু করলো। এদিকে রেস্টুরেন্টের মালিকের তো চোখ ছানাবড়া। ওপারের এই মুসলিম ছোকরাগুলো কী সাংঘাতিক! খাওয়া শেষ করে রিভলভার কোমরে গুঁজে দিব্বি রেস্টুরেন্টের মালিকের

কাছে গিয়ে বললো, 'দাদা খাইলাম তো ভালোই। পকেটে কিন্তুক পয়সা নাই। বাঁইচ্যা থাকলে আরেক দিন আইস্যা দিয়া যামু।' দাদার তখন থরহরি কাঁপুনি। মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরুলো না। এই ঘটনার কথা শুনে অনেক দিন পর আমি অট্টহাস্যে ফেটে পড়লাম।

সকাল আটটা নাগাদ লুচি আর বুটের ডাল দিয়ে নাস্তা করে ভাড়া করা তিনটা ট্যাক্সিতে আমরা বালুঘাটের উপর দিয়ে মালদহ রওয়ানা হলাম। বালুরঘাট, মালদহ এসব এলাকা মুসলমানপ্রধান। ১৯৪৭-এর ৩রা জুন মাউন্টব্যাটেনের ঘোষণায় এ-সব এলাকা পূর্ব বঙ্গের অংশ হিসাবে ঘোষিত হয়েছিলো। এমনকি ১৯৪৭-এর চৌদ্দই আগস্ট বালুরঘাট ও মালদহে পাকিস্তানি পতাকা পর্যন্ত উড়েছিলো। কিন্তু র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে মালদহের চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহকুমা ছাড়া বাকি সমস্ত জেলা আর দিনাজপুরের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী এলাকা এই বালুরঘাট মহকুমা হিন্দুস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলো।

বালুরঘাটের প্রায় সমস্ত এলাকাই আমার চেনা। ১৯৪৫ সাল থেকে আমার পুরো কলেজ জীবনটা দিনাজপুরে কেটেছে। আব্বা ছিলেন দিনাজপুরের পুলিশ কোর্ট ইন্সপেক্টর। হাসান তোরাব আলী আই. সি. এস. তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। এ সময় প্রখ্যাত কিষাণ নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশের নেতৃত্বে এই দিনাজপুরে ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন হয়েছিলো। প্রায় পঁচিশ বছর পর সেই বালুরঘাটের মাঝ দিয়ে যাওয়ার সময় অতীত স্মৃতি ভেসে উঠলো। কাছেই খাঁপুর গ্রাম। এই গ্রামে তৎকালীন ব্রিটিশ পুলিশ গিয়েছিলো একদিন ভোর রাতে তেভাগা নেতাদের গ্রেফতার করতে। তারপর এক রক্তক্ষয়ী লড়াই। একদিকে তেভাগার সমর্থক সাঁওতালদের গোক্ষুর সাপের বিষ মাখানো তীরের আক্রমণ আর তার জবাবে সশস্ত্র পুলিশের বেপরোয়া গুলিবর্ষণ। সবকিছু শেষ হবার পর খাঁপুর গ্রামটা একটা বিধ্বস্ত রণক্ষেত্র। নিহতদের সংখ্যা তেত্রিশ। এর মধ্যে পুলিশের সাতটা লাশ। আজও পর্যন্ত এই রক্তস্নাত খাঁপুর গ্রামে তেভাগা আন্দোলনের স্মৃতি হিসাবে ২৬ জন শহীদের স্মরণে নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা শুভ্র প্রস্তরফলক। কী আশ্চর্য, আজ ৩৫ বছর পর পশ্চিমা সাহায্য সংস্থাগুলো একটা কথা বারবার করে বলছে যে, কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হলে আমূল ভূমি সংস্কার না করলেও জমিতে বর্গাদারদের মেয়াদি অধিকার দিয়ে তেভাগা পদ্ধতি চালু করা অপরিহার্য। অথচ সেদিন এই কথাটা বলা রাষ্ট্রদ্রোহিতার সমতুল্য ছিলো।

যাক যা বলছিলাম। মালদহ রেলস্টেশনে যখন পৌঁছলাম তখান দুপুর গড়িয়ে গেছে। খাওয়া-দাওয়া যখন শেষ করলাম তখন বেলা সাড়ে তিনটা। এই মালদহ স্টেশনেই দেখ হলো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনাকয়েক অধ্যাপকের সঙ্গে। ওঁদের কাছ থেকে রাজশাহীর ঘটনা শুনলাম। বেলা সাড়ে চারটা নাগাদ কোলকাতাগামী ট্রেন পেলাম। হিলির সেই গাইড ভদ্রলোকই আমাদের সবার টিকিট কিনে আনলো। হাওড়া স্টেশনে যখন পৌঁছলাম তখন রাত প্রায় ন'টা। ট্যাক্সি ভাড়া করে আমরা সবাই মির্জাপুর স্ট্রিটের পুরানো একটা হোটেলে উঠলাম। বহু পুরানো একটা তিনতলা বিল্ডিংয়ে এই হোটেল। খোন্দকার আসাদ সাহেব এবং আমরা পাশাপাশি দুটো কামরা রিজার্ভ করলাম। বাকিদের সঙ্গে ফ্যামিলি নেই বলে তারা দল বেঁধে তিনটা ঘরে মেঝেতেই শুয়ে পড়লো।

সকালে নাস্তা খেয়েই দৌড়ালাম শিয়ালদহে টাকা ভাংগাবার জন্য। চারদিকে জোর গুজব ওপারের টাকার মুদ্রামান দ্রুত কমে যাচ্ছে। কপালটা ভালোই বলতে হবে ;

আমাদের প্রতি একশ' টাকার বদলে ৮৮ টাকা করে ভারতীয় মুদ্রা পেলাম। অর্থাৎ পকেটে তখন আটশ' আশি টাকা। চুক্তি মোতাবেক দু'বেলা খাওয়া ও সকালের নাস্তাসহ রুম ভাড়া পঞ্চাশ টাকা। ঘুরে-ফিরে খালি একই চিন্তা। পাঁচটা মানুষের আহার-বাসস্থানের সংস্থান করে হোটেলে আর ক'দিন থাকতে পারবো?

বেলা এগারোটা নাগাদ হোটেলে ফিরে এলাম। ঢুকতেই ম্যানেজার বললো আমার জন্য ফোন এসেছিলো। ফেরত ফোন করার জন্য নম্বর দিয়েছে। কিছুই বুঝতে পারলাম না। তবু দুরু দুরু বক্ষে ফোন করলাম। ওপাশ থেকে জবাব পেলাম, 'আমার নাম অজিত দাশ। ইউ পি আই-এর কোলকাতার ব্যুরো চিফ। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে তৈরি থাকবেন। আপনাদের জন্য থাকার জায়গা করেছি। মশায় অতো চিন্তা করবেন না।'

রুমে ফিরে এসে খোন্দকার সাহেবকে খবরটা দিলাম। বেলা দুটা নাগাদ অজিত দাশ এসে হাজির হলেন। বললেন, 'বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে টিভলি কোর্টে তেরো তলায় ভুটানের মহারাজার একটা বিরাট ফ্লাট খালি রয়েছে। হোটেলে পয়সা খরচ না করে আপনার দুটো ফ্যামিলিই সেই ফ্লাটে থাকতে পারেন। তবে একটাই শর্ত। ফ্লাটে রান্নাবান্না করতে পারবেন না।' তবু বাঁচা গেলো অন্তত রুম ভাড়া লাগবে না।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আমরা নতুন আস্তানায় উঠে এলাম। অজিত বাবু বললেন, 'আখতার সাহেব চলুন এখন গ্রান্ড হোটেলে। ইউপিআই-এর সিংগাপুর ব্যুরোর চিফ প্যাট কিলেন আপানার জন্য অপেক্ষা করছে।' অজিত বাবুর গাড়িতেই গ্রান্ড-এ গেলাম। এই মার্কিনি ভদ্রলোকের অমায়িক ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করলো। বললো, 'এ্যাকটার– তুমি যখন ফ্যামেলি নিয়ে এসেছো, তখন তোমার কোন চিন্তাই নেই। ইউপিআইতে তুমি চাকরি কন্‌টিনিউ করো। তোমার কাজ হচ্ছে মুজিবনগর সরকার সম্পর্কে খবর দেয়া। আর ক্যালকাটা ব্যুরো থেকেই বেতন নিবে।'

চা খাওয়ার পর প্যাট আমার চারটা ইন্টারভিউ টেপ করলো। সবগুলোই 'ক্রাক ডাউন'-এর পরের ঘটনাবলী সম্পর্কে। আমিই প্রথম প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিক যে, ১৭৫ মাইল পায়ে হেঁটে সপরিবারে ওপারে হাজির হয়েছি। রাত আটটায় প্যাটের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় আমার হাতে এক হাজার ভারতীয় টাকা দিয়ে বললো, 'তোমার স্পেশাল ইন্টারভিউ-এর জন্য কিছু পারিশ্রমিক দিলাম।' আমি হতবাক হয়ে রইলাম।

৭

একাত্তরে বাংলাদেশে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড আর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর দাপটে সপরিবারে বাধ্য হয়েই কলকাতায় পাড়ি জমিয়েছি। এর আগেও তিন তিনবার বাড়ি থেকে পালিয়ে এই মহানগরীতে এসেছি। প্রথমবার ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর। জন্মদাতার কড়া হুকুম ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ উত্তীর্ণ হয়ে মহসিন স্কলারশিপ না পেলে কলেজে পড়া বন্ধ। আমি তখন দিনাজপুর মহারাজ গিরিজানাথ হাই স্কুলের ছাত্র। হেডমাস্টারের নাম মণি মুখার্জী। মাত্র বছর খানেক আগে আব্বার বদলির দরুন ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে দিনাজপুরে মহারাজা স্কুলে ভর্তি হতে হাজির হয়েছি। ভর্তির সব ব্যবস্থা হওয়ার পর হেড মাস্টার যখন জানতে পারলেন যে, আমি মুসলমান তখন তার চোখ একেবারে ছানাবড়া। বললেন, 'তুমি তো এ্যাডমিশন টেস্ট ভালোই দিয়েছো। কিন্তু আমাদের স্কুলে তো আরবি, পারশি কিংবা উর্দু পড়ানো

হয় না, এখানে শুধু সংস্কৃত। তাহলে তুমি ভর্তি হবে কেমন করে?' আমি একগাল হেসে বললাম, 'স্যার আমিও সংস্কৃতের ছাত্র। আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না।' দশম শ্রেণীতে ৫৩ জন ছাত্রের মধ্যে আর একজন মাত্র মুসলমান ছাত্র পেলাম। নাম ওয়াকিল উদ্দীন মণ্ডল। দিনাজপুরের চরখাই বিরামপুরের বিরাট জোতদারের ছেলে। মাসের মধ্যে ১৫/২০ দিন অনুপস্থিত থাকে। বলতে গেলে আমিই সবেধন নীলমণি মুসলমান। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠলাম। কারণ ফুটবল খেলায় আমার দক্ষতা।

এই মহারাজা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়ার শেষ দিন ছিলো অংক পরীক্ষা। পরীক্ষা খুব একটা ভাল হলো না। তাই জন্মদাতার ভয়ে পরীক্ষার হল থেকেই এক বস্ত্রে পালিয়ে এই কলকাতায় চলে এসেছিলাম। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যায়।

দ্বিতীয়বার বাড়ি থেকে পালিয়েছিলাম ১৯৪৯ সালে। দিনাজপুর রিপন কলেজ (ব্রাঞ্চ) থেকে বিএ পরীক্ষা দিয়ে আব্বার নতুন কর্মস্থল মাদারীপুরে বেড়াতে গেলাম। আব্বা সেখানে এসডিপিও। পুরনো মাদারীপুর শহর আড়িয়াল খাঁ নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। নতুন শহরে লেকের পাড়ে এসপিডিও সাহেবের চমৎকার বাংলো। একদিন সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে আব্বার বিকট চিৎকার শুনতে পেলাম। কান পেতে এই রাগারাগির কারণ বুঝতে চেষ্টা করলাম। যখন টের পেলাম যে আমি সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস করেছি জানতে পেরে এই চিৎকার হচ্ছে, তখন এক বস্ত্রে সোজা স্টিমার ঘাটে গিয়ে কলকাতার পথে পাড়ি জমালাম।

তৃতীয় বার হচ্ছে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময়। ঢাকা থেকে সোজা লালমনিরহাট হয়ে পাটগ্রাম দিয়ে আসামে। সেখান থেকে বিহারের কাটিহার। দিন কয়েক পরে মনিহারী ঘাট দিয়ে আসাম লিংক এক্সপ্রেসে কলকাতা।

চতুর্থ বার ১৯৭১ সালে সপরিবারে ঢাকা থেকে পায়ে হেঁটে ১৭৫ মাইল দূরে হিলি। তারপর বালুরঘাট-মালদহ হয়ে কলকাতা। প্রতিবারেই কলকাতার নতুন চেহারা। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ডামাডোলে একদিকে কলকাতা শহরে খালি 'ব্যাফেলড ওয়াল' আর অস্বাভাবিক মিলিটারি যানবাহনের ছুটাছুটি। ১৯৪৯ সালে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার জের চলছে। ১৯৫২ সালে শিয়ালদহ আর হাওড়া স্টেশনে উদ্বাস্তুদের ভিড়। লাখ লাখ ছিন্নমূল মানুষ দু'মুঠো অন্নের জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে। সমগ্র মহানগরী 'ম্যাসাজ ক্লিনিকে' ভর্তি। বিত্তশালী ব্যক্তিরা এইসব ক্লিনিকে গিয়ে সামান্য অর্থের বিনিময়ে যুবতীদের দিয়ে দেহ মর্দন করে নিচ্ছে। সতীত্বহানির আশংকায় যারা পদ্মা-মেঘনা-যমুনাবিধৌত এলাকা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এপারে এসেছেন, তাঁদের অনেকে সেই সতীত্বের বিনিময়েই অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করছেন। বায়ান্নোর কলকাতায় কার্জন পার্কে একটু বেড়াতে যাওয়াও বিপদ। অহরহ নারীর দালালরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আর ১৯৭১ সালে কলকাতার আরেক রূপ।

চারদিকে শুধু নকশালদের আতংক। যে বেরুবাড়ি-ছিটমহল নিয়ে ১৯৪৭ সাল থেকে ভারত-পাকিস্তান আর ১৯৭২ সাল থেকে ভারত-বাংলাদেশ বিরোধ চলছে সেই বেরুবাড়ি থেকেই মাত্র মাইল পনেরো উত্তরে জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত এই নকশালবাড়ি। এখানেই চারু মজুমদার আর কানু সান্যালের নেতৃত্বে গড়ে উঠলো এক উগ্র বামপন্থী মার্কসীয় দল। শ্রেণী শত্রুদের হত্যার মাধ্যম সর্বহারাদের বিপ্লবের মাহেন্দ্রক্ষণ এসে গেছে। এটাই হচ্ছে নকশাল মতবাদ। যারা মার্কসীয় বুলি কপচিয়ে পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে আস্থাভাজন হচ্ছেন তারাও নকশালদের শত্রু।

১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের অন্যতম কম্যুনিস্ট নেতা কমরেড রণদিভেও এরকম

একটা থিসিস দিয়েছিলেন। ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত থিসিসকে রণদিভে 'বুর্জোয়াদের লেজুড়বৃত্তি' বলে আখ্যায়িত করে নর্দমায় নিক্ষেপ করলেন। রণদিভের মতবাদে স্বাধীনতা ঘোষণা করে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে রক্তাক্ত সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। সংঘর্ষে কত মাতার কোল শূন্য হয়েছে আর কত নারীর সিঁথির সিঁদুর মুছে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। কত কৃষকের ভিটা-মাটি শ্মশানে পরিণত হয়েছে, তা ইতিহাসে কোথাও লেখা নেই। কিন্তু যে মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব সর্বহারাদের বিপ্লবের নামে এ্যাডভেঞ্চার ইজম করে তেলেংগানা বরাংগলে বীভৎস হত্যাকাণ্ডকে আমন্ত্রণ করে এনেছিলো, তারা তাদের কাছে জবাবদিহি করেছিলো?

আবার এতগুলো বছর পরে ১৯৭১ সালে রণদিভে থিসিসের প্রেতাত্মা এসে ভর করলো পশ্চিম বাংলা নকশাল ইজমের ওপর। খুব অল্প দিনের মধ্যেই নকশাল ইজম সমগ্র পশ্চিম বাংলায় ছড়িয়ে পড়লো। শুরু হলো থানা লুট, জোরদার খতম আর ট্রাফিক পুলিশ হত্যার পালা। ক্ষেতের পাকা ধান কেটে নেয়া নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। কলকাতা মহানগরীতে বিরাট বিরাট দোকানের লোহার গেটগুলো হলো বন্ধ; আর বন্ধ গেটের উপর ছোট্ট বোর্ডে লেখা 'দি শপ ইজ ওপেন'। অর্থাৎ দুজনের বেশি গ্রাহক একসঙ্গে দোকানে ঢুকতে দেয়া হবে না। নকশালরা এর আগে গ্রাহকের ছদ্মবেশে ঢুকে দোকান লুট করেছিলো বলে এই ব্যবস্থা। রাস্তার মোড়ে প্রতিটি ট্রাফিক পুলিশকে গার্ড দেয়ার জন্য মোতায়েন হলো সশস্ত্র হোম গার্ড। আবার হোম গার্ডের রাইফেল লোহার শিকল দিয়ে গার্ডের কোমরে বাঁধা। সশস্ত্র পুলিশের দল পুলিশের গাড়ির বদলে প্রিজন ভ্যানে যাতায়াত শুরু করলো। সন্ধ্যার পর সিনেমা হলগুলোতে শো বন্ধ। বিকেল ছ'টার পরই লোকজন ছুটছে বাড়ির দিকে। দুপুরে যে মহানগরী প্রায় এক কোটি লোকের কলকোলাহলে সরগরম, রাতের ঘন অন্ধকারের আগেই তা জনমানবশূন্য এক ভৌতিক শহরে রূপান্তরিত। এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি।

এরকম এক অবস্থায় বেকারত্বের অভিশাপে ভরা পশ্চিম বাংলায় এসে উপস্থিত হলো এক লাখ সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ– সংক্ষেপে সি. আর. পি.। কোন এলাকায় জ্যোতিবসুর সিপিএম কিংবা প্রিয় দাস মুন্সীর যুব কংগ্রেসের সঙ্গে নকশালদের সামান্য গণ্ডগোল হলে আর কথা নেই সি. আর. পি. এসে সেই এলাকা ঘেরাও দিয়ে কারফিউ। এর পরের ঘটনা আর ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। গ্রেফতার-পিটানো-হত্যা। কেউ কোন প্রশ্ন করতে পারবে না। প্রিজন ভ্যান ভেঙে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে এরকম অভিযোগে কত নকশাল যুবককে যে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে তার কোন হিসাব নেই। প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও দৈনিক স্বাধীনতা পত্রিকার এককালীন সম্পাদক সরোজ দত্তের লাশ পাওয়া গেলো কলকাতার রেড রোডের পাশে। ঘরে ঘরে শুধু কান্নার রোল।

এই পরিস্থিতির মাঝে একাত্তরের এপ্রিলের প্রারম্ভে স্রোতের মতো বাংলাদেশ থেকে শুরু হলো নতুন উদ্বাস্তুদের আগমন। সীমান্তবর্তী এলাকা পার্বত্য ত্রিপুরা, মেঘালয়, জলপাইগুড়ি, নদীয়া, চব্বিশ পরগণায় বাংলাদেশের লাখ লাখ উদ্বাস্তু এসে আস্তানা গাড়লো। রানাঘাট থেকে শেয়ালদহ পর্যন্ত সর্বত্র শুধু উদ্বাস্তু শিবির। দমদমের কাছে লেক টাউন-এ গড়ে উঠলো নতুন লোকালয়।

একদিকে উদ্বাস্তুদের আগমন আর অন্যদিকে কলকাতা মহানগরীর কর্মব্যস্ত মানুষ হঠাৎ করে দেখলো চৌরঙ্গীর উপর দিয়ে খোলা জিপে নতুন চোহারার যুবকের দল। মাথায় কাস্ট্রো টুপি, গালে চাপদাড়ি, হাতে রাইফেল আর এল এম জি। এতদিন পর্যন্ত

কলকাতার মানুষ দেখেছে নকশালদের হাতে গাদা বন্দুক আর মাঝে মাঝে রাইফেল। কিন্তু এবার যাদের দেখছেন তাদের কাছে হ্যান্ড গ্রেনেড আর এলএমজি। চারদিকে একই প্রশ্ন এঁরা কারা? জবাব এলো, 'বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী'। মাত্র ছ'মাস আগেও যারা লাঠি চালাতে অনভ্যস্ত ছিলো, এখন তাদের হাতে আধুনিক সমরাস্ত্র।

সেদিন ছিলো শনিবার। কলকাতার তৎকালীন পাকিস্তানি ডেপুটি হাইকমিশনার (মরহুম) হোসেন আলী সাহেব ডিপ্লোমেটিক ব্যাগে একটা চিঠি পেলেন। তাকে পিন্ডিতে বদলি করা হয়েছে। এখন উপায়? মাত্র দু'দিন আগে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী (মরহুম) তাজউদ্দিন তাকে ডিফেক্ট করার আহ্বান জানিয়েছেলেন। কিন্তু তিনি রাজি হননি। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর এবার হোসেন আলী সাহেবই খবর পাঠালেন। শনিবার রাতেই গোপনে বৈঠক হলো। প্রধানমন্ত্রী হাইকমিশনের সমস্ত কর্মচারীর বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

পরদিন রোববারে ৭১ জন বাঙালি কর্মচারীসহ তৎকালীন ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলী বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করলেন। পার্ক সার্কাসের হাইকমিশন আমাদের দখলে এলো। চারদিকে তখন তুমুল উত্তেজনা। শত শত বিদেশী সাংবাদিক আর টি ভি ক্যামেরাম্যানদের দল হুমড়ি খেয়ে পড়লো হাইকমিশনের খবরের আশায়। হোসেন আলী সাহেব হাসিমুখে টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে ইন্টারভিউ দিচ্ছেন। বিরাট দেশপ্রেমিক হিসাবে তিনি চিহ্নিত হলেন। বিশ্বের প্রতিটি বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হলো এই ঘটনা। আলাদিনের চেরাগের স্পর্শে সুপ্ত মহানগরী জেগে উঠলো। নকশালদের আতংক দ্রুত অপসারিত হলো। সবার মুখে শুধু বাংলাদেশের ঘটনা।

সোমবার সকালে মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে যখন হাইকমিশনে হাজির হলাম তখন দেখি লাখো লোকের জনসমুদ্র আর সবার সামনে বৃষ্টিতে ভিজে হেমন্ত মুখার্জি ও সুচিত্রা মিত্রের দল অবিরাম গেয়ে চলেছেন 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি...।' আর তখন হাইকমিশন ভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা শোভাবর্ধন করছে।

৮

ছোটবেলা থেকে আমার এক অদ্ভুত অভ্যাস আছে। যত অসুবিধাই হোক না কেনো আমি ভোর চারটা কিংবা বড়জোর সাড়ে চারটার পর আর বিছানায় শুয়ে থাকতে পারি না। শীত-গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই এই অভ্যাসের ব্যতিক্রম নেই। আমার মরহুম আব্বাজানের কঠোর নির্দেশের দরুন আমাদের সবগুলো ভাইবোনের মধ্যেই ভোররাতে শয্যা ত্যাগের অভ্যাস রয়েছে। কলকাতায় আসার পরও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তাই সময় কাটাবার জন্য ভোর রাতে কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে শুরু করলাম। মাত্র দু'দিনেই একটা বিরাট নিবন্ধ লিখে ফেললাম। নাম দিলাম 'মিছিলের নাম শপথ'। লেখাটার বক্তব্য হচ্ছে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় যতগুলো আন্দোলন হয়েছে, মধ্যবিত্তসুলভ মনোভাবের দরুন তার কোনটাতেই প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। তবে আন্দোলন সফল হবার পর এসব বুদ্ধিজীবী কৃতিত্বের দাবিদার হয়েছেন। অথচ এই ২৩/২৪ বছরে পূর্ব বাংলায়

প্রতিটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ছাত্র সমাজের বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন তার জ্বলন্ত স্বাক্ষর।

বিকেলের দিকে দুরু দুরু বক্ষে সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার অফিসে গেলাম। সবাই অপরিচিত। কাউকে কিছু না বলে দেশ পত্রিকার 'লেটার বক্সে' লেখাটা রেখে এলাম। পরের দিনে আনন্দ বাজারে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে আমার লেখাটার উল্লেখ দেখে খুবই খুশি হলাম। সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকা হচ্ছে পশ্চিম বাংলার সবচেয়ে উন্নতমানের পত্রিকা। তারাশঙ্কর, সৈয়দ মুজতবা আলী, মুস্তফা সিরাজ, শংকর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, গৌরকিশোর ঘোষ, সত্যজিৎ রায় আর বিমল মিত্রের লেখা দেশ-এ অহরহ ছাপা হচ্ছে। দেশ পত্রিকার প্রচার সংখ্যা তখন দু'লাখের ওপর। আমার লেখাটা ছাপাবার পর মনে দারুণ আস্থার ভাব এলো। তাহলে পূর্ব বাংলায় আমরা খুব একটা পিছিয়ে নেই। ঢাকার সাহিত্য মহলে আমার নাম তো খুবই অপরিচিত।

দেশ-এ আমার লেখা পড়ে অজিতদা খুশিতে ফেটে পড়লেন। বললেন, 'আখতার সাহেব শীঘ্রি যেয়ে সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করুন। ভালো পারিশ্রমিক পাবেন। কমপক্ষে একশ' টাকা।' পরদিন বেলা এগারোটা নাগাদ দেশ পত্রিকার অফিসে গেলাম। পত্রিকার মালিক হচ্ছে অশোক সরকার। প্রধান সম্পাদক হিসেবে তাঁরই নাম ছাপা হয়। আর সম্পাদক হচ্ছেন সাগরময় ঘোষ। ভদ্রলোকের বিরাট বপু। আমার পরিচয় দিতেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'বেড়ে লিখেছেন মশাই। ধারাবাহিক লিখবেন কি আমাদের পত্রিকায়? প্রতি লেখায় একশ' টাকা। আমাকে বসতে বলেই একাউন্টস সেকশনে আমার লেখার টাকা দেয়ার জন্য হুকুম দিলেন। বেশ কিছুক্ষণ আলাপের পর আমি বললাম, 'ধারাবাহিক লিখতে আপত্তি নেই। কিন্তু আমার লেখা কাটছাঁট করতে পারবেন না।' আমার কথা শুনে ভদ্রলোক একেবারে আঁতকে উঠলেন। বললেন, 'দেখুন মশায় যত সাহিত্য সেবা করি না কেন, পত্রিকা চালানো হচ্ছে আমার ব্যবসা। আমরা বিতর্কমূলক লেখার পূর্ণ স্বাধীনতা দিলাম।'

পরের সপ্তাহ থেকে দেশ পত্রিকায় আমার ধারাবাহিক লেখা 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা' ছাপা শুরু হলো। সবসুদ্ধ আঠাশটা পরিচ্ছেদ ছাপা হওয়ার পর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ঢাকায় চলে এলাম। তাই লেখাটা আর শেষ করতে পারিনি। ১৯৭০ সালে ঢাকার অধুনালুপ্ত দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক 'তিস্তা-পদ্মা-যমুনা' লেখার জের হিসেবেই দেশ পত্রিকার ঐ লেখা শুরু করেছিলাম। স্বাধীন বাংলাদেশে ডামাডোল আর হৈচৈয়ের পর লেখাগুলো শেষ করার জন্য তখন আবার বসলাম। তখন দেখি আমার শ্রদ্ধাভাজন জনাব আবু জাফর শামসুদ্দীনের লেখা 'পদ্মা-মেঘনা' নামে একটা বিরাট গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাই আমার উৎসাহে ভাটা পড়লো।

যাক আবার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। দিন কয়েক পর ইউপিআই-এর দিল্লি ব্যুরোর প্রধান মি. কিলার রিপোর্ট সংগ্রহের জন্য আমাকে সঙ্গে করে সীমান্ত এলাকায় যাবেন। অজিতদা আমাকে সাবধান করে বললেন, 'মশায় বেটা একটা নছ্ছাড়। জাতে ইহুদি। তাই হাড়কিপটে।' বুঝলাম অজিতদার সঙ্গে সম্পর্ক বিশেষ সুবিধের নয়। আড্ডা মেরে আর সময় নষ্ট না করে তখনই এক নম্বর চৌরঙ্গী টেরাসের ইউপিআই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম। এলিট সিনেমা হলের পিছনে কোলকাতা কর্পোরেশনে গিয়ে তখনই কলেরা রোগ প্রতিরোধক ইনজেকশান নিলাম। আগেই শুনেছিলাম দমদম থেকে রানাঘাট পর্যন্ত বাংলাদেশের রিফিউজি ক্যাম্পগুলোতে কলেরা-মহামারী শুরু হয়েছে।

কর্পোরেশনের ডাক্তারকে সব কিছু খুলে বললাম, আর পরামর্শ চাইলাম। ভদ্রলোক যা করলেন, তার মোদ্দা কথা হচ্ছে সকালে কোলকাতায় কিছু খেয়ে রওয়ানা দিতে হবে। এরপর যতক্ষণ পর্যন্ত কলেরা এলাকায় থাকবো কিছুই খেতে পারবো না। ফ্লাস্কে ফুটানো পানি নিলে তা খাওয়া যেতে পারে।

দিন দুই পর মি. কিলার এসে হাজির হলেন। উঠলেন গ্রান্ড হোটেলে। ওখানেই বসে সব প্রোগ্রাম ঠিক হলো। অজিতদার জিপেই আমরা যাবো। কিলার বললেন, কোন ড্রাইভার লাগবে না। সে নিজেই জিপ চালাবে। আমি কিলারকে রানাঘাট এলাকায় কলেরা-মহামারীর কথা বললাম। পরদিন কাকডাকা ভোরে কাঁধে এক ফ্লাস্ক পানি নিয়ে গ্রান্ড হোটেলে হাজির হলাম। রিসেপশনের কালেই কিলারের সঙ্গে দেখা হলো। সুপ্রভাত জানিয়ে নাস্তার কথা জিজ্ঞেস করলাম। হেসে বলল, 'গোটা চারেক কলা খেয়েছি। ওতেই হয়ে যাবে।'

হোটেলের গাড়িবান্দায় রাখা জিপে ক্যামেরা, টাইপ রাইটার সব কিছু ছাড়াও এক কেস বিয়ার। ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ রওয়ানা হলাম। প্রথমে দমদমের কাছে লেক টাউন। হাজার হাজার তাঁবুতে বাংলাদেশ থেকে আগত ছিন্নমূল আদম সন্তানরা আস্তানা গেড়েছে। যাঁরা ভাগ্যবান তারাই তাঁবুতে জায়গা পেয়েছেন। কেননা তাঁবুতে জায়গা পাওয়ার অর্থই হচ্ছে পরিবারের সব সদস্যের জন্য রেশন কার্ড। এখানে জিপ থেকে নেমে কিলার অনেক ফটো তুললেন আর আমি দুটো পরিবারের সাক্ষাৎকার নিলাম। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় যশোর, কুষ্টিয়া ও দিনাজপুর এই তিনটা জেলা থেকে বলতে গেলে প্রায় সমস্ত জনসংখ্যাই সীমান্ত অতিক্রম করেছিলো। মুক্তিযুদ্ধের চেহারাটাই মার্চ, এপ্রিল ও মে মাস পর্যন্ত জেলাভিত্তিক এবং প্রতিটি জেলায় যুদ্ধের চেহারা ভিন্ন রকমের ছিলো। জুন মাস থেকে মুজিবনগর সরকারের সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে এই যুদ্ধ সেক্টরভিত্তিক রূপ পরিগ্রহ করে। পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক কর্তৃপক্ষ চেয়েছিলেন যে, তাদের সে ধারণা ভ্রমাত্মক ছিলো। চব্বিশে মার্চের পর প্রতিটি জেলাতে বাঙালি মাত্রই কোন না কোনভাবে মুক্তিযুদ্ধে শরিক হয়েছিলো। তাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখতে হলে প্রথম তিন মাস জেলাভিত্তিক এবং পরবর্তী ছয় মাস সেক্টরভিত্তিক লড়াইয়ের ইতিহাস লিখতে হবে।

প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর ভূমিকার উল্লেখ করতে হবে। গ্রাম-বাংলার লাখ লাখ দামাল ছেলেদের শৌর্য-বীর্যের কথা বলতে হবে। সশস্ত্র বাহিনীর যেসব বাঙালি সদস্য মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে জীবনকে আত্মাহুতি দিয়েছে তাদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের কথা বলবো অথচ সেক্টর কমান্ডারদের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের কথা বলবো না–তা হয় না। মুক্তিযুদ্ধের কথা বলবো অথচ মুজিবনগর সরকারের কথা বলবো না–তা হয় না। তেমনি মুক্তিযুদ্ধের কথা বলবো অথচ পাকিস্তানি ক্যাম্পগুলোতে বাঙালি সৈন্যদের দুর্বিষহ জীবনযাত্রার কথা লিখবো না–তা হয় না। মুক্তিযুদ্ধের কথা বলবো অথচ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বীভৎস হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ, গ্রেফতার আর নির্মম অত্যাচারের মধ্যে বসবাসকারী সাড়ে ছয় কোটি মানুষের কথা উল্লেখ করবো না– তা হয় না। তখন সবাই আমরা ছিলাম এক প্রাণ, এক মহা বাংলাদেশের সন্তান। আমাদের লক্ষ্য ছিলো এক ও অভিন্ন– বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা, দুঃসাহসী মতিউর রহমানের করাচি থেকে জঙ্গি বিমান নিয়ে জমাবার প্রচেষ্টা, পাকিস্তানি ক্যাম্পগুলোতে নিরস্ত্র অবস্থায় বাঙালি সৈন্যদের প্রতি মুহূর্তে মুক্তিযুদ্ধে

যাগদানের উদগ্র বাসনা, ঢাকায় গেরিলাদের চোরাগোপ্তা আক্রমণ, আখাউড়া-কসরা সেক্টরে দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ে বেঙ্গল রেজিমেন্টের যুদ্ধরত সৈনিকদের ভূমিকা, ভুরুংগামারীতে প্রতিরোধ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ বিজয়, মংলাপোর্টে বাঙালি কমান্ডোদের সাহসিকতাপূর্ণ আক্রমণ– সব কিছুই একই সূত্রে গাঁথা। এসব কিছুর মধ্যে যারা তফাৎ সৃষ্টি করতে চায় তারা কখনোই দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করে না। তারা জাতিকে বিভক্ত অবস্থায় দেখতে চায়।

যাক যা বলছিলাম। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি ও কিলার কৃষ্ণনগরের দিকে রওয়ানা হলাম। রাস্তার দু'পাশে শুধু উদ্বাস্তুদের তাঁবু। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থার পর উদ্বাস্তুদের প্রধান সমস্যাই হচ্ছে জনস্বাস্থ্য। শত চেষ্টা করেও কর্তৃপক্ষ 'স্যানিটেশন' ব্যবস্থা অটুট রাখতে পারলো না। কৃষ্ণনগরে পৌঁছে দেখলাম সংক্রামক ব্যাধি কলেরা মহামারী আকারে তাঁবুর পর তাঁবুতে ছড়িয়ে পড়ছে। কাছেই হাসপাতাল। সেখানে তিল ধারণের স্থান নেই। মাটিতে পর্যন্ত লাইন করে কলেরা রোগী শুয়ে আছে। সর্বত্র বমি আর দাস্ত। শুনলাম নিকটবর্তী একটা হাই স্কুলকে হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সেখানে আরও ভয়াবহ অবস্থা। মাটিতে লাইন করে রোগী শুয়ে আছে। কে মৃত কে জীবিত দেখে বোঝার উপায় নেই। চারদিকে শুধু কান্নার রোল। যেখানে কেউ কাঁদছে, বুঝতে হবে তার প্রিয়জন আর ইহজগতে নেই। মৃতদেহ সৎকারে অনেক ঝামেলা দেখে ক্যাম্পে নিকটজন কেউ মারা গেলে অনেকে চালাকি করে লাশটাকে রোগী হিসেবে এনে অত্যন্ত সন্তর্পণে হাসপাতালের বারান্দায় রেখে যাচ্ছে। কিলার অবিরাম শুধু ফটোই তুলে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক সাপ্তাহিক নিউজ উইকে এ সময় কলেরায় মৃত পুত্রের লাশ কোলে বাংলাদেশের এক উদ্বাস্তু মা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসার ছবি কভারে ছাপা হয়েছিলো। সাংবাদিকের মন কৌতূহলে ভরা তাই কাছেই মুদির দোকানে গিয়ে মালিকের সঙ্গে আলাপ শুরু করলাম। আমি বাংলাদেশের সাংবাদিক হিসাবে পরিচয় দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আঙুল দিয়ে রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে বললো, 'মাইল চারেক গেলেই দেখতে পাবেন রাস্তার পাশে হিন্দু-মুসলমান সব লাশকেই কবর দিচ্ছে। ধর্মীয় আচার বলতে কিছুই নেই।

আমি আর কিলার দু'জনে জিপে আবার...দৌড়ালাম। মুদিওয়ালা ঠিকই বলেছিলো। রাস্তা প্রায় জনমানবশূন্য। রাস্তার ওপরেই ছোট্ট টেবিল-চেয়ার নিয়ে এক দারোগা বসে। কাছেই জনা কয়েক শ্রমিক এক বিরাট গর্ত খুঁড়ছে। আর নাক গামছায় বাঁধা আর একদল ধাঙড় দূরে জড় করে রাখা লাশের স্তূপ থেকে একটা করে লাশ এনে গর্তে শুয়ে দিচ্ছে। এক কথায় গণকবর বলা যায়। হিন্দু-মুসলমান কোন বাছ-বিচার নেই। হাসপাতাল থেকে ঠেলা গাড়িতে লাশ হাজির করা হচ্ছে। দারোগা বাবুর সঙ্গে আলাপ করলাম। এখনও কথার মধ্যে বাঙাল টান রয়েছে। আদিবাড়ি মুন্সীগঞ্জে। বললেন, গত পাঁচদিন থেকে তিনি এই ডিউটিতে রয়েছেন। এর মধ্যে হাজার দু'য়েক কবর দিয়েছেন। ওনার কাছ থেকেই কলেরা উপদ্রুত থানাগুলোর নাম লিখে নিলাম। মাত্র তিন সপ্তাহ স্থায়ী এই কলেরা মহামারীতে মৃতের সংখ্যা ছিলো চৌদ্দ হাজারের মতো। একযুগ পরেও কৃষ্ণনগর হাসপাতালের ক্রন্দনরত মানুষগুলোর চেহারা আজও আমার চোখের ওপর জ্বলজ্বল করছে। ওদের কথা তো কেউ বলবে না?

একাত্তরের পঁচিশে মার্চ ঢাকায় পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর হামলার পর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা প্রথম কোলকাতায় গিয়ে হাজির হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ফজলে লোহানী মন্টু (টিভি অনুষ্ঠান 'যদি কিছু মনে না করেন'-এর পরিচালক) এবং (মরহুম) জিয়াউর রহমানের এককালীন উপদেষ্টা জাকারিয়া খান চৌধুরী অন্যতম। এঁরা দু'জনে কোলকাতায় উপস্থিতির দিন কয়েক পরেই ডাক্তার অমিয় বোসের প্রচেষ্টায় লন্ডনে চলে যান এবং সেখানে প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে জনমত গঠনে সচেষ্ট হন। ডাক্তার অমিয় বোস একসময় টাঙ্গাইলের কুমুদিনী হাসপাতালে চাকরি করতেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন এই ডাক্তার ভদ্রলোক বাংলাদেশের বাস্তুচ্যুত বুদ্ধিজীবীদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন। বালীগঞ্জে এই ডাক্তারের বাসায় আলাপ হলো প্রখ্যাত লেখক গৌর কিশোর ঘোষের সঙ্গে। গৌর ঘোষ তখন সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় ছদ্মনামে একটা কলাম লিখতেন। খুব সরল ও সহজ জীবনযাপন করলেও তিনি মূলত কম্যুনিস্ট বিরোধী লেখক। তখনকার দিনে যখন সবাই নকশালদের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় কাল যাপন করতেন তখনও গৌর ঘোষ এই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ও অহেতুক হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। আবার '৭৫-৭৬ সালে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থায় গণতন্ত্রকে হত্যা করা হলে গৌর ঘোষ সমালোচনামুখর হয় ওঠেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে সুদীর্ঘকাল কারান্তরালে থাকতে হয়। কারাজীবনে তিনি যে পুস্তক লিখেছিলেন তা প্রখ্যাত 'ম্যাগসেসাই পুরস্কার' অর্জন করতে সক্ষম হয়। শুনেছি তিনি এই পুরস্কারের সমস্ত অর্থই দান করে দিয়েছেন এবং পরে 'দৈনিক আজকাল' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। আবার আনন্দবাজার পত্রিকায় ফিরে এসেছেন। ডাক্তার অমিয় বোসের বাসায় বাংলাদেশের আরও যেসব বুদ্ধিজীবীর যাতায়াত ছিলো তাঁদের মধ্যে ডক্টর টি হোসেন, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম প্রমুখ অন্যতম।

মেহেরপুরের আম্রকাননে মুজিবনগর সরকারের শপথগ্রহণ এবং হোসেন আলীর (মরহুম) নেতৃত্বে হাইকমিশনের বাঙালি কর্মচারীদের আনুগত্য ঘোষণার পর দলমত নির্বিশেষে সবাই এই সরকারকে সুসংগঠিত করা, বাস্তুচ্যুতদের সহায়তা করা এবং সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধকে জোরদার করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। যেসব উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী মুজিবনগরে হাজির হয়েছিলেন তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে থিয়েটার রোডে একটা সচিবালয় স্থাপন করতে সক্ষম হলেন এবং অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে আঞ্চলিক অফিসগুলো স্থাপন করলেন। সেক্টর কমান্ডাররা অত্যন্ত দ্রুত নিজ নিজ এলাকার কর্তৃত্ব গ্রহণ করলেন। এরই পাশাপাশি ব্যবস্থা হলো হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং গ্রহণ। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের সুষ্ঠু প্রচার আর বিদেশে যোগাযোগের কাজ শুরু হলো।

নিরাপত্তার খাতিরে মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রীদের প্রথমে বিএসএফ-এর দায়িত্বে তেরো নম্বর লর্ড সিনহা রেডে রাখা হলো। ব্রিটিশ আমলে এই তেরো নম্বরে গোয়েন্দা বিভাগের সদর দপ্তর ছিলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের এককালীন পলিটিক্যাল সেক্রেটারি এবং জিয়ার আমলের অন্যতম উপ-প্রধানমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ একাত্তরে কিছুদিনের জন্য মুজিবনগর সরকারে 'কনট্যাক্ট ম্যান' হিসেবে কাজ করেছিলেন। বাংলাদেশ হাইকমিশনের দোতলায় ব্যারিস্টার আহমদের অফিস ছিলো। একাত্তরে

একটা কথা বার বার প্রমাণিত হয়েছে যে, যাঁরা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে সীমান্ত অতিক্রম করে মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন এবং বিভিন্ন সেক্টরে মরণপণ মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন, আর যাঁরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত মরণের মুখোমুখি হয়ে এক ভয়াবহ জীবনযাপন করছিলেন এবং পাকিস্তানের বন্দি শিবিরে দুর্বিষহ অবস্থায় কাল অতিবাহিত করছিলেন; সবাই এক ও অভিন্ন। ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বাঙালি জাতির এই ইস্পাত কঠিন একতা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তা না হলে একাত্তরে বাংলাদেশের কোনো এলাকা শত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত হলে মুজিবনগরে ক্রন্দন দেখেছি কেনো? আর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানের বন্দি শিবিরগুলো থেকে বাঙালিদের দেশে প্রত্যাবর্তন না হওয়া পর্যন্ত কাউকে হাসতে দেখিনি কেন?

তাই তো কাশ্মীরের মাইন পাতা উপত্যকার মরণ ফাঁদের মাঝ দিয়েও বাঙালি সৈন্যের দল মুক্তিযুদ্ধে শরিক হওয়ার উদগ্র বাসনায় মুজিবনগরে এসে হাজির হয়েছে। এ জন্যেই মুজিনবগর সরকারের নিজস্ব যুদ্ধ বিমান না থাকায়, প্রাথমিক পর্যায়ে পাকিস্তান বিমান বাহিনী থেকে 'ডিফেক্ট' করা বৈমানিকরা পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

তাই তো মরহুম জিয়াউর রহমান ও মরহুম তাহের একই সেক্টরে কিছুদিন একই সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। তাই তো মরহুম মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী মুজিবনগর সরকারের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বরের পর কে কি ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, সেটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু ষোলই ডিসেম্বরে স্বাধীনতা লাভের মুহূর্তে পর্যন্ত গুটি কয়েক হাতেগোনা লোক ছাড়া সাড়ে সাত কোটি বাঙালিই ছিলো স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত একটা নতুন জাতি।

যাক যা বলছিলাম। অবসর সময়ে নিয়মিত বাংলাদেশ মিশনে যাতায়াত শুরু করলাম। মিশনে গেলেই নিত্যনতুন খবর পাওয়া ছাড়াও ঢাকার সর্বশেষ পরিস্থিতির কথা জানা সম্ভব ছিলো। এখানেই স্বল্প দিনের ব্যবধানে শওকত ওসমান, সাদেক খান, কামরুল হাসান, দেবদাস চক্রবর্তী, কামাল লোহানী, ফয়েজ আহম্মদ, মোস্তফা সারোয়ার, সিকান্দার আবু জাফর, জহির রায়হান প্রমুখের সঙ্গে দেখা হলো। সবার মুখে শুধু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা। এখানেই একদিন দেখা হলো ইত্তেফাকের মোহাম্মদউল্লাহ চৌধুরীর সঙ্গে। কিছুদিন আমরা একই সঙ্গে ইত্তেফাকে সাংবাদিকতা করেছি। দু'জনে অনেক আলাপ হলো।

কাছেই বালু হক্কাক্ লেন। এই লেনের শেষ বাড়িটাতে মোহাম্মদউল্লাহর আস্তানা আর সাপ্তাহিক 'জয় বাংলা' পত্রিকার অফিস। মোহাম্মদউল্লাহর অনুরোধে হেঁটেই ওর অফিসে গেলাম। এখানে পরিচয় হলো টাংগাইলের তৎকালীন এম পি জনাব আব্দুল মান্নানের সঙ্গে। মুজিবনগর সরকারের প্রচার ও প্রোপাগাণ্ডার সার্বিক দায়িত্বে রয়েছেন। কিন্তু মান্নান সাহেব ও মোহাম্মদউল্লাহ দু'জনেই ছদ্মনাম গ্রহণ করেছেন। কৌতূহল দমন না করতে পেরে কারণ জিজ্ঞেস করলাম। দু'জনেরই স্ত্রী-পুত্র পরিবার অধিকৃত এলাকায় রয়েছেন। তাঁদের নিরাপত্তার জন্য ছদ্মনাম গ্রহণ করতে হয়েছে। মান্নান সাহেব ছিলেন সাপ্তাহিক 'জয় বাংলা'র প্রধান সম্পাদক। কিন্তু নাম ছাপা হতো আহম্মদ রফিক। পত্রিকার ছাপা, অঙ্গসজ্জা, সম্পাদনা আমার কাছে খুব একটা পছন্দ হলো না। তবুও কোন রকম বিরূপ মন্তব্য করলাম না। সময় পেলেই পার্ক সার্কাসের বালু

হক্‌কাক লেনে আড্ডা মারতে যেতাম। তারিখটা মে মাসের মাঝামাঝি। খাঁ খাঁ দুপুর রোদে 'জয় বাংলা' অফিসে বসে হাঁপিয়ে উঠেছি। এমন সময় মান্নান সাহেব থিয়েটার রোড থেকে এলেন হন্তদন্ত হয়ে। বললেন, 'মুকুল সাহেব, রেডিও স্টেশন কেম্‌নে চালাতে হয় জানেন?' উত্তরে বললাম, 'ঠিক জানি না, তবে আন্দাজ আছে।' এরপর পাশের ছোট্ট ঘরটাতে আমরা তিনজনে আলোচনায় বসলাম। মান্নান সাহেব বললেন, একটা পঞ্চাশ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারের ব্যবস্থা হয়েছে। তাজউদ্দিন সাহেবের হুকুম সমস্ত প্রিপারেশন তৈরি রাখতে হবে। যে কোন সময়ে এই রেডিও স্টেশন চালু করতে হবে। তখনই বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ খেয়াল হলো ঢাকা টেলিভিশনের উচ্চপদস্থ কর্মচারী জনাব জামিল চৌধুরী 'ডিফেক্ট' করে মুজিবনগরে এসেছে। এ ব্যাপারে তাঁর সাহায্য নিতে পারি। দৌড়ালাম মৈত্রেয়ী দেবীর বাসায়। সেখানে সাদেক খানকে পাওয়া যাবে। সাদেক সাহেব ভদ্রলোকের ঠিকানা দিতে পারলেন না। পরদিন বাংলাদেশ মিশনেই তার সঙ্গে দেখা হলো। একরকম জোর করেই তাঁকে বালু হক্‌কাক লেনে নিয়ে এলাম। মান্নান সাহেব নেই এবং আজকে আর আসবেন না। অগত্যা মোহাম্মদউল্লাহ্‌কে নিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপে বসলাম। বিস্তারিত বেশি আলাপের সুযোগই পেলাম না। ভদ্রলোক পরিষ্কারভাবে কয়েকটা শর্ত আরোপ করলেন। প্রথমত, ব্যাংকে বিশ লাখ টাকা আলাদা করে দিতে হবে এবং চেকে ওনার দস্তখত করার অধিকার থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, রেডিও চালাবার ব্যাপারে উনি কারো মাতব্বরি সহ্য করবেন না। তৃতীয়ত, ওনার পছন্দমত কর্মচারী নিয়োগ করবেন।

মোহাম্মদউল্লাহ উত্তর দিলো। 'মান্নান ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ না করেই বলতে পারি যে, আপনার প্রস্তাবগুলোর একটাও গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত, টাকার এখনও সংস্থান হয়নি। হলেও বাংলাদেশ মিশনের একাউন্ট সেকশনের মাধ্যমে খরচ হবে। দ্বিতীয়ত, রেডিওর নীতি-নির্ধারণ এবং সার্বিক কর্তৃত্ব মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি ছাড়া আর কারো কাছে দেয়া সম্ভব নয়। আর তৃতীয়ত, অধিকৃত বেতার স্টেশনগুলোর 'ডিফেক্ট করা' কর্মচারীদের নিয়োগ করার কথা চিন্তা করা হয়েছে। আমরা বেতার স্টেশন চালু করার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করেছিলাম– কর্তৃত্ব নয়।'

মেজাজটা খুবই বিগড়ে গেলো। ক্ষুধার্ত অবস্থায় বেলা দুটো নাগাদ বালু হক্‌কাক লেন থেকে বেরোলাম। বেরোতেই দেখি চাঁদপুরের এমপি মিজানুর রহমান চৌধুরী আর বগুড়ার গাজীউল হক হেঁটে আসছেন। মিজান ভাই আমাকে দেখেই বললেন, 'কি ব্যাপার, মুখটা কালো দেখতাছি? কই যাইতাছেন?' বললাম, 'না তেমন কিছু না। বাসায় যাচ্ছি।' এরপর দাঁড়িয়ে আর দু'-চার মিনিট কথা হলো। মান্নান সাহেব নেই জেনে উনিও ফিরে চললেন। হঠাৎ বললেন, 'অনেকদিন আপনাগো ভালো খাওয়া-দাওয়া হয়নি। কিছু মনে কইরেন না। এই পঞ্চাশটা টাকা দিলাম। আপনে আর গাজী সাহেব কোন রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাওয়া সাইর‍্যা লন।'

আমি আর গাজীউল হক বেলা আড়াইটায় পার্ক সার্কাসের 'গোল্ডেন সিরাজী' রেস্টুরেন্টে হাজির হলাম। মালিক মুসলমান। দু'জনে টেবিলে বসে অর্ডার দিয়ে বললাম, 'চার প্লেট বিরিয়ানি লাও। মগর দো প্লেট মে। অউর দো প্লেট গোস।' ক্ষুধার্ত অবস্থায় দু'জনে গোগ্রাসে খাচ্ছিলাম। একটু পরে লক্ষ্য করলাম রেস্টুরেন্টে আমরাই কেবল দু'জনে খাচ্ছি। বাকি গ্রাহকরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টেবিলগুলো ধুয়ে রাখা হচ্ছে। বুঝলাম আমাদের খাওয়া শেষ হবার পর বেয়ারাদের ডিউটি শেষ হবে। আর ঘন্টাখানেকের জন্য রেস্টুরেন্ট বন্ধ থাকবে। আমাদের কাছেই জনাকয়েক অবাঙালি

মুসলমান বেয়ারা আলাপ করছে। কান খাড়া করে শুনতে লাগলাম। ওরা আগেই বুঝেছে আমরা বাংলাদেশের।

"ইয়ে জো বাঙালি (বাংলাদেশের মুসলমান) হ্যায় না, ইয়ে লোগ্‌কা বহুত 'এ্যাডভানটেজ' হ্যায়। ইয়ে লোগ মালাউনকা (বাঙালি হিন্দু) শাক, চচ্চড়ি, ভাজি, ভর্তা খাতা হ্যায়। ফিন্‌ মুসলমানকা খানা কালিয়া, কাবাব, কোর্‌মা, কোফতা ভি খাতা হ্যায়। ইয়ে লোক দুনো তরফ কাটতা হ্যায়। যব মুছিবত মে গিয়া– একদম আসলালাসালাইকুম–ওয়া লাইকুম সালাম। আর নেহি তো পুরা বাঙালি বন্‌কে সোর মাচাতা।"

সেদিন অবাঙালি মুসলমান বেয়ারারা আমাদের সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলো, আজ এগার বছর পরেও আমি তর জবাব খুঁজে পেলাম না। আমাদের অতীত ইতিহাসন আর ঐতিহ্যের ৫ ত মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। আমাদের পৃথক জাতীয় সত্তা ঘোষিত হওয়া দরকার

১০

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় সবচেয়ে অসুবিধায় পড়লেন মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসের দাবিদার প্রগতিশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী নেতৃবৃন্দ। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যয় যে, অতীতে ১৯৪৮ সাল থেকে পূর্ববঙ্গে যতগুলো গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয়েছে, তার কোনটারই পুরোপুরি নেতৃত্ব এঁরা গ্রহণ করতে পারেননি। পেটি বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে প্রতিটি আন্দোলনে এঁরা সব সময়েই লেজুড়বৃত্তি করেছেন। মধ্যবিত্তসুলভ মনোভাব এবং 'ডি-ক্লাসড' হতে না পেরেও এঁরা দলীয় নেতৃত্ব আঁকড়ে রেখেছিলেন বলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো। পূর্ববঙ্গ বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র এলাকা হওয়া সত্ত্বেও এখানে বার বার জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর হাতে প্রগতিশীলদের মোর্চার মার খাওয়াটা দুঃখজনক বৈকি! ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে সমগ্র পূর্ব বাংলায় মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী পার্টিগুলো অর্ধ-শিক্ষিত ও পেটি বুর্জোয়াদের মোকাবেলায় কোন আসনই দখল করতে পারেনি এবং এদের মোট প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ শতকরা চার ভাগেরও কম। শুধুমাত্র নেতৃত্বের ব্যর্থতার দরুন ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ এই বিশ বছর বাংলাদেশের প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই নানা অছিলায় নিজ নিজ এলাকা পরিত্যাগ করে ঢাকায় আস্তানা গেড়েছেন। একাত্তরের পহেলা মার্চ থেকে পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদীরা নিজেদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করছিলেন, তখনও এই প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ কর্মীদের করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট কথাবার্তা বলতে ইতস্তত পর্যায়ে। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে বাংলাদেশের মফস্বল এলাকায় কত প্রগতিশীল কর্মী যে বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেছেন– কত কর্মী যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই। অথচ এর জন্য নেতৃবৃন্দের কাছে কৈফিয়ত তলব করা যাবে না– করলে তাঁকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে ধিকৃত করা হবে। না হয় 'বিভেদকারী' হিসাবে চিহ্নিত করা হবে।

প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দের ধারণা ছিল যে, জাতীয়তাবাদীরা 'ছয় দফা'র প্রশ্নে কিছুটা আপস করে ক্ষমতা গ্রহণ করলে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তখন জাতীয়তাবাদীদের মুখোশ উন্মোচন করা সহজ হবে। কিন্তু তাঁদের চিন্তাধারা ভ্রমাত্মক ছিলো। দৈনিক পূর্বদেশে আবদুল গাফফার চৌধুরী এ সময় লিখলেন যে, ৩রা জানুয়ারি রেসকোস ময়দানের জনসভায় ছ'টা কবুতর ছাড়া হলে একটা কবুতর মাটিতে পড়ে

গিয়ে আর উড়তে পারেনি, তখন এই প্রগতিশীল মহল থেকেই সেই লেখা উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসিত হলো। তারা ধরেই নিয়েছিলেন যে, জাতীয়তাবাদীদের কাছে ক্ষমতা কব্জা করাটাই বড় কথা– ছ'দফা নয়। কিন্তু তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, পাকিস্তানের সামরিক জান্তার আছে সমঝোতা ও আপস বলে কিছু নেই। উপরন্তু ভুট্টো সাহেব ক্ষমতা গ্রহণের উদগ্র বাসনায় দুই পার্লামেন্টের ধুয়া তুলেছেন এবং চরমপন্থা গ্রহণের জন্য ইয়াহিয়া খানকে ইন্ধন জোগাচ্ছেন। তাই দ্রুত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো, যেখানে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব পুরোপুরিভাবে জাতীয়তাবাদীদের হাতে অর্পিত হলো। এরই পাশাপাশি পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় চীন-মার্কিন ঐতিহাসিক নয়া সম্পর্কের সৃষ্টি হলে বন্ধুত্বের প্রতিদান হিসাবে চেয়ারম্যান মাও সে তুং-এর মহাচীন উলঙ্গভাবে পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন জানালো। এই সমর্থন অনেকের মতে প্রকারান্তরে পাকিস্তানের মানবতাবিরোধী কার্যকলাপের প্রতি সমর্থন। এর জের হিসাবে প্রগতিশীল মহলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হলো। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী নির্বাসিত মুজিবনগর সরকারের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে জড়িত থাকলেও মরহুম মশিউর রহমান দিব্যি ঢাকায় এসে হাজির হলেন। মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী উপ-দলগুলো কোথাও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সোচ্চার হলেন; আবার কোন কোন স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন। এরকম এক নাজুক অবস্থায় নেতৃবৃন্দ কর্মীদের সঠিক পথনির্দেশ করতে একরকম ব্যর্থ হলেন। অন্যদিকে চীন-মার্কিন বন্ধুত্বের ঘোর বিরোধী আর একটা প্রগতিশীল মহল হাতিয়ার হাতে যুদ্ধ করার দায়িত্ব জাতীয়তাবাদীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে অন্যান্য সহযোগিতামূলক কাজে লিপ্ত হলেন। পেটি বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে গঠিত মুজিবনগর সরকার অত্যন্ত সন্তর্পণে কেবলমাত্র জাতীয়তাবাদীদের ট্রেনিং দিয়েছে– এই অভিযোগ করে দায়িত্ব এড়ানো সম্ভব নয়। শ্রেণীস্বার্থে সরকারের ভূমিকা সঠিক ছিলো।

এই রকম এক পরিস্থিতিতে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র সংগঠনের কাজে লিপ্ত হলাম। উপরের নির্দেশ বেতার কেন্দ্রে নীতি-নির্ধারণের ব্যাপারে যাঁদের নেয়া হবে, তাঁদের সঠিকভাবে যেনো বাছাই করা হয়। এক মহাঅগ্নিপরীক্ষা।

এই সময় আমার বাসস্থানের সমস্যা দেখা দিলো। রান্নার অসুবিধার জন্য 'ট্রিভলি কোর্টে' আমার সহধর্মিণী থাকতে নারাজ। শেষ পর্যন্ত এক অবাঙালি দালালকে দু'শ টাকা দালালি দিয়ে পার্ক সার্কাসের কাছেই দিলখুশায় দেড়শ' টাকা ভাড়ায় দুই রুমের এক বাড়িতে উঠে এলাম। দিন দুয়েকের মধ্যে বুঝলাম কাজটা খুব ভালো করিনি। পুরো এলাকাটাই অবাঙালি মুসলমানদের এলাকা। রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে এঁরা আমাদের 'বাঙালি' বলে ইয়ার্কি মারে। যে উর্দুর অত্যাচারে বাস্তুচ্যুত হয়েছি, এই দিলখুশাতেও বাজার সওদা যা-ই করতে যাই না কেন, সেই উর্দুতেই কথা বলতে হচ্ছে। তাই হপ্তাখানেকের মধ্যেই আবার নিরাপদ এলাকায় বাসার খোঁজ করতে লাগলাম।

এই উপমহাদেশে বড় বড় শহরগুলোতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। করাচি, নতুন ঢাকা, নতুন দিল্লি আর সেন্ট্রাল ক্যালকাটা সর্বত্রই স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রভাব দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। করাচিতে অবস্থাপন্ন বলতে মাকরানি ও সিন্ধিদের বোঝায় না। নতুন ঢাকায় আদিবাসিন্দা ঢাকাইয়াদের প্রাধান্য নেই। নতুন দিল্লিতে বহিরাগত পাঞ্জাবি আর শিখরা জাঁকিয়ে বসেছে। ঠিক একইভাবে সেন্ট্রাল ক্যালকাটাতেও বাঙালিরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে আর বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য সহায়-সম্পত্তি প্রায় সব কিছুর মালিক অবাঙালি। যুগের পর যুগ ধরে এঁরা কোলকাতায় বসবাস করেও পশ্চিম

বাংলার সঙ্গে একাত্মবোধ ঘোষণা করতে পারেনি। খাওয়া-দাওয়া এমনকি সামাজিক স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। এদের মধ্যে অবাঙালি মুসলমানের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। ছোটখাটো ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে নানা ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে এরা লিপ্ত রয়েছে। মোটর গাড়ি, ট্রাক, বাস ইত্যাদি রিপেয়ারিং ব্যবসায় এরা একচেটিয়া। টেইলারিং-এ একই অবস্থা। আমার তো মনে হয় না যে, এদের কেউ ভারত স্বাধীন হওয়ার পর কোলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে চাকরির জন্য ধরনা দিয়েছে। উচ্চ শিক্ষা কিংবা চাকরির জন্য এরা কোন দিনই সরকারের দ্বারস্থ হয়নি। এরা শ্রমের মর্যাদায় বিশ্বাসী। তাই এরা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সসম্মানে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে এখনও পর্যন্ত সক্ষম রয়েছে। কতদিন পর্যন্ত এটা অটুট থাকবে তা লক্ষণীয়।

কিন্তু এরা একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করতে পারেনি। তাই বাংলাদেশ থেকে আগত বাঙালিরা দু'ধরনের এলাকা সযত্নে পরিহার করতেন। প্রথমত, নকশাল এলাকা আর দ্বিতীয়ত, অবাঙালি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। এ প্রসঙ্গে কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে।

ভদ্রলোকের নাম সৈয়দ হায়দার আলী। আদিবাড়ি সিরাজগঞ্জ। পিতা সৈয়দ আকবর আলী, পাকিস্তান আমলে কিছুদিনের জন্য বর্মায় রাষ্ট্রদূত ছিলেন। মাতা উত্তর ভারতীয় অবাঙালি। হায়দার সাহেবরা অনেকগুলি ভাইবোন। এদের মধ্যে হায়দার আলী রাজনীতিতে দারুণভাবে জড়িত। সত্তরের নির্বাচনে পরিষদের নির্বাচিত অন্যতম সদস্য। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় সিরাজগঞ্জের তৎকালীন এস ডি ও মরহুম শামসুদ্দীনের সঙ্গে কাজ করেছেন। কিন্তু হায়দার আলীর স্ত্রী অবাঙালি এবং কোলকাতার কলুটোলার মেয়ে। শ্বশুরের বিরাট চামড়ার ব্যবসা। একাত্তরের এপ্রিল-মে মাসে কোন অবাঙালি মহিলাকে সীমান্ত অতিক্রম করে আনা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিলো। তবুও অনেক ভোগান্তির পর হায়দার আলী স্ত্রী-পুত্রসহ কোলকাতায় এসে হাজির হয়ে নিশ্চিন্ত মনে নিশ্বাস ফেললেন। ভাবলেন অনেক বছর পর বড়লোক শ্বশুরের কাছে এসেছেন। এখন তো থাকা-খাওয়ার কোন চিন্তা থাকবে না। তাই নিশ্চিন্ত মনে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করবেন। কিন্তু বিধি বাম! দিন কয়েকের মধ্যেই হায়দার সাহেব বুঝলেন যে, কোলকাতার অবাঙালি মুসলমানদের যে মহলটি পাকিস্তানের জন্য মদত্ জোগাচ্ছে তার অন্যতম পাণ্ডা হচ্ছেন স্বয়ং শ্বশুর মহাশয়। তখন ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলী বাংলাদেশের পক্ষে কোলকাতায় তুমুল উত্তেজনা। হোসেন আলী 'ডিফেক্ট' করায় হাইকমিশন ভবন মুজিবনগর সরকারের কব্জায়। ভারত-পাকিস্তান কূটনৈতিক সম্পর্ক তখনও অব্যাহত রয়েছে। দিল্লি কর্তৃপক্ষ কোলকাতায় মিশন রাখা না রাখার ব্যাপারে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। এমন সময় কোলকাতার একশ্রেণীর অবাঙালি মুসলমান পাকিস্তানের নবনিযুক্ত ডেপুটি হাইকমিশনারকে সবরকম সহযোগিতার সিদ্ধান্ত নিলেন। একদিনে কয়েক লাখ টাকা চাঁদা পর্যন্ত এরা সংগ্রহ করলেন। এতো ব্যস্ততার মধ্যেও শ্বশুর মহাশয় জানতে পারলেন যে, জামাই বাবাজী হচ্ছেন 'জয় বাংলার' লোক। আর যায় কোথায়? জামাইকে ডেকে ভদ্রভাবে যা বললেন, তার অর্থ হচ্ছে, তোমার স্ত্রী-পুত্র আমার বাড়িতেই থাকতে পারে। তবে তুমি যে ক'টা দিন কোলকাতায় আছো, কলুটোলার দিকে যাতায়াত না করাটাই বাঞ্ছনীয় হবে। এরপর হায়দার আলী পার্ক সার্কাস এলাকায় আস্তানা গাড়লেন আর মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে ঘুরে মুজিবনগর সরকারের

প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করলেন। শেষ অবধি সশস্ত্র যুদ্ধে যোগদান করলেন।

প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী মরহুমা বদরুন্নেসার কন্যা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে প্রেম করে বিয়ে করলেন সিলেটের চা বাগানে কর্মরত এক পাঞ্জাবি ম্যানেজারকে। ভদ্রলোকের চমৎকার চেহারা আর অমায়িক ব্যবহার। পঁচিশে মার্চের পর স্বামী-স্ত্রী ঠিক করলেন ওপার বাংলায় চলে যাবেন। স্ত্রীকে বোরখা পরিয়ে ভদ্রলোক চললেন কুমিল্লা পেরিয়ে আগরতলার দিকে। পথে যতবার পাকিস্তানি আর্মি এঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, ততবারই ভদ্রলোক চোস্ত্ উর্দু আর পাঞ্জাবি ভাষায় কথা বলে উতরে গেছেন। কিন্তু আগরতলায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক গ্রেফতার হলেন। কারণ তিনি পাকিস্তানের পাঞ্জাবের অধিবাসী। অনেক দেন-দরবারের পর মরহুম জহুর আহম্মদ চৌধুরীর সুপারিশে জেল থেকে মুক্তিলাভ করলেন। এরপর তাঁরা হাজির হলেন কোলকাতা মহানগরীতে। কিন্তু দিন দুয়েকের মধ্যেই বালিগঞ্জ পুলিশ আবার তাঁকে গ্রেফতার করলো। ভদ্রলোকের স্ত্রী যাদের কাছেই সুপারিশের জন্য তদবির করলেন তারা কেউই রসিকতা করতে ছাড়লেন না। শেষ পর্যন্ত তাজউদ্দিন সাহেবের চিঠিতে ভদ্রলোক ছাড়া পেলেন। এরপর ভদ্রলোক পকেটে সব সময়ই মুজিবনগর সরকারের পরিচয়পত্র বহন করতেন।

তারিখটা মনে না থাকলেও মাসটা ছিলো একাত্তরের মে মাস। বিকালের দিকে এক নম্বর চৌরঙ্গী টেরাসে অজিত দার ইউ পি আই অফিসে বসে কাজ করছিলাম। এমন সময় হাল্‌কা রঙের গগলস পরিহিত লম্বা-চওড়া এক অবাঙালি ভদ্রলোক এসে প্রবেশ করলেন।

হাতে পুরানো এক কপি অমৃতবাজার পত্রিকা। ভদ্রলোক কাগজটা অজিতদার দিকে এগিয়ে দিয়ে ভাঙা বাংলায় বললেন, 'এই ফটো কি আপনারা পাঠিয়েছেন?' দু'জনে হুমড়ি খেয়ে ফটোটা দেখলাম। নিচে ইউ পি আই-এর ক্রেডিট লাইন দেয়া আছে। অজিতদা জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ আমরাই পাঠিয়েছি। তা হয়েছেটা কি?' একাত্তরে বিশ্বের বহু পত্র-পত্রিকায় এই ফটো ছাপা হয়েছে। এতে যশোরে পাকিস্তানি সৈন্যদের হামলায় নিহত জনাকয়েকের লাশ একটা রিকশার উপরে স্তূপিকৃত রয়েছে দেখা যাচ্ছে। ভদ্রলোক ঠাণ্ডাভাবে বললেন, 'এই ফটোর একটা কপি আমার দরকার। পয়সা-কড়ি খরচ করতে রাজি আছি।' ভদ্রলোকের আগ্রহ দেখে কৌতূহল বেড়ে গেলো। তাকে প্রশ্ন করলাম, 'এতো ফটো থাকতে এই বিশেষ ফটোর জন্য আপনার আগ্রহ কেন?' জবাব এলো, সে অনেক কথা। আপনাদের সময় থাকলে বলতে পারি। এরপর অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত ফটোটা হাতে নিয়ে রিকশার লাশগুলোর একটা প্রৌঢ় শ্মশ্রুমণ্ডিত লাশের উপর আঙুল রেখে বললেন, 'ইনিই হচ্ছেন আমার জন্মদাতা।' কথা শুনে চমকে উঠলাম। তাহলে কি লাশগুলো অবাঙালির– ভদ্রলোক আমার চেহারার পরিবর্তন লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনাদের ফটো ও ক্যাপশন ঠিকই আছে। আজ থেকে ২৫/২৬ বছর আগেকার কথা। আব্বা, আম্মা আর আমরা সব ভাইবোন একই সঙ্গে এই কোলকাতা শহরে খুব হৈচৈয়ের মধ্যে ছিলাম। ধরমতলায় আব্বার কাপড়ের ব্যবসা তখন জমজমাট। এই সময় আব্বা এক বাঙালি মুসলমান মহিলার প্রেমে পড়লেন। আম্মা বহু চেষ্টা করেও আব্বাকে এই সর্বনাশা পথ থেকে ফেরাতে পারলেন না। এরপর দেশ বিভাগ। আমরা ঘুণাক্ষরে জানতে পারিনি যে, আব্বা ওই মহিলাকে নিকা করেছেন। সবার অলক্ষ্যে আব্বা যশোরের এক হিন্দু ভদ্রলোকের বসতবাটির সঙ্গে কাপড়ের দোকানের বদলা-বদলি করে বাকি সম্পত্তি আমাদের জন্য রেখে নতুন

বউ নিয়ে দিব্যি পূর্ব পাকিস্তানে পাড়ি জমালেন। এরপর আর আব্বার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি। উনি তো বাঙালিই হয়ে গিয়েছিলেন। আম্মাও কোন দিন আব্বার কথা আলোচনা করেননি। পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঙালি হিসাবেই নাকে হত্যা করেছে। এখন আব্বার স্মৃতি রাখার জন্যই এই ফটোটার দরকার।' কথাগুলো বলে ভদ্রলোক হু হু করে কেঁদে উঠলেন।

১১

একাত্তরের যে মাসের বাইশ তারিখ। মান্নান ভাই বললেন, 'আজ রাত দশটায় বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িটাতে একটা গোপন বৈঠক আছে। আপনি হাজির থাকবেন। স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র চালু করার ব্যাপারে চূড়ান্ত আলোচনা হবে। দোতলা বাড়ি। উপরের তলায় মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রীবর্গ আর বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আস্তানা। তাই বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে। আমি আর মান্নান ভাই একটু আগেই গিয়ে হাজির হলাম। নিচের তলায় ড্রইং রুমে দু'জনে অধীর আগ্রহে বসে রইলাম। ঠিক রাত দশটায় সাদা পোশাকে দু'জন ভদ্রলোক এলেন। দু'জনেই ভারতীয় বাঙালি। একজন তো তেমন কোন কথাই বললেন না। অন্যজন নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে নাম বললেন, ভট্টাচার্য। অনেক কষ্টে কৌতূহল দমন করলাম। ওদের পুরো পরিচয় জিজ্ঞেস করলাম না।

উভয় পক্ষে বিশেষ ভূমিকা না করেই আলোচনা শুরু হলো। ভট্টাচার্য মশায় সরাসরি বললেন, 'একটা পঞ্চাশ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার বাংলাদেশের সীমান্তে বসানো হয়েছে। এই ট্রান্সমিটার চালু রাখার দায়িত্ব ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে। এর অবস্থানটা স্বাভাবিক কারণেই গোপনীয় থাকবে। তবে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কোলকাতায় প্রতিদিন বেতার অনুষ্ঠান রেকর্ড করতে হবে। রেকর্ডকৃত অনুষ্ঠান ট্রান্সমিটার ভবনে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব ভারতীয় কর্তৃপক্ষের। অনুষ্ঠান তৈরি করার ব্যাপারে প্রয়োজন হলে অল ইন্ডিয়া রেডিওর কর্মচারীরা সাহায্য করতে পারে। মান্নান ভাইয়ের অনুমতি নিয়ে আমি বললাম, 'ট্রান্সমিটারের ব্যবস্থা করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে বাংলাদেশ থেকে যেসব সাংবাদিক, শিল্পী আর বেতার কর্মী এপারে চলে এসেছেন, তাদের দিয়ে আমরা দিব্যি প্রতিদিনের বেতার অনুষ্ঠান রেকর্ড করে দিতে পারবো। আমাদের অনুষ্ঠান আমাদের মনমত করতে দিতে হবে। অল ইন্ডিয়া রেডিওর কর্মচারীদের সহযোগিতা আশা করি প্রয়োজন হবে না।'

আমার বক্তব্যে উৎসাহিত হয়ে মান্নান ভাই স্পষ্ট বলেই ফেললেন, আমাদের বেতারের নীতি-নির্ধারণের ব্যাপারে কিন্তু মুজিবনগর সরকারের নির্দেশ চূড়ান্ত হবে। এরপর আপনাদের কোন রকম বক্তব্য থাকলে মুজিবনগর সরকারের কাছে পেশ করাটা বাঞ্ছনীয় হবে। ভট্টাচার্য মশায় সম্ভবত এতোটা স্পষ্ট কথাবার্তা আমাদের কাছ থেকে আশা করেননি। তিনি আবার বললেন, 'ভেবে দেখুন, প্রোগ্রাম তৈরির ব্যাপারে কোন রকম সহযোগিতার প্রয়োজন আছে কিনা?' এবার মান্নান ভাই জবাব দিলেন, 'নাহ, আমাগো প্রোগ্রাম আমাগো পোলাপানরা করবো।'

এরপর কথা উঠলো, কবে থেকে এই বেতার অনুষ্ঠান চালু হবে? আমি হঠাৎ করে বলে বসলাম, ২৫শে মে থেকে। এই দিন হচ্ছে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন। ঘণ্টাখানেক কথাবার্তার পর ভট্টাচার্য মশায়ের ইশারা পেয়ে তাঁর সহকর্মী জিপ থেকে দুটো পুরানো টেপ রেকর্ডার ও কিছু টেপ আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। রাত

এগারটা নাগাদ ওঁরা দু'জন যখন বিদায়ের জন্য দাঁড়ালেন, তখন আমি একটা শেষ প্রশ্ন করলাম। বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাংগন থেকে প্রাপ্ত খবরের দ্রুত সত্যতা যাচাইয়ের কোন পন্থা আছে কি? কেননা আমাদের বেতার থেকে প্রচারিত খবরা-খবরের সত্যতার ওপর আমাদের 'ক্রেডিবিলিটি' নির্ভর করছে। ভদ্রলোক জবাব দিলেন, 'রোজ বিকেলে ইস্টার্ন কমান্ডের পি আর ও কর্নেল রিক্‌খে তাঁর অফিস কক্ষে যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের ব্রিফিং করছেন। আপনার পরিচয় দিয়ে যে খবর জানতে চাইবেন, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তার বিস্তারিত পাবেন। আমিও আপনাদের কথা বলে রাখবো।'

ওরা চলে যাবার পর আমি আর মান্নান ভাই মুখোমুখি তাকিয়ে রইলাম। একটা ক্যাপস্টান সিগারেট আমাকে অফার করে মান্নাভাই বললেন, 'হেগো সামনে খুউব তো চাপাবাজি করলেন। এলায় করবেন কি?' আমি বললাম, 'ঠেলার নাম জসমত আলী মোল্লা। যখন রেডিও চালু করার দিনক্ষণ ঠিক হইছে, তখন একটা কিছু হইবোই।'

দু'জনে উপর তলায় গিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন সাহেবের কাছে সব কিছু রিপোর্ট করলাম। মনে হলো তিনি খুশিই হয়েছেন। বললেন, 'তাহলে আপনারা এই বাড়িটাকেই রেডিওর রেকর্ডিং স্টেশন বানান। রেডিওর সঙ্গে জড়িত লোকজনও এই বাড়িটাতে থাকা-খাওয়া করতে পারবে। আমি সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমরা ২/১ দিনের মধ্যেই এখান থেকে সি আই টি এ্যাভেনু আর থিয়েটার রোডে উঠে যাবো।' তাজউদ্দিন সাহেব তাঁর কথা রেখেছিলেন। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িটাতে প্রতিষ্ঠিত হলো 'স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র।'

দিনে লেখার সময় পাবো না বলে সেদিন রাত বারোটায় বাসায় ফিরে রাত চারটায় রেডিওর জন্য লিখতে বসলাম। শুরুটা ছিলো "ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ থেকে ভয়ংকর দুঃসংবাদ এসে পৌঁছেছে। গত ১৭ই এবং ১৮ই মে তারিখে খোদ ঢাকা শহরের ছ'জায়গায় হ্যান্ড গ্রেনেড ছোড়া হয়েছে– টিক্কা খান ভাইয়া! শুনলেও হাসি পায়। ঢাকার কাছে পাগলাতে তোমার নির্দেশেই তো হানাদার সৈন্যরা সাঁতার কাটা আর ছোট ছোট নৌকা চালানো শিখছে। আরে! ও সাঁতার তো বাংলাদেশে মায়ের পেট থেকে পড়েই শিখতে হয়। বাংলাদেশের ছেলেগুলো পাঁচ বছর বয়স থেকেই সাঁতার শেখে। এতো আর পাঞ্জাবের এক হাঁটু পানিওয়ালা নদী নয়! এ যে বিরাট দরিয়া। শুনেছি, তোমার হানাদার সৈন্যরা যখন চাঁদপুর থেকে বরিশাল যাচ্ছিলো, তখন তারা ভেবেছিলো তারা বোধহয় বঙ্গোপসাগর দিয়ে যাচ্ছে। ওদের একটু ভালো করে ভূগোল শিখিয়ে দিয়ো– ওটা তো মেঘনা নদী! আর শোন, একটা কথা তোমাকে গোপনে বলে দিই। বাংলাদেশের বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা আর মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ মহকুমায় এক ইঞ্চি রেললাইন কিন্তু কোন সময়ই বসানো হয়নি। ওখানে অনেক নদীর নাম পর্যন্ত নেই– গ্রামের নামেই নদীর নাম। এসব এলাকার হাটগুলো পর্যন্ত নদীর উপরেই বসে; বুঝেছো অবস্থাটা! এখানেই একটা নদী আছে– নাম তার আগুনমুখা। নাম শুনেই বুঝেছো বর্ষায় ওর কী চেহারা হবে?

'না, না– তোমাকে ভয় দেখাবো না। একবার যখন হানাদারের ভূমিকায় বাংলাদেশের কাদায় পা ঢুকিয়েছো– তখন এ'পা আর তোমাকে তুলতে হবে না। গাজুরিয়া মাইর চেনো? সেই গাজুরিয়া মাইরের চোটে তোমাগো হগগলকেই কিন্তুক এই ক্যাদোর মাইদ্দে হুইত্যা থাকন লাগবো।"

পরদিন সকাল দশটা নাগাদ বালু হক্কাক্ লেনে গিয়ে হাজির হলাম। মান্নান ভাই বিমর্ষ হয়ে বসে রয়েছেন। দু'জনের একই চিন্তা। আর মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে বেতারকেন্দ্র চালু করতে হবে। ওখানে বসেই একটা অনুষ্ঠানসূচি বানালাম। এমন সময় খবর এলো ঢাকা বেতারকেন্দ্রের একদল কর্মী মুজিবনগরে এসে পৌঁছেছে। আমিনুল হক বাদশা ওদের বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। খবর শুনে দু'জনে গেলাম বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে। গিয়ে দেখি তিনজন বেতার কর্মী এসেছেন। সবাই প্রোগ্রামের লোক– কেউই বেতার ইঞ্জিনিয়ার নন। এরা হচ্ছেন আশফাকুর রহমান, তাহের সুলতান আর টি এইচ শিকদার। ঢাকা থেকে আসার সময় রেডিও স্টেশনের টেপ লাইব্রেরি থেকে এরা অসহযোগ আন্দোলনের সময়কার বেশ কিছু গানের টেপ এনেছে। কিন্তু 'স্পুল' ভেঙে টেপগুলো বালিশের মধ্যে এনেছে বলে জড়াজড়ি হয়ে টেপগুলোর এক অচিন্তনীয় অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তাহের সুলতান সমস্ত দিন চেষ্টার পর টেপগুলো আবার নতুন 'স্পুলে' ওঠালো। প্রোগ্রামের কর্মী হওয়া সত্ত্বেও তাহের সুলতানের ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞানও যথেষ্ট। সে বললো, আপাতত সমস্ত অনুষ্ঠানের রেকর্ডিংয়ের দায়িত্ব তাঁর। কিছুটা আশার আলো দেখতে পেলাম। এরপর আমরা অনুষ্ঠানসূচি চূড়ান্ত করলাম। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানসূচি ছিলো নিম্নরূপ।

পবিত্র কোরান তেলাওয়াত। অগ্নিশিখা (মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ অনুষ্ঠান) বাংলা সংবাদ। রক্তস্বাক্ষর (গণমুখী সাহিত্য অনুষ্ঠান)। বজ্রকণ্ঠ (বঙ্গবন্ধুর সকণ্ঠ বাণী)। জাগরণী। ইংরেজি সংবাদ। 'চরমপত্র'। দেশাত্মবোধক গান।

আমার স্ক্রিপ্ট সবাইকে শোনানোর পর আশফাকুর রহমানের দেয়া নাম 'চরমপত্র' সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হলো। কিন্তু সবারই একই দাবি, 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যেতে হবে। ২৩শে ও ২৪শে মে তারিখে ধরতে গেলে আমরা সবাই দিন-রাত পরিশ্রম করলাম। বাংলা সংবাদের দায়িত্বে রইলেন কামাল লোহানী। চিত্রাভিনেতা হাসান ইমাম, সালেহ আহমদ ছদ্মনাম নিয়ে প্রথম দিন বাংলা সংবাদ পড়লেন। বাংলা সংবাদ বুলেটিনের ইংরেজি তর্জমা করলেন এ টি এম জালালউদ্দীন আহমেদ। মিসেস টি হোসেন, পারভীন হোসেন ছদ্মনামে প্রথম ইংরেজি সংবাদ পড়লেন। সাপ্তাহিক 'জয়বাংলা' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক মরহুম মোহাম্মদউল্লাহ চৌধুরীর কণ্ঠে কোরান তেলাওয়াত রেকর্ডিং হলো। অনুষ্ঠান ঘোষণা ও প্রোগ্রামের সার্বিক দায়িত্ব দেয়া হলো আশফাকুর রহমানকে। আর নিউজ রুম কামাল লোহানীর কর্তৃত্বে রইলো।

মুজিবনগরে তখন তুমুল উত্তেজনা। আমাদের মতো গুটি কয়েক লোকের সম্মিলিত প্রচেষ্টা আর আন্তরিক নিষ্ঠার জন্য নির্ধারিত ২৫শে মে তারিখে বিদ্রোহী কবি নজরুলের জন্মদিনে ইথার তরঙ্গে প্রবাহিত হলো স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান। মিডিয়াম ওয়েভ ৩৬১.৪৪ মিটার ব্যান্ডে প্রতি সেকেন্ডে ৮৩০ কিলো সাইকেলে প্রতিধ্বনিত হলো বাঙালি জাতির মর্মবাণী। অধিকৃত এলাকায় বেপরোয়া হত্যা, নারী ধর্ষণ আর অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে যারা দুর্বিষহ জীবনযাপন করছিলেন, আর যারা লড়াইয়ের ময়দানে মৃত্যুর সঙ্গে পাল্লা লড়ছিলেন, মুজিবনগর সরকারের প্রচেষ্টায় স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের মাধ্যমে সবার মধ্যে সৃষ্টি হলো এক অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পর কোন্ দল, উপ-দল বা ব্যক্তিবিশেষ কে কি করেছেন তার মূল্যায়ন সযত্নে পরিহার করে শুধু এটুকুই বলবো যে, পাকিস্তানের

বন্দিশিবির থেকে শুরু করে লড়াইয়ের ময়দান পর্যন্ত অধিকৃত এলাকা থেকে শুরু করে মুজিবনগর পর্যন্ত সমস্ত বাঙালি আমরা ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এক ও অভিন্ন ছিলাম। কবি আসাদ চৌধুরীর ভাষায় বলতে হলে "দশ লক্ষ মৃতদেহ থেকে/দুর্গন্ধের দুর্বোধ জবাব শিখে রিপোর্ট লিখেছি– পড় পাঠ কর/কুড়ি লক্ষ আহতের আর্তনাদ থেকে ঘৃণাকে জেনেছি–পড়–, পাঠ কর/চল্লিশ হাজার ধর্ষিতা নারীর কাছে/সারসের সবক নিয়েছি–পড়, পাঠ কর/পৃথিবীর ইতিহাস থেকে কলংকিত পৃষ্ঠাগুলো রেখে চলে আসি, ক্যানাডার বিশাল মিছিলে শ্লোগান শোনাতে– মানুষের জয় হোক/অসত্যের পরাজয়ে খুশি হোক বিশ্বের বিবেক, পলাতক শান্তি যেন ফিরে আসে আহত বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে।

[১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে পঠিক কবি আসাদ চৌধুরীর 'রিপোর্ট-১৯৭১' কবিতার অংশবিশেষ]

দিন কয়েকের মধ্যেই ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠান ঘোষক শহীদুল ইসলামের নেতৃত্বে আর এক দল বেতারকর্মী কিছু গানের টেপ সঙ্গে হাজির হলেন। এঁরা হচ্ছেন আশরাফুল আলম, মনজুরুল কাদের, সংবাদ পাঠক আলী রেজা চৌধুরী প্রমুখ। সেই সঙ্গে আরও এলেন সাদেকীন, প্রণয় রায়, নওয়াব জামান চৌধুরী ও সালাউদ্দীন সাজ্জাদ। এঁদের সবাইকে আমরা কাজে লাগিয়ে দিলাম। এরপর চট্টগ্রাম থেকে বেলাল মোহাম্মদের নেতৃত্বে এগারোজন বেতারকর্মী এসে পৌঁছালেন। এঁরা হচ্ছেন সৈয়দ আবদুস শাকের, মোস্তফা আনোয়ার, রাশেদুল হাসান, আবদুল্লা আল ফারুক, সরফুজ্জামান, আমিনুর রহমান, কাজী হাবিবউদ্দীন, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, সুব্রত বড়ুয়া আর প্রণোদিৎ বড়ুয়া। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এই এগারো জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পঁচিশে মার্চের প্রাক্কালে এঁরা চট্টগ্রামের বেতার ভবন থেকে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের নির্দেশে অনুষ্ঠান প্রচার করছিলেন। কিন্তু পঁচিশে মার্চের বীভৎস হত্যাকাণ্ড শুরু হওয়ার পর আগ্রাবাদস্থ বেতার ভবন থেকে অনুষ্ঠান বন্ধ হলে, এই এগারজন দুঃসাহসী বেতারকর্মী কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবনে জমায়েত হন। কেননা এই ট্রান্সমিটার থেকে সরাসরি অনুষ্ঠান প্রচার সম্ভব। ট্রান্সমিটারটি শহরের অন্য প্রান্তে কালুরঘাটে। বেশ কিছুটা নিরাপদ রয়েছে। বেলাল মোহাম্মদ বেতারকেন্দ্রের নতুন নামকরণ করলেন, 'বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র'। সৈয়দ আব্দুস শাকের গ্রহণ করলেন অনুষ্ঠান সম্প্রচারের প্রকৌশলগত সার্বিক দায়িত্ব, তার সহযোগিতায় এগিয়ে এলেন বেতার প্রকৌশলী সরফুজ্জামান ও আমিনুর রহমান। সমগ্র বাংলাদেশে তখন শুরু হয়েছে ব্যাপক হত্যা, অগ্নিকাণ্ড আর ধ্বংসলীলা। এর মধ্যে আকস্মিকভাবে ২৬শে মার্চ দুপুরে কালুরঘাট ট্রান্সমিশন থেকে ইথার তরঙ্গে ভেসে এলো, 'বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি...।' বেলাল মোহাম্মদের কণ্ঠ থেকে প্রচারিত হলো প্রথম বেতার কথিকা। 'হানাদার'– দুশমন। ওদের ক্ষমা নেই– ক্ষমা নেই। স্বাধীন বাংলার প্রতিটি গৃহ এক একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ।

'....বাঙালি আজ জেগেছে,
জয় নিপীড়িত জনগণের জয়
জয় নব অভিযান
জয় নব উত্থান ॥
জয় স্বাধীন বাংলা।

চট্টগ্রামে বিপ্লবী বেতারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিটির সবচেয়ে বেশি অবদান ছিলো তিনি হচ্ছেন মরহুম এম এ হান্নান। চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি মরহুম হান্নানের সক্রিয় সহযোগিতায় বেলাল মোহাম্মদ ও অন্যান্য বেতারকর্মীরা এই দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়েছিলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে বেতারকেন্দ্রটি চালু হবার পর মরহুম হান্নান জাতির উদ্দেশ্যে এক বৈপ্লবিক ভাষণও প্রদান করছিলেন।

চট্টগ্রামের এই দুঃসাহসী বেতারকর্মীরা পরদিন ২৭শে মার্চ যোগাযোগ স্থাপন করলেন তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানের সঙ্গে। বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে ঘোষিত হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা। ২৭শে মার্চ আমি মেজর জিয়া বলছি; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশে আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। তেঁতুলিয়া থেকে মনপুরা পর্যন্ত আর টেকনাফ থেকে মেহেরপুরের আম্রকানন পর্যন্ত উচ্চারিত হলো স্বাধীনতার অগ্নিশপথ। লাখো লাখো দামাল ছেলে ঝাঁপিয়ে পড়লো রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে। দিন কয়েকের বেশি এই বেতারকেন্দ্র স্থায়ী হতে পারেনি। হানাদার বাহিনীর বিমান আক্রমণে বিধ্বস্ত হলো কালুরঘাটের ট্রান্সমিটার। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে এই 'বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র' যে দায়িত্ব পালন করেছে, তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

চট্টগ্রামে বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের কর্মীরা বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে মুজিবনগরে উপস্থিত হওয়ায় আমাদের মনোবল ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলো। এরপর এলেন রাজশাহী বেতারের অনুষ্ঠান সংগঠক মেসবাহউদ্দীন আহমদ, অনুষ্ঠান প্রযোজক অনু ইসলাম, খুলনা বেতারের টেকনিক্যাল এ্যাসিস্টেন্ট মমিনুল হক চৌধুরী আর ঢাকার অনুষ্ঠান ঘোষক মোতাহার হোসেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অধিবেশন শুরু হওয়ার পর মাত্র ৩ সপ্তাহের মধ্যে বহু বেতারকর্মী, শিল্পী, নাট্যাভিনেতা, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিক্ষক এসে হাজির হলেন। তাই অনুষ্ঠানের সময়সীমা বাড়িয়ে দেয়া হলো। সংবাদ বিভাগের সার্বিক দায়িত্বে রইলেন কামাল লোহানী ও সুব্রত বড়ুয়া। ইংরেজি অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পর্যায়ক্রমে বহন করলেন আলমগীর কবির ও আলী যাকের। কিছুদিনের জন্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ইংরেজি সংবাদ ভাষ্য প্রচার করলেন জামিল আখতার ছদ্মনামে। উর্দু অনুষ্ঠান পরিচালনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন শহীদুল হক ও জাহিদ সিদ্দিকী। আশ্চর্য হলেও বলতে হয় যে, আলমগীর কবির পেশায় চলচ্চিত্র পরিচালক, আলী যাকের বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ী, মওদুদ আহমদ ও গাজীউল হক আইনজীবী আর শহীদুল হক ট্রাভেল এজেন্সি ব্যবসায় পারদর্শী। অথচ জাতির দুর্যোগে এঁরা বেতার অনুষ্ঠান পরিচালনায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখলেন।

শিক্ষকদের মধ্যে অধ্যাপক শওকত ওসমান, সৈয়দ আলী আহসান, ডক্টর মাযহারুল ইসলাম, ডক্টর আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক আব্দুল হাফিজ, অধ্যাপক বদরুল হাসান প্রমুখ স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে নিয়মিতভাবে কথিকা প্রচার শুরু করলেন। সাংবাদিকদের মধ্যে ফয়েজ আহমদের 'পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে', আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'বিচার প্রহসন' আর আমীর হোসেনের 'সংবাদ পর্যালোচনা' ধারাবাহিকভাবে প্রচার শুরু হলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সবার জন্য সামান্য কিছু পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা হলেও সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ

করলেন না। সাংবাদিকদের মধ্যে আরও যারা স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলেন তাদের মধ্যে সলিমুল্লাহ (ইলিয়াস আহমেদ), মহাদেব সাহা, রণেশ দাসগুপ্ত, সাদেকীন, আব্দুর রাজ্জাক চৌধুরী, গাজীউল হাসান খান, আমিনুল হক বাদশাহ্ প্রমুখ অন্যতম। এছাড়া কবি সিকান্দার আবু জাফর, কবি আসাদ চৌধুরী, কবি নির্মলেন্দু গুণ প্রমুখ তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে বলিষ্ঠ স্বাক্ষর রাখলেন।

প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক জহির রায়হান (মরহুম) একদিন স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে স্বকণ্ঠে প্রচার করলেন তার নিজের লেখা নিবন্ধ 'পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ'। তিনি বললেন, 'পাকিস্তানের এই অপমৃত্যুর জন্য বাংলাদেশের মানুষ দায়ী নয়। দায়ী পাকিস্তানের শাসকচক্র, যারা পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষের স্বাধিকারের প্রশ্নকে লক্ষ লক্ষ মৃতের লাশের নিচে দাবিয়ে রাখতে চেয়েছে। ...বাংলাদেশ এখন প্রতিটি বাঙালির প্রাণ। বাংলাদেশে তারা পাকিস্তানের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে দেবে না। সেখানে তারা গড়ে তুলবে এক শোষণহীন সমাজব্যবস্থা, সেখানে মানুষ প্রাণভরে হাসতে পারবে, সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে।'

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত হলো প্রখ্যাত সাহিত্যিক শওকত ওসমানের জ্বালাময়ী লেখা 'ইয়াহিয়া জবাব দাও।' শওকত ওসমানের ভাষায় বলতে হলে 'মিথ্যাবাদীর সঙ্গে যে বসবাস করে, সেও মিথ্যুকে পরিণত হয়। সংগ দোষ। ইয়াহিয়া, জবাব দাও, তুমি কেন ওয়াদা খেলাফ করলে?'

পঁচিশে মার্চ রাত থেকে বাংলাদেশের বুকে যে জঘন্য হত্যাকাণ্ড হয়েছে, তা স্বচক্ষে অবলোকনের পর কবি সিকান্দার আবু জাফরের (মরহুম) লেখনী বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। তিনি একাত্তরের ২৬শে জুলাই 'অভিযোগ ইশতেহার' প্রকাশ করলেন। ধারাবাহিকভাবে তিন পর্যায়ে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে এই ইশতেহার প্রচারিত হলো। কবি ঘোষণা করলেন, বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্দীপ্ত বাঙালি আজ হাতে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে মুক্তিসংগ্রামের দুর্জয় অংগীকারে। বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক– বাংলার বাছাই করা বীর সন্তানেরা। তাদের সঙ্গে নিজেদের বন্ধু আত্মজনের রক্তস্রোত তৎকালীন ই পি আর, পুলিশ, আনসার বাহিনী আর মুক্তি-মাতাল বাঙালি তরুণ-কিশোর-ছাত্র এবং ছাত্রীরাও। রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনা করেছিলেন, বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল পুণ্য হউক– আজ এতদিনে শ্রেণী-বর্ণ-গোত্র-ধর্ম নির্বিশেষে নিরীহ বাঙালি নয়–নারীর রক্তধৌত বাংলার মাটি পুণ্যস্নাত হয়েছে– মহাপুণ্যস্নাত হয়েছে। পাকিস্তানি হানাদার ঘাতকেরা ইতিহাসের একটি সহজ সত্য অস্বীকার করতে পারেনি যে, সার্বিক মৃত্যু ঘটিয়ে একটি জাতিকে তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত রাখা যায় না।

.........এমন সামগ্রিক মৃত্যুর আবর্তে কোন জাতি নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে না। তাই বাঙালির ঘরে যত ভাই-বোন, আজ অগণিত আত্মপরিজনের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন লাশের সামনে দাঁড়িয়ে এক বেদনায় একাত্ম হয়েছে, এক প্রতিজ্ঞায় বাহুবদ্ধ হয়েছে মৃত্যুর বিনিময়-মূল্যেই তারা মৃত্যুকে রোধ করবে। বাংলার মাটির পুণ্য পীযূষ ধারায় সঞ্জীবিত প্রাণ একটি বাঙালি বেঁচে থাকতে বাংলাদেশের এই মুক্তিসংগ্রাম শেষ হবে না।"

চট্টগ্রামের 'বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রর' সঙ্গে জড়িত অন্যতম বেতারকর্মী

ও তরুণ লেখক মোস্তফা আনোয়ার তার অমর বেতার কথিকায় লিখলেন, 'দাংগাবাজী কলা-কৌশল আর চলবে না। লাঞ্ছিত, নিপীড়িত দরিদ্র বাঙালি গণমানুষ ওদের কলংকিত রাজনীতির মুখোশ উন্মোচিত করেছে। ওদের নগ্ন আসল রূপটি অতি দুর্ভাগ্যের রাত্রে আমরা দেখে ফেলেছি– পশুও বুঝি এত নগ্ন– এত বিশ্রী, এত কুৎসিত, এত বীভৎস নয়। ওরা মানুষ হত্যা করেছে– আসুন আমরা পশু হত্যা করি।"

অত্যন্ত দ্রুত 'স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র' একটা পূর্ণাংগ বেতারে রূপান্তরিত হলো। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান 'অগ্নিশিখা'র দায়িত্ব দেয়া হলো টি এইচ শিকদারকে। ধারা বর্ণনা ও অন্যান্য কাজে সহযোগিতা করলেন আশরাফুল আলম। এছাড়া নাটকে মোস্তফা আনোয়ার, সংগীতে তাহের সুলতান, কথিকায় মেসবাহউদ্দীন আহমদ, সাহিত্যে মোহাম্মদ ফারুক (ইনি শাহাজাহান ফারুক ছদ্মনামে সংবাদ পাঠ করতেন), আর প্রতিধ্বনি ও সোনার বাংলা নামে দুটি অনুষ্ঠান শহীদুল ইসলামের দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া হলো। অনুষ্ঠানগুলোর সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন আশফাকুর রহমান।

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের নীতি-নির্ধারণ, মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, অর্থ সংগ্রহ এবং কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদির দায়িত্ব পালনের জন্য তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য জনাব আবদুল মান্নানের পরামর্শদাতা হিসাবে রইলেন কামরুল হাসান, মুজিবনগর সরকারের তথ্য সচিব আনোয়ারুল হক খান এবং তথ্য ও প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর এম আর আখতার। পাকিস্তান সরকারের কর বিভাগের কর্মচারী জনাব আনোয়ারুল হক খান একাত্তরের জুন মাসে কার্যোপলক্ষে লন্ডনে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হলে তিনি অনতিবিলম্বে সরাসরি মুজিবনগরে এসে হাজির হন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ইনিই ছিলেন সরকারের প্রথম তথ্য সচিব। জনাব খান স্বাধীন বাংলাদেশে চার সপ্তাহও এই পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেননি। ১৯৭২ সালের জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে বিশেষ মহলের কারসাজিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দিলে জনাব খানকে ওএসডি করা হয়। বহু দিন তিনি বিড়ম্বিত ওএসডি অবস্থায় থাকার পর ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। নিয়তির পরিহাস! মুজিব হত্যার পর জনাব খানের পদাবনতি ঘটে এবং তিনি নিগৃহীত হন। পরবর্তীকালে ঘটনাপ্রবাহ আমার আর জানা নেই। আমি নিজেই তখন সপরিবারে নির্বাসনে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে লন্ডনে জনাব আনোয়ারুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার পূর্বে জাকার্তায় কার্যরত জনৈক উচ্চপদস্থ বাঙালি কর্মচারীকে মুজিবনগর সরকারের তথ্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছিলো। কিন্তু ভদ্রলোক প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন। শুধু তাই নয়, মুজিবনগর সরকারের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের সময় জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি প্রতিনিধি দল ইন্দোনেশিয়ায় গমন করলো তিনি তার বিরোধিতা করেন। জাকার্তাস্থ পাকিস্তানি দূতাবাস থেকে জানানো হয় যে, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্র-বিরোধী এই প্রতিনিধি দলের সফরের অনুমতি দেয়া উচিত হবে না।' জবাবে ইন্দোনেশীয় সরকার এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করে যে, পাকিস্তান এবং নির্বাসিত বাংলাদেশ, উভয় সরকারের প্রতিনিধি দলের বক্তব্য প্রকাশে তাদের আপত্তি নেই। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই ভদ্রলোক তথ্য মন্ত্রণালয়ের চাকরি লাভ করেন এবং বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছেন।

১২

ঢাকা বেতারকেন্দ্রের প্রখ্যাত সংগীত পরিচালক সমর দাস যে অমানুষিক পরিশ্রম করে আমাদের সংগীত অনুষ্ঠানগুলোকে সাফল্যমণ্ডিত করেছিলেন তার উল্লেখ না করলে অমার্জনীয় অপরাধ হবে। সীমিত সংখ্যক বাদ্যযন্ত্র ও যন্ত্রশিল্পী নিয়ে শুধুমাত্র আন্তরিক নিষ্ঠা আর অদম্য উৎসাহের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়েছিলো। স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে কোন সাউন্ড প্রুফ রেকর্ডিং স্টুডিও ছিলো না। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িটার যে ছোট্ট কক্ষে এক সময় মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ থাকতেন, আমরা সেই কক্ষটার চারদিকের দেয়ালে বিছানার চাদর ও কাপড় ঝুলিয়ে দরজা ও জানালার ছিদ্রগুলো বন্ধ করে রেকর্ডিং স্টুডিও বানিয়েছিলাম। সেখানেই ছিলো আমাদের দুটো ভাঙা টেপ রেকর্ডার। এই রেকর্ডিং রুমটা আর নিউজের জন্য পাশের রুমের একাংশ ছাড়া সমস্ত বাড়িটার কোথাও আর পা রাখবার জায়গা ছিলো না। সর্বত্রই ছিলো বেতারকর্মী ও শিল্পীদের বিছানা। এই সময় বাড়িটাতে প্রায় সত্তরজন লোক রাত্রিযাপন করতেন। টয়লেট ছিলো মাত্র দুটা। অবশ্য সবার জন্য আমরা মুজিবনগর সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় দু'বেলা খাবারের ব্যবস্থা করেছিলাম। এই অবস্থার মধ্যেই কামাল লোহানী ও জালালকে নিউজ লিখতে হয়েছে। আলী জাকের ও আলমগীর কবিরকে ইংরেজি অনুষ্ঠান তৈরি করতে হয়েছে। শহিদুল হক ও জাহেদ সিদ্দিকীকে উর্দু অনুষ্ঠানের টেপ রেকর্ডিং করতে হয়েছে। 'জল্লাদের দরবার' ও 'চরমপত্রের' রেকর্ডিংও করতে হয়েছে। কোথাও কারো কাছ থেকে তেমন কোন অভিযোগ উথাপিত হয়নি। আমরা সবাই ছিলাম এক ও অভিন্ন প্রাণ। সবার চোখের সামনে সব সময়েই দুটো জিনিস জ্বলজ্বল করে ভাসতো। প্রথমটা হচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাংগনের মুক্তিযুদ্ধ। আর দ্বিতীয়টা শত্রু দখলকৃত এলাকায় মানুষের দুর্বিষহ জীবনযাত্রা। ঢাকা থেকে আমাদের পরিচিত কেউ এলেই আমরা চারদিক ঘিরে তাঁর কাছ থেকে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানার জন্য প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতাম।

কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে আব্দুল জব্বার, অজিত রায়, সরদার আলাউদ্দিন, মোকসেদ আলী সাঁই, আপেল মাহমুদ, কাদেরী কিবরিয়া, রথীন্দ্রনাথ রায়, হরলাল রায়, অরূপ রতন চৌধুরী, তপন ভট্টাচার্য, স্বপ্ন রায়, শাহ্ আলী সরকার, কল্যাণী ঘোষ, লাকি আহমদ, মঞ্জুর আহম্মদ, তোরাব আলী শাহ্, গোপী নাথ, রূপা খান, মালা খান প্রমুখ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে বলিষ্ঠ অবদান রেখেছেন। আব্দুল জব্বারের কণ্ঠে 'সালাম সালাম হাজার সালাম' আর আপেল মাহমুদের কণ্ঠে 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি'...এই দুটো গান বাঙালি জাতির মনের মণিকোঠায় অমর হয়ে রইবে। এতোগুলো বছর পরেও কোন অবসর মুহূর্তে এই দুটো গান শুনলে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে।

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত নাটকের সফলতা এক বাক্যে স্বীকৃত হয়েছে। নাট্যশিল্পীদের মধ্যে হাসান ইমাম, সুভাষ দত্ত, সুমিতা দেবী, রাজু আহমেদ, নারায়ণ ঘোষ, মাধুরী চ্যাটার্জী, মাহমুদা আখতার রেবা, সৈয়দ মোহাম্মদ চাঁন, কল্যাণ মিত্র, আশরাফুল আলম, মিঠু, বুলবুল মহালনবীশ, মামুনুর রশিদ প্রমুখ নিয়মিতভাবে আমাদের নাটক ও একাংকিকাতে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রখ্যাত নাট্যকার কল্যাণ

মিত্রের লেখা 'জল্লাদের দরবার' নাটকে ইয়াহিয়া খানের ভূমিকায় রাজু আহমদের অভিনয় অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। উভয় বাংলায় এমন দরাজ কণ্ঠের অভিনয় তো আজও পর্যন্ত পেলাম না। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ঘাতকের নির্মম বুলেটে রাজু আহমদ নিহত হয়েছেন। কিন্তু বাংলা নাট্য জগতে রাজু আহমদের শূন্যস্থান এখনও পর্যন্ত পূরণ হলো না।

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে নিয়মিত অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার মাসখানেকের মধ্যে আরা কিছু শিল্পী, সাহিত্যিক ও বেতারকর্মী এসে হাজির হলেন। এঁদের মধ্যে নাসিম চৌধুরী, নুরুন্নাহার মাজাহার, উম্মে কুলসুম, নাসরিন আহমদ, মুজিব বিন হক, নেওয়াজিশ হোসেন, নূরুল ইসলাম, গণেশ ভৌমিক, গাজিউল হাসান খান ছাড়াও রাজশাহী বেতারের অনুষ্ঠান প্রযোজক মুহাম্মদ ফারুক, মোস্তাফিজুর রহমান ও অনুষ্ঠান ঘোষক আবু ইউনুস, চট্টগ্রাম বেতারের ইয়ার মাহমুদ, মনতোষ দে ও হাবিবুল্লাহ চৌধুরী আর ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠান ঘোষক মহসীন রেজা ও অনুষ্ঠান তত্ত্বাবধায়ক এ কে শামসুদ্দীন প্রমুখ অন্যতম। আশ্চর্য হলেও একথা সত্য যে, দখলকৃত বাংলাদেশের ছ'টা বেতারকেন্দ্র থেকে মাতৃভূমি সেবার উদগ্র বাসনা আর বিবেকের দংশনে বিপুলসংখ্যক বেতারকর্মী আমাদের সঙ্গে যোগদান করলেও কোন আঞ্চলিক বেতার পরিচালক তো দূরের কথা, একজন সহকারী বেতার পরিচালক পর্যন্ত 'ডিফেক্ট' করেননি। অথচ ছ'টা বেতারকেন্দ্রের চারটাই হচ্ছে সীমান্ত এলাকায়।

বিভিন্ন ধরনের বাধা, সীমাবদ্ধতা, অসুবিধা এবং এতো সব প্রতিকূল পরিবেশের মাঝেও স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রতিদিন অনুষ্ঠান চালু রাখতে হয়েছে। দখলকৃত এলাকার ছ'টা বেতারকেন্দ্র থেকে অবিরাম আমাদের বিরুদ্ধে যেখানে বিষোদগার করা হয়েছে, তার মোকাবেলা করতে হয়েছে। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা বহু শিল্পী, নাট্যকার, যন্ত্রশিল্পী, বেতারকর্মী, সাংবাদিক, লেখক আর শিক্ষকদের সক্রিয় সহযোগিতা লাভে সক্ষম হয়েছিলাম। এঁদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবী শ্রদ্ধেয় সৈয়দ আলী আহসান যেদিন তাঁর নিজস্ব কথিকা প্রচারের জন্য বালিগঞ্জে আমাদের স্টুডিওতে এলেন, সেদিন আমরা দারুণভাবে উৎসাহিত হলাম। রেকর্ডিংয়ের প্রাক্কালে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'স্যার আপনার স্ক্রিপ্ট কোথায়?' জবাবে মিষ্টি হেসে বললেন, 'স্ক্রিপ্টের প্রয়োজন হবে না। ক'মিনিট বলতে হবে তাই শুধু বলে দাও।' 'রেকর্ডিং' শুরু হলো। পাঁচ মিনিটের কথিকা, চার মিনিট পঞ্চাশ সেকেন্ডের মাথায় তাঁর কথিকা শেষ করলেন। দশ সেকেন্ড সময় অনুষ্ঠান ঘোষকের জন্য। সৈয়দ সাহেব স্ক্রিপ্ট ছাড়া তাঁর কথিকা রেকর্ডিংয়ের সময় কোথাও একবার আটকালেন না কিংবা এ্যাঁ-এ্যাঁ করলেন না। আমরা সবাই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। তিনি বললেন, 'বুঝলে, ব্রিটিশ আমলে হিন্দুদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে আমিও এক সময় অল ইন্ডিয়া রেডিওতে চাকরি করতাম।'

ডক্টর মাজহারুল ইসলাম একজন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তিনি যেদিন আমাদের স্টুডিওতে এসে তাঁর কথিকা 'বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু' রেকর্ডিং করলেন, আমরা বাংলা ভাষার ওপর তাঁর দখল দেখে চমৎকৃত হলাম। ডক্টর আনিসুজ্জামানের লেখা 'অমর ১৭ই সেপ্টেম্বর' স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রর অমূল্য সম্পদ। এছাড়াও শওকত ওসমান, সিকান্দার আবু জাফর, জহির রায়হান, আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, ফয়েজ আহমদ, আব্দুর রাজ্জাক চৌধুরী, রণেশ দাসগুপ্ত, গাজীউক হক, সলিমুল্লাহ, আমীর হোসেন, আসাদ চৌধুরী ও মহাদেব সাহা প্রমুখের মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠিত কবি, সাহিত্যিক আর

সাংবাদিকের দল স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে তাঁদের অমর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

সংবাদ পাঠক হিসেবে হাসান ইমাম, কামাল লোহানী, বাবুল আখতার, পারভীন হোসেন, আলী জাকের আর জাহেদ সিদ্দিকী যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অনুষ্ঠান ঘোষণায় আশফাকুর রহমান আর মাজাহারের মতো সাবলীল ও দরাজ কণ্ঠস্বর আজও খুঁজে পেলাম না।

কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে আব্দুল জব্বার, অজিত রায়, আপেল মাহমুদ, কাদেরী কিবরিয়া, রথীন্দ্রনাথ রায়, সরদার আলাউদ্দীন, মোকসেদ আলী সাঁই, মান্না হক, তপন ভট্টাচার্য আর অরূপরতন চৌধুরী এই স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে তাঁদের অনন্য প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। উভয় বাংলায় আজ এঁরা প্রতিষ্ঠিত কণ্ঠশিল্পী হিসেবে স্বীকৃত।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের দখলিকৃত এলাকার ছ'টা বেতারকেন্দ্র থেকে অবিরাম যেভাবে বাঙালি জাতি ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ অপপ্রচার চালানো হয়েছে, তার জবাব দেয়ার জন্য ছিলো আমাদের এই একটিমাত্র বেতারকেন্দ্র। এ সময় শুধুমাত্র ঢাকা বেতারকেন্দ্র থেকে আঠারোটা প্রোপাগাণ্ডা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে। এছাড়া রাজশাহী ও অন্যান্য বেতারকেন্দ্র থেকেও ঢালাওভাবে আমাদের বিরুদ্ধে সম্প্রচার অব্যাহত ছিলো। এসব প্রচার ও প্রোপাগণ্ডার সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ বাধ্যতামূলকভাবে এসব করলেও অনেকে যে উৎসাহের সঙ্গে 'দায়িত্ব' পালন করেছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে। পরবর্তীকালে এঁদের প্রায় সবাই সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অনেকে আবার বাঙালি জাতি ও মুক্তিযুদ্ধের দর্শন সম্পর্কে দেশবাসীকে আজও পর্যন্ত 'সবক' দান করে চলেছেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট মৌলিক নীতি গ্রহণ না করায় এই অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে। তদবিরের বদৌলতে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে অনেকেই নিজেদের কলুষমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু মফস্বল এলাকায় 'খুঁটির জোরে'র অভাবে অনেকে এই 'সুযোগ' থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

এখানে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ না করলে নব্য স্বাধীন বাংলাদেশের আসল চেহারাটা অনুধাবন করা যাবে না। বাহাত্তর সালের গোড়ার দিকে কুষ্টিয়ার কোর্টে জনৈক রাজাকারের বিরুদ্ধে একটা মামলার শুনানি হচ্ছিলো। সাক্ষী-সাবুদ গ্রহণ আর জেরা শেষ হলে মাননীয় বিচারক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আইনমত জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি দোষী না নির্দোষী।' আসামি একদৃষ্টে মাননীয় হাকিমের দিকে নিশ্চুপভাবে তাকিয়ে রয়েছে। মিনিট কয়েক পর আসামির মুখ থেকে জবাব এলো, 'আমি ভাবতাছি।' জনৈক উকিল সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, 'কী ভাবতাছোস?' এবার আসামি জবাব দিলো, 'আমি ভাবতাছি, আমারে যে সা'বে এই রাস্তায় আনছিলো, সেই সা'বই তো হাকিমের চেয়ারে বইস্যা রইছে। তা'হইলে এইটা কেমন বিচার যে, হেই সা'বে আজ প্রমোশন পাইয়া হাকিম, আর আমি হইলাম আসামি?'

ঠিকই– একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় এই মাননীয় বিচারক মহোদয় ছিলেন কুষ্টিয়ার এডিসি (রাজাকার রিক্রুটমেন্ট), আর এরই প্রচেষ্টায় এই আসামি রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো। নিয়তির পরিহাস। সেদিনের গ্রামের সেই সাধারণ মানুষটা এখন আসামির কাঠগড়ায় আর এডিসি মহোদয় প্রমোশন পেয়ে বিচারকের আসনে বসে রয়েছেন। এটাই ছিলো কোন সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণে অপারগ বাংলাদেশের চেহারা।

১৩

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র চালু হওয়ার পর কিছুদিনের মধ্যেই এর অনুষ্ঠানগুলো ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করলো। এসব অনুষ্ঠান রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা ছাড়াও দখলকৃত এলাকার জনসাধারণের মনোবল বৃদ্ধি করলো। আমরা লক্ষ্য করলাম যে, দখলকৃত এলাকায় ছ'টা বেতারকেন্দ্র থেকে মুক্তিযোদ্ধা ও বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে যত বিষোদগারই করা হোক না কেনো, এসব বেতারকেন্দ্র থেকে স্বাধীন বাংলা বেতারের নাম উচ্চারণ করা হচ্ছে না। কেননা এতে করে মুক্তিযোদ্ধাদের নিজস্ব বেতারকেন্দ্রের স্বীকৃতি দেয়া হবে। তাই বিভিন্ন সেক্টর থেকে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে আমরা যখন দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বর্বর হত্যাকাণ্ড, নারীর অবমাননা, ধর্মীয় স্থান অপবিত্রতার মতো নানা ধরনের মানবতাবিরোধী অভিযোগ উপস্থাপন করতে শুরু করলাম, তার কোন পরিষ্কার জবাব এসব বেতারকেন্দ্র থেকে দিতে ব্যর্থ হলো। উপরন্তু স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের নাম উচ্চারণে নিষেধাজ্ঞা থাকায় ওদের যত গালাগালি সব আকাশবাণীর বিরুদ্ধে প্রচার হলো।

একাত্তরের জুলাই মাসের প্রথম দিকে একদিন মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের সামগ্রিক দায়িত্বে নিযুক্ত জনাব আব্দুল মান্নান ও আমাদের কয়েক জনকে ডাকলেন। নীতি-নির্ধারণ সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা হবার পর বললেন, 'পাকিস্তান বেতার থেকে যে অবিরাম আমাদের তমুকের এজেন্ট, তমুকের দালাল ইত্যাদি বলা হচ্ছে তার জবাব দিচ্ছেন না কেন?' আমি বললাম, 'আমরা প্রোপাগাণ্ডা যুদ্ধে ডিফেন্সের যেতে চাই না।'

'যে মুহূর্তে আমরা অভিযোগ অস্বীকার করে প্রতিবাদ করতে যাবো, সেই মুহূর্তেই আমরা কিন্তু অভিযোগের অর্ধেকটা স্বীকার করে নিলাম। আর এ অভিযোগ খণ্ডন করবার পুরো দায়িত্বই তখন আমাদের। তাই ওরা যে অভিযোগেই উত্থাপন করুক না কেন, আমরা তার জবাব না দিয়ে পাল্টা বর্বর হত্যাকাণ্ড, নারী নির্যাতন ও ধর্মীয় স্থান অপবিত্র করার অভিযোগ উত্থাপন করে ওদের ডিফেন্সে ফেলবো। আর আমরা যখন দিন-তারিখ-ক্ষণ ও স্থানের উল্লেখ করে এসব ঘটনার কথা বলছি, তখন বাংলার মানুষ তার সাক্ষী হয়ে রয়েছে। তাই প্রোপাগাণ্ডায় ওরা আমাদের সঙ্গে পারবে না।' প্রধানমন্ত্রী আমাদের যুক্তির সঙ্গে একমত হলেন।

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র যতদিন চালু ছিলো, ততদিন প্রোপাগাণ্ডার ক্ষেত্রে আমরা 'এগ্রেসিভ' ছিলাম। কোন সময়েই নমনীয় নীতি গ্রহণ করিনি। অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে মুক্তিযোদ্ধারা যেভাবে লড়াই করেছে তা সঠিক– নির্বাসিত সরকার বাঙালি জাতির বৃহত্তর স্বার্থে যে ভূমিকা পালন করছে তা প্রশ্নাতীত– আর দখলিকৃত এলাকার প্রতিটি মানুষ যেভাবে সহযোগিতা করেছে, তা নির্ভুল। উপরন্তু বাঙালি সৈন্যদের 'ডিফেকশন' মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে দুরন্ত স্বদেশপ্রেম হিসাবে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র তার বলিষ্ঠ নীতি ও উন্নতমানের অনুষ্ঠানের জন্য অচিরেই পশ্চিম বাংলায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করলো। বিশেষ করে 'জল্লাদের দরবার' ও 'চরমপত্র' মুখে মুখে আলোচিত হতে থাকলো। ২০/২২ বছর ধরে যেসব পূর্ববঙ্গীয় বাস্তুহারা ওপারে পাড়ি জমিয়েছিলেন, তাঁরা বহুদিন পরে বাঙ্গাল ভাষার

বেতার অনুষ্ঠান শুনতে পেয়ে হতবাক হলেন। কোলকাতায় বাসে, ট্রামে, খেলার মাঠে– সর্বত্রই ভিড়ের চাপ বৃদ্ধি পেলে রংবাজ ছোকরাদের মুখে মুখে ফিরতো 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানের সেই ট্রেড মার্ক কথা– 'এলায় কেমন বুঝতাছেন?'

কোলকাতা হচ্ছে হুজুগে শহর। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আর স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলোর হুজুগে সমগ্র মহানগরী আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। এমনি এক সময়ে একদিন বিকেলে 'আকাশবাণী' কোলকাতা কেন্দ্রে আড্ডা মারতে গেলাম। অনুষ্ঠান প্রযোজক সরল গুহের কামরায় চুটিয়ে আড্ডা হচ্ছিলো। সরল বাবুর আদি বাড়ি ঢাকায়। তাই বাঙাল হিসাবে আমাদের প্রতি তাঁর খুব টান। এমন সময় বর্ধমান কলেজের এক অধ্যাপক এলেন। ভদ্রলোক খাঁটি পশ্চিমবঙ্গীয়। কথায় কথায় এই অধ্যাপক বলেই বসলেন, 'বাংলাদেশে কিসের এক যুদ্ধ শুরু হয়েছে? আর তার সুযোগে মশায় জয় বাংলা রেডিও যা করছে তা আর বলার নয়। যা-ইচ্ছে তাই ভাবে রেডিওতে বাঙাল ভাষা ব্যবহার করছে। বাংলা ভাষাটাকে মশায় একেবারে 'রেপ করে দিলো।' আর যায় কোথায়? সবাই আমরা একযোগে প্রতিবাদ করে উঠলাম। কিশোরগঞ্জের সন্তান প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত গায়ক দেবব্রত বিশ্বাস জবাবে বললেন, 'হ্যাঁ মশায় কুঁচো চিংড়ির ঝোল খাইয়া সিঁদুরমাখা সিন্দুকের মইধ্যে বুঝি আর বাংলা ভাষাটা আটকাইয়া রাখতে পারলেন না। বাংলা ভাষার লাইগ্যা ঢাকার পোলাপানরা গুলি খাইলো আর হেই বাংলা ভাষার দরদি হইলেন আপনে? এইটা কি আপনার পৈতৃক সম্পত্তি নাকি?' প্রখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায় অনেক কষ্টে দু'জনকে থামালেন।

এমন সময় 'সংবাদ সমীক্ষার' দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে এলেন। বললেন, 'চলুন নিউজ সেকশনে। সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো।' সরল বাবুর ঘরে উত্তপ্ত পরিবেশ দেখে বিদায় নিয়ে দেবদুলালের সঙ্গে বার্তা বিভাগে গেলাম। সবার সঙ্গে পরিচিত হবার পর বার্তা সম্পাদক বললেন, আমাদের এখানে তো পালা করে দু'জনে সংবাদ সমীক্ষা লেখে আর দেবদুলাল তা পড়ে। তা আপনাদের স্বাধীন বাংলা বেতারে 'চরমপত্রের' স্ক্রিপ্ট লেখে কে? আমি বিনীতভাবে বললাম, লেখা আর ব্রডকাস্ট দুটোই আমি করি। স্ক্রিপ্ট লেখার সময় অনেকেই উৎসাহিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রশ্ন এলো, তা 'চরমপত্র' ক'দিন থেকে করছেন? জবাব দিলাম, হ্যাঁ, মাস তিনেক তো হবেই। এইবার দেবদুলাল বললেন, 'আখতার সাহেব চরমপত্র নিজেই লেখেন– নিজেই ভয়েস দেন। আজ তিন মাসের মধ্যে কোন দিন বাদ যায়নি। এর ওপর আবার উনিই হচ্ছেন মুজিবনগর সরকারের ইনফরমেশন বিভাগের ডিরেক্টর। আপনার কথা ক্যালকাটা স্টেশনের আর ডি জানতে পারলে আমাদের ভাত মারা যাবে।'

নিয়তির পরিহাস। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় 'আকাশবাণী'র কোলকাতা কেন্দ্র থেকে নিয়মিতভাবে 'সংবাদ সমীক্ষা' পড়ার জন্য দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভারত সরকারের সর্বোচ্চ 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করা হলো আর স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানের যিনি একাধারে লেখক ও পাঠক ছিলেন, তিনি সুদীর্ঘ এগারো বছর পর বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে যাবার আশংকায়, এখন সাপ্তাহিক 'স্বদেশ পত্রিকা'র মাধ্যমে 'চরমপত্র' স্মৃতিচারণ করে সান্ত্বনা লাভ করছে।

যাক যা বলছিলাম। স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের অনুষ্ঠানের সময় বৃদ্ধি করার পর আমরা নিয়মিতভাবে আরও প্রোপাগাণ্ডা স্ক্রিপ্ট লেখার লোকের অভাব অনুভব করলাম। এ কথা ঠিক যে, দৈনিক পত্রিকায় যাঁরা নিয়মিত কলাম লিখে থাকেন তারা সব সময়ই বেতারের উপযোগী কথিকা লেখায় পারদর্শী। বাংলাদেশের সংবাদপত্র জগতে যে

ক'জনা কলামিস্টের সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে আবুল মনসুর আহমেদ, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, জহুর হোসেন চৌধুরী, খন্দকার আবদুল হামিদ আর আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে গাফ্ফার চৌধুরী এখনও জীবিত। আবুল মনসুর আহমেদের পরিচয় মূলত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হিসাবে চিহ্নিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, তিনি জীবনের অনেক অমূল্য সময় রাজনীতিতে অতিবাহিত করেছেন। না হলে তার ক্ষুরধার লেখনীর বদৌলতে সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হিসাবে তিনি অমর হয়ে থাকতেন। মনসুর সাহেবের শেষ জীবনের লেখা বইগুলোর মূল্যায়ন করলে বলা চলে যে, এসব রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ওপর ভিত্তিমূলক রোজনামচা। অথচ তাঁর যৌবনের লেখা বই 'ফুড কনফারেন্স' প্রকাশিত হবার পর সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর কাছ থেকে জাতি অনেক কিছু আশা করেছিলো। এমন কি প্রৌঢ়ত্বে এসেও তিনি সযত্নে সক্রিয় সাংবাদিকতা থেকে দূরে ছিলেন। রাজনীতিই তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। অবশ্য রাজনীতিতে তিনি সাফল্য অর্জন করে এক সময় পাকিস্তানের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিলেন।

মরহুম তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার জীবনের শুরুটা ছিলো রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে। ঘটনাপ্রবাহের মাঝ দিয়ে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে পড়েন এবং সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হন। নিরলস পরিশ্রম ও আন্তরিক নিষ্ঠার জন্য মানিক ভাই শুধু যে একজন সাংবাদিক হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাই নয়, তিনি তৎকালীন পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ কলামিস্ট হিসাবেও স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তার লেখা 'রাজনৈতিক মঞ্চ' বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে এক অমর ও অক্ষয় অবদান। জহুর হোসেন চৌধুরী তার শেষ জীবনের লেখা 'দরবার-ই-জহুর'-এর জন্য বাংলা সংবাদপত্র জগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'কলামিস্ট' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবেন।

এছাড়া তরুণ 'কলামিস্ট' আহমেদুর রহমানের কথা বলতে হয়। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় 'ভীমরুল' ছদ্মনামে তাঁর লেখা নিবন্ধগুলো এক সময় বেশ সাড়া জাগিয়েছিলো কিন্তু পিআইএ-এর উদ্বোধনী কায়রো ফ্লাইট দুর্ঘটনায় এই প্রতিভাময় কলামিস্টের অকালমৃত্যু হয়।

আর একজন কলামিস্ট খন্দকার আব্দুল হামিদের সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি মরহুম আবুল মনসুরের হাতে। বিভাগ-পূর্ব যুগে কোলকাতায় দৈনিক 'ইত্তেহাদ' পত্রিকায় জনাব হামিদ সক্রিয়ভাবে জড়িত হন। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট তারিখে 'ইত্তেহাদ' পত্রিকায় তিনি পাকিস্তান সম্পর্কে লিখেছিলেন, "আমরা যাকে 'সুবেহ সাদেক' বলছি-তা আবার 'সুবেহ কাজেব' না হয়ে দাঁড়ায়?"

পরবর্তীকালে ঢাকা বেতারকেন্দ্রে তিনি কিছুদিন 'স্ক্রিপ্ট রাইটারের' কাজ করার পর সাপ্তাহিক ইত্তেফাক, দৈনিক মিল্লাত, দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক আজাদ পত্রিকায় অজস্র নিবন্ধ লিখেছেন। এইসব নিবন্ধের রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্পর্কে কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করলেও তার ক্ষুরধার লেখনী, পরিপক্বতা এবং চমৎকার উপস্থাপনা সম্পর্কে সর্বমহলে তিনি প্রশংসিত হয়েছেন। কিন্তু খন্দকার সাহেবও সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত হওয়ায় আন্তরিকতার সঙ্গে সাংবাদিকতা করতে পারেননি। কেননা রাজনীতিতে জড়িতে হওয়ার অর্থই হচ্ছে কোন না কোন মহল থেকে তিনি সমালোচিত হতে বাধ্য। রাজনীতি জিনিসটা সব সময়ই বিতর্কিত। অবশ্য খন্দকার সাহেবও রাজনীতির মাধ্যমে দু'বার মন্ত্রীর পদ লাভ করেছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁকে আমৃত্যু সংবাদপত্রের 'কলামিস্ট' হিসেবেই দেখতে চেয়েছিলাম। তাঁর জীবন অভিজ্ঞতায়

ভরপুর। তিনি বাংলাদেশের সমাজ জীবন সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। তাঁর লেখনীর উপস্থাপনা, আংগিকের ভংগিমা এবং বক্তব্য প্রকাশ সাবলীল। উপরন্তু তাঁর সমালোচনার দক্ষতা প্রশ্নাতীত। তবুও মনে হয় সাংবাদিকতায় অবদান রাখার ক্ষেত্রে তাঁর কিছুটা দ্বিধা রয়েছে। রাজনীতির হাতছানি তাঁকে বার বার উন্মনা করে তুলেছে এবং তিনি রাজনীতির আবর্তে বেশ ঘুরপাক খেয়েছিলেন।

আমরা গর্বিত যে, স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'কলামিস্ট' আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর সহযোগিতা লাভ করেছিলাম। একটু বিলম্বে হলেও তিনি সপরিবারে একাত্তরের জুলাই মাসে এসে হাজির হলেন আগরতলায়। এখানে তিনি বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হলেন। কেননা ১৯৭০ সালে তিনি অধুনালুপ্ত দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকায় বিতর্কিত 'তৃতীয় মত' লিখেছিলেন। তৎকালীন আওয়ামী লীগের অন্ধ সমর্থকদের কাছে এই লেখা বিশেষ পছন্দসই ছিলো না। গাফ্ফার চৌধুরী হচ্ছেন সংবাদপত্র জগতের একজন পেশাদার কলামিস্ট। যখন যে পত্রিকায় কাজ করেছেন, তখন সে পত্রিকার কর্তৃপক্ষের মতামতের দিকে মোটামুটি লক্ষ্য রেখে তিনি তার ক্ষুরধার লেখনী পরিচালনায় পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর লেখায় সাবলীল গতি, চমৎকার যুক্তি আর অপূর্ব উপস্থাপনা রয়েছে।

তাই একাত্তরের আগরতলায় উপস্থিত হয়ে বিপদের গন্ধ পেয়ে সপরিবারে কোলকাতায় এসে হাজির হলেন। আমাদের সুপারিশে মান্নান সাহেব তাঁকে 'সাপ্তাহিক জয় বাংলা' পত্রিকায় চাকরি দিলেন। এখানেও নিস্তার নেই। বালু হক্কাক লেনের 'জয় বাংলা' পত্রিকা অফিসে একদিন কিছুসংখ্যক বাংলাদেশের বাঙালি ছাত্র আক্রমণ করে বসলো। কারণ 'তৃতীয় মতে'র লেখক। মান্নান সাহেব ও আমি বহু কষ্টে পরিস্থিতির মোকাবেলা করে চৌধুরী সাহেবকে পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস দিলাম।

শেষ পর্যন্ত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তাঁর বিখ্যাত বেতার কথিকা 'বিচার প্রহসন' ধারাবাহিকভাবে প্রচার শুরু হলো। এছাড়াও তিনি আরও বহু বেতার কথিকা লিখে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের মান উন্নয়নে সহযোগিতা করেছেন।

স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সালে জনাব চৌধুরী দৈনিক 'জনপদ' পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালীন বিতর্কিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ 'ক্ষমা করো প্রভু' লিখে লন্ডনের পথে পাড়ি জমালেন। নিবন্ধটার মর্মকথা হচ্ছে, 'হে প্রভু এ পর্যন্ত তুমি যা' বলেছো আর যা হুকুম করেছো তার সবই পালন করেছি। কিন্তু তোমার সব শেষ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারলাম না বলে আমাকে ক্ষমা করে দিও।'

ঘটনাপ্রবাহের মাঝ দিয়ে আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী এগারো বছর ধরে পরদেশী হয়ে আছেন। বাংলাদেশের সংবাদপত্রে আজ পর্যন্ত এ ধরনের কলামিস্ট আর হলো কোথায়?

১৪

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রতিদিন ইংরেজি ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারের কৃতিত্ব দু'জনের। একজন হচ্ছেন বর্তমানে প্রখ্যাত নাট্যকার আলী যাকের এবং আরেকজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালক আলমগীর কবির। দু'জনেই তখন অধিকৃত এলাকায় অবস্থানকারী আত্মীয়-স্বজনদের নিরাপত্তার খাতিরে আবু মোহাম্মদ আলী আর আহমেদ চৌধুরী ছদ্মনামে ইংরেজি অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। তবে এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে এঁরা যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হয়।

পরবর্তীকালে স্মৃতি মন্থন করতে গিয়ে আলী যাকের এক জায়গায় লিখেছেন, "পঁচিশে মার্চ রাত্রি এগারোটায় বাংলার মানুষের জীবনের একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি। ১৬ই ডিসেম্বর বিকেল চারটায় আর এক অধ্যায়ের শুরু। এর মাঝের অধ্যায়টি ভরা থাক নিরেট অশ্রুবিন্দু দিয়ে। কিন্তু এই অশ্রুবিন্দু গত নয় মাসের সংগ্রামের মাঝ দিয়ে রূপান্তরিত হয়েছে মুক্তোয়– সংগ্রামের, ত্যাগ, তিতিক্ষায় গাঁথা স্বাধীনতার মুক্তোর মালা।" ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এই নয় মাসকাল সময় বাংলাদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবার জন্যই ঘটনাবহুল আর বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরপুর। এর সমন্বয় করলেই সৃষ্টি হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস। অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে বলতে হবে যে, আজ এগারো বছর পরেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস লেখা হয়নি। ইতিহাস লেখা তো দূরের কথা আমাদের সাহিত্যে স্বাধীনতার লড়াইয়ের যথার্থ প্রতিফলন পর্যন্ত দেখতে পাইনি। একমাত্র সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' ছাড়া স্বাধীনতার লড়াইভিত্তিক আর কোন সার্থক নাটক রচিত হয়নি। শুধুমাত্র কবিতার ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ওপর ভিত্তি করে তেমন কোন সাড়া জাগানো উপন্যাস কিংবা ছোটগল্প লেখা হয়নি। স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিকায় যে ক'টি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে, সেগুলোতেও মুক্তিযোদ্ধদের প্রকৃত চরিত্রের রূপায়ণ হয়নি। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে পরোক্ষভাবে কটাক্ষ পর্যন্ত করা হয়েছে। আর পুনরায় 'মানুষ হওয়ার' উপদেশ দেয়া হয়েছে।

এ কথা ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে, একাত্তরে হাজার হাজার বাঙালি সৈন্য ও অফিসার পাকিস্তানের বন্দি শিবিরে দুর্বিষহ জীবনযাপন করেছেন অথচ তাঁদের এই ভয়াবহ জীবনযাত্রার ওপর ভিত্তি করে আজও পর্যন্ত কোন নাটক, উপন্যাস বা ছোট গল্প কিছুই রচিত হয়নি। তাঁদের এই বন্দি জীবনের ঘটনাবলী কি বাঙালি জাতির ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়? দুঃসাহসী বৈমানিক মতিউর রহমানের দেশপ্রেমের ওপর ভিত্তি করেও তো একটা চলচ্চিত্র নির্মিত হতে পারতো? একাত্তরের ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের পরেও যেসব বুদ্ধিজীবী আজও পর্যন্ত জীবিত রয়েছেন, তাদের কাছে আমার এই প্রশ্ন রইলো। যে জাতি তার অতীতকে শ্রদ্ধা করতে জানে না– যে জাতি তার স্বাধীনতার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস প্রজ্বলিত করতে শিখে নাই– যে জাতি তার মহান সৈন্যদের আত্মদানকে স্মরণ করতে পারে না– সে জাতি কোন দিন ঐক্যবদ্ধভাবে প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে আগুয়ান হতে পারে কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

যাক যা বলছিলাম। স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান শুরু করার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এ অনুষ্ঠান বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করলো। মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন ক্যাম্প ও সেক্টর কমান্ডারদের কাছ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক চিঠিপত্র আসতে লাগলো। যুদ্ধের অবস্থা দেখার জন্য আর বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য প্রায়ই মুজিবনগর থেকে খুলনা-যশোর সেক্টরে যাতায়াত শুরু করলাম।

দিনটা আমার এখনও মনে আছে। সেদিন ছিল একাত্তরের বিশে জুলাইয়ের সকাল। যশোর সীমান্তে একটা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প সফর করতে গিয়েছিলাম। কথায় কথায় আমার পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়লো। মুক্তিযোদ্ধারা আবদার করলো 'চরমপত্র' পড়ে শোনাবার জন্য। কিন্তু তখন আমার কাছে কোন 'চরমপত্রে'র স্ক্রিপ্ট নেই। তাই অপারগতার কথা বললাম। কিন্তু ওরা নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো দুপুরে ওদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার পর 'চরমপত্রের' একটা স্ক্রিপ্ট লিখে সন্ধ্যা নাগাদ ওদের শোনাবার পর আমি ছাড়া পাবো। অগত্যা রাজি হলাম।

সেদিন যে স্ক্রিপ্ট লিখেছিলাম, ওদের অগ্রিম শোনাতে হয়েছিলো আর তা পরদিন স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছিলো। স্ক্রিপ্টটা ছিলো :-

"....যা ভাবছিলাম, তাই-ই হইছে। মুক্তিবাহিনীর বিচ্চুগুলোর আত্কা, গাবুর, কেচ্কা আর মাজুরিয়া মাইর একটুক কইর‍্যা কড়া হইয়া উঠতাছে আর খেইলটা জমতাছে। এর মইদ্দে টিক্কা-নিয়াজীর হেই জিনিস খরাপ হইয়া গেছে গা। তাগো তিনটা ডিভিশনের বেস্ট সোলজাররা বাংলাদেশের কেদোর মাইদ্দে ঘুমাইয়া পড়ছে। এই দিকে নর্দার্ন রেনজারস, গিলগিট স্কাউট, লাহোর রেনজারস, পশ্চিম পাকিস্তানি আমর্ড পুলিশ যাগোই ময়দানে নামাইতাছে, তারাই আছাড় খাইতাছে। আইজ কাইল এইগুলো আছাড় খাইলে আর কান্দে না। লগে লগে আখেরি দমড়া ছাইড়া দেয়। বাংলাদেশের দখলিকৃত এলাকায় হানাদার সোলজাররা ট্রেনে চাপলে ডিনামাইট, রাস্তায় গেলে মাইন, টাউনে ঘুরলে হ্যান্ড গ্রেনেড আর দরিয়াতে নামলেই খালি চুবানি খাইতে হয়। এইরকম একটা অবস্থায় পরায় চাইর মাস যুদ্ধ হওনের পর টিক্কা-নিয়াজী জমা-খরচের হিসাব কইর‍্যা ভিমরী খাইছে। এলায় করি কি? দশ লাখ লোক মারলাম ঠিকই কিন্তুক আমাগো সোলজারগো খবর পাইতাছি না কেন? হেরা গেলো কই?...

হেরপর বুঝতেই পারতাছেন? টিক্কা সাবে রাওয়ালপিন্ডিতে খবর পাডাইছেন। কয়েক হপ্তার মাইদ্দে অবস্থা খুবই খতরনাক্ হইয়া উঠছে। সবকিছু কেমন জানি গোলমাল মনে হইতাছে। তাই, হে আব্বাজান, আপনারে ২৬শে জুলাই থাইক্যা ২৯শে জুলাই পর্যন্ত বংগাল মুলুকে সফরের জন্য যে দাওয়াত দিছিলাম তা' অখন 'ক্যানছেল' করতাছি। এই রিপোর্ট পাওনের লগে লগে আরও দুই ডিভিশন সোলজার পালাইবেন। এছাড়া কিছু মালপানি না হইলে কেইস খুব খারাপ হইবো। এই খবরগুলো আবার লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ কাগজে ছাপাইছে। ...সেনাপতি ইয়াহিয়া কত আশায় বুক বাঁধছিলো। টিক্কা-নিয়াজী সবকিছু কনট্রোল কইর‍্যা ফালাইছে। এইদিকে মিলিটারি-ডেমক্রেসির খসড়া শাসনতন্ত্র তৈরি হইছে। কিন্তুক টিক্কার কাছ থনে এইডা কী রিপোর্ট আইলো? রিপোর্টার ভিতরে ঘুটা মাইর‍্যা ইয়াহিয়া সাবের নাকের ডগার চশমাডা বহাইলো। রিপোর্টকা অন্দরমে লিখ্‌লিখ্‌ পশ্চিম পাকিস্তানি সোলজাররা অহন সিলেট, কুমিল্লা, রংপুর আর যশোর বর্ডার থনে পাউচ্ছাইতে শুরু করছে। ঢাকা-কুমিল্লা-চিটাগাং রাস্তায় যাতায়াত করা তো দূরের কথা; অনেক জায়গায় টেলিগ্রাফের তারভি ঠিক করণ যায় নাই। গেলো এক মাসের মাইদ্দে এই এলাকায় গেরিলারা নব্বইটা কামিয়াবী হামলা করণের গতিকে পরায় সাতশ' সোলজারের হয় মউত হইছে– না হয় জখমি হইছে।

এর লগে বংগাল মুলুকে আবার সয়লাব মানে কিনা বন্যার পানি গল্ গল্ কইর‍্যা আইতাছে। তাই রাওয়ালপিন্ডির থনে যেসব ম্যাপ পাডানো হইছে, তার লগে রাস্তাঘাটের কোনই মিল পাইতাছি না। বংগাল মুলুকে সয়লাবের পানি কোন দিশা পাই না। কোথাও দুই-তিন ফুট আবার কোথাও বিশ-তিরিশ ফুট। গেরামের দিকে যাও দু'-চাইরটা রাস্তা আছে, হগলডি মাইন-এ ভরা। ব্রিজগুলো গায়েব।

এর মাইদ্দে বিচ্চুগুলা আবার আমাগো জোয়ানগো কাছ থনে বহু চীনা আর মার্কিনি অস্ত্রপাতি দখল করছে। ঐসব চিন্তা কইরা বর্ডার এলাকা থনে সোলজার সরাইতে শুরু করছি। অবশ্যি সরানোর অর্ডার যাওনের আগেই আমাগো বহুত সোলজার ধাওয়া খাইয়া ভাইগ্যা আইতাছে। এইসব সোলজাররা বিচ্চুগো ধাওয়ানিতে এতোই ডরাইছে যে, দেশে ফেরত যাওনের লাইগ্যা অক্কারে পাগ্‌লা হইয়া উঠছে। এলায় যশোর-কুষ্টিয়া এলাকার রিপোর্ট দিতাছি। হেইখানে আমাগো সমস্ত সাপ্লাই লাইন দুষ্কৃতিকারীরা অক্করে

ছেড়াবেড়া কইর‍্যা ফেলাইছে। অহন হেইখানে আমাগো যেসব জোয়ান আটকা পড়ছে, তাগো সাপ্লাইয়ের কথা চিন্তা কইর‍্যা জেনারেল নিয়াজী মাথার চুল ছিঁড়তাছে। এক আধদিনের মাইদ্দে সাপ্লাই-এর ব্যবস্থা না করলে একটা কেলেংকারিয়াস ব্যাপার হইয়্যা যাইবো। ইদানীং দুশমুন সৈন্যগো নম্বর খুবই বাইড়া গেছে আর আমাগো নম্বর তুরন্দ কইম্যা যাইতাছে। নর্দার্ন রিজিয়নের রংপুর-দিনাজপুর সেক্টরের খবর খুবই দেরিতে পাইতাছি। এর মাইদ্দে আবার আমাগো বহু এই দেশী 'সাপোর্টার' গা হেরা কতল করণের গতিকে কাজকামে খুবই অসুবিধা হইতাছে। এছাড়া পেরত্যাক দিনই আমাগো দিক্কার ব্যবসায়ীরা করাচিতে ভাগতাছে। সান্দ্যার লগে লগে ঢাকা টাউনের মাইদ্দেই খালি বোমাবাজি শুরু হয়। হেইদিন কমলাপুর রেল স্টেশনেই এইরকম একটা কারবার হইছে। যাত্রাবাড়ী ব্রিজ ভাংগছে। রাইতে বোমা আর গুলির আওয়াজ না হইলে বলে বাঙালিগো ঠিক মতন ঘুম হয় না। এইগুলা মানুষ না আর কিছু।

এই রিপোর্ট পাওনের পর আপনারা আন্দাজ করতে পারেন সেনাপতি ইয়াহিয়ার কী রকম ধেড়া ধেড়া অবস্থা হইতে পারে। হের মোটা আর কাঁচা-পাকা ভ্রূগুলো কুঁচকাইয়া উঠলো। হেতনে একটা ট্রিকস্ করলো। হেই সময় কানাডার একটা পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি দল ইসলামাবাদে সফর করণের লাইগ্যা গেছিলো। সেনাপতি ইয়াহিয়া লজ্জা-শরমের মাথা খাইয়া খু-ব-ই অস্তে হেই মেম্বারগো কানে কানে কইয়্যা ফেলাইলো "ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর লগে যে কোন টাইমে যে কোন জায়গায় মোলাকাত করতে পারি।" মনে লয় এই ট্রিকসটা কেহই বুঝতে পারলো না। কেইসটা হইতাছে বাংলাদেশ আর ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের মাইদ্দে ফাটাফাটির কেইস। হেইখানে সাবে আলাপ করতে চায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর লগে। কেমন বুঝতাছেন! হেতনের হইছে ম্যালেরিয়া বীমারি আর দাওয়াই খাইতে চান আমাশয়ের।

খালি কলসের আওয়াজ বেশি ঠং ঠং কইর‍্যা আওয়াজ হইলো। বাংলাদেশের কেদোর মাইদ্দে আড়াই ডিভিশন সোলজার নষ্ট করণের পর ইয়াহিয়া সাব এলায় আত্‌কা ইন্ডিয়ার লগে যুদ্ধ করমু কইয়া ধমক দেখাইছেন। বেডা এক খান। হেতনে কইছে ইন্ডিয়া যদি বাংলাদেশের কোন এলাকার দখলি লইতে চায়, তয় যুদ্ধ ঘোষণা কইর‍্যা দিমু। হগল দুনিয়ারে কইয়া দিতাছি, আমি ইন্ডিয়ার লগে যুদ্ধ করমু। আর আমি একলা নাইক্যা আমার লগে মামু আছে। আমার চাচা রইছে।

কেমন বুঝতাছেন! হেতনে জ্ঞান-পাগল হইছে। যাঁরা বংগাল মুলুক থনে ইয়াহিয়া সা'বের সোলজারগো খেদাইয়া, পিটাইয়া, মাইর‍্যা আর ধাওয়াইয়া একটার পর একটা এলাকা মুক্ত করতাছে, মওলবী সা'বে কিন্তু পরায় চাইর মাস ধইর‍্যা তাগো লগে যুদ্ধ করতাছে। দুনিয়ার হগল মাইনষে মুক্তি ফৌজের বিচ্চুগুলোর এই কেচ্‌কা মাইর দেখতাছে। আর অহন সদর ইয়াহিয়া টিরিক্‌স কইর‍্যা একবার কয় ইন্ডিয়ার লগে আলাপ করমু– আর একবার কয় ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করমু। কীর লাগগ্যা এইসব উল্ডা-পালডা কথাবার্তা? ভাসুরের নাম মুখে লইতে বুঝি শরম করে?

হেইর লাইগ্যা কইছিলাম। যা ভাবছিলাম তাই-ই হইছে।"

১৫

একাত্তরের জুলাই মাসের কথা। বালু হক্কাক লেনে 'জয় বাংলা' পত্রিকা অফিসে আরও কয়েকজন বুদ্ধিজীবী আমাদের নিয়মিত আড্ডায় হাজিরা দিতে শুরু করলেন। এঁদের মধ্যে এ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান (পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ সম্পাদক), এ্যাডভোকেট গাজীউল হক, ডক্টর ই জি সামাদ (ফরাসি ভাষায় অভিজ্ঞ), শিল্পী

কামরুল হাসান, আন্তর্জাতিক সাঁতারু ব্রজেন দাশ, চিত্র প্রযোজক আব্দুল জব্বার, সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ, অধ্যাপক বদরুল হাসান (বর্তমানে মানসিকভাবে অসুস্থ) প্রমুখ অন্যতম। এমন সময় আমরা খবর পেলাম যে, মার্কিনি আশীর্বাদপুষ্ট একটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের দুস্থ বুদ্ধিজীবীদের নগদ অর্থ সাহায্য দিচ্ছে। বেসরকারিভাবে তালিকা প্রস্তুত করে এই অর্থ সাহায্য দেয়ার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানটির কর্তৃপক্ষ কোন কার্পণ্য করছে না। মুজিবনগর সরকার এ ব্যাপারে কোন তদন্ত শুরু করার আগেই টাকা দেয়ার পর্ব শেষ হয়ে গেছে। যতদূর মনে পড়ে দুস্থ বুদ্ধিজীবীদের তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও একমাত্র চিরকুমার সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ ছাড়া আর কেউই সরাসরি দান হিসাবে নগদ টাকা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাননি।

পুরো ব্যাপারটা জানার পর মান্নান ভাই ভ্রূ কুঁচকিয়ে একটা ক্যাপস্টান সিগারেটে জোরে টান দিয়ে বললেন, 'কারবারটা তো খুব গেন্‌জাম মনে হইতাছে?' এর আগে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে মান্নান ভাইয়ের অনুপস্থিতির সুযোগে খন্দকার মোশতাকের সমর্থক দু'জন পরিষদ সদস্য স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের জনাকয়েক কর্মী নিয়ে বেতারকেন্দ্রে সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনার নামে গোটা দুয়েক বৈঠক করেছেন। এই দুইজন পরিষদ সদস্য তখন বেতারকেন্দ্রের স্টুডিওতেই অবস্থান করতেন। সীমান্ত এলাকা সফর শেষে মান্নান ভাই ফিরে এসেই এঁদের দু'জনকে বিনীতভাবে বেতারের স্টুডিও ভবন পরিত্যাগ করার অনুরোধ করলে এঁরা পার্ক সার্কাসে বাংলাদেশ হাইকমিশনে থাকার ব্যবস্থা করেন। পরে জেনেছিলাম, এঁরা দু'নম্বর সেক্টরে থাকাকালীন সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ এঁদের কার্যকলাপ পছন্দ না করায় এঁরা মুজিবনগরে চলে আসেন।

দিন কয়েক পরে আরও একটা খবরে আমরা বেশ বিব্রত হয়ে উঠলাম। একটা ব্রিটিশ সাহায্য সংস্থার সক্রিয় সহযোগিতায় বাংলাদেশের জনাকয়েক শিক্ষিত ছেলেমেয়েকে বেতারের অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসাবে নিয়োগ করে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। আমরা মুজিবনগর সরকারের মাধ্যমে এই ব্যাপারে পুরো রিপোর্ট সংগ্রহ করলাম। উদ্দেশ্য স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের অনুপ্রবেশ করা। এই কেন্দ্র থেকে তখনও পর্যন্ত বাচ্চাদের জন্য কোন অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় না। তাই এই ব্রিটিশ সাহায্য সংস্থা একটি নির্দিষ্ট সময়ে বাচ্চাদের অনুষ্ঠান প্রচারে আগ্রহী। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের কল্যাণের জন্য মোটা অংকের চাঁদা দিতে প্রস্তুত। এই ব্রিটিশ সাহায্য সংস্থার স্বেচ্ছাসেবকরা এর মধ্যেই অধিকৃত এলাকায় বেশ কয়েক দফায় নিগৃহীত হয়েছেন। উপরন্তু উদ্বাস্তু শিবিরগুলোতেও সাহায্য করছে। তাই আনুষ্ঠানিকভাবে বেতারে বাচ্চাদের জন্য অনুষ্ঠান প্রচারের প্রস্তাব করলে তো সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা মুশকিল হবে।

মান্নান সাহেব আমাদের জনাকয়েককে নিয়ে বৈঠক করলেন। সিদ্ধান্ত হলো যে, পরদিন থেকে আমরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে বেতারকেন্দ্র থেকে বাচ্চাদের জন্য একটা অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করবো। যাতে সেই ব্রিটিশ সাহায্য সংস্থা প্রস্তাব করলে আমরা বলতে পারি যে, স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে নিয়মিতভাবে ছেলেমেয়েদের জন্য অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে। এই অনুষ্ঠান পরিকল্পনা, গ্রন্থনা, পরিচালনা সব কিছু আমার ওপর ন্যস্ত হলো। বাচ্চাদের জন্য সপ্তাহে দুই দিন এই অনুষ্ঠানের নামকরণ করলাম 'ওরা রক্তবীজ'। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে আমার সবধর্মিনি মাহমুদা খানম আর আমার দুই কন্যা কবিতা ও সঙ্গীতা। এছাড়া আরও কয়েকটা ছেলেমেয়ে সংগ্রহ করলাম। স্বাধীন

বাংলা বেতারকেন্দ্রের কেউই বুঝতে পারলো না যে, এত তাড়াহুড়া করে কেন বাচ্চাদের জন্য এ অনুষ্ঠান শুরু হলো। মুজিবনগর সরকারের তথ্য ও প্রচার বিভাগের পরিচালক হিসাবে সারাদিন কাজকর্মের পর প্রতি রাতে 'চরমপত্রে'র স্ক্রিপ্ট লেখা ছাড়াও আবার বাচ্চাদের জন্য 'ওরা রক্তবীজ' অনুষ্ঠানের স্ক্রিপ্ট লিখতে গিয়ে আমার প্রাণান্তকর অবস্থা হলো। সপ্তাহে ২/৩ দিন আমাকে প্রায় সারা রাত ধরে লিখতে হতো।

'রক্তবীজ' অনুষ্ঠান শুরু করার হপ্তাখানেক পরে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন সাহেবের কাছ থেকে খবর এলো, মান্নান সাহেবকে দেখা করার জন্য। মান্নান ভাই আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনার পর মান্নান ভাই বললেন, 'হেগো কইয়া দিয়েন, আমাগো রেডিও থাইক্যা পোলাপানগো প্রোগ্রাম রেগুলার হইতাছে।' জবাব শুনে প্রধানমন্ত্রী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

মাত্র দু'তিন সপ্তাহ চালু রাখার পর আমরা ছেলেমেয়ের জন্য এই বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ করে দেই। কেননা যে উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠান চালু করা হয়েছিলো তা সফল হয়েছে। এর পরবর্তী কয়েকটা ব্যাপার আমাদের আরও বিচলিত করে তুললো। একাত্তরের আগস্ট মাসে একদিন স্টুডিওতে গিয়ে শুনলাম অন্যান্য অনুষ্ঠান তো দূরের কথা 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান আর রেকর্ডিং হবে না। কারণ বেতারকর্মীরা চরম বামপন্থীদের 'প্রচেষ্টায়' ধর্মঘট করেছে। একমাত্র তিনটি ভাষায় সংবাদ প্রচার ছাড়া 'দাবি' না মানা পর্যন্ত বেতারে আর কোন অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে না। এরকম সিদ্ধান্তের কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলাম। যেখানে লাখ লাখ মুক্তিযোদ্ধা নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ করে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে আর কোটি কোটি মানব সন্তান মৃত্যুগুহায় এক ভয়াবহ জীবনযাপন করছে, সেখানে সবার মনোবলের রক্ষাকারী স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে সামান্য ক'টা দাবির জন্য শুরু হয়েছে ধর্মঘট। নিজের মনকে আর প্রবোধ দিতে পারলাম না। দৌড়ালাম বালু হক্কাক লেনে মান্নান ভাইয়ের কাছে। এখন উপায়?

এ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান, এ্যাডভোকেট গাজীউল হক আর আমি এই তিনজনে মিলে মান্নান ভাইকে বুঝালাম ওদের 'দাবি' মেনে নেয়ার জন্য। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এটা করতেই হবে। মহল বিশেষের চক্রান্তের মোকাবেলায় আর কোন পথ আমাদের জন্য খোলা নেই। তবুও দিন তিনেক পর্যন্ত এই ধর্মঘট অব্যাহত ছিলো। ধর্মঘটের পর বেতারকেন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান চালু হলে 'চরমপত্রের' স্ক্রিপ্টে লিখলাম, "দিনা কতক আছিলাম না। বিচ্চুগো কারবার দেখতে গেছিলাম। এর মাইদ্দেই ঠেটা মালেক্যায় একটা চানসিং করছুইন। বেডায় 'রেডিয়ো গায়েবী আওয়াজ' থাইক্যা একটা লেকচার দিয়া বইছে। বেডা একখান। সাবে কইছে, কিসের ভাই, আহ্লাদের আর সীমা নাই।"

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে এই আকস্মিক তিনদিনের ধর্মঘটের ফলে মুজিবনগর সরকার খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লো। যদিও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন এবং আব্দুল মান্নান এম এন এ তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছিলেন; তবুও একজন তথ্য সচিবের প্রয়োজন দেখা দিলো। এরই ফল হিসাবে লন্ডনে যোগাযোগ স্থাপন করে আনোয়ারুল হক খানকে নতুন তথ্য সচিব নিয়োগ করা হয়। ইতিমধ্যে তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় চারটা দফতরের সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমত, বেতার দফতর; দ্বিতীয়ত, শিল্পী কামরুল হাসানের অধীনে আর্ট ও ডিজাইন দফতর, তৃতীয়ত, চিত্র প্রযোজক আব্দুল জব্বারের অধীনে চলচ্চিত্র দফতর আর চতুর্থত, এম

আর আখতার মুকুলের পরিচালনায় তথ্য ও প্রচার বিভাগ। অত্যন্ত দ্রুত তথ্য ও প্রচার দফতর সম্প্রসারিত হলো।

ওয়াশিংটনে সর্বজনাব এনায়েত করিম, এ এম এ মুহিত, এ এস এম কিবরিয়া, এস আর করিম, এ মাহমুদ আলী প্রমুখ, লন্ডনে মহিউদ্দিন চৌধুরী, হংকংয়ে মহিদ্দীন আহমেদ আর টোকিওতে ডিফেক্ট করা কূটনীতিবিদ মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে নিয়মিতভাবে যুদ্ধের খবরাখবর ও নিউজ ফটোগ্রাফ পাঠানো শুরু হলো। এছাড়াও তথ্য ও প্রচার দফতরের বিশেষভাবে ইংরেজিতে প্রকাশিত বই-পুস্তক, পোস্টার ফোল্ডার ও নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা বিভিন্ন দেশে আমাদের প্রতিনিধিদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হলো। ফলে আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকা ও রেডিও-টেলিভিশন মারফত আমাদের সপক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে উঠলো। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সামাদের সহযোগিতায় তথ্য ও প্রচার দফতর থেকে আমরা ফরাসি ভাষায় একটা রঙিন ফোল্ডার প্রকাশ করলাম। অন্যদিকে রণাংগন থেকে সরাসরি যুদ্ধের খবর পাবার জন্য এগারোটা সেক্টরের অনেক ক'টাতেই বিশেষ সংবাদদাতা পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম। এদের মধ্যে অধ্যাপক আব্দুল হাফিজ, আব্দুল্লাহ আল ফারুক, চট্টগ্রামের আবুল মঞ্জুর প্রমুখ অন্যতম। প্রতিরক্ষা সচিব আব্দুস সামাদের সহযোগিতায় প্রত্যেক সমর সংবাদদাতাকে একটা করে টেপরেকর্ডার দিয়ে রণাঙ্গনে পাঠানো হলো। এঁদের পাঠানো সংবাদ পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংবাদ বুলেটিনে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

এরই পাশাপাশি বেসামরিক প্রশাসনের সুবিধার জন্য বাংলাদেশকে যে দশটা জোনে ভাগ করা হয়েছিল, তার প্রতিটা জোনে তথ্য ও প্রচার দফতরের প্রকাশিত বই, পুস্তক, ফোল্ডার, পোস্টার, প্রচারপত্র ইত্যাদি বিতরণের জন্য অফিসার নিয়োগ করা হলো। এইসব অফিসার মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প ছাড়াও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হাটে-বাজারে প্রচারপত্র ও বই-পুস্তকগুলো দেদার বিতরণ শুরু করলো। আগস্ট মাসের শেষ দিকে আমরা লক্ষ্য করলাম যে, সীমান্তবর্তী এলাকায় সন্ধ্যার পর শত্রু সৈন্যরা তাদের বাংকার ও ক্যাম্প থেকে বেরুনো একরকম বন্ধ করে দিয়েছে। এর ফল হিসাবে আমাদের প্রকাশিত প্রচারপত্রগুলো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পৌঁছানোর সুবিধা হলো। এই সময় ফরিদপুর-বরিশাল অঞ্চলে পর্যন্ত রাস্তার পাশে প্রকাশ্য স্থানে বিশিষ্ট শিল্পী কামরুল হাসানের অংকিত সাড়া জাগানো পোস্টার 'এই জানোয়ারকে হত্যা করতে হবে' শোভাবর্ধন করতে দেখা গেছে।

আগস্ট মাসের শেষের দিকে একটা খবরে আমরা বেশ বিব্রত বোধ করলাম। দখলদার বাহিনী যত্রতত্র শহর ও গ্রামাঞ্চলে প্রায় সবার কাছ থেকে পরিচয়পত্র দাবি করছে। কেউ পরিচয়পত্র দেখাতে না পারলে তাঁকে মুক্তিবাহিনীর লোক হিসাবে সন্দেহ করে গ্রেফতার করছে। এর মোকাবেলায় দিন কয়েকের মধ্যেই নমুনা হিসাবে কয়েকটা 'আইডেনডিটি কার্ড' সংগ্রহ করে অফসেট পদ্ধতিতে প্রথম দফায় পাঁচ লাখ নকল 'কার্ড' ছাপাবার ব্যবস্থা করলাম। এরপর জোনাল অফিসের মাধ্যমে সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এসব হুবহু নকল কার্ড বিতরণ শুরু হলে নিরীহ গ্রামবাসী অযথা হয়রানির হাত থেকে রক্ষা পেলো।

যাঁর সক্রিয় সহযোগিতায় এইসব নকল 'আইডেনটিটি কার্ড' মাত্র দিন কয়েকের মধ্যে ছাপানো সম্ভব হয়েছিল তাঁর কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভদ্রলোকের আদি বাড়ি মুন্সীগঞ্জে। বিভাগপূর্ব যুগে তিনি কোলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশুনা করতেন।

পরে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অংকশাস্ত্রে মাস্টার ডিগ্রি লাভ করে 'র‍্যাডিয়েন্ট প্রসেস' নামে কোলকাতায় একটা প্রেস চালু করেন। বাংলাদেশের প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক আলমগীর কবীরের মাধ্যমে এই ভদ্রলোকের সংগে আমার প্রথম পরিচয়। নাম নিরোদ বরণ মুখার্জী। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিবনগর সরকারের সমস্ত প্রোপাগাণ্ডামূলক বই-পুস্তক, পোস্টার, প্রচারপত্র, ফোল্ডার, এমনকি নকল আইডেনটিটি কার্ড এই 'র‍্যাডিয়েন্ট প্রসেস' প্রেস থেকে ছাপানো হয়েছিল।

কি আশ্চর্য, মি. মুখার্জী বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার এতোগুলো বছরের মধ্যে একবারও বাংলাদেশে আসেননি কিংবা বাংলাদেশ দেখার আগ্রহ পর্যন্ত প্রকাশ করেননি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায়ই তিনি বলতেন, 'আপনাদের সহযোগিতা করতে পারছি, এটাই আমার সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা। দূর থেকে দেখবো আমার জন্মভূমিও সার্বভৌম ও স্বাধীন।'

১৬

নির্বাসিত মুজিবনগর কবে, কোথায় এবং কিভাবে গঠিত হয়েছিল; চট্ করে এর জবাব দেয়া মুশকিল। কেননা এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। তাই সংক্ষেপে হলেও এখানে তৎকালীন রাজনীতির পূর্ণ ইতিহাস উল্লেখ করা প্রাসংগিক হবে। সুদীর্ঘ প্রায় দেড় যুগ পর পুরনো পত্র-পত্রিকা আর প্রাপ্ত নথি ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব প্রদত্ত ছ'দফা ঘোষণার পর থেকেই সমগ্র পাকিস্তানে বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় রাজনীতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। ষাট দশকের গোড়ার দিকে, আইয়ুব খানের বিরোধিতায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যেখানে খাজা নাজিমউদ্দীন, নূরুল আমিন, ফাতেমা জিন্নাহ থেকে শুরু করে সালাম খান, শেখ মুজিব এমন কি অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমদ পর্যন্ত ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের ছত্রছায়ায় মোর্চা করেছিল, সেখানে মাত্র কয়েক বছর পর ১৯৬৬ সালে ছ'দফা ঘোষণার পর, পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্ব দ্রুত শেখ মুজিবের হাতে কেন্দ্রীভূত হতে শুরু করলো। ছ'দফার আঞ্চলিক স্লোগানের মোকাবেলায় দক্ষিণপন্থীদের বিরোধিতা আর মার্কসীয় দলগুলোর উন্নাসিকতা সবকিছুই নস্যাৎ হয়ে গেলো। দক্ষিণ ও বামপন্থী নেতৃবৃন্দ সবার অলক্ষ্যে ছ'দফার উগ্র জাতীয়তাবাদী দাবির মুখে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। এমন এক অবস্থায় আইয়ুব খান বললেন, অস্ত্রের ভাষায় ছ'দফার জবাব দেয়া হবে। শেখ মুজিব কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলে তাঁর জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পেলো। শুরু হলো তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। পুরো ব্যাপারটাই আইয়ুব সরকারের প্রতি বুমেরাং হলো। ঢাকায় প্রকাশ্য রাজপথে ২০শে জানুয়ারি ছাত্রনেতা আসাদকে হত্যা করা হলো। ১৯৬৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালীন অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক নিহত হলো। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ১৮ই ফেব্রুয়ারি সামরিক বাহিনীর সংগে ছাত্রদের সংঘর্ষে অধ্যাপক শামস্ উজ জোহা শাহাদাৎ বরণ করলেন। জনতার আক্রোশ ভয়াবহ আকার ধারণ করলো। ঢাকায় লাখো লাখো মানুষের মিছিল সান্ধ্য আইন অগ্রাহ্য করে সামরিক বাহিনীর সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। ভস্মীভূত হলো দৈনিক পাকিস্তান (বর্তমান দৈনিক বাংলা ও সাপ্তাহিক বিচিত্রা ও মর্নিং নিউজ (বর্তমানে টাইমস) পত্রিকা অফিস। আব্দুল গণি রোডে মন্ত্রীদের বাসভবন ছাড়াও রমনা গেটে আরও কয়েকটা সরকারি বাসভবন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। ঢাকায় যত্রতত্র তখন আগুনের লেলিহান শিখা আর লাশ নিয়ে মিছিল। ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে সংগঠিত আন্দোলনের প্রচণ্ড দাবির মুখে ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেন এবং সামরিক হেফাজত থেকে শেখ মুজিবসহ সবাই মুক্ত হলেন। আমি তখন মার্কিনি সংবাদ সংস্থা ইউপিআই-এর ঢাকাস্থ সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করছিলাম। পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করলাম, এতদিন পর্যন্ত আয়ুববিরোধী যে সর্বদলীয় আন্দোলন মোটামুটিভাবে প্রগতিশীল নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছিলো, তা 'সোনার থালায়' শেখ মুজিবের হাতে তুলে দিয়ে মধ্যবিত্ত মার্কসীয় নেতৃবৃন্দ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। মনে হলো, অধীর আগ্রহে এঁরা যেনো শেখের মুক্তির এই দিনটির জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন।

তেইশে ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতাদানকালে শেখ সাহেব রাওয়ালপিন্ডিতে আহৃত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের কথা ঘোষণা করলেন। অথচ মওলানা ভাসানী, জুলফিকার আলী ভুট্টো এই বৈঠক 'বয়কটের' আহ্বান জানিয়েছেন। এঁরা ভেবেছিলেন এঁদের সঙ্গে শেখ মুজিবও বৈঠক বয়কট করবেন। তাহলে টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হতে বাধ্য এবং আইয়ুব খানের পদত্যাগ ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। কিন্তু শেখের 'স্ট্রাটেজি' হচ্ছে বৈঠকে যোগদান করে ছ'দফার দাবি উত্থাপন করে অটল ও অবিচল থাকবেন। ফলে বৈঠক স্বাভাবিকভাবেই ব্যর্থ হবে। এতে আইয়ুব খানকেই বৈঠকের ব্যর্থতার কথা ঘোষণা করে পদত্যাগ করতে হবে। ফলে ছ'দফার জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পাবে।

এরকম এক পরিস্থিতিতে শেখ মুজিব রেসকোর্স ময়দানে রাওয়ালপিন্ডিতে আসন্ন গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের কথা ঘোষণা করে সেখান থেকেই তাঁর এককালীন রাজনৈতিক গুরু মওলানা ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রওয়ানা হলেন। এই সাক্ষাতের কর্মসূচি সাংবাদিকদের মধ্যে শুধুমাত্র ফয়েজ আহমেদ ও আমার জানা ছিল। আমরা দু'জন আগে থেকে মরহুম সাইদুল হাসানের বাসায় অপেক্ষা করছি। আমাদের কৌতূহল যে, এতদিন পরে ভাসানী-মুজিবের সাক্ষাৎকারটা কেমন হয়।

মওলানা সাহেব তখন মরহুম সাইদুল হাসানের বাসায় অবস্থান করছিলেন। ন্যাপ ভাসানীর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক কমরেড তোয়াহাসহ আরও কয়েকজন নেতৃবৃন্দ সেখানে রয়েছেন। সন্ধ্যার পরেই একটা সাদা রঙের টয়োটা গাড়িতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এসে হাজির হলেন। হাতের তালু থেকে খইনীটুকু ঠোঁটের মধ্যে ঢুকিয়ে মওলানা উঠে দাঁড়িয়ে শেখকে জড়িয়ে ধরলেন। অশ্রুসজল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন। 'মুজিবর মিয়া কেমন আছো?' জবাব এলো, 'হুজুর, আপনাদের দোয়া আর আল্লার আশীর্বাদে বাঁইচ্যা বাইরাইলাম।'

এরপর মওলানা সাহেব আমাদের বাইরে যেতে বলে দরজা বন্ধ করে শেখের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। আমরা বাইরে থেকে তাঁদের গলার আওয়াজ শুনতে লাগলাম। মিনিট দশেক পরে দরজা খোলা হলে আমরা সবাই ভিতরে গিয়ে বসলাম। দু'জনের কথোপকথন তখনও অব্যাহত রয়েছে।

মওলানা : মুজিবর মিয়া আমি কইতাছি, তুমি যাইয়ো না পিন্ডিতে।

মুজিব : হুজুর, আমি তো' কথা দিছি। তাই আমাকে যেতেই হবে।

মওলানা : আমি আর ভুট্টো তো যামু না। তুমি না গেলে বৈঠক শেষ।

মুজিব : আমি গেলেও বৈঠক শেষ। আপনে তো আমারে চেনেন?

মওলানা : আইয়ুব তো এখন মরা লাশ। বৈঠকে যাইয়া আর লাভ আছে?

মুজিব : আমিও জানি হেইডা এখন মরা লাশ। কিন্তু জানাজা পড়তে দোষটা কি?

মাওলানা : মুজিবর মিয়া, তুমি যাইয়ো না পিন্ডিতে।

মুজিব : হুজুর, দোয়া রাইখেইন। পিন্ডিতেও যামু– বৈঠকও ভাংগমু।

এরপরের ঘটনাবলী সংক্ষেপে বলতে গেলে আইয়ুবের পদত্যাগ, ইয়াহিয়ার ক্ষমতা গ্রহণ, পূর্ব বাংলায় প্রলয়ংকরি ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় দশ লাখ লোকের মৃত্যু এবং একজন বুদ্ধিদীপ্ত, বিশাল ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয় নেতা হিসাবে মধ্যগগনে জ্বলন্ত সূর্যের মতো শেখ মুজিবের অভ্যুদয়।

সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা প্রদর্শনে সক্ষম হন। প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদে মোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে পূর্ব বাংলার জন্য বরাদ্দকৃত ১৬৯টি আসন। আওয়ামী লীগের উগ্র জাতীয়তাবাদী শ্লোগানের মুখে সবাইকে হতবাক করে দক্ষিণ ও বামপন্থী দলগুলো শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো। সুদীর্ঘ ২৩ বছর রাজনীতির পর ধর্মীয় ও মার্কসীয় দলগুলো একটা আসনও লাভ করতে পারলো না। পিডিপির টিকেটে নূরুল আমিন এবং একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী ছাড়া বাকি ১৬৭টি আসন আওয়ামী লীগ দখল করে প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হলো। সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে নির্বাচন সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন করতে পারলো না। অন্যদিকে 'রোটি, কাপড়া আওর মোকান'-এর শ্লোগান দিয়ে আইয়ুব খানের পদচ্যুত পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে নবগঠিত পিপলস্ পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে ১৪৪টি আসনের ৮৮টি দখল করে ক্ষমতার অংশ দাবি করে বসলো। (২০/১২/৭০ তারিখে লাহোরে প্রদত্ত জুলফিকার আলী ভুট্টোর বিবৃতি)। এদিকে শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন, আওয়ামী লীগ ছয় দফা দাবির বাস্তবায়নের ওয়াদা করে নির্বাচনে জয়লাভ করেছে বিধায় এই ছয় দফার ভিত্তিতেই প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র প্রণীত হবে। ভুট্টো সাহেব জবাবে বললেন, নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদ এখন একটা 'কসাইখানায়' পরিণত হয়েছে। শুধুমাত্র ছয় দফাভিত্তিক একটা সংবিধানে দস্তখত করার জন্য পিপলস্ পার্টির সদস্যরা ঢাকায় আসন্ন পরিষদ অধিবেশনে যোগদান করতে পারে না। পরিষদের বাইরে এ ব্যাপারে আগেই একটা ফয়সালা হওয়া দরকার।

১৯৭১ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি এক সরকারি ঘোষণায় বলা হলো যে, প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান আগামী ৩রা মার্চ সকাল ন'টায় ঢাকায় প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেছেন। কিন্তু জুলফিকার আলী ভুট্টো পরিষ্কার ভাষায় বললেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর দল কিছুতেই ঢাকায় আহূত পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে পারে না। শুধু তাই-ই নয়। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নির্বাচিত প্রতিনিধিরা (৫৬ জন) অধিবেশনে যোগদানের জন্য ঢাকায় গেলে 'তাঁদের আর দেশে ফিরতে দেয়া হবে না'। ভুট্টো আরও ঘোষণা করলেন যে, পিপলস্ পার্টি পরিষদের বিরোধীদলীয় আসনে বসার জন্য নির্বাচন করেনি। পিপলস্ পার্টিকে ক্ষমতার অংশ দিতেই হবে আর পরিষদের বাইরে প্রস্তাবিত সংবিধান সম্পর্কে পিপলস্ পার্টির সংগে আওয়ামী লীগকে সমঝোতা করতে হবে। অন্যথায় ৩রা মার্চ পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত 'রক্ত গঙ্গা প্রবাহিত হবে'।

জবাবে শেখ মুজিব ১৯৭১ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এক সমাবেশে বললেন, 'আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া শ্রেয় মনে করবো, তবুও কোন অবস্থাতেও আত্মসমর্পণ করবো না। গণতন্ত্রকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেই হবে।'

সমগ্র পাকিস্তানে তখন রাজনৈতিক উত্তপ্ত পরিবেশ। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আকস্মিকভাবে পহেলা মার্চ তারিখে আর এক ঘোষণায় অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের আসন্ন অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলেন। রেডিওতে ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার ঘন্টা খানিকের মধ্যে ঢাকায় স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হলো। স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছু বন্ধ হয়ে ঢাকার রাজপথে বেরুলো অসংখ্য খণ্ড মিছিল। অত্যন্ত দ্রুত পরিস্থিতির অবনতি ঘটলো।

মতিঝিলের হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি বৈঠক শেষে ক্ষুব্ধ শেখ মুজিব উপস্থিত সাংবাদিকদের বললেন, 'একটা সংখ্যালঘিষ্ঠ পার্টির আব্দার ও জেদের ফলে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি হতে চলেছে। এরই ফলে অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষিত হয়েছে। জনসাধারণের সংখ্যাগুরু অংশের প্রতিনিধি হিসাবে আমরা এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করবোই।' পরিস্থিতি সম্পর্কে ইতিমধ্যেই মওলানা ভাসানী, নুরুল আমিন, আতাউর রহমান খান, অধ্যাপক মোজফ্ফর আহমদসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সংগে যোগাযোগের উল্লেখ করে শেখ মুজিব আরও বলেন, "আগামী ৭ই মার্চ সমগ্র পূর্ব বাংলায় প্রত্যেকদিন বেলা দুটো পর্যন্ত হরতাল অব্যাহত থাকবে। আর এর মধ্যে ষড়যন্ত্রকারীরা যদি বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ৭ই মার্চ নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হবে। ওইদিন রেসকোর্স ময়দানে আহূত জনসভায় আমি চূড়ান্ত কর্মসূচি ঘোষণা করবো।"

পহেলা মার্চ থেকেই সমগ্র পূর্ব বাংলার চেহারাই পাল্টে গেলো। বিভিন্ন জায়গায় সামরিক বাহিনীর সঙ্গে ছাত্র-জনতার খণ্ড মিছিলের সংঘর্ষে রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের অংগ দল পূর্ববংগ ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে তেশরা জানুয়ারি পল্টন ময়দানে এক বিরাট জনসভার আয়োজন করা হলো। নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে এবং শেখ মুজিবের উপস্থিতিতে এই জনসভায় সর্বপ্রথম উত্তোলিত হলো বাংলাদেশের মানচিত্র অংকিত রক্তবলয় খচিত এক নতুন জাতীয় পতাকা। বাংলাদেশের এই জাতীয় পতাকা বহন করে পরবর্তীকালে গঠিত হয়েছিল মুজিবনগর সরকার। আর এই জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষার জন্য আত্মাহুতি দিয়েছিল হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এই পতাকার সংশোধন করা হয়। আর স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল পতাকাকে সযত্নে ঢাকা মিউজিয়ামে রেখে দেয়া হয়েছে। ছাত্রলীগের উক্ত জনসভাতেই বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবেশিত হয়। এই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে তৎকালীন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শাহজাহান সিরাজ এবং তৎকালীন 'ডাকসু' সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস মাখন বক্তৃতা করেন। তিরিশ মিনিটকাল স্থায়ী বক্তৃতায় অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে শেখ মুজিব দলমতনির্বিশেষে সকল বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁকে সমর্থনের আহ্বান জানান। তিনি ওয়াদা করেন যে, মরণের মুখোমুখি হলেও তিনি বাংলাদেশের জনতার দাবির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। শেখ সাহেব শত উত্তেজনার মুখে সবাইকে শান্তি বজায় রাখার অনুরোধ জানান।

১৭

তবুও ঢাকা, চট্টগ্রাম, টংগী, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা প্রভৃতি জায়গা থেকে সংঘর্ষের খবর আসতে শুরু করলো। অনেক স্থানে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সান্ধ্য আইন বলবৎ হলো।

পূর্ব বাংলার পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি লক্ষ্য করে এবং শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণদানের আগেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ৬ই মার্চ রেডিও মারফত জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে, আগামী ২৫শে মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তবে তিনি হুশিয়ার করে বলেন, দেশের প্রেসিডেন্ট এবং সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে পাকিস্তানের অখণ্ডতা যে কোন মূল্যেই রক্ষা করা হবে।

এই রকম এক অবস্থার প্রেক্ষিতে ৭ই মার্চের জনসভায় শেখ সাহেব কি বক্তৃতা করবেন, তা নির্ধারণের জন্য বত্রিশ নম্বরের বাসভবনে প্রায় সমস্ত রাত ধরে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের সংগে তাঁর বৈঠক হলো। পরদিন সমগ্র ঢাকা নগরীতে এই জনসভা উপলক্ষে তুমুল উত্তেজনা। সকাল থেকে বিভিন্ন মহল্লা আর দূর-দূরান্তর থেকে হাজার হাজার জনতার খণ্ড মিছিল এসে জমায়েত হলো রেসকোর্স ময়দানে। সেই দিন পূর্ব বাংলায় নয়া গভর্নর টিক্কা খান এসে হাজির হয়েছেন।

এত বড় জনসভা ঢাকার বুকে আজও পর্যন্ত হয়নি বললে চলে। জনসভার আগেই শেখ মুজিব দশ দফা নির্দেশ জারি করলেন। এর মধ্যে হরতাল অব্যাহত রাখা, পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থ প্রেরণ বন্ধ, খাজনা বন্ধ, কালো পতাকা উত্তোলন আর বেতার ও টেলিভিশনে আন্দোলনের খবরা-খবর প্রচার না হলে বাঙালি কর্মচারীদের ধর্মঘট ইত্যাদি অন্যতম। সমস্ত দিন ধরে রেডিওতে ঘোষণা করা হলো যে, রমনা রেসকোর্স ময়দান থেকে শেখ মুজিবের ভাষণ রেডিওতে সরাসরি প্রচার করা হবে। জনসভায় উপস্থিত লাখো লাখো লোক স্বচক্ষে দেখলো মুজিবের বক্তৃতা রিলে করার জন্য বেতারকর্মী ও প্রকৌশলীরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই বক্তৃতা রিলে করা হলো না। ঢাকা বেতারকেন্দ্রের দায়িত্বে নিয়োজিত জনৈক উর্ধ্বতন বাঙালি কর্মচারী ব্রডকাস্টিং হাউসে বসে সামরিক কর্তৃপক্ষের সংগে যোগসাজশ করে শেষ মুহূর্তে বক্তৃতার রিলে বন্ধ করে রাখেন। অবশ্য তাঁর কথিত কৈফিয়ত হচ্ছে, সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারা রিলে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু পরদিন সাপ্তাহিক 'স্বরাজ' পত্রিকায় গোপন তথ্য সংবলিত পুরো ব্যাপারটাই ছাপা হলো। সংবাদটির হেডিং ছিলো '...সাহেব ধরা পড়েছেন।' ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহল ছাড়াও বেতারকর্মীরা আক্রোশে ফেটে পড়লো। বেতারকর্মীরা ধর্মঘটের হুমকি দিলো। অবস্থা বেগতিক দেখে পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় বঙ্গবন্ধুর প্রদত্ত ভাষণ রেডিওতে প্রচার করা হলো।

সাতই মার্চ বেলা তিনটা দু'মিনিট থেকে তিনটা বিশ মিনিট পর্যন্ত এই আঠারো মিনিট শেখ মুজিব ভাষণদান করেন। এতগুলো বছর পরে শেখ মুজিবের এই ঐতিহাসিক বক্তৃতার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এত সুন্দর, স্বচ্ছ আর অপরূপ বাচনভঙ্গিমায় আজ পর্যন্ত এই উপমহাদেশে আর কোন নেতা বক্তব্য পেশ করতে

পেরেছেন বলে আমার মনে হয় না। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে দক্ষিণপন্থী ও উগ্র জাতীয়তাবাদীদের পরস্পরবিরোধী চাপ, আর বাইরে থেকে বিভিন্ন মহলে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার সত্ত্বেও শেখ মুজিবের বক্তৃতা সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিল। তিনি বক্তৃতায় এককভাবে স্বাধীনতার ঘোষণার কথা বলেননি। অথচ উগ্র জাতীয়তাবাদীদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' অন্যদিকে তিনি দক্ষিণপন্থীদের জন্য পরিষ্কার ভাষায় বললেন, 'যদি প্রেসিডেন্ট আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে, জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ হচ্ছে একটা সার্বভৌম সংস্থা এবং স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনে এর ক্ষমতা রয়েছে তা হলে শর্তাধীনে অধিবেশনে যোগদান করতে রাজি আছি।' তাঁর ঘোষিত সাতটি শর্তের মধ্যে অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার, সামরিক বাহিনীর ব্যারাকে প্রত্যাবর্তন ও অবিলম্বে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর অন্যতম। একই নিঃশ্বাসে তিনি বলেন, 'এসব শর্ত পালিত না হলে শহীদদের রক্ত মাড়িয়ে আমরা জাতীয় পরিষদে যোগদান করতে পারি না।'

এরপর শেখ সাহেব আওয়ামী লীগের প্রদত্ত দাবি আদায়ের জন্য চাপ অব্যাহত রাখলেন। তাঁর পক্ষ থেকে পার্টির সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ ক্রমাগত ধর্মঘটের ফলে একটা বৈধ সরকার অকেজো হওয়ার প্রেক্ষিতে, যেভাবে প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করে দেশকে সম্পূর্ণ অরাজকতার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন তা অতুলনীয়। এ সময় বাংলাদেশে যেভাবে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে তা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। দলমত নির্বিশেষে সকল মহল থেকে সক্রিয়ভাবে এই সব পদক্ষেপে সমর্থন দেয়া হয়েছিল। তাজউদ্দিন আহমদের স্বাক্ষরিত অসহযোগ আন্দোলন সংক্রান্ত মোট ৩৫টি নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। এইসব নির্দেশ সকল বাঙালি সরকারি নির্দেশ হিসাবে পালন করেছিল।

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক আকাশে দ্রুত ঘটনাপ্রবাহ অব্যাহত থাকল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সদলবলে ঢাকায় এলেন শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে। ১৬ই মার্চ পুরানো গণভবনে দু'দলের মধ্যে প্রথম দফায় ৯০ মিনিটকালে আলোচনা হলো। পিপলস্ পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো তখন পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য দুটো পৃথক জাতীয় পরিষদের দাবি নিয়ে ঢাকায় হাজির হয়েছেন। কিন্তু শেখ প্রকাশ্যেই বললেন, গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে হবে আর জনগণের ভোটে আমরাই হচ্ছি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই আমরাই সরকার গঠন করবো। ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও তখন ঢাকায় হাজির হয়েছেন। দিন কয়েক ধরে নানা পর্যায়ে আলোচনা অব্যাহত রইলো। আর প্রতিদিন মুজিব-ইয়াহিয়া কথাবার্তা চললো। কিন্তু পূর্ব বাংলার অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ বুঝতেই পারলেন না যে, আলোচনার পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে একটা 'ধোঁকাবাজি' মাত্র। ইয়াহিয়া খানের কিছু সময়ের প্রয়োজন। কেননা ঢাকায় আসার পূর্বে ইয়াহিয়া খান ইসলামাবাদে বুরোক্র্যাট্দের সংগে, পিন্ডিতে সামরিক জেনারেলের সংগে, করাচিতে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সংগে আর লারকানায় পিপলস্ পার্টি নেতা ভুট্টোর সংগে পরবর্তী বিকল্প পন্থা সম্পর্কে আলাপ করে সমর্থন নিয়ে এসেছেন। এই বিকল্প পন্থা হচ্ছে গণহত্যার নীলনক্শা। পূর্ব বাংলায় ব্যাপক গণহত্যার জন্য আরও সৈন্য সমাবেশ ও রসদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে। তাই কিছু সময়ের প্রয়োজন। আর এই সময়টার জন্য আলোচনার বাহানা করা।

পঁচিশে মার্চ রাতে সুপরিকল্পিতভাবে ঢাকায় গণহত্যার নীলনক্শা কার্যকর হলো। মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনার সাফল্য সম্পর্কে যখন কেউ কেউ আশান্বিত হচ্ছিলেন, তখন ইয়াহিয়ার আকস্মিকভাবে ঢাকা ত্যাগ ও সামরিক বাহিনী কর্তৃক ঢাকা নগরী আক্রমণে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কিছুটা হতবাক হয়েছিলেন বৈকি। সন্ধ্যা থেকেই বঙ্গবন্ধু একে একে সমস্ত আওয়ামী নেতৃবৃন্দকে সীমান্ত অতিক্রমের নির্দেশ দিলেন। গভীর রাতে তিনি চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নানের কাছে স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী পাঠালেন। নিজেও গোপন স্থানে চলে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় নিয়ে সুটকেস তৈরি করলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাঁর বত্রিশ নম্বরের বাড়ি ত্যাগ করলেন না। তাহলে টেলিফোনে তিনি কার কাছ থেকে আশ্বাস পেলেন? যে আশ্বাসের ওপর নির্ভর করে তিনি পাথরের মতো নিশ্চুপভাবে গ্রেফতারের প্রতীক্ষায় বসে রইলেন। এ প্রশ্নের সমাধান তো আজও পর্যন্ত হলো না? এ ব্যাপারে তিনি একটা কৈফিয়ত দিয়েছেন বৈকি। কিন্তু বাস্তবে তিনি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেফতার হলেন এবং তাঁর জীবন হলো বিপন্ন। উপরন্তু ঢাকায় গণহত্যাও সংঘটিত হলো।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু যদি সশরীরে মুজিবনগরে উপস্থিত থাকতে পারতেন তা'হলে তো ইতিহাসের গতিধারা সুষ্ঠু ও সঠিক পথে প্রবাহিত হতো। মুজিবনগরে আমরা ইস্পাত কঠিন একতা নিয়ে থাকতে পারতাম। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে ভয়াবহ রূপ দেখতে পাই, তা মুজিবনগরের শতধা বিভক্ত অথচ সুপ্ত উপদলীয় কোন্দলের বহিঃপ্রকাশের ফল বললে অন্যায় বলা হবে না। একটা কথা বলে রাখা দরকার যে, স্বাধীনতা-উত্তরকালের বাংলাদেশের রাজনীতিকে বুঝতে হলে মুজিবনগরের রাজনীতিকে বুঝতে হবে। মাত্র ন'মাসকাল সময়ের মধ্যে সবারই মানসিক যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে, তা অনুধাবন করা অপরিহার্য। অবস্থার প্রেক্ষিতে মনে হয় যে, বঙ্গবন্ধু দেশে প্রত্যাবর্তনের পর এই পুরো ব্যাপারটাই তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় সশরীরে উপস্থিত থাকতে না পেরে মনে হয় তাঁর মনে কিছু সংশয় ও দ্বিধা ছিল না।

যা হোক আবার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ১৯৭১ সালে ১০ই এপ্রিল তারিখে তাজউদ্দিন আহমেদের স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর হরমান রাষ্ট্রপতি এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দিন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ গঠনের কথা বলা হয়। বিবৃতিতে আরও জানানো হয় যে, অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে শপথগ্রহণ করাবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় পত্র-পত্রিকা ও বেতার ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং বেতারে প্রচারিত হয়। কসবা-আখাউড়া সেক্টরে স্বল্পকালীন স্থায়ী একটা এক কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার সংবলিত স্বাধীন বাংলাদেশ বেতারকেন্দ্র থেকে এগারোই এপ্রিল তারিখে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের একটি রেকর্ডকৃত ভাষণ প্রচারিত হয়। পরে এই ভাষণ আকাশবাণীর কোলকাতা কেন্দ্র থেকেও প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। এই বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ কুমিল্লা/সিলেট এলাকায় মেজর খালেদ মোশাররফ, চট্টগ্রাম/নোয়াখালী এলাকায় মেজর জিয়াউর রহমান এবং ময়মনসিংহ/টাংগাইল এলাকায় মেজর শফিউল্লাকে মুক্তিযুদ্ধের কর্তৃত্ব গ্রহণের নির্দেশ দেন।' এছাড়াও তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় মেজর ওসমানকে, ফরিদপুর/বরিশাল/পটুয়াখালী/ খুলনা অঞ্চলে মেজর জলিলকে, রাজশাহীতে মেজর আহম্মদকে এবং সৈয়দপুর/রংপুরে মেজর নজরুল ও মেজর আহমদকে কর্তৃত্ব দেয়ার কথা বলেন।

১৩ই এপ্রিল তারিখে নির্বাচিত মুজিবনগর সরকারের ছয় সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম ও দফতর ঘোষণা করা হয়। মন্ত্রিসভায় অন্যদের মধ্যে অর্থমন্ত্রী এম মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামরুজ্জামান আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ দায়িত্ব নেন।

১৭ই এপ্রিল তারিখে প্রায় শতাধিক বিদেশী সাংবাদিক, বেতার ও টিভি প্রতিনিধিদের কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরে 'ভবেরপাড়া' গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। চুয়াডাংগা থেকে এই গ্রামের দূরত্ব প্রায় ১৮ মাইল। কিছু সংখ্যক নব নির্বাচিত পরিষদ সদস্যও এখানে উপস্থিত ছিলেন। আর ছিলেন হাজার পাঁচেক গ্রামবাসী। নির্বাচিত সরকারের গঠনের প্রমাণ হিসাবে এই 'ভবেরপাড়া' গ্রামে এক নাতিদীর্ঘ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আনসারদের ও প্রাক্তন ইপিআরের দুইটি পৃথক প্লাটুনের কাছ থেকে প্রথমে উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম অভিবাদন গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়। এরপর পবিত্র কোরান তেলাওয়াত। আওয়ামী লীগ পার্টির চিফ হুইপ দিনাজপুরের অধ্যাপক ইউসুফ আলী স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ সমাপ্ত করলে মুহূর্মুহু শ্লোগান উচ্চারিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান সেনাপতি হিসাবে আওয়ামী লীগ দলীয় পার্লামেন্ট সদস্য এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ওসমানীর নাম ঘোষণা করা হয়। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ 'ভবেরপাড়া' গ্রামের নাম পরিবর্তন করে মুজিবনগর নামকরণ করেন। মুজিবনগর সরকার কবে, কোথায় এবং কিভাবে গঠন হয়েছিল সংক্ষেপে এটাই হচ্ছে তার ইতিবৃত্ত।

১৮

একাত্তরের সতেরোই এপ্রিল মেহেরপুরের আম্রকাননে দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠের পর আনুষ্ঠানিকভাবে মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে দফতর বণ্টন ঘোষণা করা হয়। এই অস্থায়ী মন্ত্রিসভা ছিল নিম্নরূপ :

রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়ক	:	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (পরবর্তীকালে নিহত)
উপ-রাষ্ট্রপতি	:	সৈয়দ নজরুল ইসলাম (পরবর্তীকালে নিহত)
প্রধানমন্ত্রী	:	তাজউদ্দিন আহমেদ (পরবর্তীকালে নিহত)
অর্থমন্ত্রী	:	এম মনসুর আলী (পরবর্তীকালে নিহত)
স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী	:	এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান (পরবর্তীকালে নিহত)
পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী	:	খন্দকার মোশতাক আহমদ

রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং সর্বাধিনায়কের দায়িত্বভার প্রদান করা হয়। এছাড়া অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল আতাউল গণি ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি এবং টাংগাইলের এম এন এ জনাব আব্দুল মান্নানকে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তথ্য, প্রচার ও বেতারের দায়িত্বে প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। মুজিবনগর সরকারের অভ্যন্তরীণ কোন্দল উপলব্ধি করতে হলে এবং এই সরকারের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে হলে আওয়ামী লীগের পূর্ব ইতিহাস জানা অপরিহার্য।

১৯৪৮ সালের প্রথম ভাষা আন্দোলনের পর শক্তিশালী মুসলিম লীগের মোকাবেলায় একটা বলিষ্ঠ বিরোধী দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান মরহুম কাজী হুমাউন বসিরের বাসভবন 'রোজ গার্ডেনে'

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর উপস্থিতিতে প্রথম প্রস্তুতি বৈঠক হয়।

এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার যে, হুমাউন সাহেব তাঁর নিজ বাসভবনের বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের বৈঠকের ব্যবস্থা করলেও তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কখনই আওয়ামী লীগে যোগদান করেননি এবং ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে ঢাকা মহাখালী থেকে মুসলিম লীগের টিকিটে যুক্তফ্রন্টের গোলাম কাদেরের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে পরাজিত হয়েছিলেন।

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করা হয়। এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি হচ্ছেন আসাম থেকে আগত মজলুম নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। টাংগাইলের যুব নেতা শামসুল হক পার্টির সাধারণ সম্পাদক এবং শেখ মুজিবুর হরমান ও খন্দকার মোশতাক আহমদ যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হন। তৎকালীন পূর্ব বাংলায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শামসুল হকের অবদান অপরিসীম। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সাংগঠনিক ক্ষমতা ও বাগ্মীতা তখন ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। পূর্ব বাংলার প্রথম উপনির্বাচনে জনাব শামসুল হক মুসলিম লীগ প্রার্থী খুররম খান পন্নীকে পরাজিত করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু বছর কয়েক পরে সম্ভবত পারিবারিক কারণে তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে ১৯৫৩ সালে মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সম্পাদকের দায়িত্ব শেখ মুজিবকে প্রদান করেন। দিনাজপুর ও রাজশাহীতে ছাত্র আন্দোলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নতম কর্মচারী ধর্মঘট এবং আটচল্লিশের প্রথম বাংলা ভাষা আন্দোলনে উপর্যুপরি কারাবরণ ছাড়াও শেখ মুজিবের অপূর্ব সাংগঠনিক ক্ষমতা দেখে মওলানা সাহেব এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এটাই হচ্ছে মুজিব-মোশতাক বিরোধের প্রথম সূত্রপাত।

১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নতম কর্মচারী ধর্মঘটের জের হিসাবে নেতৃস্থানীয় জনা বারো ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্কলারশিপ বাতিল ও জরিমানা ইত্যাদি ধরনের শাস্তি প্রদান করলে শেখ মুজিব ছাড়া বাকি এগারো জনই ক্ষমার আবেদন করে অব্যাহতি লাভ করেন। এ সময় ছাত্র রাজনীতির কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জনাব অলি আহাদসহ ৬ জনকে ৪ বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়। মুজিব ছাত্রাবস্থায় 'রাজনীতি করবো না বলে মুচলিকা' দিতে অস্বীকার করেন। ফলে শেখের ছাত্র জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রায় একুশ বছর পর বাংলাদেশ যখন স্বাধীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তখন এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মুজিবের প্রতি প্রদত্ত শাস্তি প্রত্যাহার করে। অবশ্য তখন তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

যাক যা বলছিলাম। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন শুরু হবার আগে থেকেই শেখ মুজিব কারাগারে আটক ছিলেন। তাই পরবর্তীকালে কেউ কেউ বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারীদের অন্যতম হিসাবে শেখ মুজিবের নাম উল্লেখ করে থাকলে তা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইতিহাস বিকৃত করা বাঞ্ছনীয় নয়– বরং ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে যাঁর যেটুকু প্রাপ্য, তা দিতে কার্পণ্য করাটা মহাপাতালের কাজ। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রাক্কালে শেখকে ঢাকা থেকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয় এবং একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্রদের ওপর গুলিবর্ষণের সংবাদ জেলখানায় পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজবন্দি শেখ মুজিবুর রহমান ও বরিশালের মহীউদ্দীন আহমদ অনশন ধর্মঘট শুরু করেন।

কারাগার থেকে ১৯৫২ সালে মুক্তিলাভের পর শেখ সাহেব পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের পক্ষে পূর্ব বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে পার্টিকে সংগঠিত করার

জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে মওলানা সাহেব কারামুক্ত মুজিবকে পার্টির অস্থায়ী সম্পাদক নিয়োগ করেন। ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৭ সালের কাগমারী সম্মেলন পর্যন্ত এই দীর্ঘ পাঁচ বছর ভাসানী-মুজিব জুটি আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছেন। পরবর্তীকালে মওলানা সাহেব নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে পার্টির জন্য মুজিবের মতো দক্ষ সাধারণ সম্পাদক আর পাননি। ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য হিসাবে শেখ সাহেব পিকিং-এ আয়োজিত বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগদান করেন। এই প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন জনাব আতাউর রহমান খান, খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, এ্যাডভোকেট জমীর উদ্দীন, জাকোরীর পীর সাহেব ও মিয়া ইফতেখারউদ্দীন। দলের নেতা মওলানা ভাসানী দিন কয়েক পরে পিকিং গমন করেন। এই সফরকালেই চীনের মাও সে তুং ও চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎকারের ফলে তৎকালীন পাকিস্তানের সঙ্গে মহাচীনের অর্থবহ যোগসূত্রের সূত্রপাত হয়। পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মরহুম হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর চীন সফর আর চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের ঐতিহাসিক পাকিস্তান সফরকালে একটা কথা উভয় পক্ষই উপলব্ধি করে যে, পাকিস্তান 'সিয়াটো' ও 'বাগদাদ চুক্তিভুক্ত' দেশ হওয়া সত্ত্বেও দুটো প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব। এরই জের হিসাবে আয়ুব আমলে পাক-চীন মৈত্রী আরও সুদৃঢ় হয় এবং ইয়াহিয়ার আমলে দুটি দেশের সম্পর্ক এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয়, যখন 'সোভিয়েট' সম্প্রসারণবাদের মোকাবেলায় পাকিস্তানি দূতিয়ালীতে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনিদের সঙ্গে ১৯৭১ সালে চীনের আঁতাত সৃষ্টি হয়। আর এর 'কাফ্‌ফারা' হিসাবে চীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে এবং পাকিস্তানের সামরিক জান্তাকে নানাভাবে সমর্থন প্রদান করে। এরই ফল হিসাবে মুক্তিযুদ্ধের সময় চীন সমর্থক মার্কসীয় নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

আবার মুজিব-মোশতাক প্রসংগে ফিরে আসা যাক। মাত্র এক বছর সময়কালের মধ্যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে শেখ সাহেব পার্টির অভ্যন্তরে দ্রুত প্রভাব বিস্তার করেন। ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে শক্তিশালী মুসলিম লীগের মোকাবেলায় হক-ভাসানী-সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে চারদিকে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দেয়। যুক্তফ্রন্টের প্রধান দুটি অংগদল আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির মধ্যে এই মর্মে বোঝাপড়া হয় যে, ২৩৭টা মুসলিম আসনের ৭৫টিতে কেএসপি, বাকি ১৬২টি আসনে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিরা যুক্তফ্রন্টের 'নমিনি' হিসাবে গণ্য হবে (৩০৯টি আসনবিশিষ্ট প্রাদেশিক পরিষদের পৃথক নির্বাচনের সুবিধা হিসাবে ৭২টি আসন অমুসলিমদের জন্য রিজার্ভ ছিল)।

চারদিকে তখন নির্বাচনী ডামাডোল তুংগে। প্রকাশ, এ সময় একদিন শেখ মুজিবের পক্ষে মরহুম জালালউদ্দীন কে এম দস লেনে শেরেবাংলা ফজলুল হকের সঙ্গে দেখা করে এক প্রস্তাব পেশ করলেন। শেখের অনুরোধে দাউদকান্দি এলাকা থেকে কৃষক শ্রমিক পার্টির 'নমিনি' দিতে হবে এবং আওয়ামী লীগ এ ব্যাপারে বিশেষ চাপ সৃষ্টি করবে না। ফলে কে এএসপি-র এই 'নমিনি' যুক্তফ্রন্টের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। শেরেবাংলা ও শেখ মুজিবের মধ্যে নানা-নাতি সম্পর্ক থাকলেও যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ বৈঠকগুলোতে প্রায়ই দু'জনার মধ্যে বাক-বিতণ্ডা হতো

এবং হক সাহেব এই তরুণ যুবককে বেশ কিছুটা সমীহ করতেন। প্রস্তাব শুনে মুহূর্তে শেরেবাংলা বুঝতে পারলেন আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের চেহারাটা। মুচকি হেসে রাজি হলেন তিনি। দাউদকান্দি হচ্ছে খন্দকার মোশতাকের নির্বাচনী এলাকা। এই এলাকা থেকে মোশতাক সাহেব যুক্তফ্রন্টের নমিনেশন না পেলে তার রাজনৈতিক জীবনের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যাবে। আর আওয়ামী লীগ পার্টিতে শেখ সাহেব তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে 'সাইজ' করে রাখতে সক্ষম হবেন।

শেষ পর্যন্ত খন্দকার মোশতাক আহমদ চুয়ান্নোর সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নমিনেশনে বঞ্চিত হয়ে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর কাছে ধরনা দিলেন। শহীদ সাহেব সব ব্যাপার বুঝতে পেরে খন্দকার মোশতাককে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়ার ইংগিত দিলেন। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য শরিক দলের সঙ্গে চুক্তি মোতাবেক কোন নেতার পক্ষে প্রকাশ্যে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক 'নৌকা মার্কা'য় বিরুদ্ধে কিছু বলা চলবে না। তাই শহীদ সাহেব অত্যন্ত সন্তর্পণে স্নেহভাজন খন্দকারকে বললেন নির্বাচনী অভিযানকালে তিনি দাউদকান্দি সফর করবেন না। তবে পার্শ্ববর্তী এলাকায় গেলে দাউদকান্দির প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে চা-পান করবেন এবং পরোক্ষভাবে খন্দকার মোশতাকের পক্ষে কাজ করার অনুরোধ জানাবেন।

ফেনীতে আজীবন আওয়ামী লীগের নেতা মরহুম আব্দুল জব্বার খদ্দরও যুক্তফ্রন্টের নমিনেশন লাভে বঞ্চিত হলেন। এখানে হক সাহেবের জেদের ফলে মরহুম মাহবুবুল হক যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী মনোনীত হলেন। দাউদকান্দির মতো ফেনীতেও শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী একই ধরনের 'ট্যাক্‌টিস' গ্রহণ করলেন। নির্বাচনে দাউদকান্দি ও ফেনী এই দুই জায়গা থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে খন্দকার মোশতাক ও আব্দুল জব্বার খদ্দর জয়লাভ করলেন। জনাব খদ্দর জয়লাভ করে আওয়ামী লীগে যোগদানের কথা ঘোষণা করলেও খন্দকার মোশতাক দিব্য কৃষক শ্রমিক পার্টির ছত্রছায়ায় গিয়ে হাজির হলেন। আতাউর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের প্রথম মন্ত্রিসভার পদত্যাগের সময় মোশতাক আহমদ কৃষক শ্রমিক পার্লামেন্টারি পর্যায়ে চিফ হুইপ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

প্রায় দশ বছর আগে ১৯৬৪ সালে খন্দকার মোশতাক নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আবার আওয়ামী লীগে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করলে শেখ সাহেব মহানুভবতা প্রদর্শন করে তাঁকে পার্টিতে গ্রহণ করেন। সম্ভবত আওয়ামী লীগ পার্টিতে বামপন্থীদের অনুপ্রবেশের মোকাবেলায় তিনি খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে আরও জনাকয়েক দক্ষিণপন্থী নেতাকে পার্টিতে স্থান দেন। কিন্তু এর মধ্যে বুড়িগঙ্গার অনেক পানি গিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানী কাগমারী সম্মেলনের পর দলবলসহ আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে 'ন্যাপ' গঠন করেছেন। আটান্ন সালে জেনারেল আইয়ুব সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছেন এবং ১৯৬২ সালে একটা গণবিরোধী শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করেছেন। মৌলিক গণতন্ত্র চালু করে আইয়ুব খান মিস ফাতেমা জিন্নাকে পরাজিত করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। সম্মিলিত বিরোধীদলীয় মোর্চা ভেঙ্গে মুজিব তার পার্টি আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করে নিজেই দলীয় সভাপতি হয়েছেন। এছাড়া ময়মনসিংহের সৈয়দ নজরুল সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ঢাকার তাজউদ্দিন আহমেদ সাধারণ সম্পাদক পদে অদিষ্ঠিত হয়েছেন। অন্যদিকে উত্তরবংগের

এম মনসুর আলী, কামরুজ্জামান ও অধ্যাপক ইউসুফ আলী আওয়ামী লীগে নেতৃস্থানীয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

খন্দকার মোশতাক আওয়ামী লীগে পুনরায় যোগদানের পর শেখ মুজিব তাঁর এই পুরানো সহকর্মীকে সৈয়দ নজরুল, তাজউদ্দিন, মনসুর আলী ও কামরুজ্জামানের ওপর স্থান দিতে পারলেন না। পার্টি লাইনআপে মোশতাক সাহেবের স্থান হলো পাঁচ নম্বরে। মনঃক্ষুণ্ন হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না তাঁর।

শেখ মুজিব থেকে খন্দকার মোশতাক বয়সে বড় এবং একজন প্রতিষ্ঠিত এ্যাডভোকেট। আওয়ামী লীগের জন্মের সময় দু'জনে যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। অথচ রাজনীতির উত্থান-পতনে মুজিবের দুঃসাহসিকতা, জনপ্রিয়তা ও সাংগঠনিক ক্ষমতার দরুন মুজিবের নেতৃত্ব প্রশ্নাতীত হয়ে দাঁড়ালো। আর খন্দকার সাহেব এতোগুলো বছর পরে আবার আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে জুনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদ মেনে নিতে বাধ্য হলেন। তবে তিনি পার্টির অভ্যন্তরে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য উপদল গঠন করলেন। সংক্ষেপে এটাই হচ্ছে মুজিব-মোশতাক বিরোধের ইতিবৃত্ত। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগরে অত্যন্ত সন্তর্পণে এর জের অব্যাহত থাকে এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাজনীতিতেও এর প্রতিফলন দেখা যায়।

১৯

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে পর্দার অন্তরালে একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি হচ্ছেন সিলেট থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য আব্দুস সামাদ আজাদ। ছাত্র জীবনে ইনি শাহ মোহাম্মদ আজিজুর রহমান সমর্থিত নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনে দলত্যাগ করে জনাব সামাদ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং দীর্ঘদিন কারা জীবপনযাপন করেন। কারামুক্ত হওয়ার পর ইনি অনেক দিন পর্যন্ত মওলানা ভাসানীর 'সাগরেদ' হিসেবে বামপন্থী রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীকালে জনাব সামাদ বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হয়ে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা হিসাবে পার্টিতে স্থান দখল করেন। বিদেশী কারসাজি, নানা মহলের চক্রান্তে মুজিবনগরে আওয়ামী লীগ যখন বেশ ক'টা উপদলে বিভক্ত তখন দেশে বৃহত্তর স্বার্থ অর্থাৎ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা স্মরণ করে মওলানা ভাসানী ছাড়াও সামাদ সাহেবের প্রচেষ্টায় এসব উপদলের মধ্যে বাহ্যত একটা ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। মন্ত্রিসভার প্রতিটি বৈঠকের আগে জনাব সামাদের একটা বিশেষ দায়িত্ব ছিল– সব ক'জন মন্ত্রীকে বৈঠকে হাজির করা।

অন্যদিকে ঐক্যের অজুহাতে তখন ন্যাপ (মুজাফ্‌ফর), ন্যাপ (ভাসানী), কম্যুনিস্ট পার্টি ও জাতীয় কংগ্রেস মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করলো। তখন এই সামাদ সাহেবের প্রচেষ্টায় মুজিবনগর সরকার বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়।

এ সময় তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর এককালীন 'রাজনৈতিক গুরু' মওলানা ভাসানীর কাছে ধরনা দিলেন। বললেন, একবার মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত করা হলে আওয়ামী লীগের সুপ্ত উপদলগুলো প্রকাশ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং নেতারা মুক্তিযুদ্ধের বদলে রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। আব্দুস সামাদ আজাদের প্রচেষ্টায় মওলানা সাহেব মধ্যস্থতা করতে রাজি হলেন।

সবক'টা রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের বৈঠক আহ্বান করা হলো। এই যৌথ বৈঠকে মওলানা ভাসানী এ মর্মে যুক্তি দেখালেন যে, দখলিকৃত বাংলাদেশে তথাকথিত গভর্নর ডাক্তার আব্দুল মোতালেব মালেক, মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও পিডিপি'র পরাজিত সদস্যদের নিয়ে একটা 'নামকাওয়াস্তে' মন্ত্রিসভা বানিয়েছে বলে আমরা গণতন্ত্রের নামে তাঁদের যথাযথভাবে সমালোচনা করছি। একইভাবে সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে দুই ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও জাতীয় কংগ্রেসের সমস্ত প্রার্থী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে বলে তাঁদের মাঝ থেকে মন্ত্রিসভায় সদস্য নেয়া সম্পূর্ণভাবে গণতন্ত্র বিরোধী এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের পরিপন্থী। মওলানা সাহেব সেদিন এভাবে মুজিবনগর মন্ত্রিসভাকে রক্ষা করলেন। তবে একটা সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হলো। তবুও মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরে তিনটি উপদলের অস্তিত্ব বজায় থাকলো।

সুদীর্ঘ এগারো বছর পরে সম্ভবত একটা মন্তব্য করা প্রাসংগিক হবে যে, তাজউদ্দিন আহমেদ তাঁর রাজনৈতিক জীবনে আওয়ামী লীগে মিস্‌ফিট ছিলেন। তাঁর চালচলন, কথাবার্তা, চিন্তাধারা ও কার্যক্রমের সঙ্গে আওয়ামী লীগের অনেক নেতার সঙ্গে খুব একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি বাংলাদেশের ঐতিহ্য মোতাবেক পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে খুব একটা দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেননি। তিনি ছিলেন স্পষ্টবাদী ও উপদল গঠনে অপরিপক্ব। সুদীর্ঘকালে তিনি শেখ মুজিবকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছেন। তিনি সাত বছরের মতো আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

ষাট দশকের শেষ ভাগে বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসাবে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব সাফল্যে শেখের সঙ্গে তাজউদ্দিনের অবদান কম নয়। উপরন্তু প্রতিটি সংকটজনক মুহূর্তে শেখ মুজিবকে সৎ পরামর্শ দেয়ার ক্ষেত্রে তাজউদ্দিন কোন দিনই সংকোচ বোধ করেননি। একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন এবং ঢাকায় মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনার সময় তাজউদ্দিনের অবদান অনস্বীকার্য। সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস নির্বাসিত মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জনাব তাজউদ্দিন আহমদ অসংখ্য প্রতিবন্ধকতার মধ্যে সমগ্র বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ রাখার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন, ইতিহাসে তার উল্লেখ থাকা অপরিহার্য।

সেদিনের কথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। চুয়াত্তর সালের নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে হঠাৎ করে নতুন গণভবনে খবরের কাগজের সম্পাদক আর সিনিয়ার রিপোর্টারদের ডাক পড়লো। প্রেসিডেন্ট মুজিব সাংবাদিকদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করবেন। পাশের ঘরে বঙ্গবন্ধু চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার মহাপরিচালক তাঁকে বললেন, 'তাজউদ্দিন সাহেব তাঁর কিছু সমর্থক নিয়ে সলাপরামর্শে বসেছেন আর পদত্যাগপত্রে দস্তখত করতে গড়িমসি করছেন।'

বঙ্গবন্ধু চিৎকার দিয়ে বললেন, 'আপনারা জেনে রাখুন, আমি তাজউদ্দিনকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগপত্রে দস্তখত করতে বলেছি। যদি না করে, তা'হলে আমি তাজউদ্দিনকে এখনই মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করবো।'

কথা ক'টা বলে তিনি পাইপ ধরিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখেন বেশ কিছুক্ষণ হলো ক্যাবিনেট সেক্রেটারি ফাইল হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। রাগতস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন? হাতে ওটা কিসের ফাইল?'

তৎকালীন ক্যাবিনেট সেক্রেটারি জবাব দিলেন, 'স্যার, আমি অর্থমন্ত্রীর বাসায়

যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উনি পদত্যাগপত্রে দস্তখত করে দিয়েছেন। সেটা আপনাকে দেখাবার জন্য এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি।'

সবাই হতভম্ব হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। আমার মনে পড়লো, বাহাত্তরের জানুয়ারির কথা। পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে এসেছেন। বঙ্গভবনে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। আজ থেকে বঙ্গবন্ধু দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন। দেশে ফেরার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কেনো তিনি এ সিদ্ধান্ত নিলেন তা রহস্যাবৃত থাকাই ভালো। এ অনুষ্ঠানে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন সপরিবারে এসেছেন। তিনি সবার সঙ্গে প্রাণখোলা হাসি দিয়ে কথা বলছেন। আমরা সবাই অবাক হয়ে তাঁকে লক্ষ্য করছি। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর তিনি সাংবাদিকদের বললেন, 'আজ আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন। নেতার অনুপস্থিতিতে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত থেকে দেশকে স্বাধীন করেছি। আবার নেতাকে মুক্ত করে তাঁরই হাতে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার তুলে দিয়ে আমি নিজকে ধন্য মনে করছি। অন্তত ইতিহাসের পাতার এক কোণায় আমার নামটা লেখা থাকবে।'

মাত্র বছর তিনেকের ব্যবধান। বিশেষ বিশেষ মহলের কারসাজিতে শেখ মুজিব ও তাজউদ্দিন এই দুই অভিন্ন হৃদয়ের মধ্যে অবিশ্বাস ও সন্দেহের সূচনা হলো। সৃষ্টি হলো দু'জনের মধ্যে মতানৈক্য– মন্ত্রিসভা থেকে তাজউদ্দিন বিদায় নিলেন। মনে হলো বঙ্গবন্ধু'র কোমর থেকে শাণিত তরবারি অদৃশ্য হয়ে গেলো।

প্রায় দেড় যুগ ধরে ছায়ার মতো যে নির্লোভ ব্যক্তি অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুকে অনুসরণ করেছেন এবং নিঃস্বার্থভাবে পরামর্শ দিয়ে বহু বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন, এক গোপন চক্রান্তের ফাঁদে পা দিয়ে বঙ্গবন্ধু সেই মহৎ প্রাণ ব্যক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করলেন।

যাক যা বলছিলাম। একাত্তরের এপ্রিল, মে ও জুনের প্রথমার্ধে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামরুজ্জামানসহ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ অনেক কটা বিবৃতি প্রদান ও সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে 'শেষরক্ত বিন্দু দিয়ে লড়াই-এর' বলিষ্ঠ ঘোষণা করে সবার মনোবল সুদৃর করতে সক্ষম হলেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন বললেন, 'লাশের পাহাড়ের নিচে পাকিস্তান নামে দেশটার মৃত্যু হয়েছে।' বিশ্বের পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের গণহত্যার বিস্তারিত প্রকাশিত হলো। পাকিস্তানের সামরিক জান্তা বহু চেষ্টা করেও এসব সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করতে পারলো না। এরপর পরই প্রকাশিত হলো সম্পাদকীয় মন্তব্য। এ ধরনের কিছু সম্পাদকীয় মন্তব্যের তারিখসহ হেডিং ছিল নিম্নরূপ :

১। পাকিস্তানের দুঃখ, দি এজ ক্যানবেরা, ২৯শে মার্চ ১৯৭১
২। পাকিস্তানে জঘন্য হত্যাকাণ্ড, দি গার্ডিয়ান, লন্ডন ৩১শে মার্চ
৩। পাকিস্তানের নামে, নিউইয়র্ক টাইমস্, ৩১শে মার্চ
৪। পূর্ব পাকিস্তানে হত্যাকাণ্ড, দি টাইমস্, লন্ডন ৩রা এপ্রিল
৫। রক্তাক্ত বাংলাদেশ, নিউ স্টেটসম্যান, লন্ডন ১৬ই এপ্রিল
৬। পূর্ব-বাংলার দুঃখ, দি গার্ডিয়ান, লন্ডন ২৭শে মে
৭। আরেক চেংগিস খান, দি হংকং স্ট্যান্ডার্ড ২৫শে জুন

৮। বাঙালি গণহত্যার সহযোগী, ডেইলি নিউজ, ওয়াশিংটন ৩০শে জুন
৯। বেয়নেটের মাথায় শান্তি, দি নভস্তি, বেলগ্রেড, ৮ই জুলাই
১০। দ্বিখণ্ডিত জাতি, নিউইয়র্ক ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, ২৩শে জুলাই

এরকম পরিস্থিতিতে মওলানা ভাসানী মাত্র দু'দিনের ব্যবধানে দুটো বিবৃতি দিলেন। ৩১শে মে মওলানা সাহেব এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বললেন, 'পশ্চিম পাকিস্তানিদের অমানুষিক অত্যাচারের হাত থেকে বাঙালিদের রক্ষা করার একমাত্র উপায়ই হচ্ছে বাংলাদেশের পূর্ব স্বাধীনতা।' তিনি এ মর্মে তথ্য প্রকাশ করলেন যে, তিনি এর মধ্যেই সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগেন, মহাচীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুং, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হিথ-এর নিকট প্রেরিত তারবার্তায় পাকিস্তানের সমর্থন না করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বর্তমান মুহূর্তে দলমত নির্বিশেষে বাঙালি মাত্র সবারই কর্তব্য হচ্ছে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করা। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মওলানা ভাসানী বলেন যে, তাঁর স্ত্রী-পুত্র এখন কোথায় আছে তা তিনি জানেন না। তবে কাগমারীতে তাঁর আজীবনের সংগৃহীত পারিবারিক লাইব্রেরি পাকিস্তানি সৈন্যরা ধ্বংস করেছে। দোসরা জুন তারিখে মওলানা ভাসানী আর একটা বিবৃতিতে বললেন, বাংলাদেশের প্রশ্নের আর কোন মধ্যস্থতার প্রশ্ন ওঠে না। যে হানাদাররা লাখ লাখ নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করে সমগ্র বাংলাদেশে ভয়াবহ রক্তাক্ত তাণ্ডবলীলা অব্যাহত রেখেছে, তাদের সংগে রাজনৈতিক কোন সমাধান করা অবান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করবো। হয় আমরা জিতবো না হয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো। তিনি আরও বলেন, বিলম্বে হলেও পিকিং এই বিরোধে ইসলামাবাদকে সমর্থন দেয়ার ভুল উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

একই দিনে নির্বাসিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে ঘোষণা করলেন, পঁচিশে মার্চের গণহত্যার পর বাংলাদেশ এখন রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। বাংলাদেশ এখন স্বাধীন ও সার্বভৌম। বুকের তাজা লোহু দিয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করবোই। আমরা স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র মারফত এই বিবৃতির জোর প্রচারণা শুরু করলাম।

২০

সতেরোই এপ্রিল মেহেরপুরের আম্রকাননে নির্বাচিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর নিরাপত্তার খাতিরে এই মন্ত্রিসভার পাঁচজন সদস্য প্রথম কোলকাতায় তেরো নম্বর লর্ড সিংহ রোডে অবস্থান করেন। কয়েক সপ্তাহ পরে এঁরা বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডের একটা ভাড়া করা বাড়িতে উঠে আসেন। এ সময় বঙ্গবন্ধুর এককালীন রাজনৈতিক সেক্রেটারি ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ পার্ক সার্কাসের বাংলাদেশ মিশনে অফিস স্থাপন করে 'কন্ট্যাক্টম্যান-এর' দায়িত্ব পালন করেন। লন্ডন, দিল্লি প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যারিস্টার মওদুদ যোগাযোগের ব্যবস্থা করেন। কিছুদিনের মধ্যে মুজিবনগর সরকার আরও সংগঠিত হলে এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্যরা এসে হাজির হলে ব্যারিস্টার সাহেবকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ নোয়াখালী থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রার্থনা

করেন। কিন্তু আব্দুল মালেক উকিলের নেতৃত্বে নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগ এই মনোনয়নের তীব্র বিরোধিতা করে। ফলে ব্যারিস্টার সাহেব আওয়ামী লীগের মনোনয়ন লাভে ব্যর্থ হন এবং পরবর্তীকালে জনাব মওদুদ রাজবন্দিদের মুক্তির আন্দোলন গড়ে তোলেন। এমনকি কোনরকম ফি ছাড়া কোর্টে রাজবন্দিদের আইনজ্ঞ হিসাবে কাজ করার জন্য 'ডিফেন্স কাউন্সিল' গঠন করেন ও লন্ডনস্থ 'এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের' সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ব্যক্তি স্বাধীনতার অন্যতম প্রবক্তা হিসাবে পরিগণিত হন। অথচ ছাত্র জীবনে এই মওদুদ সাহেব ছিলেন কুখ্যাত গভর্নর মোনেম খাঁ'র সৃষ্ট 'এন এস এফ'-এর অন্যতম নেতা। শেষ পর্যন্ত ব্যারিস্টার মওদুদ কিছুদিনের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। জিয়ার আমলে ইনি উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেছিলেন।

যাক্ যা বলছিলাম। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে স্বাধীনে বাংলা বেতার কেন্দ্রের স্টুডিও স্থাপিত হলে মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যরা সিআইটি এভেন্যুর ভাড়া করা ফ্ল্যাটে তাঁদের পরিবার রাখার ব্যবস্থা করেন এবং থিয়েটার রোডে সরকারের একটা ক্যাম্প অফিস স্থাপন করা হয়। এই ক্যাম্প অফিসের এক কোণায় ছোট্ট দুটি কামরায় প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ তাঁর অফিস ও থাকার ব্যবস্থা করলেন। বাকি অংশে মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী সচিবালয় ছাড়াও মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্নেল আতাউল গণি ওসমানীর ক্যাম্প অবস্থিত ছিল। অফিসের একতলায় আর এক কোণায় ডক্টর মোজাফ্ফর আহম্মদ চৌধুরী, ডক্টর এ আর মল্লিক, ডক্টর মোশাররফ হোসেন, অধ্যাপক রেহমান সোবহান, ডক্টর আনিসুজ্জামান প্রমুখ তাঁদের আস্তানা স্থাপন করেছিলেন। এছাড়া বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ আর খন্দকার ও ইয়ুথ ক্যাম্পের পরিচালক উইং কমান্ডার মীর্জা এখানে তাঁদের ক্ষুদ্র অফিস স্থাপন করেছিলেন। পুলিশ বিভাগের নবনিযুক্ত আইজি জনাব আব্দুল খালেকের জন্য এখানে একটা অফিস রুমের ব্যবস্থা করা হয়। থিয়েটার রোডের এই অস্থায়ী সচিবালয়ের দোতলায় মন্ত্রিপরিষদ সদস্যদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। আর ছিল একটা সার্বজনীন মেস। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস এই অফিসেই রাত্রি যাপন করেছেন এবং দু'বেলা মেসের খাবার খেয়েছেন। অবস্থার প্রেক্ষিতে অত্যন্ত দ্রুত মুজিবনগর সরকারের সচিবালয়কে সংগঠিত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ নিম্নোক্ত চারজনকে সচিব নিয়োগ করেন। এঁরা হচ্ছেন :

প্রতিরক্ষা সচিব : আবদুস সামাদ
অর্থ সচিব : খোন্দকার আসাদুজ্জামান
মন্ত্রিপরিষদ সচিব : তওফিক ইমাম
সংস্থাপন সচিব : নূরুল কাদের খান

পরিস্থিতির মোকাবেলায় এঁরা যে অমানুষিক পরিশ্রম করে নির্বাসিত সরকারের সচিবালয় গড়ে তুলেছিলেন তা তুলনাহীন। শুধু সচিবালয় সংগঠনই নয়, একটি পূর্ণাংগ সরকারের সম্ভাব্য সরকারি বিধি ও ফিনান্সিয়াল রুলস্ জারির ব্যবস্থাও করতে হয়েছিল। উপরন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এত বড় একটা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় কাজের সুবিধার জন্য কোনো 'ওয়ার কাউন্সিল' গঠন করা হয়নি। কেননা অনেকের মতে এতে করে গণতন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা করা ছাড়াও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। তাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন

অবস্থাতেও তাজউদ্দিন মন্ত্রিসভাকে কয়েকবার আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির কাছে স্বীয় কার্যক্রমের জবাবদিহি করতে হয়েছে এবং পরিষদ সদস্যদের উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে।

মুজিবনগর সরকার সংগঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে কাজের সুবিধার জন্য প্রধান সচিবালয় ছাড়াও দশটা উপ-প্রশাসন অঞ্চল স্থাপন করা হলো। এগুলোই জোনাল অফিস নামে পরিচিত। নির্বাচিত সদস্যদের সার্বিক দায়িত্বে এসব জোনাল অফিস পরিচালনার ব্যবস্থা হলো। অফিসগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

১। দক্ষিণ-পূর্ব জোন ক	: অধ্যাপক নূরুল ইসলাম চৌধুরী
২। দক্ষিণ-পূর্ব জোন খ	: জহুর আহম্মদ চৌধুরী
৩। দক্ষিণ-পশ্চিম জোন ক	: এম, এ রউফ চৌধুরী
৪। দক্ষিণ-পশ্চিম জোন খ	: ফণি মজুমদার
৫। পশ্চিম জোন ক	: আজিজুর রহমান
৬। পশ্চিম জোন খ	: আশরাফুল ইসলাম
৭। উত্তর জোন	: মতিউর রহমান
৮। উত্তর-পূর্ব জোন ক	: দেওয়ান ফরিদ গাজী
৯। উত্তর-পূর্ব জোন খ	: শামসুর রহমান খান
১০। পূর্ব জোন	: লে. কর্নেল এম এ রব

এঁদের ওপর কয়েক ধরনের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হলো। প্রথমত, মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত সেক্টর কমান্ডারদের সঙ্গে সহযোগিতা করা ও সমন্বয় সাধন। দ্বিতীয়ত, মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পগুলো পরিচালনা, মুক্তিযোদ্ধা নির্বাচন ও ট্রেনিংয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা। মুক্তিযোদ্ধা নির্বাচনের ক্ষেত্রে খুবই সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ ছিল। বামপন্থী দর্শনে বিশ্বাসী কোনো যুবকের মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে যাতে অনুপ্রবেশ না হয় সে ব্যাপারে সজাগ থাকার জন্যই এ সতর্কতা। কেননা দীর্ঘদিনব্যাপী মুক্তিযুদ্ধে অব্যাহত থাকলে এর নেতৃত্বে বামপন্থীদের করায়ত্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। কিন্তু একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় 'রুশ সম্প্রসারণবাদকে' প্রতিহত করার বাসনায় মহাচীনের নেতৃত্বে 'সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনিদের' সঙ্গে আঁতাত সৃষ্টির জন্য উদ্‌গ্রীব হওয়ায় চীনা সমর্থক বামপন্থী মহলে ব্যাপক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এ সময় পাকিস্তানী দূতিয়ালীর ফলে চীন-মার্কিন সম্পর্ক স্থাপিত হলে লোকায়ত্ব চীন সরাসরিভাবে বাংলাদেশে পাকিস্তান সামরিক জান্তার কার্যক্রমকে সমর্থন করে। ফলে চীনা সমর্থক অনেক বামপন্থী যুবক মুক্তিযুদ্ধ থেকে সযত্নে সরে যায়। আবার অনেক একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে সম্প্রসারণবাদীদের চক্রান্ত বলে এর বিরোধিতা করে। এরকম বিভ্রান্তির অবস্থায়ও সুষ্ঠু নেতৃত্বের অভাবে মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী কত ছাত্র-যুবক যে নিশ্চিহ্ন হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আর কত কর্মী হতাশাগ্রস্ত হয়ে বিপথগামী হয়েছে তার হিসাব নেই। অন্যদিকে মস্কোপন্থীরা নানা কারণে মোটামুটিভাবে রণাংগন থেকে দূরে অবস্থান করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন জুগিয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসীদের বিশেষ অনুপ্রবেশ হয়নি। অবশ্য মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পৃথকভাবে মস্কোপন্থীরা কয়েক হাজার যুবককে ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। সে ট্রেনিংও অসম্পূর্ণ থেকে গেলো।

জোনাল অফিসগুলোর তৃতীয় দায়িত্ব ছিল শরণার্থীদের দেখাশোনা ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এতদসম্পর্কিত কাজের সমন্বয় সাধন করা। চতুর্থ, দখলিকৃত এলাকা থেকে কোন সরকারি কর্মচারী এসে হাজির হলে তাঁর নাম ও পরিচয় লিপিবদ্ধ করে যোগ্যতা অনুসারে কাজে লাগানো এবং বেতারে ব্যবস্থা করা।

মুজিবনগর সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রথম, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের সর্বোচ্চ বেতন যথাক্রমে সর্বসাকুল্যে মাসিক পাঁচশ ও সাড়ে তিনশ' টাকা নির্ধারিত হয়েছিল। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য পূর্ব বেতন বহালের নির্দেশ দেয়া হলো।

পরবর্তীকালে কিছু সংখ্যক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ঢাকা ও লন্ডন থেকে হাজির হলে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ আরও তিনজন সচিব নিয়োগ করেন। এঁরা হচ্ছেন :

প্রিন্সিপ্যাল সচিব : রুহুল কুদ্দুস
তথ্য ও বেতার সচিব : আনোয়ারুল হক খান
বৈদেশিক সচিব : মাহবুব আলম চাষী।

এদের মধ্যে একাত্তরের ২৭শে নভেম্বর তারিখে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন বিশেষ অর্থবহ কারণে এক নির্দেশে বৈদেশিক সচিব জনাব মাহবুব আলম চাষীকে বরখাস্ত করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী অন্যতম রাষ্ট্রদূত জনাব আবুল ফতেহকে নয়া বৈদেশিক সচিব নিয়োগ করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে জনাব ফতেহ হচ্ছেন প্রথম পররাষ্ট্র সচিব।

যা হোক মুজিবনগর সরকার সংগঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ দেশবাসীর প্রতি ১৭ দফা নির্দেশ প্রদান করলেন। তখন পর্যন্তও মুজিবনগরস্থ স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র চালু হয়নি। তাই প্রধানমন্ত্রীর ১৭ দফা নির্দেশ প্রচারপত্র আকারে ছাপিয়ে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিতরণের ব্যবস্থা করা হলো। অবশ্য নির্দেশের সারাংশ আকাশবাণী ও বিবিসিসহ বিভিন্ন বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। নির্দেশগুলো ছিল নিম্নরূপ :

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার সকল রকমের অত্যাচার, অবিচার, অন্যায় ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে এক সুখী, সমৃদ্ধ, সুন্দর সমাজতান্ত্রিক ও শোষণহীন সমাজ কায়েমে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই জাতির এই মহাসংকট মুহূর্তে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনাদের প্রতি আমার আবেদন :

১. কোন বাঙালি কর্মচারী শত্রুপক্ষের সাথে সহযোগিতা করবেন না। ছোট-বড় প্রতিটি কর্মচারী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করবেন। শত্রুকবলিত এলাকায় তারা জনপ্রতিনিধিদের এবং অবস্থা বিশেষে নিজেদের বিচার-বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করবেন।

২. সরকারি, আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সমস্ত কর্মচারী অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁরা স্ব স্ব পদে বহাল থাকবেন এবং নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করবেন।

৩. সামরিক, আধাসামরিক লোক কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত অবিলম্বে নিকটতম মুক্তিসেনা শিবিরে যোগ দেবেন। কোন অবস্থাতেই শত্রুর হাতে পড়বেন না বা শত্রুর

সাথে সহযোগিতা করবেন না।

৪ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ছাড়া অন্য কারো বাংলাদেশ থেকে খাজনা, ট্যাক্স, শুল্ক আদায়ের অধিকার নেই। মনে রাখবেন, আপনার কাছ থেকে শত্রুপক্ষের এভাবে সংগৃহীত প্রতিটি পয়সা আপনাকে ও আপনার সন্তানদের হত্যা করার কাজে ব্যবহার করা হবে। তাই যে কেউ শত্রুপক্ষকে খাজনা, ট্যাক্স দেবে অথবা এ ব্যাপারে সাহায্য করবে, বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিবাহিনী তাদেরকে জাতীয় দুশমন বলে চিহ্নিত করবে এবং তাদের দেশদ্রোহের দায়ে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবে।

৫. যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিশেষ করে নৌ-চলাচল সংস্থার কর্মচারীরা কোন অবস্থাতেই শত্রুর সাথে সহযোগিতা করবেন না। সুযোগ পাওয়া মাত্রই তাঁরা যানবাহনাদি নিয়ে শত্রুকবলিত এলাকার বাইরে চলে যাবেন।

৬. নিজ নিজ এলাকার খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। আর এ চাহিদা মিটানোর জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে। মনে রাখবেন, বর্তমান অবস্থায় বিদেশী খাদ্যদ্রব্য ও জিনিসপত্রের ওপর নির্ভর করলে তা আমাদের জন্য আত্মহত্যার শামিল হবে। নিজেদের ক্ষমতানুযায়ী কৃষি উৎপাদনের চেষ্টা করতে হবে। স্থানীয় কুটির শিল্প বিশেষ করে তাঁত শিল্পের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

৭. কালোবাজারি, মুনাফাখরি, মজুদদারি, চুরি, ডাকাতি বন্ধ করতে হবে, এদের প্রতি কঠোর নজর রাখতে হবে। জাতির এই সঙ্কট সময়ে এরা আমাদের এক নম্বর দুশমন। প্রয়োজনবোধে এদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. আর এক শ্রেণীর সমাজবিরোধী ও দুষ্কৃতকারী সম্পর্কেও সদা সচেতন থাকতে হবে। এদের কার্যকলাপ দেশদ্রোহমূলক। এরা হচ্ছে শত্রুপক্ষকে সংবাদ সরবরাহকারী।

৯. গ্রামে গ্রামে রক্ষীবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। মুক্তিবাহিনীর নিকটতম শিক্ষা শিবিরে রক্ষীবাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকদের পাঠাতে হবে। গ্রামের শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা ছাড়াও এরা প্রয়োজনবোধে মুক্তিবাহিনীর সাথে প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করবে। আমাদের কোন স্বেচ্ছাসেবক বা কর্মী যাতে কোন অবস্থাতেই শত্রুর হাতে না পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১০. শত্রুপক্ষের গতিবিধির সমস্ত খবরাখবর মুক্তিবাহিনীর কেন্দ্রে জানাতে হবে।

১১. স্বাধীন বাংলা মুক্তিবাহিনীর যাতায়াত ও যুদ্ধের জন্য চাওয়ামাত্র সমস্ত যানবাহন (সরকারি-বেসরকারি) মুক্তিবাহিনীর হাতে ন্যস্ত করতে হবে।

১২. বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী অথবা বাংলাদেশ সরকার ছাড়া অন্য কারো কাছে পেট্রোল, ডিজেল, মবিল ইত্যাদি বিক্রয় করা চলবে না।

১৩. কোন ব্যক্তি পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর অথবা তাদের এজেন্টদের কোন প্রকারের সুযোগ-সুবিধা, সংবাদ সরবরাহ অথবা পথনির্দেশ করবেন না। যে করবে তাঁকে আমাদের দুশমন হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪. কোন প্রকার মিথ্যা গুজবে কান দেবেন না বা চূড়ান্ত সাফল্য সম্পর্কে নিরাশ হবেন না। মনে রাখবেন, যুদ্ধে অগ্রাভিযান ও পশ্চাদপসরণ দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

কোন স্থান থেকে মুক্তিবাহিনী সরে গেছে দেখলেই মনে করবেন না যে, আমাদের সংগ্রামে বিরতি দিয়েছে।

১৫. বাংলাদেশের সকল সুস্থ ও সবল ব্যক্তিকে নিজ নিজ আগ্নেয়াস্ত্রসহ নিকটস্থ মুক্তিবাহিনী শিবিরে রিপোর্ট করতে হবে। এ নির্দেশ সকল আনসার, মুজাহিদ ও প্রাক্তন সৈনিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

১৬. শত্রু বাহিনীর ধরাপড়া সমস্ত সৈন্যকে মুক্তিবাহিনীর কাছে সোপর্দ করতে হবে। কেননা জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের কাছ থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হতে পারে।

১৭. বর্বর খুনি পশ্চিমা সেনাবাহিনীর সকল প্রকার যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থা যাতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হতে পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

২১

মুজিবনগর সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট ও অংগদলের ওপর নির্ভরশীল বেশ কিছু সংখ্যক আধাসরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। এগুলোর মধ্যে ডক্টর টি হোসেনের অধীনে বাংলাদেশ রেডক্রস, মি. জে জি ভৌমিকের অধীনে রিলিফ কমিশন, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের নেতৃত্ব বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার্স কোর প্রভৃতি ছাড়াও বাংলাদেশ শিক্ষক সহায়ক সমিতি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী ও কুশলী সমিতি এবং বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি প্রভৃতি অন্যতম।

একাত্তরের এপ্রিল-মে মাস থেকেই ঘটনাপ্রবাহের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও একটা নির্বাসিত সরকারের সার্বিক দায়িত্বে নিজেদের সংগঠনের জন্য সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। তথ্য দপ্তরের প্রতিটি জোনাল অফিসে প্রতিনিধি প্রেরণ করে সরকারের প্রকাশিত বই-পুস্তক, পোস্টার, পত্র-পত্রিকা এবং প্রচারপত্র বিলির ব্যবস্থা করলো। উপরন্তু তথ্য দপ্তরের সমর সংবাদদাতারা খবর সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন রণাংগনে গিয়ে হাজির হলো। চারদিকে সাজসাজ রব। এমনকি মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পগুলোতে অবস্থানকারী ছাত্র-যুবকদের বাঙালি জাতীয়তাবাদী দর্শনে উদ্বুদ্ধ করা এবং কেন এই মুক্তিযুদ্ধ বুঝবার জন্য মাহিনা করা রাজনৈতিক বক্তার ব্যবস্থা করা হলো। এর আগে এপ্রিল মাসেই মুজিবনগর সরকার সমগ্র রণাংগনকে এগারোটি সেক্টরে বিভক্ত করে সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ করেছেন। কাজের সুবিধার জন্য মাঝে মাঝে এসব সেক্টর কমান্ডারদের বদলিও করা হয়েছে। পঁচিশে মার্চ ঢাকায় গণহত্যা শুরু হওয়ার অব্যবহিত পরেই ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও অষ্টম ব্যাটালিয়ন বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য ঘোষণা করে লড়াই শুরু করে। পরবর্তী সময়ে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নবম, দশম ও একাদশ ব্যাটালিয়ান গঠন করা হয়।

সশস্ত্র বাহিনীর সৈন্যদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য প্রাক্তন ইপিআর ও সশস্ত্র পুলিশের সদস্যরা এসে হাজির হন। এছাড়া ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ট্রেনাররা অত্যন্ত দ্রুত হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে প্রশিক্ষণ দান করেন। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যদিও অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল আতাউল গণি ওসমানী প্রধান সেনাপতি হিসাবে যুদ্ধে সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন, তবুও সেক্টর কমান্ডাররা নিজেদের এলাকার অবস্থার প্রেক্ষিতে যুদ্ধে 'স্ট্রাটেজি' বা কৌশল স্থির করার ব্যাপারে স্থানীয়ভাবে সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করেছিলেন। তাই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন এলাকার যুদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া আরও একটা বিষয় লক্ষণীয়, যেসব সেক্টর কমান্ডাররা গেরিলা পদ্ধতির যুদ্ধের দিকে বেশি নজর দিয়েছেন তারা তত বেশি সাফল্য লাভ করেছেন। সীমাবদ্ধ রসদ, অনিয়মিত সরবরাহ আর সীমিত সংখ্যক ট্রেনিংপ্রাপ্ত অফিসার ও জোয়ান দিয়ে পেশাদার পদ্ধতির লড়াই করা সম্ভব নয়। এরই পাশাপাশি আরও কয়েকটা ব্যাপার বিশেষ লক্ষণীয়। পঁচিশে মার্চের পর ভারত সরকার আমাদের লাখ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয় দান এবং নির্বাসিত সরকারকে বিভিন্ন ব্যাপারে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করলেও আমাদের সেক্টর কমান্ডারদের হাতে প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহে কার্পণ্য ও ইতস্তত করেছিল। কেননা মুক্তিযুদ্ধে প্রাথমিক পর্যায়ে সমগ্র পশ্চিম বাংলা ছাড়াও বিহার, ত্রিপুরা, আসামের একাংশে ব্যাপকভাবে নকশালদের সশস্ত্র আন্দোলন অব্যাহত ছিল। আমাদের কাছে সরবরাকৃত সমরাস্ত্র নকশালদের কব্জায় চলে যেতে পারে বলে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের আশংকা ছিল। উপরন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে মুক্তিবাহিনীর দক্ষতার ব্যাপারেও ভারতের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। সর্বোপরি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘায়িয় হলে শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি জাতীয়তাবাদীদের হাতে থাকবে কিনা ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সে ব্যাপারেও নিশ্চিত হতে চাচ্ছিল।

বাস্তব ক্ষেত্রে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, বাঙালি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করতে সক্ষম। আবার গণহত্যা ও অস্ত্রের ভাষায় জবাব অস্ত্র দিয়ে প্রদর্শনে পারদর্শী। তাই কোন প্রতিবন্ধকতাই আমাদের মুক্তিবাহিনীকে হতোদ্যম করতে পারেনি। এগারোটা সেক্টরেই মুক্তিবাহিনীর দামাল ছেলেরা অকুতোভয়ে লড়াই করেছে। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমাদের ছেলেদের লড়াইয়ের কাহিনী আজ সুদীর্ঘ এগারো বছর পর লোকগাথায় পরিণত হয়েছে। অথচ এসব লাড়াইয়ের প্রকৃত কাহিনী লিপিবদ্ধ করার কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হয়নি। ঢাকায় বসে যুদ্ধের লাখ লাখ দলিল ঘেঁটে এবং শহরে শিক্ষিত লোকদেরই ইন্টারভিউ নিলে ইতিহাস লেখা হয় না। আবারও বলতে বাধ্য হচ্ছে যে, ইতিহাস বিকৃত করার অধিকার আমাদের নেই। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে যার যেটুকু প্রাপ্য তার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বর পর্যন্ত বাঙালি জাতির ইস্পাত কঠিন একতা ছিল। তাই ঢাকায় গ্রিনরোডে গেরিলা হামলা করতে গিয়ে যে যুবক ধরা পড়ে আত্মাহুতি দিল, টাঙ্গাইলের কালিহাতির লড়াইয়ে যে কৃষক পুত্র জীবন উৎসর্গ করলো, বগুড়া শহরের উপকণ্ঠে যে ছাত্রকে শত্রু সৈন্যরা সর্বশরীরে পেট্রোল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে মারলো, মতলব থানায় যে কিশোরের দেহ বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেল, সৈয়দপুরে যে নির্বাচিত পরিষদ সদস্যকে হত্যার পর দেহ ছয়টা খণ্ড করে রাস্তায় ঝুলিয়ে রাখল, যশোরে জেলখানার অভ্যন্তরে যে মহৎপ্রাণ আইনজীবীকে পিটিয়ে হত্যা করা হলো, মীরপুরে যে সাংবাদিককে জবাই করা হলো, রংপুরের বাংকারে যে দৃহবধূ পশু শক্তির কাছে সতীত্ব বিসর্জন দিয়ে ধরাধাম থেকে বিদায় নিলো, ঢাকায় যে বুদ্ধিজীবীকে চোখ বেঁধে নিয়ে বেয়নেটের খোঁচায় হত্যা করা হলো, করাচি থেকে যে দুঃসাহসী বৈমানিক মুক্তিযুদ্ধে শরিক হওয়ার প্রচেষ্টায় যুদ্ধবিমান নিয়ে রণাংগনে আসার প্রচেষ্টায় আত্মাহুতি দিল আর সীমান্ত প্রদেশের ওয়ারসাক ক্যাম্পে যে বাঙালি যুদ্ধবন্দি বিনা চিকিৎসায় মৃত তাঁর একমাত্র শিশু সন্তানকে পাথরের নিচে কবর

দিয়ে আহাজারি করলো– তারা আমরা সবাই এক সূত্রে গাঁথা, আমরা সবাই একই মাটির সন্তান।

তাই মুক্তিযুদ্ধের কথা বলবো আর বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু'র নাম উচ্চারণ করবো না, তা হয় না। একাত্তরের স্বাধীনতার ইতিহাস লিখবো কিন্তু মুজিবনগর সরকারের অবদানের উল্লেখ করবো না, কিংবা মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর জলিল, মেজর আবু তাহের, মেজর হায়দার, মেজর ওসমান, উইং কমান্ডার বাশার, মেজর মীর শওকত, মেজর মঞ্জুর, এয়ার কমডোর খন্দকার, ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দীন আর কাদের সিদ্দিকীর কাদেরিয়া বাহিনীর লড়াইয়ের কথা বলবো না– তা হয় না।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখার সময় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বরের পর কার প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে, কিংবা কে কোন্ রাজনৈতিক দলে যোগদান করেছে, সেটা বিচার্য বিষয় নয়। নয় মাসকাল মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কার কি ভূমিকা ছিল এবং এই যুদ্ধে কে কিভাবে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন, সেটাই বিচার্য। আর এই ইতিহাস লেখার সময় বাঙালি জাতিকে বিভক্ত হিসাবে চিত্রিত করার ধৃষ্টতা প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় হবে না। পাকিস্তানের বন্দি শিবিরে আটক হাজার হাজার বাঙালি সৈন্যরাও দেশপ্রেমিক। অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁদের বন্দি জীবনযাপন করতে হলেও তাঁদের মন-প্রাণ আমাদের সঙ্গেই ছিল। মুক্তিযুদ্ধে আমাদের কামিয়াবীর জন্য তাঁরাও আল্লাহ্‌র দরগায় ফরিয়াদ জানিয়েছে।

যা হোক, মুজিবনগর সরকার ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসেই সমগ্র রণাংগনকে মোট ১১টা সেক্টরে ভাগ করার ব্যবস্থ করলো। মুক্তিযুদ্ধে শেষ হওয়া পর্যন্ত কাদেরিয়া বাহিনী ও মুজিব বাহিনী এসব সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে কাদেরিয়া বাহিনীর সঙ্গে মুজিবনগর সরকারের কিছুটা যোগাযোগ স্থাপিত হলেও এই দুটো বাহিনীর ওপর নির্বাসিত সরকারের কোন রকম কর্তৃত্ব ছিল না বললেই চলে। তবে এঁরা মুজিবনগর সরকারের আওতার বাইরে নিজস্ব পদ্ধতিতে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখার সময় কোনরকম জোড়াতালির আশ্রয় গ্রহণ না করে বাস্তব অবস্থার সঠিক সুষ্ঠু রূপায়ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এদিকে প্রধান সেনাপতি কর্নেল (অবঃ) মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানীর অধীনে সমগ্র রণাংগনকে নিম্নোক্তভাবে ১১টা সেক্টরে ভাগ করে এগারোজন সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ করা হলো :

এক নম্বর সেক্টর

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ফেনী নদী পর্যন্ত

ক মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল-জুন), খ মেজর মোহম্মদ রফিক (জুন-ডিসেম্বর)

দুই নম্বর সেক্টর

নোয়াখালী জেলা, কুমিল্ল জেলার আখাউড়া-ভৈরব রেল লাইন পর্যন্ত এবং ফরিদপুর জেলার অংশ বিশেষ

ক মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর)

খ মেজর এম টি হায়দার (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর), নভেম্বর মাসে মেজর খালেদ গুরুতররূপ আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। নভেম্বরের শেষ নাগাদ

সুস্থ হয়ে পুনরায় যুদ্ধে যোগদান করেন। অবশ্য তখন তিনি 'কে' ফোর্সের অধিনায়ক।

তিন নম্বর সেক্টর

সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা, ঢাকা জেলার অংশ বিশেষ, কিশোরগঞ্জ মহকুমা এবং ভৈরব-আখাউড়া রেলওয়ে লাইনের পূর্ব দিকের কুমিল্লা জেলার বাকি অংশ

ক মেজর কে এম শফিউল্লাহ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর)

খ মেজর নূরুজ্জামান (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)

চার নম্বর সেক্টর

সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, পূর্ব ও উত্তর দিকে সিলেট-ডাউকি রোড পর্যন্ত মেজর সি আর দত্ত

পাঁচ নম্বর সেক্টর

সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল এবং ডাউকি-ময়মনসিংহ জেলার সীমান্ত পর্যন্ত মেজর মীর শওকত আলী

ছয় নম্বর সেক্টর

দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমা এবং ব্রহ্মপুত্র নদের তীরাঞ্চল ছাড়া সমগ্র রংপুর জেলা

উইং কমান্ডার এম বাশার

সাত নম্বর সেক্টর

রাজশাহী, পাবনা, ঠাকুরগাঁও মহকুমা ছাড়া দিনাজপুর এবং ব্রহ্মপুত্র নদের তীরাঞ্চল ছাড়া সমগ্র বগুড়া জেলা

ক নাজমুল হক (শহীদ আগস্ট '৭১)

খ মেজর কাজী নূরুজ্জামান (অবসরপ্রাপ্ত)

আট নম্বর সেক্টর

কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুরের অধিকাংশ ও খুলনার উত্তরাঞ্চল

ক মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (এপ্রিল-আগস্ট)

খ মেজর এম, এ, মঞ্জুর (আগস্ট-ডিসেম্বর)

নয় নম্বর সেক্টর

খুলনা জেলার দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা

ক মেজর এম এ জলিল (মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস কাল তিনি অসীম সাহসিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে এই সেক্টরে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে এঁকে গ্রেফতার করা হয়। সম্ভবত খুলনায় শান্তি ও শৃংখলাজনিত পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার প্রশ্নে মতবিরোধের সৃষ্টি হলে এই গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আট নং সেক্টরের অধিনায়ক মেজর এম এ মঞ্জুর ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে এই গ্রেফতারি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।

দশ নম্বর সেক্টর

হেডকোয়ার্টারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে একটা নৌ কমান্ডো বাহিনী সংগঠিত করা হয়। চালনা পোর্ট ছাড়াও অভ্যন্তরীণ নদী পথে এই বাহিনী বহু সাফল্যজনক অপারেশন পরিচালনা করেন। নৌ কমান্ডো বাহিনীর উল্লেখযোগ্য অপারেশন হচ্ছে রাতের অন্ধকারে চালনা বন্দরে অবস্থানকারী এগারোটি জাহাজ ঘায়েল করা। কাজের সুবিধার

জন্য এই মর্মে নির্দেশ ছিল যে, এঁরা যখন যে এলাকায় অপারেশন করবেন, সে এলাকার সেক্টর কমান্ডারের সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে তা করতে হবে। দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তীর্ণ নদীপথ ছাড়াও এঁরা চট্টগ্রাম এলাকাতেও তৎপর ছিলেন।

এগারো নম্বর সেক্টর

কিশোরগঞ্জ মহকুমা বাদে সমগ্র ময়মনসিংহ জেলা এবং ব্রহ্মপুত্র নদের (যমুনা) উভয় তীরবর্তী এলাকা।

ক মেজর আবু তহের (আগস্ট-নভেম্বর)

খ ফ্লাইট লে. এম হামিদুল্লাহ (নভেম্বর-ডিসেম্বর)। নভেম্বরে মেজর আবু তাহের গুরুতররূপে আহত হলে এম হামিদুল্লাহ সেক্টরে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই সেক্টরের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিশেষ করে টাঙ্গাইল জেলায় কাদেরিয়া বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপক সফলতা প্রদর্শন করে। এঁরা ছিলেন কাদের সিদ্দিকীর কমান্ডের বাহিনী।

২২

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার মাস কয়েকের মধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা এসে বিভিন্ন সেক্টর কমান্ডারদের অধীনে যোগ দিতে শুরু করলো। পার্বত্য ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয়, জলপাইগুড়ি, বিহার ও ছোটনাগপুরে ভারতীয় কর্তৃত্বাধীনে এঁদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এছাড়াও প্রতিটি সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা ছিল। বিশেষ করে দুই নম্বর সেক্টরেই মেজর এম টি হায়দারের নেতৃত্বে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-যুবককে গেরিলা ট্রেনিং দেয়া হয়। মূলত এঁরাই ঢাকা নগরীতে বিভিন্ন 'অপারেশন' কাজে লিপ্ত ছিল। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সন্নিকটে 'নাসিমন' বিল্ডিং-এর তিন তলায় অন্তরীণাবদ্ধ খালেদ মোশাররফের পরিবারকে এঁরাই দিবালোকে দুঃসাহসিক গেরিলা অভিযান পরিচালনা করে উদ্ধার করে কসবা সেক্টরে হাজির করেছিল। আবার ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে অর্থাৎ লে. জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিলে দস্তখত হবার আগেই এঁরা বিপদসংকুল ডেমরার রোড নিয়ে অগ্রসর হয়ে ঢাকার উপকণ্ঠে বাসাবো, খিলগাঁও, মাদারটেক, মুগদাপাড়া, কমলাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে 'পজিশন' গ্রহণ করে এবং ষোলই ডিসেম্বর ঢাকা বেতারকেন্দ্র দখল করে। অন্যদিকে কাদেরিয়া বাহিনী ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে কালিয়াকৈর থেকে ডেইরি ফার্মের পিছন দিয়ে সরাসরি সাভার এলাকায় হাজির হয়ে রেডিও'র ট্রান্সমিটার দখল করে মিরপুর রোড বরাবর এগিয়ে আমিন বাজার এলাকায় 'পজিশন' নেয়। মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত নিয়মিত বাহিনীগুলোর মধ্যে কাদেরিয়া বাহিনী সর্বপ্রথম ষোলই ডিসেম্বর সকালে মিরপুর ব্রিজ দিয়ে রাজধানী ঢাকা নগরীতে প্রবেশ করেছিল।

যাক যা বলছিলাম। অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের সেক্টর কমান্ডাররা একটা ব্যাপারে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হলো। যখনই মুক্তিযোদ্ধারা সেক্টর কমান্ডারের নির্দেশে 'এ্যাকশনের' জন্য রওয়ানা হয়, তখনই ভারতীয় সেনাবাহিনীর স্থানীয় কর্মকর্তারা আন-অফিসিয়ালি নানা 'ওজর-আপত্তি' উত্থাপন করতে শুরু করলো। এদের বক্তব্য হচ্ছে 'প্রফেশনাল' যুদ্ধের শর্ত পূরণ করে 'এ্যাকশনে' যেতে হবে। কিন্তু মুক্তিবাহিনীতে যথেষ্ট সংখ্যক সামরিক অফিসার ও জোয়ান না থাকায় এসব শর্ত পূরণ

সম্ভব ছিল না। উপরন্তু এসব এ্যাকশন ছিল অনেকটা গেরিলা পদ্ধতির। তাই প্রফেশনাল যুদ্ধের পদ্ধতি কোন সময়েই অনুসরণ করা হয়নি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর স্থানীয় কর্মকর্তাদের এসব ওজর-আপত্তির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার ছিলেন দুই নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ। আর এই সেক্টরের কসবা-আখাউড়া এলাকায় সবচেয়ে দীর্ঘদিনব্যাপী লড়াই সংঘটিত হয়েছে।

এরকম এক অবস্থায় মুজিবনগর সরকার বেশ ক'জন সেক্টর কমান্ডারদের মেজর থেকে লে. কর্নেল পদে প্রমোশন দিল। এদের মধ্যে লে. কর্নেল কে এম শফিউল্লাহ, লে. কর্নেল জিয়াউর রহমান ও লে. কর্নেল খালেদ মোশাররফ অন্যতম। এছাড়া মুজিবনগর সরকার এই তিনজনকেই ব্রিগেড আকারের ফোর্স গঠনের অনুমতি দিল। জুলাই মাসের শেষের দিকে লে. কর্নেল জিয়াউর রহমান 'জেড ফোর্স' গঠন করলেন। সেপ্টেম্বর নাগাদ খালেদ মোশাররফ 'কে ফোর্স' এবং লে. কর্নেল কে এম শফিউল্লাহ 'এস ফোর্স' গঠন করলে যুদ্ধের তীব্রতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলো।

এর মধ্যে জোনাল অফিসগুলো আরও সংগঠিত করা ছাড়াও মুজিবনগর সরকারের সচিবালয় সম্প্রসারিত হলো। এই প্রশাসনের আওতায় যেসব উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে পরিস্থিতির মোকাবেলায় দক্ষতা প্রমাণ করেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন :

সেক্রেটারি জেনারেল	: রুহুল কুদ্দুস
পররাষ্ট্র সচিব	: মাহবুবুল আলম চাষী (সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে এ ফতেহ)
দেশরক্ষা সচিব	: এ সামাদ (সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তথ্য ও বেতার সচিবের অতিরিক্ত দায়িত্ব)
অর্থ সচিব	: খোন্দকার আসাদুজ্জামান
মন্ত্রী পরিষদ সচিব	: তৌফিক ইমাম
সংস্থাপন সচিব	: নূরুল কাদের খান
তথ্য ও বেতার সচিব	: আনোয়ারুল হক খান
কৃষি সচিব	: এম নূরুদ্দীন
স্বরাষ্ট্র সচিব	: এম এ খালেক (পুলিশের আইজি'র অতিরিক্ত দায়িত্ব)
স্বাস্থ্য সচিব	: ডা. টি হোসেন
পরিচালক, আর্টস ও ডিজাইন	: কামরুল হাসান
পরিচালক, তথ্য ও প্রচার	: এম আর আখতার মুকুল
পরিচালক, চলচ্চিত্র দফতর	: আবদুল জব্বার খান
রিলিফ কমিশনার	: জয় গোবিন্দ ভৌমিক
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির একান্ত সচিব	: কাজী লুৎফুল হক
প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব	: ড. ফারুক আজিজ খান
উপ-সচিব, দেশরক্ষা	: আকবর আলী খান

উপ-সচিব, সংস্থাপন : ওয়ালীউল ইসলাম
উপ-সচিব, স্বরাষ্ট্র : খোরশেদুজ্জামান চৌধুরী
অর্থমন্ত্রীর একান্ত সচিব : সাদ'ত হোসেন
উচ-সচিব রিলিফ
এবং ডেপুটি রিলিফ কমিশনার : মামুনুর রশীদ
ট্রান্সপোর্ট পুল অধিকর্তা : এম এইচ সিদ্দিকী
প্রধানমন্ত্রীর স্টাফ অফিসার : মেজর নুরুল ইসলাম
প্রধান সেনাপতির এডিসি : লেঃ শেখ কামাল ও ক্যাপ্টেন নূর
পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পি, আর, ও, : কুমার শংকর হাজরা

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বিশেষ সেল ঃ অধ্যাপক আব্দুল খালেক–এম এন এ, তাহেরউদ্দীন ঠাকুর-এম এন এ জোয়াদুল করিম ও আমিনুল হক বাদশা।

যাই হোক, আবার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ স্বয়ং তথ্য, প্রচার ও বেতার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে লিপ্ত থাকায় টাঙ্গাইল থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য জনাব আব্দুল মান্নানকে এই মন্ত্রণালয়ে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে তত্ত্বাবধায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই মন্ত্রণালয়ের জন্য একজন পৃথক সচিব পর্যন্ত ছিল না। দেশরক্ষা সচিব জনাব এ সামাদ তথ্য সচিবের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। এতে মাঝে মাঝে স্বাভাবিকভাবেই বিভ্রাটের সৃষ্টি হচ্ছিল। তবে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে লন্ডন থেকে আনোয়ারুল হক খান মুজিবনগরে এসে তথ্য সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করলে পরিস্থিতির সুরাহা হয়।

কাজের সুবিধার জন্য তথ্য, প্রচার ও বেতার মন্ত্রণালয়ের অধীন চারটা দফতর সৃষ্টি হয়। এসব দফতরগুলো হচ্ছে তথ্য ও প্রচার, আর্টস ও ডিজাইন, ফিল্মস এবং বেতার দফতর। বেতার দফতরের ডিরেক্টরের পদ ষোলই ডিসেম্বর পর্যন্ত শূন্য ছিল। ফলে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র আব্দুল মান্নান এম এন এ এবং তথ্য সচিব আনোয়ারুল হক খানের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ছিল। মেসার্স কামরুল হাসান, এম আর আখতার ও আব্দুল জব্বার খান বেতারকেন্দ্রের উপদেষ্টা হিসাবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। আগেই বলেছি যে, এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে, পাকিস্তান বেতারকেন্দ্রগুলো থেকে বিপুল সংখ্যক বাঙালি কর্মচারী 'ডিফেক্ট' করা সত্ত্বেও এঁদের মধ্যে কোন প্রথম শ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন না। ঢাকা টেলিভিশনের দু'জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী যথাক্রমে জামিল চৌধুরী ও মোস্তফা মনোয়ার মুজিবনগরে অবস্থান করা সত্ত্বেও 'অজ্ঞাত কারণে' তাঁরা স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র পরিচালনায় যুক্ত ছিলেন না।

সেপ্টেম্বর মাসে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে বিশেষ মহলের প্ররোচনায় দিন কয়েকের জন্য অঘোষিত ধর্মঘট (কেবলমাত্র তিনটি ভাষায় সংবাদ বুলেটিন প্রচারিত ছাড়া) হয়েছিল। ফলে মুজিবনগর সরকার বেশ উদ্বিগ্ন হয়। তৎকালীন দেশরক্ষা ও তথ্য সচিব জনাব এ সামাদ বেতারে চুক্তিভিত্তিক চাকরিজীবীদের চাকরির মেয়াদ ১৫ই অক্টোবর পর্যন্ত বৃদ্ধি করে ৭ই অক্টোবরের মধ্যে এককভাবে স্ব স্ব দাবি দাখিলের নির্দেশ

দেন। মুজিবনগর সরকারের পুরানো নথি থেকে জনাব সামাদের দস্তখত করা নোটে দেখা যায় যে, মোট ১১ জন চুক্তিভিত্তিক এবং ৭ জন্য নিয়মিত বেতার কর্মচারী দাবি পেশ করেন। এঁদের মধ্যে এম মামুন, মোহম্মদ ফারুক, রণজিৎ পাল চৌধুরী, প্রণোদিৎ কুমার বড়ুয়া, মোহাম্মদ আবু ইউনুস, জরীন আহমদ, রবীন্দ্রনাথ রায়, পারভীন হোসেন, মোঃ আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, সাদেকীন, অরুণ কুমার গোস্বামী, নূরুল ইসলাম সরকার, সুব্রত বড়ুয়া, বাবুল আখতার (মনজুর কাদের), শহীদুল ইসলাম ও মান্না হক প্রমুখ অন্যতম।

এছাড়া চট্টগ্রামে স্বল্পকালস্থায়ী বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের সেই দুঃসাহসী ১১ জন বেতারকর্মী ৭ই অক্টোবর এক আবেদনে মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসের বেতন প্রার্থনা করেন। মুজিবনগর সরকারের নথিতে দেখ যায়, এঁদের এই তিন মাসের বেতন না দিয়ে 'সান্ত্বনাসূচক' পত্র দেয়া হয়। এঁরা হচ্ছেন : ১. বেলাল মোহাম্মদ, ২. সৈয়দ আব্দুস সাকুর, ৩. মোঃ আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, ৪. রাশেদুল হাসা, ৫. আমিনুর রহমান, ৬. মোস্তফা আনোয়ার, ৭. আব্দুল্লা আল্ ফারুক, ৮. এ এইচ এম শরফুজ্জামান, ৯. রিয়াজুল করিম চৌধুরী, ১০. কাজী হাবিব উদ্দিন, ১১. সুব্রত বড়ুয়া। ইংরেজিতে লেখা তথ্য সচিবের নোটের উপর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের বাংলায় প্রদত্ত নির্দেশ ছিল, "জনাব আবদুল মান্নান এম এন এ সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে ১৫ই অক্টোবরের মধ্যেই শিল্পীদের সাক্ষাৎদান বা অন্য কোন প্রক্রিয়াতে তাঁদের চুক্তিপত্র বা অন্যরূপ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেলা আবশ্যক। প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অনুমোদন করা হলো।"

মুজিবনগর সরকারের নথিতে এ ব্যাপারে নয়া তথ্য সচিব জনাব আনোয়ার হকের দস্তখত করা ৩০শে অক্টোবরের নোটের মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নোটে বলা হয় যে, প্রথম গ্রুপ অর্থাৎ যারা রেডিও পাকিস্তানের প্রাক্তন কর্মচারী তাঁদের স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে সরাসরি নিয়োগ করা হয়েছে। দ্বিতীয় গ্রুপ অর্থাৎ যারা আগে বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করতেন, কিন্তু বর্তমানে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে নিয়োজিত রয়েছেন, তালিকা মোতাবেক তাঁদের চুক্তিভিত্তিক চাকরি আরও তিন মাস মেয়াদে বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে প্রাক্তন তথ্য সচিবের সুপারিশ মোতাবেক মেসার্স আবদুল জব্বার, আপেল মাহমুদ, মান্না হক এবং রথিন রায়ের চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়নি। এছাড়া মাধুরী চ্যাটার্জী, নাসিম চৌধুরী ও ইয়ার মোহাম্মদ পরিচালিত 'সোনার বাংলা' অনুষ্ঠানের মান ও বক্তব্য সন্তোষজনক নয় বলে এই অনুষ্ঠান বন্ধ করা হয়েছে। তবে এইসব শিল্পীদের অনিয়মিত শিল্পী হিসাবে অন্য অনুষ্ঠানে নিয়োগ করতে বলা হয়েছে।

এছাড়া অনুষ্ঠানের মান উন্নয়নের জন্য অবিলম্বে তিনজন অভিজ্ঞ স্ক্রিপ্ট রাইটার নিয়োগের সুপারিশ করা ছাড়াও নাটক বিভাগে প্রখ্যাত নাট্যকার রণেন কুশারীর নিয়োগের কথা বলা হয়।

এম এন এ ইনচার্জ জনাব আব্দুল মান্নান তথ্য সচিবের সুপারিশের সঙ্গে একমত হলে এসব ব্যবস্থা অবিলম্বে বাস্তবায়িত হয় এবং স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে পূর্ণ শৃংখলা ফিরে আসে। এদিকে তখন বিভিন্ন রণাংগন থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের একটার পর একটা সাফল্যের খবর এসে পৌছাতে শুরু করলে চারদিকে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং সবাই দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ অব্যাহত রাখে।

২৩

একাত্তরের সেপ্টেম্বর মাসের কথা। বালীগঞ্জে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে স্টুডিওতে সকাল দশটা নাগাদ 'চরমপত্রে'র স্ক্রিপ্ট রেকর্ড করতে গিয়ে দেখি বিষাদের ছায়া। কারণ জিজ্ঞেস করলাম। দিন কয়েক আগে বগুড়া জেলার ধুনটা থানায় গেরিলা হামলা করতে গিয়ে আমাদের মুক্তিবাহিনীর তেরোজন যোদ্ধা নিহত হয়েছে। এই খবরে অনেকের মধ্যে হতাশার ছায়া। নিউজ সেকশনে গিয়ে খবরটা পড়লাম। মেঘালয় সেক্টর থেকে এই দুঃসাহসী বাঙালি যোদ্ধারা প্রায় পাঁচদিন প্রচেষ্টার পর ব্রহ্মপুত্র নদ তথা যমুনা নদী দিয়ে শত্রু পক্ষের পাহারা এড়িয়ে পূর্ব বগুড়ার সারিয়াকান্দি এলাকায় হাজির হয়। তারপর ধুনটা থানার শত্রু পক্ষের ক্যাম্পের ওপর এই গেরিলা হামলা। কোন রকম 'কভার' ছাড়াই বেশ ক'জনকে হত্যা ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করতে সক্ষম হলেও পশ্চাদপসরণের সময় মাত্র পাঁচজন ফিরে আসে। এই যুবকদের সবাই বগুড়া ও সিরাজগঞ্জের সন্তান। পরে জেনেছিলাম আমার সম্পর্কে বড় শালীর এক কিশোর পুত্র খোকন এই এ্যাকশনে নিহত হয়। অথচ তার পিতা মোজাম পাইকার হচ্ছেন আজীবন মুসলিম লীগার। মান্নান সাহেব আমাকে ডেকে বললেন, "খুউব তো 'চরমপত্রে' চাপাবাজি করতাছেন। অহন তো হেরাই কইতে পারে—এহায় কেমন বুঝতাছেন? মুকুল সাহেব, আমরা বোধ হয় 'টিবিটিয়ান রিফিউজি' হইয়া গেলাম?"

কথাগুলো শুনে বুকটা ধক্ ধক্ করে উঠলো। প্রায় দশ বছর আগে চীন-ভারত যুদ্ধের প্রাক্কালে তিব্বত থেকে যে লক্ষাধিক শরণার্থী দালাইলামার সঙ্গে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে, তারা তো এখনও দিল্লি-কোলকাতার পথে পথে ঘুরছে? কোন সুরাহাই হয়নি। সাহস সঞ্চয় করে জবাব দিলাম : আমাগো পোলাপানরা যদি মেঘালয় থাইক্যা আইশ্যা বগুড়ার ধুনটা থানা আক্রমণ করতে পারে, তা হইলে লড়াইয়ের কারবারটা এই বিচ্ছুগো ওপর ছাইড়্যা দেন। আর তা ছাড়া কোন রকম 'কভার' ছাড়া যে হামলা করছিল, তাতে তো বেবাকগুলারই মারা যাওয়ার কথা। তবুও আমাগো পোলাপান দেইখ্যা পাঁচজন ফেরত আইছে। এরপর যখন 'গেরিলা' হামলার টাইমে ঠিক মতন 'কভার' পাইতে শুরু করবো, তহনকার কথাটা চিন্তা করতে পারতাছেন?

কথা ক'টা বলে একটু উত্তেজিত হয়ে উঠছিলাম। তাই এক কাপ চা সংগ্রহ করে নিউজ রুমের কোণায় বসে সেদিনকার স্ক্রিপ্ট সংশোধন করলাম। "হয়ে গ্যাছে। হেগো কুফা অবস্থা হয়ে গ্যাছে। জঙ্গি সরকারের হানাদার বাহিনীর লগে আইজ কাইল একজন কইরা মওলবী সাব দিতাছে। আমাগো বিচ্ছু বাহিনীর আত্‌কা আর আন্ধারিয়া মাইর খাওনের পর যখন হেগো সোল্‌জাররা আখেরি দমডা ফালাইবার জন্যি শরীলডা খিঁচতে শুরু করে, তহন এই মওলবী সাবে এতটুক্ আল্লাহর নাম হুনাইয়া দেয়। ব্যস, লাহোরে যে পোলাডা পয়দা হইয়া পয়লা দম পাইছিল, আমগো ভুরুংগামারীতে হেই বেডায় আখেরি দমডা ছাড়লো। এরপর কেদোর মাইন্দে হোতনের পালা। আর কোন নিশানা পর্যন্ত রইলো না। আগেই কইছিলাম এক মাঘে শীত যায় না। তহন মছুয়া বেডাগো কী চোটপাট। আমাগো লগে শ্যাম চাচা রইছে— আমাগো লগে বোঁচা মামু রইছে। অহন তো চাচা-মামু কাউরেই দেখতাছি না?"

'চরমপত্র' স্ক্রিপ্ট রেকর্ডিং-এর পর বিক্ষুব্ধ মনে বালু হক্কাক লেনে 'জয় বাংলা' পত্রিকা অফিসে এলাম। জনাকয়েক অপরিচিত লোক প্রবীণ সাংবাদিক আব্দুর রাজ্জাক ও সন্তোষ গুপ্তের সঙ্গে আলাপ করছেন। আমাকে দেখেই রাজ্জাক ভাই বললে, 'অনেক দিন বাঁচবেন। আপনার কথাই হচ্ছিল। এঁরা এসেছেন তমলুক থেকে। মহকুমা শহর থেকে মাইল বিশেক দূরে মহিষাদলে এঁরা তিনদিনব্যাপী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করেছেন। এই দেখেন প্রচারপত্রে আমাদের নাম পর্যন্ত ছাপা হয়েছে। গাফ্‌ফার ও মাহবুবও যাচ্ছে।' প্রচারপত্রটা হাতে নিয়ে দেখলাম। প্রখ্যাত সাংবাদিক গাফ্‌ফার চৌধুরী, আদমজী পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক আব্দুর রাজ্জাক, মাহবুব তালুকদার, সন্তোষ গুপ্ত আর স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের 'চরমপত্র' লেখক ও পাঠক এম আর আখতারের নাম ছাপা হয়েছে। আমি বিনীতভাবে বললাম, 'আমার সঙ্গে আলাপ না করে আমার নাম ছাপাটা আপনাদের ঠিক হয়নি। আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। একদিকে মুজিবনগর সরকারের চাকরি, অন্যদিকে রোজ রাতে 'চরমপত্রে'র স্ক্রিপ্ট লেখা আর পরদিন রেকর্ডিং করতে হয়। তাই আমি যেতে পারবো না। বহু অনুরোধ-উপরোধের পর বললাম, 'চেষ্টা করে দেখবো। তবে পুরো কথা দিতে পারলাম না।' বালু হক্কাক লেন থেকে সোজা এক নম্বর বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে আমার অফিসে চলে এলাম। মনে পড়লো হপ্তাখানেক আগে এক প্রতিনিধি দলের তালিকা থেকে আমার নাম কেটে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, 'মুকুল তো যেতে পারবে না। ওকে তো রোজ 'চরমপত্র' লিখতে হবে।' মনকে প্রবোধ দিতে পারিনি। যাঁরা গায়ে ফুঁ দিয়ে মাতবরি মেরে বেড়াচ্ছে, তারাই প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করছে তাঁদের কপালে শূন্য।

কাজের চাপে তমলুক মহকুমার মহিষাদলে যাবার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। দিন কয়েক পরে সকালে বাসার দরজা খুলে দেখি তিনজন ২০/২২ বছরের ছেলে দোরগোড়ায় বসে রয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা কি চান?'

উত্তরে বললো, 'স্যার, আমাদের চিনতে পারলেন না? সেদিন বালু হক্কাক লেনে দেখা হয়েছিল। আমরা এসেছি তমলুকের মহিষাদল থেকে।'

'তা তো বুঝলাম। আমার পক্ষে যাওয়া কিন্তু সম্ভব হবে না।' একটু রাগত স্বরেই বললাম। তিনজন যুবক প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠলো। একজন বললো, 'স্যার গতকাল বিকালে সম্মেলন শুরু হওয়ার সময় প্রায় হাজার তিরিশেক লোক জমায়েত হয়েছিল। কিন্তু যখনই শুনলো যে, এতো প্রচার সত্ত্বেও 'চরমপত্র' আসেনি, তখনই গণ্ডগোল শুরু হলো। শেষে আমাদের প্যান্ডেল পুড়িয়ে দিয়েছে। আমরা তিনজনে কোন রকমে রাতে পালিয়ে কোলকাতায় এসেছি। আপনাকে নিতে না পারলে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।'

ওদের কথাবার্তা শুনে মায়া হলো। বললাম, 'ঠিক আছে, আগামীকাল সকালে দশটার ট্রেনে যাবো। তবে আমার ফ্যামিলি সঙ্গে থাকবে। থাকা-খাওয়ার ঠিক মতন ব্যবস্থা হয় যেনো। কাছিম আর পাঁঠার মাংস খাই না কিন্তু।' আমি যাবো শুনে তিনজনেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। আগের ছেলেটাই বললো, 'স্যার, আমি নিজে এসে আপনাদের হাওড়া স্টেশনে নিয়ে যাবো। ওদের আজই পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

সকাল আটটা নাগাদ স্বাধীন বাংলায় গিয়ে সেদিনের 'চরমপত্র' রেকর্ডিং করে আশফাককে বললাম, রাতে আরও দুটো স্ক্রিপ্ট অগ্রিম রেকর্ডিং করবো। এরপর

দৌড়ালাম বালু হক্কাক লেনে মান্নান ভাইয়ের কাছে দু'দিনের ছুটির জন্য। তিনি সহাস্যে রাজি হলেন। তারপর গেলাম রেডিয়ান্ট প্রসেস প্রেসে। আমাদের তথ্য ও প্রচার দফতরের যে বইটা ছাপা হচ্ছে তার প্রুফ দেখতে হবে। প্রুফগুলো নিয়ে বেলা বারোটা নাগাদ বাসায় ফিরে এলাম। দুপুরে খেয়ে লিখতে বসলাম। যখন লেখা শেষ করলাম, তখন রাত ন'টা বাজে। লেখা শেষ করার আনন্দে বিকট একটা চিৎকার দিলাম। গিন্নী খাওয়ার জন্য অনুরোধ করলো। বললাম ভরপেটে রেকর্ডিং করতে বড্ড কষ্ট হয়। তাই ফিরে এসে খাবো।

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে দুটা 'চরমপত্র' স্ক্রিপ্ট অগ্রিম রেকর্ডিং শেষ করে যখন বাসায় ফিরলাম তখন রাত এগারোটা বেজে গেছে। খাওয়ার পর আবার বই-এর প্রুফ নিয়ে বসলাম। চারদিকে নিঝুম রাত। কর্মচঞ্চল কোলকাতা মহানগরী প্রায় নীরব-নিথর। আর আমি নিবিষ্ট মনে প্রুফ দেখে চলেছি। প্রুফ শেষ করে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত আড়াইটা। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত অবস্থায় বিছানায় গিয়ে কাত হলাম।

সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ অনেক ডাকাডাকির পর ঘুম থেকে উঠে দেখি সবাই তৈরি আর বাসার সামনে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।

হাওড়া থেকে ইলেকট্রিক ট্রেনে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে তমলুক। আবার তমলুক থেকে দুপুর নাগাদ মহিষাদলে পৌঁছলাম। আমাদের থাকার জায়গা এক ডাক্তার ভদ্রলোকের বাসায়। নাম হরিধন দত্ত। স্ত্রী ও তিন পুত্র কন্যাসহ ছোট্ট পরিবার। আদি বাড়ি ঢাকার বিক্রমপুরের তাড়পাশায়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে আমরা ঢাকায় থাকতাম জেনে কী খুশি। খাতিরের আর অন্ত নেই। ভদ্রলোক তাঁর নিজের শোবার ঘর আমাদের জন্য ছেড়ে দিলো। আরাম করে গোসলের পর ঘুমিয়ে পড়লাম। বেলা দুটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে শুনলাম দুপুরের খাওয়া তৈরি।

বড় রান্নাঘর। সেখানে আসন পেতে আমাদের সবার খাওয়া দেয়া হয়েছে। হিন্দুর রান্নাঘর। তাই যেতে ইতস্তত করছিলাম। এমন সময় মিসেস দত্ত নিজেই বেরিয়ে এলেন। বললেন, 'আজ থেকে আপনি আমার বড়'দা। আমাকে সুমিত্রা নামেই ডাকবেন।' এই কথা শুনে ওদের এক পুত্র ও দুই কন্যা আমাকে 'মামা' বলে সম্বোধন করলো। আমি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। আমার ছোটবেলাতেই দেখেছি মুসলমানের ছোঁয়া থাকলে লংকাকাণ্ড হয়ে যেতো। আর আজ? কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

সারাটা দুপুর আমরা শুধু ঢাকার গল্প করে কাটালাম। ডাক্তার দত্ত এর মধ্যে বেরিয়ে গেলেন মাইল পাঁচেক দূর থেকে ভালো রুই মাছ আর গলদা চিংড়ি আনার জন্য। রাতে আমাদের খাওয়াবেন। সন্ধ্যার একটু আগে সম্মেলনের স্থানে এলাম। মহিষাদল হাই স্কুলের মাঠে এই সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চারদিকে লোকে লোকারণ্য। আন্দাজ করলাম হাজার তিরিশেক লোক জমায়েত হয়েছে। অর্ধেকের বেশি মহিলা।

বক্তৃতা দিতে উঠে প্রথমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ৪২-এর অসহযোগ আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমির বর্ণনা দিলাম। বললাম, আমাদের মহাদুর্যোগের সময় আপনারা আশ্রয় দেয়া ছাড়াও নানাভাবে সাহায্য করছেন বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তবে দোহাই লাগে আপনাদের। ভাই হিসাবে দূর থেকে আমাদের শুভ কামনা করলে বন্ধুত্ব অটুট থাকবে।

কিন্তু 'গার্জিয়ান' হবার চেষ্টা করলে উভয়ের জন্য অমঙ্গল হবে। বক্তৃতা পর্ব শেষ হবার পর 'চরমপত্র' পাঠ করার আশ্বাস দিলাম।

পরদিন সকাল দশটায় বিদায় পর্ব। সুমিত্রা ও তার ছেলেমেয়েরা পা ছুঁয়ে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিলো। বিদায় লগ্নে আমারও চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। ট্যাক্সিতে ওঠার পর ডাক্তার দত্ত আমার হাত ধরে বললো, 'দাদা, আমরা কি কোন দিনই বিক্রমপুরে পিতা-মাতামহের জন্মভূমি দেখতে পারবো না?'

আমি বললাম, 'দেশ স্বাধীন হলে নিশ্চয়ই পারবেন। তবে ভারতীয় পাসপোর্ট ও বাংলাদেশী ভিসায় তা সম্ভব হবে।' আমার শেষের কথাগুলো গাড়ি স্টার্টের শব্দে কিছুটা ডুবে গেলো কিনা বুঝতে পারলাম না।

২৪

একাত্তরের সেপ্টেম্বরের শেষ দিকের কথা। ভর দুপুরে এক নম্বর বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে মুজিবনগর সরকারের তথ্য ও বেতার দফতরে বসে একগাদা প্রুফ দেখছিলাম। মাঝে মাঝে খবর নিচ্ছিলাম যে, আমাদের জোনাল অফিসগুলোতে এবং বিদেশে ছ'টা বাংলাদেশ মিশনে পাঠাবার জন্য সবগুলো প্যাকেট তৈরি হয়েছে কিনা। এসব প্যাকেটে তথ্য দফতরের প্রকাশিত বই, প্রচারপত্র, ফোল্ডার এমনকি বড় বড় পোস্টার পর্যন্ত রয়েছে। এই পোস্টারগুলোর একটা শিল্পী কামরুল হাসানের আঁকা 'এই জানোয়ারকে হত্যা করতে হবে'। বিদেশীদের জন্য ইংরেজিতেও ছাপা হয়েছে। এমন সময় পিওন একটা ভিজিটিং কার্ড নিয়ে এলো। প্রশান্ত সরকার, ব্যুরো চিফ, সাপ্তাহিক ব্লিটজ, কোলকাতা। ভদ্রলোককে ভিতরে আসতে বলে মুহূর্ত কয়েক চিন্তা করলাম। প্রশান্তবাবু ঘরে ঢুকে হাসিমুখে এমনভাবে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন, তাতে মনে হলো না জানি কত যুগের পরিচয় আমাদের। তাকে চেয়ারে বসতে দিয়ে আমার ভ্রূ কুঁচকে উঠলো– কোথায় যেনো দেখেছি। ঝট্ করে মনে পড়লো দিন কয়েক আগে আমাদের মুক্তিবাহিনীর সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে ছোট একটা রিপোর্ট স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় তখন অন্যতম শিফট-ইন-চার্জ সন্তোষ বসাক। আদি ও অকৃত্রিম ঢাকাইয়া হিন্দু। এক সময় ঢাকায় দৈনিক আজাদের স্টাফ রিপোর্টার ছিল। 'এই ঢাকায়-ঢাকাইয়া' নামে আজাদে লেখা তাঁর সাপ্তাহিক ফিচার খুবই নাম করেছিল। আমি তখন দৈনিক ইত্তেফাকের রিপোর্টার ছিলাম। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা অফিসে গিয়ে সন্তোষদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সেই ছোট্ট খবরটার কথা। গোপনে বলেছিল, 'চিফ রিপোর্টার প্রশান্ত সরকারের লেখা। নকশালদের সঙ্গেও প্রশান্তের যোগাযোগ রয়েছে। ওদের আন্ডার গ্রাউন্ড কাগজেও লেখে।' তাই আজ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপের শুরুতে আমিও হাসিমাখা মুখে বললাম, 'আপনে তো ক্যালকাটা স্টেটস্‌ম্যানেরও চিফ রিপোর্টার-তাই না?'

'না, না, আজ আমি এসেছি ব্লিটজ-এর ব্যুরো চিফ হিসেবে। আমার কভার স্টোরির জন্য কিছু ম্যাটেরিয়াল দিতে হবে। প্লিজ। চলুন না, কোথাও গিয়ে বসি?'

শেষ পর্যন্ত কাছেই একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসতেই ভদ্রলোক দু'পেগ হুইস্কির অর্ডার দিলেন। আমি গভীরভাবে বললাম, 'দুটো কেনো আমি তো খাই না।' মনে হলো আকাশ থেকে পড়লেন। প্রশান্তবাবু এক রকম চিৎকার করে উঠলেন, 'বলেন কি মশায়? হুইস্কিতে অরুচি? আমার আজ দুপুরের খাওয়াটাই মাটি হয়ে যাবে।'

অনেক সাধ্য-সাধনা করেও কোন ফল হলো না। পরিবেশ হালকা করার জন্য বললাম, 'দাদা আপনি স্বচ্ছন্দে চালিয়ে যান। আমি বরং একটা লাচ্ছি খাবো। বহু বছর পর পশ্চিম বাংলায় আবার যখন বাঙালি হিন্দু সমাজটা অন্তরঙ্গ আলোকে দেখছি, তখন অবাক হয়ে যাচ্ছি। যদিও ধর্মীয় কুসংস্কার অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে ও মনের উদারতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তবুও তিন যুগ আগেকার সেই মেধার অনুপস্থিত দেখতে পাচ্ছি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতীয় প্রতিযোগিতায় এরা আর স্থান দখল করতে পারছে না। নৈরাশ্য আর হতাশা পশ্চিম বাংলার যুব শ্রেণীকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। মনে হয় এরই ফলশ্রুতি হিসাবে নকশাল আন্দোলন পশ্চিম বাংলায় দ্রুত প্রসার লাভ করেছে।

ভাবতে অবাক লাগে, যে ভদ্রলোক দু'আনার নস্য ব্যবহার করে আর বাস- ট্রামে যাতায়াত করে পয়সা বাঁচায়, তিনিই আবার মাইনের টাকা খরচ করে মদ্যপান করেন। প্রাসঙ্গিক বলে একটা ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। ১৯৪৪ সালের কথা। আমি তখন দিনাজপুর মহারাজা গিরিজানাথ হাই স্কুলের ছাত্র। মণি মুখার্জী স্কুলের প্রধান শিক্ষক। টিফিন পিরিয়ডে আমাদের দশম শ্রেণীর তিনজন হিন্দু ছাত্রকে গাঁজা খাওয়া অবস্থায় ধরে আনা হলো। ক্লাসে মোট ৫২ ছাত্রের দু'জন মুসলমান। বাকি সবাই হিন্দু। টিফিনের পর ক্লাস শুরু হলে আদ্দির পাঞ্জাবি, শান্তিপুরী ধুতি আর গ্লাসকিটের পাম্প-সু পরিহিত প্রধান শিক্ষক মণি মুখার্জী এসে একটা বক্তৃতা করলেন। পুরো বক্তৃতাটাই হিন্দু ছাত্রদের প্রতি ভর্ৎসনামূলক। তিনি বলেন, হিন্দু যুব সমাজ গাঁজা, ভাং, আফিম, দেশী মদ সব রকম নেশায় অভ্যস্ত। এরা নেশার সময় কোন রকম বাছ-বিচার করে না। এছাড়া বাঙালি হিন্দু যুবকদের বাপ-দাদার সম্পত্তি বিক্রি করে নেশায় আসক্ত হওয়ার ভূরিভূরি প্রমাণ রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের বহু উপন্যাসে তার প্রতিফলন রয়েছে। আর বাঙালি মুসলমান যুবকরা চাকরি জীবনে ঘুষের টাকায় ভালো মদ ও সিগারেট ছাড়া খায় না। মাস্টার মশায়ের এই বক্তৃতা আমার মনে আজও পর্যন্ত জাগ্রত রয়েছে।

একাত্তরের কোলকাতায় একটু অবস্থাপন্ন বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে মদ্যপানের প্রকট অভ্যাস লক্ষ্য করলাম। বালিগঞ্জে ডক্টর অমিয় মুখার্জীর বাসভবনে সান্ধ্যকালীন আসরে শ্যামবাজারের অপর প্রান্ত থেকে প্রখ্যাত সাংবাদিক গৌর কিশোর ঘোষকেও নিয়মিত যাতায়াত করতে দেখেছি। আর এক সংবাদপত্র সম্পাদক তো মদের আখড়ায় বসে নিজের কন্যার সম্প্রদান করতে পারেনি। শুধু লগ্ন পার হওয়ার শেষ মুহূর্তে কন্যার মাতুল সে দায়িত্ব পালন করেছিল।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দু'জন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সফরে এলে তাঁদের এক মাস মেয়াদি পাসপোর্ট দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। পরে জেনেছিলাম মদ্যপ দেখে তাঁদের প্রতি এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে কবি মশায়কে একদিন সকালে পূর্বাণী হোটেলের লিফট-এর পাশে ঘুমন্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। সঙ্গে অবশ্য ঢাকার কয়েকজন তরুণ কবিকে অনুরূপ অবস্থায় দেখা গিয়েছিল। ঢাকায় সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে তিনি কপি রাইট বিক্রি করার দলিলে দস্তখত করে গেছেন। আর এক প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক কার্যোপলক্ষে একবার বাংলাদেশে এসেছিলেন। কিন্তু ভদ্রলোককে কোন দিন সুস্থ অবস্থায় দেখিনি। বেশ কিছুদিন আগেই এই প্রতিভাবান হিন্দু ভদ্রলোকের মৃত্যু হয়েছে।

আবার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। খেতে খেতে প্রশান্ত বাবুর সঙ্গে বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অনেক আলাপ হলো। শেষ পর্যন্ত আমরা এক অলিখিত চুক্তিতে

উপনীত হলাম। ক্যালকাটা স্টেটসম্যানের লেখার ব্যাপারে মুজিবনগর সরকারের তথ্য অধিকর্তা হিসাবে আমার কোন অনুরোধ থাকবে না। তবে ইংরেজি সাপ্তাহিক বোম্বের 'ব্লিটজ'-এর কভার স্টোরির ব্যাপারে আমি যেভাবে বলবো সেভাবে রিপোর্টিং হবে। লাঞ্চের পর অফিসে ফিরে এসে মুক্তিবাহিনীর লড়াই সম্পর্কিত অনেকগুলো ফটো প্রশান্ত বাবুকে দিলাম। এরপর ব্লিটজের স্টোরির জন্য নানা তথ্য সরবরাহ করলাম। শেষে তাঁর সঙ্গে তাজউদ্দিন আহমদ ও ওসমানী সাহেবের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলাম। পরের সপ্তাহে 'ব্লিটজ' পত্রিকায় বিশেষ সাক্ষাৎকার ও ফটো ইত্যাদিসহ ছ'পৃষ্ঠা ছাপা হয়েছিল। ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে সর্বাধিক প্রচারিত এই ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যপ্রাচ্যের প্রচার সংখ্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দিন কয়েক পরে বিকেলের দিকে লেখা দেয়ার জন্য ইউপিপির অজিত দাসের সঙ্গে সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার অফিসে গিয়েছি। সম্পাদক সাগরময় ঘোষের সঙ্গে কথাবার্তার পর ভাবলাম আনন্দবাজারে একটু আড্ডা মেরে যাই। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও অন্যতম সহকারী সম্পাদক সৈয়দ মোস্তফা সিরাজের সঙ্গে পরিচয়ের পর বার্তা সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরীর টেবিলে বসে চা খেলাম। এমন সময় অমিতাভ বাবু আমার দিকে এএফপি'র এক ছোট্ট সংবাদ এগিয়ে দিয়ে বললেন, দেখেন মশায় আপনাদের বিচ্ছুদের কাণ্ড দেখেন?

নিবিষ্ট চিত্তে ছোট্ট নিউজটা দেখলাম। ফেনীর কাছে দুষ্কৃতকারীদের হামলায় একটা খাদ্যবাহী ট্রাক বিধ্বস্ত হয়েছে। আর ড্রাইভারসহ জনা পাঁচেক বেসরকারি নিরীহ লোক নিহত এবং ট্রাকের সমস্ত খাদ্য বিনষ্ট হয়েছে। মনে হলো খবরটার মধ্যে কোথায় যেন ফাঁকি রয়েছে। অমিতাভ বাবুর অনুমতি নিয়ে নিউজের কপিটা সঙ্গে করে বাসায় ফিরে এলাম। রাতে 'চরমপত্র' লিখতে বসে বার বার ফেনীর এই নিউজটার কথা চিন্তা করলাম। এতো সব নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ঢাকা থেকে এই নিউজটা ছাড়া পেলো কেমন করে? তাহলে এই নিউজটা কর্তৃপক্ষের আশীর্বাদপুষ্ট। সেক্ষেত্রে এর পিছনে উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্যটা হচ্ছে বহির্বিশ্বে প্রচার করা। কর্তৃপক্ষ যেখানে মফস্বল এলাকায় লোকদের জন্য খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করছে, সেখানে মুক্তিযোদ্ধারা সেই খাদ্যশস্য বিনষ্ট করছে। আর এদের হামলায় নিরীহ সাধারণ মানুষ নিহত হচ্ছে। এতে স্বাভাবিকভাবেই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বহির্বিশ্বে ঘৃণার উদ্রেক হবে। তাহলে আসল ব্যাপারটা কি? চিন্তার জাল বুনতে শুরু করলাম। ঘণ্টাখানেক পরে আকস্মিকভাবে চিৎকার করে উঠলাম।

পুরো ব্যাপারটাই এবার উল্টা দিক দিয়ে চিন্তা করলাম। এএফপি হচ্ছে একটা ফরাসি বার্তা সংস্থা। সমগ্র পাকিস্তানে এই প্রতিষ্ঠানের একজন মাত্র সংবাদদাতা রয়েছে। আর তিনি রয়েছেন করাচিতে। তাহলে ঢাকার সংবাদ তিনি পেলেন কোথা থেকে? এএফপি'র সঙ্গে পাকিস্তান প্রেস ইন্টারন্যাশনালের এ মর্মে চুক্তি রয়েছে যে, সমগ্র পাকিস্তানের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও ঘটনাবলীর যেসব খবর পিপিআই-এর করাচিস্থ হেড অফিসের টেলিপ্রিন্টারে এসে পৌঁছবে, এএফপি'র সেই সংবাদদাতা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যেটুকু ভাল মনে করবেন সেটুকু এএফপি'র জন্য পাঠাবেন। তখন চিন্তা করলাম পিপিআই নিশ্চয়ই তাদের ঢাকা অফিস থেকে এই খবর পেয়েছে। তাহলে পিপিআই-এর ঢাকাস্থ অফিস নিশ্চয়ই সামরিক কর্তৃপক্ষের 'ক্লিয়ারেন্স'র পর এই সংবাদ করাচিতে পাঠিয়েছে।

হঠাৎ মনে পড়লো করাচির সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকাগুলোর জন্য প্রতিদিন সকাল দশটা নাগাদ পিপিআই-এর ঢাকা অফিস স্থানীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত সংবাদের একটা সার সংক্ষেপ করাচি অফিসে পাঠিয়ে থাকে। তাহলে এটা নিশ্চিত হলাম যে, ঢাকার কাগজগুলোতে ফেনীর এই ঘটনা আগের দিন ছাপা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে এই নিউজ রিলিজ হওয়ার পিছনে ইস্টার্ন কমান্ডের পিআরও মেজর সিদ্দিক সালেকের হাত রয়েছে। এরপর আসল খবর বের করতে বিশেষ অসুবিধা হলো না। তৎকালীন ঢাকার অন্যতম প্রভাবশালী বাংলা পত্রিকা 'পূর্বদেশে'র সম্পাদক ছিলেন ফেনী নিবাসী। সুতরাং ফেনীর সন্নিকটে মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যজনক হামলা হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তবে প্রোপাগাণ্ডার জন্য 'নিজ কলে তৈরি সুতায় প্রস্তুত কাপড়' কীভাবে হয়েছিল সেটাই বিবেচ্য বিষয়।

'চরমপত্রের' স্ক্রিপ্ট-এ সব কিছুর বর্ণনা দিয়ে লিখলাম ফেনীর ঘটনা সম্পর্কে এএফপি যে খবর দিয়েছে তা একটু হেরফের করলে আসল সংবাদ বেরিয়ে যাবে। দিন, ক্ষণ, তারিখ সব ঠিক আছে। তবে ওটা আসলে খাদ্যবাহী ট্রাক ছিল না– ছিল সৈন্যবাহী ট্রাক। খাদ্যের বদলে ট্রাকে বেশ পরিমাণ সমরাস্ত্র ও রসদ ছিল। তাই ট্রাকের পাঁচজন নিরীহ মানুষ মারা যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। আসলে পাঁচজন 'মছুয়া সোলজার' মারা গেছে।

সেদিনকার স্ক্রিপ্টটা ছিল, "ঠাস কইর‍্যা একটা আওয়াজ হইলো। ডরাইয়েন না, ডরাইয়েন না! আমাগো কুর্মিটোলার মাইদ্দে জেনারেল পিঁয়াজী সা'বে চেয়ার থনে পইড়া গেছিল।...এদিককার কারবার হুনছেননি? গেলো পরশু দিন ফেনীর কাছে এক ট্রাক মছুয়া সোলজার যাইতেছিল, গেরাম লুট করণের লাইগ্যা। আহারে...হেগো আলাদা না পাইয়া, বিচ্ছুরা হেগো ডাবিহা করছে। ঢাকার মওলবী বাজারের কসাইরা যেমনে কইর‍্যা গোস বানায়, বিচ্ছুরা হেই মছুয়াগুলোর হেই কারবার করছে। কিন্তুক ঢাকার ইস্টার্ন কমান্ডের পিআরও সা'ব মেজর সালেক এই খবরডারে বেমালুম গায়েব কইরা কী সোন্দর কইর‍্যা কইছে 'ফেনীর কাছে দুষ্কৃতকারীরা' খাদ্যবাহী ট্রাক ধ্বংস করছে, আর পাঁচজন নিরীহ লোককে মারছে। এলায় বুঝছেন, কেমন কইর‍্যা মিছা কথা কইতে কইতে হেগো মুখের দুই দিক ঘা হইয়া গেছে।' দিন কয়েক পরের কথা। ঢাকা থেকে পূর্বদেশের এক সাংবাদিক স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে এসে প্রথমেই আমার খোঁজ করলো। বললো, 'মুকুল ভাই জাদু জানে– না হয় অবজারভার অফিসের সঙ্গে সরাসরি ফোন যোগাযোগ রয়েছে। তা না হলে ফেনীর আসল খবরটা মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে 'চরমপত্র' বলতে পারলো কেমন করে?

২৫

মাসের কথা ঠিক খেয়াল নেই। এতোগুলো বছর পরে খেয়াল না থাকারই কথা। তবে মনে হয় একাত্তরের আগস্ট কি সেপ্টেম্বর মাস হবে। একদিন সকালের দিকে কার্যোপলক্ষে থিয়েটার রোডে মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী সচিবালয়ে গিয়েছি। আমার খুবই পরিচিত এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোক ঢাকায় এক সময় সাংবাদিকতা পেশায় সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। পরে তিনি জীবিকার সন্ধানে আমদানি-রফতানি ব্যবসায় নিয়োজিত হন। ছাত্র জীবনে প্রগতিশীল রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন এবং সাংবাদিক থাকাকালীন বিভিন্ন মহলে যোগাযোগ হওয়ার সুবাদে ১৯৭০ সালের

সাধারণ নির্বাচনে ন্যাপের (মোজাফফর) টিকিটে উত্তর বাংলার এক জেলা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, কোনরকমে নির্বাচিত হতে পারলে জীবনের একটা হিল্লা হয়ে যাবে। এ সময় আমিও একদিন সেই জেলা শহরে গিয়ে হাজির হলাম। সমগ্র শহরের দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার দেখলাম। "এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ও ...জেলার কৃতী সন্তানের আগমন উপলক্ষে...পার্কে বিরাট জনসভা।" কথা ছিল রাত আটটার দিকে আমরা খাওয়া-দাওয়া করে আড্ডায় বসবো। কিন্তু সাড়ে আটটা পর্যন্ত তাঁকে না পেয়ে খুঁজতে বেরুলাম। শেষ পর্যন্ত রাত ন'টায় তাঁকে সেই পার্কে পেলাম। প্রস্তাবিত জনসভাকে কর্মিসভায় রূপান্তরিত করে ভদ্রলোক কর্মীদের প্রতি জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিচ্ছেন। 'প্রথমত, চেয়ারম্যান মাও-এর নেতৃত্বে চীন কিভাবে মার্কসীয় পথ থেকে বিপথগামী হয়েছে। আর দ্বিতীয়ত, মার্কিনি যোগসাজশে শেখের আওয়ামী লীগ ছ'দফা প্রণয়ন করে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়ে কিভাবে মেহনতী জনতাকে ধাপ্পা দিচ্ছে।'

দিন দু'য়েক পর 'নৌকার' আয়োজিত একই পার্কের জনসভায় গিয়ে দেখি একটা প্রচারপত্র বিলি হচ্ছে, 'পূর্ব বাংলা শ্মশান কেনো?' পরে বন্ধুবরকে প্রচারপত্রটা দেখিয়ে বলেছিলাম, 'নির্বাচনের ফলাফল তো দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি।' তিনি জবাবে বললেন, 'মুসলিম লীগ আওয়ামী লীগ তো টাকার এপিঠ-ওপিঠ। ওরা ওরা ভোট ভাগাভাগি করবে আর মাঝখান থেকে মেহনতী জনতার ভোটে আমি পার হয়ে যাবো।' পরে সেই এলাকার নির্বাচনের ফলাফল ছিল নৌকার প্রার্থীর প্রায় ৯৬ হাজার ভোটের বিরুদ্ধে আমার বন্ধুর হাজার ছ'য়েক ভোট।

মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী সচিবালয়ে দেখা হতেই তিনি এক অনুরোধ করে বসলেন। তিনি ক্যালকাটা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দিতে চান। আমাকে তার পুরো ব্যবস্থা করে দিতে হবে। হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন না হয় করলাম। কিন্তু আপনাকে কোন পার্টির নেতা হিসাবে পরিচয় দেবো?' মনে হলো আমার প্রশ্নটা ঠিকমতো বুঝতে পারলেন না। তাই আবার বললাম, 'আপনি যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন সে কথা কি বলবো?'

এবার আমার প্রশ্ন বুঝতে পেরে বন্ধুবর একটু চুপ থেকে জবাব দিলেন, 'আরে না। এখন তো মুক্তিযুদ্ধ চলছে। আমরা সবাই বাঙালি। আমাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই।' সাংবাদিক সম্মেলনে ভদ্রলোককে উত্তরবঙ্গের অন্যতম আওয়ামী লীগ নেতা হিসাবে পরিচয় করে দিয়েছিলাম।

মুজিবনগরের স্মৃতিচারণ লিখতে গিয়ে এখন মাঝে মাঝে বেশ আফসোস হয়। ডাইরি যা রেখেছি, তা কেন কষ্ট করে আরো বিস্তারিতভাবে রাখলাম না। তাহলে তো আজ দিন-ক্ষণ-তারিখ সব কিছুই হুবহু লিখতে পারতাম।

তবুও সেদিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সকাল এগারোটা নাগাদ স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে 'চরমপত্র' রেকর্ডিং করে বেরুতেই বন্ধু ফয়েজ আহমদের সঙ্গে দেখা। ইনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বেতার কথক। আর অন্যদিকে চিরকুমার। ১৯৫৪ সালে বিনা পাসপোর্টে স্টকহম শান্তি সম্মেলনে যোগদান থেকে ষাট দশকে পিকিং বেতারে চাকরি করাকালীন চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রত্যক্ষদর্শী হওয়া ছাড়াও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় এর জীবন ভরপুর। যৌবনের

অনেকগুলো বছর ইনি কারাগারে কাটিয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশের সবচেয়ে সহজ কাজ বিবাহ বন্ধনে ইনি আবদ্ধ হতে পারেননি। বিবাহিতা মহিলা আর পুলিশের দারোগার মধ্যে নাকি কোন তফাৎ নেই। এহেন ফয়েজ আহমদকে কাছে পেয়ে বললাম, 'হাতে কোন কাজ না থাকলে চল যাই বাবলু হক্কাক লেনে গাফ্ফার চৌধুরীর ওখানে আড্ডা মারতে যাই। মান্নান ভাইয়ের সঙ্গেও আমার একটু কাজ আছে।' ফয়েজ সাহেব চিরকুমার হলেও ওর চরিত্রের বিশেষ একটা গুণ রয়েছে। রুটিন মাফিক তিনি বিবাহিত বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে কুশলাদি জিজ্ঞেস করা আর আড্ডা মারতে পছন্দ করেন। আজ বালু হক্কাক লেনে যাওয়ার প্রস্তাবে একটু ইতস্তত করতে লাগলেন। তাই পরিষ্কার জিজ্ঞেস করে বসলাম, 'কি ব্যাপার? আর কোন জরুরি কাজ আছে নাকি?' ভদ্রলোক নাসারন্ধ্রে এক গাদা নস্য গুঁজে দিয়ে বললো, 'গাফ্ফার যদি এ দু'দিনে জেনে ফেলে যে, ওর বউকে আমিই রাগিয়ে এসেছি, তাহলে আমাকে শেষ করে ফেলবে।' আমি পরিষ্কার কিছু বুঝতে না পেরে পুরো ব্যাপারটা জানার জন্য চাপাচাপি করলাম। এরপর ফয়েজ সাহেব যা বয়ান করলেন তাতে হতভম্ব হয়ে গেলাম।

দিন দুয়েক আগে ইন্টালি এলাকায় গাফ্ফারের বাসায় ফয়েজ সাহেব গিয়েছিলেন। কিন্তু গাফ্ফার তখন বাসায় নেই। অগত্যা ভাবীর সঙ্গেই কিছুক্ষণ দিন-দুনিয়ার হাল-হকিকত নিয়ে আলাপ করলেন। শেষে ভাবীর সঙ্গে রসিকতা করলেন। বললেন, 'আচ্ছা ভাবী, গাফ্ফারকে জিজ্ঞেস করবেন তো সে ট্রামে যাতায়াত করে, না বাসে?' বেচারী ভাবীর চক্ষু ছানাবড়া। 'কেনো ভাই, কেনো, এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো কেনো?' কবি ফয়েজ আহমদ ধূমায়িত চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললো, 'আপনি চিরটাকাল সোজা ও সরলই রয়ে গেলেন। আমার কথামতো এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করলে দেখবেন গাফ্ফার প্রথমে থমমত খেয়ে উঠবে। তারপর বলবে কেন বাসেই তো যাতায়াত করি! এবার বুঝেছেন, আপনার পতি-দেবতার কাজটা?'

বেচারী ভাবী কিছুই বুঝতে পারলেন না। চোখ ছানাবড়া করে তাকিয়ে রইলেন। মুচ্‌কি হেসে ফয়েজ বললো, 'ভাবী, এটা হচ্ছে কোলকাতা শহর। পথে-ঘাটে শুধু জোয়ান মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ট্রামে-বাসে সর্বত্র খালি পুরুষ আর মেয়েদের ধাক্কাধাক্কি লেগেই আছে। ট্রামের দরজাগুলো বড় বড়। তাই ধাক্কাধাক্কি একটু কম হয়। আর বাসের ধাক্কাধাক্কি? সে আর বলার মতো নয়। বাসের মধ্যে মেয়ে-পুরুষ একেবারে চাপাচাপি করে দাঁড়িয়ে থাকে। এপারের মেয়েদের আবার লজ্জার বালাইটা কম। তাই বাসের ছোট্ট দরজা দিয়ে ওঠানামা করার সময় পুরুষ আর মেয়ে যাত্রীদের যে অবস্থা হয়, আর কি বলবো ভাবী?'

চিরকুমার কবি বুঝতেই পারলেন না তিনি গাফ্ফার চৌধুরীর কি সর্বনাশ করলেন। কিছুক্ষণ পরে ফয়েজ সাহেব চলে গেলেন। কিন্তু গাফ্ফার-গিন্নীর মুখ গম্ভীর ও কালো হয়ে রইলো। সন্ধ্যার পর পতিদেবতা বাসায় ফেরার পর মিসেস সেলিনা চৌধুরী ফয়েজ ভাইয়ের শিখিয়ে দেয়া প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলো। 'কি গো, ট্রামে এলে, না বাসে এলে?' গাফ্ফার সাহেব প্রথমে প্রশ্ন শুনে ঠিকই থতমত খেয়ে গেলেন। তারপর জবাব দিলেন, 'কেন রোজকার মতো বাসেই এসেছি।'

এরপরের ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। দিন দুই হলো স্বামী-স্ত্রীতে বাক্যালাপ বন্ধ। মাঝে মধ্যে মহিলার শুধু স্বগতোক্তি : এতো বড় বদমাইশ আর চরিত্রহীন লোক আর

আমি জীবনে দেখিনি। বাইরে শুধু ভদ্রতার মুখোশ, তলে তলে এতো চুলকানি?' গাফ্ফার চৌধুরী কিছুই বুঝতে পারলেন না। আবার ব্যাপারটা নিয়ে কারো সঙ্গে আলাপও করতে পারলেন না। শুধু বালু হক্কাক লেনে লিখতে বসে আনমনা হয়ে উঠছেন। এমন সময় ভর দুপুরে আমি ও ফয়েজ আহমদ দু'জনে গিয়ে হাজির হলাম। ফয়েজ একটু মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলো, 'কিরে কেমন আছিস? তোর বউয়ের খবর কি?' যাঁহাতক্ এই প্রশ্ন, অমনি গাফ্ফার সাহেব হুড়মুড় করে দাঁড়ালো। আর ফয়েজ সাহেব ভোঁ দৌড়। গাফ্ফারও ওকে ধরবার জন্য পিছে পিছে দৌড়। ফয়েজ সাহেবকে ধরে এনে চিৎকার করে গাফ্ফার বললো, 'শুয়ার এ কাজ তোরই। তুই ছাড়া আর কেউই আমার বাসায় যায় না। তুই গিয়ে আমার বউয়ের মাথাটা গরম করে দিয়ে এসেছিস। আমাদের ফ্যামিলি লাইফটা শালা গণ্ডগোল করে দিয়েছিস।' কবি ফয়েজ আহমদ হাতজোড় করে বললো, 'ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে আমি বুঝতেই পারিনি। আমার তো এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞতা নেই। তাই মাফ করে দে ভাই।' জয় বাংলা অফিসে উপস্থিত আমরা সব ক'জনা ফয়েজের কথায় হো হো করে হেসে উঠলাম।

এহেন ফয়েজ আহমদ হঠাৎ করে উঠে, 'আচ্ছা আসি' বলে রওনা হওয়ার চেষ্টা করতেই ঢাকার অবজারভাবের বার্তা সম্পাদক এ বি এম মূসা এসে ওর হাত চেপে ধরে বললো, 'শালা, আমাদের কাউকে কিছু না বলে বাসা থেকে ভেগে এসেছিস কেন?' জবাবে ফয়েজ বললো, 'হাত ছাড় বলছি। আমাকে তোর বাসায় থাকার জন্য উল্টা পাঁচশ টাকা দিলেও থাকবো না। তোর বাসা সেই দমদমের কাছে। সকাল দশটা নাগাদ এই পার্ক সার্কাস এলাকায় আসতে হলে শেষ রাতে রওয়ানা হতে হয়। আবার সন্ধ্যার মধ্যে ফিরতে হলে বেলা তিনটায় যাত্রা করতে হয়। ভাই, তোর পায়ে পড়ি আমাকে মাফ করে দে। তোকে বললে তো আসতে দিবি না। তাই ভেগে এসেছি। এখন এই পার্ক সার্কাসেই একটা অফিসের টেবিলে রাত কাটাচ্ছি।' কিন্তু মূসা সাহেব নাছোড়বান্দা। সন্ধ্যার পর গল্প করার জন্য তার একজন লোক দরকার। তাহলে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াঝাঁটিও কম হয়। শেষ পর্যন্ত দৈনিক পূর্বদেশের প্রাক্তন চিফ রিপোর্টার সলিমুল্লাহকে মূসা সাহেবের বাসায় থাকার ব্যবস্থা করা হলো।

এরপর ফয়েজ আহমদ এক ঘটনা বললেন। একদিন খুব ভোরে মূসা সাহেবের বাসা থেকে বাসে পার্ক সার্কাসে আসছিলেন। বাসে জায়গা পেয়ে বেশ আরামেই ছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম এভেন্যু পর্যন্ত আসতেই বাসটা একেবারে ভরে গেলো। ফয়েজ সাহেবের সামনেই এক মাঝবয়সী মহিলা এক হাতে সন্তান আর হাতে লোহার রড ধরে দাঁড়িয়ে। বাসের ঝাঁকুনিতে ফয়েজ সাহেবের গায়ের ওপর এসে পড়ছেন। বিরক্ত বোধ করলেও কিছু বলার নেই। এমন সময় মহিলা বলে উঠলেন, 'মশায় তো বেশ আরামেই বসে আছেন? ধরুন আমার ছেলেটাকে।' বলেই সেই মহিলা তার ছেলেকে একেবারে ফয়েজ আহমদের কোলে বসিয়ে দিলেন। ছেলেটার নাসারন্ধ্র থেকে তখন নীলাভ গলিত পদার্থ বের হচ্ছে। পার্ক সার্কাস পর্যন্ত বাসে আর ফয়েজ সাহেবের যাওয়া হলো না। পরের 'ষ্টপেজে' নেমে ফয়েজ সাহেব একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে এলেন। পরবর্তী ঘটনা হচ্ছে মুসা সাহেবের বাসা থেকে কবি ফয়েজ আহমদের পলায়ন। এরপর ফয়েজ সাহেব আর কোন দিন বাসে চড়েননি।

গোটা তিনেক বাসা বদলের পর তখন সবেমাত্র বালীগঞ্জের পাম এভেন্যুতে উঠে এসেছি। এখানে অনেক ব্যাপারে সুবিধা হলো। প্রথমত, পরিবারের নিরাপত্তা। দ্বিতীয়ত, বাসার কাছেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের রেকর্ডিং স্টুডিও। হেঁটেই যাতায়াত করা যায়। পাম এভেন্যু এলাকায় নক্‌শালদের 'উৎপাত' নেই। আবার অবাঙালি মুসলমানদের 'ভ্রূকুটি'ও নেই। একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে এঁরা কেউই সমর্থন করতে পারেনি। পশ্চিম বাংলার বাঙালি মুসলমানরাও আমাদের সমর্থন দেয়ার ব্যাপারে বেশ দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ছিল। অনেকের মতে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে এঁরা সব সময়েই 'দুর্দিনের আশ্রয়স্থল' হিসাবে গণ্য করে ভরসা পেয়েছে। তবে নকশাল ও অবাঙালি মুসলমানদের মতো পশ্চিম বাংলার মুসলমানরা কোন সময়েই প্রকাশ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেনি। এসব ব্যাপারের জন্য আমরাও কোলকাতায় বাসা ভাড়া করার সময় বেশ চিন্তা-ভাবনা করতাম।

এই পাম এভেন্যুর বাসায় একদিন বেলা ন'টা নাগাদ বাইরে কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলে দেখি আমার এক পরিচিত পুরনো বন্ধু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই সঙ্গে আইন অধ্যয়ন করেছি। কিছুদিন ব্যারাক ইকবাল হলে আমি ওর রুম-মেট ছিলাম। অবশ্য ভদ্রলোক আমার চেয়ে বয়সে বেশ বড়। আইন পাস করার পর তিনি নিজ জেলায় চলে গিয়ে ওকালতি শুরু করেন এবং সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িত হন। এরপর অনেকদিন পর্যন্ত দু'জনের মধ্যে আর যোগাযোগ নাই। কিন্তু বন্ধুবর বহু বছর প্রচেষ্টার পর আওয়ামী লীগ নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এহেন ব্যক্তিকে আমার বাসার দরজায় দেখে বেশ অবাক হলাম। ব্যাপারটা কি?

তবুও হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে বাইরের ঘরে বসলাম। এর মধ্যে চা-পর্ব সমাধা হলো। কিন্তু কি জন্য ভদ্রলোক এসেছেন তা বললেন না। শুধু মাঝে মাঝে জানতে চাইলেন, 'আমরা কবে নাগাদ দেশে ফিরতে পারবো?' প্রতি বারই আমি হাসিমুখে জবাব দিলাম, 'নানা সূত্রে রণাংগনের যেসব খবর পাচ্ছি, তাতে দেশ স্বাধীন হতে খুব একটা দেরি হবে না। আমাদের হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং শেষ হওয়ার 'পর এখন বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছে। আর যেভাবে স্থানীয় লোকদের সহযোগিতা পাচ্ছে, তাতে জয় আমাদের সুনিশ্চিত।'

ভদ্রলোকের চেহারা দেখে মনে হলো না যে, আমার জবাবে তিনি খুব একটা ভরসা পেলেন। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, 'ঠিক কবে নাগাদ স্বাধীন হবো বলতে পারো?' এবার বললাম, 'তুমি তো রাজনীতিবিদ? এ প্রশ্নের জবাব তোমারই তো জানা থাকার কথা?' তবুও আমার বন্ধু শান্ত হতে পারলেন না।

এবার বললেন, "তুমি তো স্বাধীন বাংলায় 'চরমপত্র' প্রচার করছো। আমাদের চেয়ে তোমার কাছে প্রতিনিয়তই অনেক গোপন খবর আসছে। বলো না ভাই, 'আমরা কবে নাগাদ স্বাধীন হবো?" বেশ বিরক্ত বোধ করলাম। তবুও মুখে তার সামান্যতম প্রকাশ না দেখিয়ে পরিবেশ হালকা করার জন্য বললাম, 'স্কুলের বার্ষিক স্পোর্টসে দড়ি টানাটানি প্রতিযোগিতা দেখেছো নিশ্চয়ই। বেশ কিছুক্ষণ দু'পক্ষই সমান অবস্থায় থাকে। তারপর হুড়মুড় করে শক্তিশালী পক্ষ অপর পক্ষকে টেনে নিজেদের এলাকায় নিয়ে আসে। এখন অবস্থা এরকম যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যে কোন সময় আমাদের

'বিচ্ছুরা' হুড়মুড়ের কারবার করে ফেলবে। তাই তো সঠিক তারিখ ও সময় কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয়।'

আমার কথা শেষ হতেই হঠাৎ করে বন্ধুবর এসে আমার হাত দুটো ধরে বললেন, 'ভাই, আমাকে বাঁচাতে হবে। এই দেখ ওরা আমার সম্পর্কে কি প্রচারপত্র ছাপিয়েছে? আমার এতদিনের পলিটিক্যাল ক্যারিয়ারটাই নষ্ট হতে চলেছে।' প্রচারপত্রটি আকারে বেশ বড়।–জেলার শান্তি কমিটির প্রচারিত। প্রচারপত্র বলা হয়েছে যে, অমুক (আমার বন্ধুবর) আওয়ামী লীগ নেতা এখন হিন্দুস্তান থেকে করাচিতে পালিয়ে এসেছেন। সেখানে উর্দু 'দৈনিক জং' পত্রিকায় তিনি যে বিশেষ সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, ঢাকার দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় তা ফলাও করে ছাপা হয়েছে। জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে 'শান্তি কমিটি' সেই বিবৃতি প্রচারপত্র হিসাবে প্রকাশ করেছে।

প্রচারপত্র পড়ে অবিশ্বাস করার কোনই কারণ নেই যে, উনি এখন করাচিতে। অথচ বেচারা আমার সামনে বসে। কেইসটা কি? বন্ধুকে আশ্বাস দিলাম 'চরমপত্রে' তোমার সম্পর্কে রেফারেন্স দিয়ে বিস্তারিত বলবো যে, পাকিস্তানিরা কিভাবে মিথ্যার বেসাতি করছে।' আমার আশ্বাস শুনে তার চেহারা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। বলেই ফেললো, 'বহুদিন তো ভালো খাওনি? চল আজ তোমাকে চাইনিজ খাওয়াবো।'

বন্ধুবরকে সঙ্গে করেই বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে গেলাম স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের স্টুডিওতে শেষ রাতের লেখা 'স্ক্রিপটা' রেকর্ডিং করতে। সেখানে ঘণ্টা খানেক কাটিয়ে এক নম্বর বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে আমার তথ্য দফতরে গেলাম। হাতের কাজ শেষ করে বহুদিন পরে চললাম পার্ক স্ট্রিটে চাইনিজ খেতে।

রেস্টুরেন্টে খেতে বসে দু'জনের অনেক আলাপ হলো। হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি না এর মধ্যে নেপাল গিয়েছিলে বাংলাদেশের পক্ষে প্রচার করতে?' বন্ধু জবাবে বললো, 'তা প্রায় তেরো দিন ছিলাম। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ওদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।'

কেন জানি না হঠাৎ করে বলেই ফেললাম, 'দোস্ত, বিদেশে আমাদের প্রচার প্রোপাগাণ্ডার ব্যাপারটা 'ডিফেক্ট' করা বাঙালি কূটনীতিবিদদের ওপর ছেড়ে দিয়ে রণাংগনে চলে যাও।' পরবর্তীকালে তোমরা যারা সক্রিয় রাজনীতি করবে, তাদের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে থাকাটা কাজে লাগবে। মুক্তিযুদ্ধের মজাটাই হচ্ছে, নানা কারণে মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী অধিকাংশ নেতাই সযত্নে দূরে সরে রয়েছে আর জাতীয়তাবাদীরা ময়দানে লড়াই করেছে। বাঙালি সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধারা ছাড়াও চট্টগ্রামের জহুর আহম্মদ চৌধুরী ও অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, কুমিল্লার ক্যাপ্টেন সুজাত আলী ও মিজান চৌধুরী, সিলেটের কর্নেল ওসমানী ও রব সাহেব, টাঙ্গাইলের ব্যারিস্টার শওকত আলী, কাদের সিদ্দিকী, শাহ্‌জাহান সিরাজ ও আব্দুল মান্নান, নোয়াখালীর আসম রব ও খাজা আহম্মদ, ফরিদপুরের আবদুর রাজ্জাক ও শেখ মনি, বগুড়ার মুজিবর রহমান আক্কেলপুরী ও মুস্তাফিজুর রহমান পটল, ঢাকার শামসুল হক, গাজী গোলাম মোস্তফা ও মোস্তফা সারোয়ার, রংপুরের সাফাকাত হোসেন, পাবনার সৈয়দ হায়দার আলী, দিনাজপুরের অধ্যাপক ইউসুফ আলী ও শাহ্ মাহতাব, যশোরের নূরে আলম সিদ্দিকী, কুষ্টিয়ার ডক্টর আহসাবুল হক, খুলনার বাবার আলী, বরিশালের নূরুল ইসলাম মঞ্জুর ও হাসনাত প্রমুখ সবাই তো এবারের মুক্তিযুদ্ধে শরিক হয়েছে। তাহলে তুমি কেনো ময়দানে যাচ্ছ না? আমার প্রশ্নের সরাসরি কোন জবাব পেলাম না। বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা এলিট সিনেমার পিছনে র‍্যাডিয়েন্ট প্রেসে চলে গেলাম একটা প্রচারপত্রের ফাইনাল প্রুফ দেখার জন্য। বিদেশে প্রচারের জন্য ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় দুটো ফোল্ডার ছাপা শুরু

হওয়ার কথা। ফরাসি ভাষায় দক্ষ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবনে সামাদেরও বিকালের দিকে প্রেসে আসর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

প্রেসের কাজকর্ম শেষ করে সেদিন সরাসরি বাসায় ফিরে এলাম। সন্ধ্যা বেলাতেই 'চরমপত্রে'র স্ক্রিপ্ট-এর অর্ধেকটা আমার বন্ধুর পুরো ব্যাপারটার উদ্ধৃতি দিয়ে পাকিস্তানি প্রোপাগাণ্ডার তীব্র সমালোচনা করে বললাম, আমাদের অমুক নেতা করাচিতে 'হিজরত' করা তো দূরের কথা সম্প্রতি নেপালে বাংলাদেশের পক্ষে প্রচার শেষ করে এখন মুজিবনগরে ফিরে এসেছেন। খুব শীঘ্রই উনি রণাংগনে চলে যাবেন।

দিন কয়েক পরে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে খবর এলো, ঢাকায় এক গাদা পত্র-পত্রিকা এসেছে। উনার দফতরে সশরীরে গিয়ে দেখে আসতে হবে। তখনই দৌড়ালাম থিয়েটার রোডে মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী সচিবালয়ে। অফিসে বসেই পত্রিকাগুলো পড়তে শুরু করলাম আর মাঝে মাঝে নোট বইয়ে তথ্য লিখে নিচ্ছি। এমন সময় মাথা তুলে দেখি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী দাঁড়িয়ে। চেয়ার থেকে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই বাধা দিলেন। 'উঠতে হবে না। তোমার হাতের কাজ করে যাও। আর শোন, গত পরশুদিন তোমার লেখা চরমপত্র খুবই জোরদার হয়েছে। পাকিস্তানি প্রোপাগাণ্ডার চেহারাটা প্রকাশ করেছো।' কথা ক'টা বলে পাশের ঘরে উনি চলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, "তুমি তো অনেক গোপন খবরই রাখো? তবে একটা খবর রাখনি। যার সম্পর্কে সেদিন তুমি চরমপত্রে লিখেছো, তাঁকে কিন্তু আমরা প্রোপাগাণ্ডার জন্য নেপালে পাঠাইনি উনি নিজেই গিয়েছিলেন। সম্ভবত কাঠমাণ্ডু থেকে করাচি যাওয়ার জন্য। সেখান থেকে ঢাকা। বেচারার ফ্যামিলি তো অধিকৃত এলাকায় রয়ে গেছে। শেষ মুহূর্তে একটা গোয়েন্দা রিপোর্টে খবরটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঠমাণ্ডুতে জরুরি টেলেক্স পাঠিয়ে নেপাল সরকার ও ভারতীয় দূতাবাসের প্রচেষ্টায় ওকে ফিরিয়ে এনেছি। পাকিস্তানিরা একটু এ্যাডভান্স প্রোপাগাণ্ডা করেছিল। তুমিও দেখছি ওদের কড়া জবাব দিয়েছো।'

কথা ক'টা বলে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ চলে গেলেন পাশের ঘরে আর আমি হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলাম। তাহলে কেইসটা কি?

২৭

ছেলেটার নাম আলম। পেশায় প্রেস ফটোগ্রাফার। ষাট দশকের শেষভাগে আমি তখন ঢাকার দৈনিক আজাদ পত্রিকার জেনারেল ম্যানেজার। সে সময় আলম ছিল আজাদ পত্রিকা ফটোগ্রাফার জহীরের ডাকরুম এ্যাসিস্ট্যান্ট। জহীর চলে যাবার পর আলমই আজাদের প্রেস ফটোগ্রাফার হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করে। আমিও পরে 'দৈনিক পূর্বদেশে' চলে যাই। তাই আলমের আর বিশেষ খোঁজ-খবর রাখতাম না। একাত্তরের যুদ্ধের দামামার মধ্যে আলম একদিন বালু হক্কাক লেনে এসে হাজির। চুল উষ্কখুষ্ক, চোখ রক্তিম আর মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনে মলিন বেশ। আমাকে দেখেই চিৎকার করে উঠলো, 'মুকুল ভাই, আইস্যা পড়ছি। আমারে কামে লগান।' কথা ক'টা বলেই সাদা দাঁতগুলো বের করে একটা অদ্ভুত অমায়িক হাসি দিল। মনে মনে একটু বিরক্ত বোধ করলেও তা প্রকাশ করতে পারলাম না।

জিজ্ঞেস করলাম, 'ঢাকার খবর কি?' উত্তরে বললো, 'খবরটবর বেশি কইতে পারুম না। আমার নিজের অবস্থাই বলে কেরোসিন হইছিল? ভাগ্যিস, পীর সাহেবের মাইয়া বিয়া করছিলাম। সেই শ্বশুরবাড়িতেই দিন পনেরো লুকাইয়া আছিলাম। পীর সাহেব দেইখ্যা 'মছুয়ারা' তাঁর বাড়ি সার্চ করে নাই। আমি ধরা পড়লেই তো শ্যাষ কইরা ফালাইতো।'

এবার বললাম, 'তুই কেডা যে তোরে শ্যাষ করতো?'

আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়া আলম তার হাতের ক্যামেরাটা ঠক্ করে আমার টেবিলের উপরে রেখে কাঁধের ঝোলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে এক গাদা প্রসেস করা ফিল্ম বের করলো। তখনও এগুলো প্রিন্ট করা হয়নি।

আমি দু'হাত দিয়ে ফিল্ম ধরে চোখের কাছে এনে দেখে শিউরে উঠলাম। পঁচিশে মার্চ রাতে ঢাকার গণহত্যার ফটো। এতদিন ধরে এই ফটোগুলার প্রতীক্ষায় ছিলাম। আমি নিবিষ্ট মনে নেগেটিভগুলো দেখতে লাগলাম। আর আলম বলতে লাগলো, 'এই যে লাশগুলো লাইন কইর্‌য়া হোতাইয়া রাখছে, এইগুলা ইকবাল হলের ছাত্রগো লাশ। এই রোলের মধ্যে সবই ইকবাল হলের ফটো। এইবার দেখবেন পলাশী ব্যারাকেই ফায়ার ব্রিগেড স্টেশনের দমকল বাহিনীর কর্মচারীদের লাশ। তারপর নয়াবাজার আর চকবাজার। শাঁখারি বাজারে গুনের সাহস হয়নি। এইবার দেখেন বুড়িগঙ্গা নদীর হেই পাড়ে কেরানীগঞ্জ আর শুভড্যাতে বেটারা কি কারবার করছে, তার ফটো।' একদমে কথাগুলো বলে আলম আবার তার সাদা দাঁতগুলো বের করে হাসি দিয়ে বললো, 'মুকুল ভাই, এইবার কন্ আমারে আপনে প্রেস ফটোগ্রাফারের একটা চাকরি দিবেন? আর আমি কিন্তু কইলকাতা শহরে থাকুম না। আমারে ফন্ট্রে পাঠাইতে হইবো।'

এবার আমি আর গাম্ভীর্য রাখতে পারলাম না। বললাম, দেখি তোর জন্যে কি করতে পারি। পাশের ঘরে মান্নান ভাই একমনে মোহাম্মদউল্লাহ চৌধুরীর লেখা পড়ছিল। সাপ্তাহিক 'জয় বাংলার' পরবর্তী সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধ হিসাবে ছাপা হবে। আমি মান্নান ভাইকে নেগেটিভগুলো দেখিয়ে বললাম, "আপনার সম্মতি পেলে আলমকে মুজিবনগর সরকারের তথ্য দফতরের প্রেস ফটোগ্রাফার হিসাবে এখুনি নিয়োগপত্র ইস্যু করতে চাই।"

দুই আঙুলের গোড়ার মধ্যে ধরা জ্বলন্ত ক্যাপস্টান সিগারেটটাতে জোরে একটা টান দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তিনশ' টাকা বেতনে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়া দেন। আর ইকবাল হলের মাঠের লাইন করা লাশের একটা ফটো সংখ্যা 'জয় বাংলা' পত্রিকা দিয়া দিবেন।'

মান্নান সাহেবের রুম থেকে হাসি মুখে বেরিয়ে আলমকে বললাম, 'তোর কপালটা ভালো। এক ঘন্টার মধ্যে এ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়ে যাবি।'

তখনই আমাদের একাউন্টটেন্ট পাকিস্তান অবজারভারের প্রাক্তন কর্মচারী দত্ত বাবুকে নির্দেশ দিলাম আলমের চাকরির প্রস্তাব দিয়ে ফাইল তৈরি আর নিয়োগপত্র টাইপ করতে। মাত্র ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আলম মুজিবনগর সরকারের তথ্য দফতরের প্রেস ফটোগ্রাফার হিসেবে নিয়োগপত্র পেয়ে গেল। এবার দত্তবাবুকে বললাম আলমকে একশ' টাকা এ্যাডভান্স দেয়ার ব্যবস্থা করুন।

জীবনের প্রথম এই কোলকাতা মহানগরীতে এসে বেচারী আলম অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে হাবুডুবু খাচ্ছিল। স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, এভাবে এত অল্প সময়ের মধ্যে তার চাকরি হয়ে যাবে।

পিয়নকে দুটো লাড়ুয়া বিস্কুট আর দু'কাপ চা' আনার কথা বলে আলমকে কাছে এনে বসালাম। বললাম, বুঝছোস, এই যে কইলকাতা শহর দেখতাছোস এইটার চাইরো দিকে খালি গেনজাম। খুব সাবধানে ঘোরাফেরা করবি। উত্তর দিকে দমদম থাইক্যা শ্যামজাবার আর দক্ষিণে যাদবপুর, টালীগঞ্জ ও নরেন্দ্রপুর। এইসব এলাকায়

নক্‌শালরা অন্ধরে গিস্‌গিস্ করতাছে। প্রায়ই যুব কংগ্রেসের লগে মাইরপিট চলতাছে। আর সেন্ট্রাল ক্যালকাটার কলাবাগান, কলুটোলা, নাখোদা মসজিদ, চীৎপুর, মীর্জাপুর, ধরমতলা, দিলখুশা এইগুলো হইতেছে অবাঙালি মুসলমান এলাকা। তাই একটু হিসাব কইর‍্যা চলবি। তোরে অক্ষুণি একটা 'আইডেনটিটি কার্ড' দিমু। খবরদার থানা-পুলিশ ছাড়া আর কাউরে দেখাইবি না।

এরপর একটা ব্যক্তিগত চিঠি দিয়ে আলমকে শিয়ালদার কাছে আমার পরিচিত এক 'ফ্রিলান্স' ফটোগ্রাফারের বাসায় পাঠালাম ঢাকার গণহত্যার নেগেটিভগুলো প্রিন্ট করার জন্য। ভদ্রলোকের বাসাতেই ডার্করুম। চিঠিতে অনুরোধ ছিল ফটোগুলো প্রিন্ট করার সময় আলম তাকে সাহায্য করবে। আর আলমকে হুঁশিয়ার করে দিলাম যে, খবরদার! কোন অবস্থাতেই অতিরিক্ত কোন প্রিন্ট যেন না হয়। প্রয়োজনীয় টাকা দিয়ে আলমকে রাত ন'টার মধ্যে নেগেটিভ ও প্রিন্টগুলো নিয়ে আমার বাসায় আসার নির্দেশ দিলাম।

আলম আমার ইশারা ঠিকই বুঝেছিল। রাত দশটা নাগাদ ফটো আর নেগেটিভগুলো আমার বাসায় পৌঁছে দিয়েছিল। ওর দায়িত্বজ্ঞান দেখে সেদিন বিমুগ্ধ হয়েছিলাম। পরবর্তীকালে ঢাকার গণহত্যা সম্পর্কিত কত ফটো বিভিন্ন বই, পুস্তক আর পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে ও হচ্ছে। এর প্রায় সবই আলমেরই তোলা। দিন দুয়েকের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও নির্দেশ দিয়ে আলমকে আট নম্বর সেক্টরে অর্থাৎ যশোর-কুষ্টিয়া এলাকায় মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। সপ্তাহ খানেক ওর কোন খবরই পেলাম না। মনে মনে একটু চিন্তিত হয়ে উঠলাম। ঠিক ন'দিন পরে উস্কখুস্ক চেহারায় একটা খোলা জিপ চালিয়ে আলম এসে বালু হক্কাক লেনে হাজির হলো। ওকে দেখেই জিজ্ঞেস করলাম, 'এই শয়তানটা, এতোদিন কোথায় ছিলি? আর জিপ যে চালাচ্ছিস, তোর ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে? এই জিপ তোকে দিল কে?' সাদা দাঁতগুলো বের করে চমৎকার একটা হাসি দিয়ে বললো, "মুকুল ভাই, এই দেশে লাইসেন্স লাগে না। 'জয় বাংলা' বললেই চলে। বিচ্ছুগো লগে একটা কড়া কিছিমের 'এ্যাকশন' দেখতে গেছিলাম। আপনে রেডিওতে যা কইতাছেন, তার লগে কোন তফাৎ পাইলাম না। মাইর কারে কয়? হেইটা দেইখ্যা জীবনটা সার্থক হয়েছে।

'একটা ফ্যামিলি প্ল্যানিং অফিসে যাইয়া দেখি কাকপক্ষী পর্যন্ত অফিসে নাই। এই জিপটা পইড়া আছে। আমারে বিচ্ছুরা দেখাইয়া দিল, কেমতে কইরা চাবি ছাড়া স্টার্ট লওন যায়। হেরপর বুঝতেই পারতাছেন, মাঠের মইধ্যে জিপ চালানো শিইখ্যা ফেলাইলাম। দিন কতক জিপটা খুব চালাইছি। তারপর আল্লার নামে অহন অন্ধরে ক্যালকাটা।'

আমি বললাম, 'তুই তো আজরাইল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস? কোথায় যে কি করিস তার ঠিক আছে?' জবাবে বললো, "রাজাকার ধরার যেসব ফটো তুলেছি আর 'এ্যাকশনের যেসব দৃশ্য আনছি' আপনে থ' মাইর‍্যা যাবেন। শ্যামনগর থানা দখলের পর কর্নেল হুদা থানার উপরে বাংলাদেশের ফ্লাগ উঠাইতাছে তারও ফটো আনছি।"

না, ছোকরা একটুও মিথ্যা বলেনি। পরে প্রিন্টগুলো দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এসব ফটো পত্র-পত্রিকায় ছাপানো ছাড়াও বিদেশে বাংলাদেশ মিশনগুলোতে (লন্ডন, ওয়াশিংটন, দিল্লি, হংকং ও টোকিও) পাঠিয়েছিলাম। প্রায় এগারো বছর পরেও দেখছি আলম প্রায় সেরকমই বেপরোয়া রয়েছে। জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও সম্প্রতি ওর তোলা বেশ ক'টা ফটো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় আলমকে দেখলেই গ্রামবাংলার কিশোর ও তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতীক বলে আমার কাছে মনে হতো।

যাক যা বলছিলাম, হপ্তা দুয়েক পরে আলমকে নয় নম্বর সেক্টরে পাঠালাম। সঙ্গে আমার ঢাকার বাড়িওয়ালার কাছে লেখা একটা চিঠি খামে দিলাম। বললাম পাকিস্তানি ডাকটিকিট লাগিয়ে খুলনা-যশোরের যে কোন পোস্ট অফিসের ডাক বাক্সে দিলেই চলবে।

ঢাকার তোপখানা রোডের ইগলু আইসক্রিম-এর ভিতরে যে গলি চলে গেছে সেখানে আমার ফেলে আসা ভাড়া করা বাসা। পাশেই একটা বস্তি। আমার বাড়িওয়ালা ঢাকাইয়া। তাকে লিখলাম, 'সপরিবারে গ্রামে রয়েছি। গণ্ডগোল থেমে গেলেই ঢাকায় ফিরবো। আপনার সমস্ত ভাড়াই বুঝি দিবো। তবে আমার জিনিসপত্রগুলো যেন আপনার হেফাজতে ঠিক থাকে।'

প্রায় মাসখানেক পরে আমার খোঁজে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে এক ছোকরা এসে হাজির। বললো, 'মুকুল ভাই, আমি নয় নম্বর সেক্টরের লোক। আমার কাছে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তা পালন করেছি।' আমি বিস্ময় প্রকাশ করলাম। এবার ছেলেটা বললো, 'আপনার বাড়িওয়ালার কাছে লেখা চিঠি নিয়ে আমি খুলনা থেকে বরিশাল হয়ে ঢাকায় আপনার চিঠিটা জিপিওতে পোস্ট করছি। এরপর তোপখানা রোডে আপনারা বাসায় খোঁজ নিছি। মালপত্রের কথা কইতে পারি না। তবে হাসানুজ্জামান নামে এক সাংবাদিক ভদ্রলোক বাসাটা ভাড়া নিছে।'

কিছুটা নিশ্চিত হলাম। সাংবাদিক হাসানুজ্জামান আমার অনেক দিনের বন্ধু। ওর বিয়ের ঘটক আমি ছিলাম। তাছাড়া বিয়ের পর নতুন বউ নিয়ে আমার বাসাতেই ওরা উঠেছিল।

দেশ স্বাধীন হবার পর পরিবারের সবাইকে কোলকাতায় রেখে ঢাকায় এসে সরকারি নির্দেশে পূর্বাণী হোটেলে উঠলাম। দিন কয়েক পরে তোপখানা রোডে বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। মনে মনে ঠিক করলাম যদি আমার মালপত্রগুলো ঠিক মতো পাই, তাহলে দশ মাসের ভাড়ার আংশিক টাকা দিয়ে রফা করবো।

সকাল দশটা নাগাদ গিয়ে ঢাকাইয়া বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা হতেই ভদ্রলোক খুশি হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর আমার পরিবারের সবার কুশল জানতে চাইলো। আমাকে ধরে দোতলায় ওর বাসায় নিয়ে চায়ের ব্যবস্থা করলো। চা খেতে খেতে শুনলাম বাড়িওয়ালার কাণ্ড। বাড়িটাতে চারটা ঘর। দিন কয়েক পরে যখন বুঝলো আমরা আপাতত আর ঢাকায় ফিরবো না, তখন আমাদের সমস্ত মালপত্র একটা ঘরে ঢুকিয়ে বড় বড় লোহার পেরেক মেরে ঘরটার দরজা বন্ধ করে দিল। এরপর তিনরুম ভাড়া নেয়ার লোক খুঁজতে শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত মাসিক আড়াইশ' টাকা ভাড়ায় এই হাসানুজ্জামান সাহেব এখানে উঠে এসেছেন।

এরপর বকেয়া বাড়ি ভাড়া পরিশোধের আলাপ শুরু হলো। কত টাকায় ফয়সালা করা যায় পরিষ্কার করে কেউই প্রকাশ করলাম না। আলাপের এক ফাঁকে বললাম, 'গেরামে বউ-পোলাপান লইয়া খুবই কষ্টে আছিলাম।' আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই বাড়িওয়ালা চিৎকার করে উঠলো, ভোগাস্ মারার আর জায়গা পান না? আপনে তো 'জয়বাংলা' রেডিওর মাইকে 'চরমপত্র' কইয়া আমাগো হগলরে জানে বাঁচাইছেন। অহন তো চেহারা-সুরত দেখলে মনেই হয় না যে, কিছু কইতে পারেন। আর সংগ্রামের

টাইমে আপনার চাপাবাজির ঠেলায় মছুয়াগুলো অক্করে পাগলা হইয়া উঠছিলো।'

এমন সময় বাড়িওয়ালার স্ত্রী এসে বললো, 'আপনাগো ভাড়া লইয়া আর এতো বাহাস করণ লাগবো না। মহল্লার সরদার সা'বের কাছে শালিস দেন।' আমিও শালিসের প্রস্তাবে রাজি হলাম। পরদিন সকালে শালিস বসবে।

যথারীতি হাজির হলাম। সরদার সাহেবকে বললাম, 'আমি তো এই নয় মাস ছিলাম না। পুরা ভাড়া প্রায় দুই-আড়াই হাজার টাকা। আমার মরা বাপ আসলেও শোধ দিতে পারুম না। তাছাড়া বাড়িওয়ালা তো এ সময় আর এক ভাড়াটে পেয়েছেন।' সরদার সাহেব এবার বাড়িওয়ালার বক্তব্য শুনতে চাইলেন। বাড়িওয়ালা বললো, 'সরদার সা'বের কাছে যখন শালিস দিছি তখন আমি কিছু কমু না। শালিসে যে রায় হয় তাই মাইন্যা লমু।' দুরু দুরু বক্ষে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। সরদার সাহেব মাথাটা চুলকায়ে একটা তারা মার্কা সিগারেট ধরিয়ে গোটা কয়েক টান দিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো। "ওই শোন, 'চরমপত্র' সা'বে তোর ভাড়াটিয়া আছিল, এইটাই তোর কপাল। বকেয়া ভাড়া এক প'হা তুই পাইবি না। এইটাই আমার রায়।"

আমি রায় শুনে অবাক হয়ে গেলাম। অনেক কষ্টে বাড়িওয়ালার দিকে তাকালাম। বাড়িওয়ালা বললো, 'মহল্লার সরদারের রায় আমি মাইন্যা নিলাম। তয় আমি ওনার মালপত্র দিমু না। ওনার পরিবার মুজিবনগর থাইক্যা আহনের পর হগলে আমার বাড়ি এক বেলা ডাইলভাতের দাওয়াত খাইলে এই মালপত্র ফেরত পাইবো। মাইনষের কাছে কইতে পারমু 'চরমপত্র' সা'বে পরিবার লইয়া আমার বাড়িতে দাওয়াত খাইছিল।'

ঢাকাইয়াদের অপরূপ মহানুভবতায় আমি কয়েক মুহূর্ত হতবাক হয়ে রইলাম। তারপর বললাম, "এবার আমার একটু বক্তব্য আছে। বাড়িওয়ালার দাওয়াত আমি কবুল করলাম। কিন্তু আমি উনাকে দু'মাসের ভাড়া সাতশ' টাকা দেবো বলে 'এরাদা' করে এসেছি। এখন এই সাতশ' টাকা তো আমি আর ফেরত নিয়ে যেতে পারি না। সরদার সাহেব, এই টাকার একটা বিহিত করেন।'

সরদার সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, "ঠিক আছে এই সাতশ' টাকা মহল্লার মসজিদের চাঁদা।"

আমি কথা রেখেছিলাম। মাস খানেক পরে মুজিবনগর থেকে আবার পরিবারের সবাই ঢাকায় এসে তোপখানা রোডের গলির সেই বাড়িওয়ালার বাসায় দাওয়াত খেয়েছিলাম। সত্যি, ঢাকাইয়াদের হাতের রান্নার তুলনা হয় না।

একাত্তরের অক্টোবর মাস নাগাদ কয়েকটা ঘটনায় মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী সচিবালয়ে আমরা খুবই আশান্বিত হয়ে উঠলাম। পশ্চিম পাকিস্তানের কাশ্মীর সীমান্ত দিয়ে এক প্লাটুন বাঙালি সৈন্য মাইন পাতা দুর্গম সীমান্ত অতিক্রম করে এসে হাজির হলো। আমরা তাদের আন্তরিক সংবর্ধনা জানালাম। তারা থিয়েটার রোডস্থ অস্থায়ী সচিবালয়ের দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছোট্ট মাঠটাতে তাঁবু টাঙিয়ে অবস্থান করলো। তাদের একটাই দাবি। তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে চায়। দিন কয়েক পরে একদিন থিয়েটার রোডে গিয়ে দেখি তারা কেউই নেই। সবাই লড়াইয়ের ময়দানে চলে গেছে। এদের দেশপ্রেমের কথা বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকার কথা। তাই বলেছিলাম, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় গোটা

কয়েক আঙুলে গোনা লোক ছাড়া সমগ্র বাঙালি জাতির ইস্পাতকঠিন একতা অটুট ছিল। আর তাই একটা দানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে আমরা মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছি।

এ সময় আমাদের হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং সমাপ্ত হওয়ায় তাঁরা বিভিন্ন রণাংগনে সেক্টর কমান্ডারদের হাত শক্তিশালী করতে সক্ষম হলো। সত্যি কথা বলতে গেলে একাত্তরের অক্টোবর মাস থেকেই মুক্তিযুদ্ধের চেহারা তার পাল্টে গেলো। সব ক'টা সেক্টরেই মুক্তিযোদ্ধাদের মনে দৃঢ়প্রত্যয় যে, যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ প্রায় নিশ্চিত। এমন সময় আমার প্রতি নির্দেশ এলো মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম ব্যাচ কমিশন্ড অফিসারদের জন্য একদিনের মধ্যে সনদ ছাপিয়ে দিতে হবে। নিজেই দৌড়ালাম র‍্যাডিয়েন্ট প্রসেস প্রেসে। ছাপা শেষ করে পুরো প্যাকেটটা হাতে করে যখন বাসায় ফিরলাম তখন রাত এগারোটা বাজে।

পরদিন সকাল ৯টা নাগাদ মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি তৎকালীন কর্নেল ওসমানীর অফিসে গিয়ে সনদগুলো দিলাম। জলপাইগুড়ি সীমান্তে প্রথম ব্যাচ কমিশন্ড অফিসারদের পার্সি আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কর্নেল ওসমানীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়ক মরহুম সৈয়দ নজরুল ইসলাম এই প্যারেডের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা ও সনদ বিতরণ করেন।

পশ্চিমা সংবাদপত্রগুলোতেও তখন মুক্তিযোদ্ধাদের শৌর্য-বীর্যের কাহিনী ফলাও করে ছাপা হওয়া ছাড়াও টেলিভিশনে প্রায় প্রতিদিনই বাংলাদেশের লড়াই-এর খবর দিত। এ সময় সরেজমিনে অবস্থা পর্যালোচনার জন্য পশ্চিমা দেশগুলো থেকে একের পর এক প্রতিনিধি দল আসতে শুরু করলো। এদের দেখাশোনা ও উদ্বাস্তু শিবিরে নিয়ে যাওয়া ছাড়াও রণাংগন পরিদর্শন করানো বেশ দায়িত্বপূর্ণ কাজ। মুজিবনগর সরকারের জোনাল অফিসগুলো এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করলো।

ব্রিটিশ লেবার পার্টির এম.পি এবং 'ওয়ার এ্যান্ড ওয়ার' সাহায্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ডোনাল্ড চেসম্যান এসে হাজির হলেন। দমদম থেকে শুরু করে বনগাঁ পর্যন্ত উদ্বাস্তু শিবিরগুলো পরিদর্শনের পর তাঁকে ছয় নম্বর সেক্টরে পাটগ্রাম, ভুরুঙ্গামারী, রৌমারী, চিলমারীর মুক্তাঞ্চলে পাঠানো হলো। সঙ্গে কুষ্টিয়া থেকে নির্বাচিত পরিষদ সদস্য ডা. আহসাবুল হক। এই সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে, ডোনাল্ড চেস্ম্যানকে দেখানো যে, বাংলাদেশের এলাকা বিশেষ মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসাবে মুক্তাঞ্চল সফরের পর ব্রিটেনে ফিরে গিয়ে ডোনাল্ড চেসম্যান সেখানকার পত্র-পত্রিকায় স্বীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলে আমাদের প্রচার প্রোপাগাণ্ডার জন্য তা যথেষ্ট হবে। আমাদের অনুমান যথার্থ ছিল। ব্রিটেনে ফেরার পর চেস্ম্যানের বিবৃতি পশ্চিম সংবাদপত্রে বেশ ফলাও করে ছাপা হয়েছিল।

মুক্তিযোদ্ধা ও স্থানীয় জনসাধারণের মনোবল বৃদ্ধির উদ্দেশ্য অক্টোবর মাসে মুজিবনগর সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন মুক্তাঞ্চল ও সীমান্তবর্তী এলাকা সফরের ব্যবস্থা হয়। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মরহুম এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান নয় নম্বর ও আট নম্বর সেক্টর অর্থাৎ খুলনা ও যশোর এলাকা সফরের পর রাজশাহীর মুক্তাঞ্চল ভোলারহাট সফরে গেলেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানীকে সঙ্গে করে মেঘালয় ও সাব্রুম সীমান্ত সফরের পর দুই নম্বর সেক্টর অর্থাৎ আখাউড়া এলাকায় হাজির হলেন। বাংলাদেশের

মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ এই দুই নম্বর সেক্টরে সংঘটিত হয়েছিল। এই সেক্টরে সাফল্যজনকভাবে যুদ্ধ পরিচালনার কৃতিত্ব মরহুম খালেদ মোশাররফ ও মরহুম এম টি হায়দারের। আগেই বলেছি যে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখতে হলে একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বরের আগে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের ভূমিকা ও অবদানের প্রকৃত মূল্যায়ন অপরিহার্য। স্বাধীনতা-উত্তর যুগের কার্যকলাপকে বিচারের প্রেক্ষাপটে গণ্য করা কোনভাবেই বাঞ্ছনীয় হবে না। তাই প্রতিটি সেক্টরের যুদ্ধের প্রকৃত ঘটনা লিপিবদ্ধ করা ঐতিহাসিকদের জন্য এক বিরাট দায়িত্ব। আমাদের পরবর্তী বংশধররা অন্তত পুরুষদের শৌর্য-বীর্যের কাহিনী পাঠ করে দেশপ্রেমের জন্য অনুপ্রেরণা লাভ করবে। প্রায় এগারো বছর গত হওয়ার পর এখনও যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার আন্তরিক প্রচেষ্টা নেয়া সম্ভব। অন্যথায় অনেক কিছুই বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

আবার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। মুক্তাঞ্চল সফরের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ সদলবলে দিনাজপুরের তেঁতুলিয়া ও পচাগড় সফরের পর রংপুর জেলার পাটগ্রামে এসে হাজির হলেন। এক্ষণে এসব এলাকার অতীত ইতিহাস উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১৯৪৭ সালের ৩রা জুন উপমহাদেশের তৎকালীন ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন এক ঘোষণায় জেলাওয়ারীভাবে বাংল ও পাঞ্জাব প্রদেশ দুটোকে ভাগ করে ভারত ও তৎকালীন পাকিস্তানের অন্তর্গত এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করেন। এ ঘোষণায় সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলা পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ ও খুলনা জেলাকে পশ্চিম বাংলার এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এছাড়া সমগ্র দিনাজপুর ও নদীয়া জেলা বর্তমান বাংলাদেশের অংশ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু নানা মহলের প্রতিবাদের ফলে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ৩রা জুনের ঘোষণার প্রেক্ষিতে থানাওয়ারীভাবে কিছুটা রদবদলের জন্য র‍্যাডক্লিফ সাহেবের নেতৃত্বে এক সদস্য বিশিষ্ট রোয়েদাদের ব্যবস্থা করা হয়। এটাকেই 'র‍্যাডক্লিফ এওয়ার্ড' বলা হয়। এর রায়ই সমগ্র খুলনা জেলাকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও মুর্শিদাবাদ জেলাকে পশ্চিম বাংলায় দেয়া হয়। অন্যান্য সংশোধনীর মধ্যে ২৫টি থানা সংবলিত নদীয়া জেলার ১২টি থানা ভারতীয় এলাকা ও ১৩টি থানা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই ১৩টি থানা নিয়েই নতুন কুষ্টিয়া জেলা। এছাড়া দিনাজপুর জেলার ৩০টি থানার মধ্যে ১০টি থানা নিয়ে বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ এলাকা ভারতকে এবং মালদহ জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহকুমা ও জলপাইগুড়ি জেলার পাঁচটি থানাকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হিসাবে ঘোষণা করা হয়। আর গণভোটে জয়লাভ করা সত্ত্বেও সিলেটের (আসামের অন্তর্ভুক্ত ছিল) করিমগঞ্জ এলাকাটি আবার ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জলপাইগুড়ি জেলার যে পাঁচটি থানা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তার মধ্যে প্রশাসন ও যোগাযোগ সুবিধার জন্য তেঁতুলিয়া, পচাগড় প্রভৃতি চারটি থানাকে দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শুধুমাত্র পাটগ্রাম থানা অন্তর্ভুক্ত হয় রংপুরে। থানাওয়ারী ভিত্তিতে র‍্যাডক্লিফ এওয়ার্ডের ফলে দু'দেশের মধ্যে পরবর্তীকালে ছিটমহলের সমস্যা দেখা দেয়।

একাত্তরের অক্টোবর মাসে প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ এসব মুক্তাঞ্চল এলাকা সফরে এলেন। তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর হেডকোয়ার্টার স্টাফ অফিসার নুরুল ইসলাম (পরবর্তীকালে জেনারেল ও অবসরপ্রাপ্ত), ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, জনাব মতিউর রহমান, জনাব

মোস্তফা সারোয়ার ও জনসংযোগ অফিসার জনাব আলী তারেক (পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে পরিষদ সদস্য) অন্যতম।

ছয় নম্বরের সেক্টর কমান্ডার পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রাক্তন উইং কমান্ডার এম কে বাশার (পরবর্তীকালে এয়ার ভাইস মার্শাল পদে উন্নীত ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান হিসাবে কার্যরত অবস্থায় বিমান দুর্ঘটনায় নিহত।) নেতৃবৃন্দকে সংবর্ধনা জানালেন। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী প্রায় একশত বর্গমাইল মুক্তাঞ্চল সফর করলেন। পাটগ্রাম, রৌমারী, চিলমারী, ভুরুঙ্গামারীর বিস্তীর্ণ এলাকা প্রধানমন্ত্রী কয়েকদিন ধরে ঘুরে ঘুরে বেড়াবার সময় সবারই কুশলাদী জিজ্ঞেস করলেন। সমগ্র এলাকায় তখন বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পোস্ট অফিস ও থানার কাজ আবার চালু হয়েছে। শুল্ক ঘাঁটি বসেছে। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি প্রায় নাই বললেই চলে। কৃষকরা নদীর বিস্তীর্ণ এলাকায় রবিশস্য বপন করেছে। প্রধানমন্ত্রী পাটগ্রামে এক আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দিলেন ও অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলো পরিদর্শন করলেন। বাঙালি জাতির তখন ইস্পাতকঠিন একতা। মুক্তিযুদ্ধে কামিয়ানী লাভ করতেই হবে।

সফরের শেষ প্রান্তে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ গেলেন একটা ফিল্ড হাসপাতালে। কয়েকটা ঘর, বাঁশের বেড়া, মাটির মেঝে ও টিনের ছাদ। বাকিগুলো অস্থায়ী তাঁবুর মধ্যে। আহতদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার পর তিনি একট. জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালেন। একজন আহত তরুণকে ঘিরে বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা দাঁড়িয়ে আর দু'জন মেডিক্যাল ছাত্র তাঁকে শুশ্রূষা করছে। তাজউদ্দিন সাহেব ঘটনার বিস্তারিত জানতে চাইলেন।

দিন কয়েক আগে ভুরুঙ্গামারীর যুদ্ধে এই তরুণ মুক্তিযোদ্ধা মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। ছেলেটার নাম কসীমউদ্দীন। বাড়ি গাইবান্ধার গ্রামে। গুলিতে আঘাতপ্রাপ্ত একটা পা অপারেশন করে কেটে ফেলা হয়েছে। রক্তের প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় মুক্তিযোদ্ধারা চাঁদা করে সাত'শ টাকা সংগ্রহ করেছে। সে টাকায় লোক পাঠিয়ে জলপাইগুড়ি হাসপাতাল থেকে রক্ত কিনে আনা হয়েছে। তবুও কসীমউদ্দীনকে বাঁচানো সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। তাই তাঁকে বলা হয়েছে যে, তোমার আব্বা-আম্মাকে দেখতে ইচ্ছে করলে তাদের আনার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু কসীমউদ্দীনের জবাব শুনে সবাই হতবাক হয়েছে। ছেলেটা পরিষ্কার দুটো কথা বললো। প্রথমত, আমি জানি আমার মৃত্যু হবে এবং আপনারা খামখা আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। আমার মৃত্যু সংবাদ যেন কোন অবস্থাতেই আমার গ্রামে না পৌঁছায়। গ্রামের সমস্ত বন্ধু-বান্ধবদের বলেছি যে, আমি মুক্তিযুদ্ধে শরিক হতে চললাম। ওরা আমার পদাংক অনুসরণ করবে। কিন্তু আমার মৃত্যু সংবাদ গ্রামে পৌঁছলে ওদের মনে প্রতিক্রিয়া হতে পারে। আর দ্বিতীয়ত, আমার বিশ্বাস দেশ স্বাধীন হবেই হবে। তাই বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আব্বা-আম্মা আমার মৃত্যু সংবাদ শুনলে অন্তত কিছুটা সান্ত্বনা পাবে যে, তাঁদের সন্তানের রক্তের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে। মৃত্যুপথযাত্রী এই যুবকের কথায় উপস্থিত সবাই সেদিন বিস্মিত হয়েছিল। পরদিন বিকেল নাগাদ কসীমউদ্দীনের মৃত্যু হলো।

এদের দৃঢ় মনোবল ও অপূর্ব সাহসিকতার জন্য রক্তাক্ত একাত্তরে আমরা জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছি। বাংলাদেশের প্রতিটি রণাংগনে এরকম শত শত দামাল ছেলে শাহাদাৎ বরণ করেছে। এঁদের সবার কবর চিহ্নিত করার আর উপায় নেই। এঁরা বাংলার মাটিতে মিশে রয়েছে। কিন্তু আমরা কি এঁদের যথাযথ মর্যাদা দিতে পেরেছি? নিজের বিবেককে জিজ্ঞেস করে তো কোন জবাব পাই না।

২৯

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ কবে এবং কিভাবে নির্বাসিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন এ ব্যাপারটা আজ এগারো বছর পরেও রহস্যাবৃত রয়ে গেলো। তখন বলা হয়েছিল যে, পঁচিশে মার্চ ঢাকায় তৎকালীন পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর হামলা শুরু হবার পর সীমান্তের ওপারে আগরতলা এলাকায় কিছুসংখ্যক সংসদ সদস্যের সম্মতিক্রমে জনাব তাজউদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হয়েছিল। এছাড়া জনাব মনসুর আলী, জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামান ও খন্দকার মোশতাক আহমদকে যথাক্রমে অর্থ, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়া। কিন্তু যতদূর মনে পড়ে জনাব এম মনসুর আলী ও জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামান এই দু'জনেই আগরতলা এলাকায় যাননি। এরা দু'জনেই উত্তরাঞ্চলে হিলি সীমান্ত অতিক্রম করেছিলেন। যদিও সতেরোই এপ্রিল মেহেরপুরের আম্রকাননে মুজিবনগরে বিদেশী সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে এই মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হয়েছিল, তবুও সাত দিন আগে অর্থাৎ ১১ই এপ্রিল তারিখে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি-নির্ধারণী বিবৃতি দিয়েছিলেন এবং তা ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ও আকাশবাণী থেকে প্রচারিত হয়েছিল।

তাই অনেকের মনে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক যে, প্রকৃতপক্ষে কিভাবে এই মন্ত্রিসভার সদস্য নির্বাচিত বা মনোনীত হয়েছিলেন। অবশ্য একথা ঠিক যে, বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি সেই ভয়াবহ দিনগুলোতে এই নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ সমর্থন প্রদান করেছিল। কিন্তু সুদীর্ঘ এগারো বছর পর এ ব্যাপারে কেউ কৌতূহল প্রকাশ করলে দোষণীয় হবে না।

কোন কোন মহলের মতে পর্দার অন্তরালে যাদের প্রচেষ্টায় এবং যোগসাজশে ত্বরিত এই মন্ত্রিসভা গঠন সম্ভব হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ও অধ্যাপক ইউসুফ আলী অন্যতম।

মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভা ঘোষিত হবার পর প্রাথমিক পর্যায়ে নিরাপত্তার খাতিরে এঁদের কোলকাতায় ১৩ নম্বর লর্ড সিংহ রোডে বিএসএফ-এর প্রহরায় রাখা হয়েছিল। তখন এই ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ও অধ্যাপক ইউসুফ আলীর মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম ও ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ দু'জনেই জীবনের অনেক ক'টা বছর বিলাতে কাটিয়েছেন। ষাট দশকের শেষার্ধে এঁরা দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

ব্যারিস্টার মওদুদ রাওয়ালপিন্ডিতে আইয়ুব-মুজিব গোলটেবিল বৈঠকের সময় শেখ মুজিবের রাজনৈতিক সেক্রেটারি ছিলেন। আর ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম দেশে প্রত্যাবর্তনের পর আওয়ামী লীগে যোগদান করেন এবং সত্তরের নির্বাচনে কুষ্টিয়া থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২৫শে মার্চের পর জনাব ইসলাম সস্ত্রীক মুজিবনগরে হাজির হন এবং প্রবাসী সরকার গঠনে অবদান রাখতে সক্ষম হন।

এহেনো ব্যারিস্টার ইসলাম একদিন আমার খোঁজে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে এসে হাজির হলেন। বললেন, পরের রোববার সকালে কয়েকটা পরিবার গাড়িতে ডায়মন্ড হারবার যাবে। আমরা যেতে রাজি আছি কিনা। জিজ্ঞাসা করলাম, আর কারা

যাচ্ছেন?

জনাব ইসলাম জবাবে বললেন, ডক্টর টি হোসেন ও ডক্টর অমিয় বোসের পরিবারের সবাই যাচ্ছেন।

বালীগঞ্জের ডাক্তার অমিয় বোস কোলকাতায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক এবং তাঁর স্ত্রী ইংরেজ ললনা। এক সময় ডক্টর বোস টাংগাইলের মীর্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতালে চাকরি করতেন। বাংলাদেশের প্রতি তাঁর খুব টান। জিয়ার আমলের প্রাক্তন উপদেষ্টা জনাব জাকারিয়া খান ও বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'যদি কিছু মনে না করেন' অনুষ্ঠানের পরিচালক জনাব ফজলে লোহানী একাত্তরের পঁচিশে মার্চে ঢাকায় গণহত্যা শুরু হবার পর কোলকাতায় হাজির হলে ডাক্তার বোসের প্রচেষ্টায় এঁরা দু'জনই লন্ডনে পাড়ি জমাতে সক্ষম হন।

যা হোক, ব্যারিস্টার সাহেবের প্রস্তাবে রাজি হলাম। কোলকাতায় জীবনটাতে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছিল। তিনটি গাড়িতে আমরা চারটা পরিবার রোববার সকালে রওয়ানা হলাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এই ডায়মন্ড হারবার। আমরা বেশ কিছুক্ষণ খুব হৈচৈ করে ঘুরে বেড়ালাম। এরপর শুনলম আমরা ড. আলী নামক এক ভদ্রলোকের মেহমান। বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ ডায়মন্ড হারবারের এক গ্রামে ডা. আলীর বাসায় হাজির হলাম। কয়েক একর জুড়ে দেয়াল দিয়ে ঘিরে তার বিরাট দোতলা বাড়ি। সেই গ্রামে বিদ্যুৎ না থাকলেও ডাক্তার আলীর বাড়িতে নিজস্ব জেনারেটরের ব্যবস্থা আছে। দোতলা বাড়ির একপাশে ডাক্তার সাহেবের চেম্বার ও নার্সিং হোম আর অপারেশন থিয়েটার। একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা।

বাড়ির আর একদিকে পুকুর, গরু ভর্তি গোয়ালঘরে আর ধানের গোলা। উঠানে লাইন করে খড়ের পালা। সবকিছু দেখে আমরা চমৎকৃত হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'ডাক্তার সাহেব, চারদিকে নকশাল আর নব কংগ্রেসের মারপিটের মধ্যে এরকম রাজসিক হালে টিকে আছেন কেমন করে?'

মুহূর্তে ডাক্তার আলী এক গাল হেসে জবাব দিলেন, 'কেন, প্রতি মাসে আমি সবাইকে চাঁদা দেই। আর ওদের মারামারিতে লোকজন আহত হলে বিনা পয়সায় তাদের চিকিৎসা করি। তাই আমাকে কেউ বিরক্ত করে না। বেশ আছি এখানে।' নাস্তা খেতে বসে আবার ডাক্তার সাহেবকে প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা, আপনি এমবিবিএস পাস করলেন কোত্থেকে? যতদূর জানি, ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়া তো ভয়াবহ ব্যাপার। তাই না? তার ওপর আপনি হচ্ছেন মুসলমান?' এবার ডাক্তার সাহেব চমকে উঠলেন। একটু আমৃতা আমৃতা করে বললেন, 'সে একটা ছোটখাটো ইহিতাস। আমার আব্বা তখন জীবিত। আমি সবেমাত্র আই এস সি পাস করেছি। আর কোলকাতায় শুরু হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাংগা। এরপরেই আব্বা আমাকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেন পড়াশোনার জন্য। আমি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করে আবার ডায়মন্ড হারবারে চলে এসেছি। এক সময় আমার পাকিস্তানি পাসপোর্ট ছিল। এখন পুরোপুরি ভারতীয় নাগরিক।' ডাক্তার সাহেবের বক্তব্যের সবটুকু সত্য বলে মেনে নিতে পারলাম না। আমার মনে সন্দেহ হলো, ভদ্রলোকের কাছে নিশ্চয় এখনো পাকিস্তানি পাসপোর্ট রয়েছে। আমাদের কাছে আসল কথা বলতে সাহস করেননি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় কতগুলো ব্যাপারে অনেকের মনেই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। প্রথমত, কোলকাতায় বসবাসকারী অবাঙালি মুসলমানদের এই মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা। দ্বিতীয়ত, পশ্চিম বাংলার বাঙালি মুসলমানদের (সবাই নন)

নিরপেক্ষ ভূমিকা। তৃতীয়ত, মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী কোন কোন মহলের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা। চতুর্থত, দক্ষিণ ভারতীয় মুসলমানের এই মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন দান এবং পঞ্চমত, ভারতীয় হিন্দুদের ব্যাপক সহযোগিতা।

বিভিন্ন মহলে আলাপ-আলোচনার পর এসব প্রশ্নে কিছু জবাব পেয়েছি। প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় ক্ষেত্রেই কোলকাতার অবাঙালি মুসলমান ও পশ্চিম বাংলার বাঙালি মুসলমানরা (সবাই নন) সে আমলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে বিপদের সময় নিজেদের বিকল্প আশ্রয় স্থল হিসাবে বিবেচনা করতো। এদের অনেকের পরিবারই বিভক্ত অবস্থায় এপার-ওপার দু'জায়গায় বসবাস করছিল। তাই স্বাভাবিকভাবে তাদের এই ভূমিকা ছিল। তৃতীয় মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী একটা মহল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নব্যসৃষ্ট চীন-মার্কিন বন্ধুত্বের প্রতি অন্ধ সমর্থক হওয়ায় চীনের অকৃত্রিম বন্ধু পাকিস্তানের মানবতাবিরোধী কার্যকলাপের সমর্থন দান করেছিল। মার্ক্সীয় দর্শনে আর একটা উপদলের মতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব মেহনতী জনতার পার্টির হাতে না থাকায় এর বিরোধিতা করা অপরিহার্য। সে আমলে বাংলাদেশের রাজনীতিতেও এর প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল। চতুর্থ ক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারতীয় মুসলমানরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ন্যায়সংগত বিবেচনা করেই এর প্রতি সমর্থন দান করেছিলেন। পঞ্চম ক্ষেত্রে ভারতের পূর্ব সীমান্তে বন্ধুভাবাপন্ন স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্ট হলে বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখতে হবে না এবং দ্বিখণ্ডিত পাকিস্তান আন্তর্জাতিক পরাশক্তির নিকট পূর্বের মর্যাদা হারাতে বাধ্য হবে। উপরন্তু পশ্চিমবঙ্গে হিজরত করা বাঙালি হিন্দুরা সহজেই তাদের পিতৃ পুরুষদের জন্মভূমি পরিদর্শনের সৌভাগ্য লাভ করবে।

আজ থেকে এগারো বছর আগে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের বিভিন্ন মহলে চিন্তাধারা সম্পর্কে এ ধরনের ধারণা পাওয়াটা স্বাভাবিক ছিল।

সন্ধ্যা নাগাদ আমরা ডাক্তার সাহেবের কাছে বিদায় নিয়ে আবার কোলকাতায় ফিরে এলাম। কিন্তু ফেরার পথে আমার শুধু একথাটাই মনে হলো যে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মেডিক্যাল কলেজ, নার্সিং স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলো থেকে পশ্চিম বাংলার কত বাঙালি মুসলমান ছাত্র এবং পূর্ব বাংলার কত হিন্দু ছাত্র ছাত্রী পাস করার পর ভারতকে তাদের কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছেন তার একটা হিসাব-নিকাশ হওয়া দরকার। কেননা এ ধরনের স্কুল-কলেজগুলো সরকারের বিপুল অনুদানে পরিচালিত। আর এই অনুদানের টাকা সাধারণ মানুষের ট্যাক্স থেকে সংগ্রহ করা হয়। অথচ এসব প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করার পর বেশ কিছু ছাত্রীর অন্য যে কোন দেশে পাড়ি জমানোর ব্যাপারটা কোন অবস্থাতেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না।

ফেরার পথে গাড়িতে নানা ধরনের আলাপ হলো। ডাক্তার বোস বললেন, 'অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে বাংলাদেশ যে স্বাধীন হতে চলেছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। স্বাধীন হবার পর নানা ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের কথা হয়তো ভুলেই যাবেন।' প্রশ্নের জবাবটা আমিই দিলাম। ভুলবো কিনা জানি না। তবে খুব একটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো কিনা সন্দেহ। আমরা যারা বাঙালি মুসলমান, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মুক্তিযুদ্ধের ডামাডোলে এপারে এসে হাজির হয়েছি, তাঁরা কিন্তু ঢাকা-খুলনায় বেশ সচ্ছল জীবনইযাপন করছিলাম। মধ্যবিত্তের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে স্বাভাবিকভাবে আমাদের চাহিদা আরও বেশি ছিল। তাই আমরা মধ্যবিত্তরা প্রতিটি ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বৈষম্যের প্রশ্ন উত্থাপন করেছি। আর শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে জড়িত হয়েছি।

এখানে কোলকাতায় ট্রামে-বাসে ঘোরাঘুরি করে আর এক বেলা ভাত খেয়ে যেভাবে জীবনযাপন করেছি, তাতে আমরা যে ক'টা পরিবার ডায়মন্ড হারবারে গিয়েছিলাম, তারা খুব একটা সন্তুষ্ট নয়। ঢাকায় এঁদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব গাড়ি রয়েছে। কিন্তু পশ্চিম বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবপনযাত্রার মানের কথা চিন্তা করে আমাদের জন্য যে খরচের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা আমাদের খুব একটা মনঃপূত নয়। অথচ এ ব্যাপারে সামান্যতম আলোচনা করার পরিবেশনেই।

অন্ধকারে ডা. বোসের চেহারার প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ করে তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, আমি তো' মাঝে মাঝে ঢাকায় গিয়েছি। সেখানে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে জীবনযাত্রা লক্ষ্য করেছি, তাতে নিজেই ঈর্ষান্বিত হয়েছি। অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী আর অফিসারদের অনেকেরই নতুন নতুন বাড়ি-গাড়ি দেখে আর ঘন ঘন বিদেশে যাতায়াতের গল্প শুনে অবাক হয়েছি। এতো আরাম-আয়েশের জীবন ও সচ্ছল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও আপনারা বাঙালি মুসলমানরা কেনো এই মুক্তিযুদ্ধে জড়িত হলেন বলতে পারেন?'

এবারও ডা. বোসের প্রশ্নের জবাব আমিই দিলাম। 'তাহলে শোনেন। ইসলামাবাদের কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল যে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তদের কোলকাতা তথা পশ্চিম বাংলায় সহসা যাতায়াত করতে দিলে পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু আধিপত্যে বাঙালি কালচারের অনুপ্রবেশ ঘটবে। ব্যাপারটা পাকিস্তানের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। তাই পাকিস্তানের চব্বিশ বছরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম বাংলার মধ্যে যাতায়াত ও যোগাযোগ দুরূহ করে এক অদৃশ্য দেয়াল তোলা হয়েছিল। এছাড়া পাকিস্তানের সংহতিকে মজবুত করার নামে প্রতি বছরই পূর্ব পাকিস্তান থেকে সাংবাদিক, সাহিত্যিক, ছাত্র, ডাক্তার প্রতিনিধি দলকে পশ্চিম পাকিস্তানে সফরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এতে অন্য আর এক ধরনের প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটা সবারই নজর এড়িয়ে গেছ। পশ্চিবঙ্গে চব্বিশ বছর যাতায়াত না থাকায়, সেখানকার বাঙালি মধ্যবিত্ত হিন্দুদের অবস্থার কথা আমরা খুব একটা জানতে পারিনি। অথচ বারবার পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে পাকিস্তানের সংহতি বৃদ্ধি পাওয়া তো দূরের কথা করাচি লাহোর-পিন্ডির শানশওকত দেখে আমরা ঈর্ষান্বিত হয়েছি। মনে মনে ভেবেছি আমরা বাঙালিরা হচ্ছি পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ, অথচ মজাটা ভোগ করেছো তোমরা। বছরের পর বছর ধরে সবার অজান্তে আমাদের মধ্যে এসবের ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়েছে। আমরা যদি বিগত বছরগুলোতে পশ্চিমবঙ্গে যাতায়াত করতে পারতাম আর দেখতাম যে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম হাওয়ার পরও ভারতীয় বাঙালি হিন্দু যুবককে কলেজে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। বাসে করে যয়দেবপুর কিংবা দমদম থেকে যাতায়াত করতে হয়। চার আনার নস্য আর দু'পয়সা দামের কয়েকটা ক্যাভেন্ডার সিগারেট খেয়ে দিন কাটাতে হয়। পিতামাতা আর অবিবাহিত ভগ্নীর বোঝা বহন করতে হয়। আমরা যদি পশ্চিম বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভয়াবহ জীবনযাত্রাকে দেখতে পেতাম ও নিজেদের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করতে পারতাম, তাহলে আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে অনেকেই এই মুক্তিযুদ্ধে শরিক হওয়ার ব্যাপারে ইতস্তত করতো। আমরা চব্বিশটা বছর ধরে শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে আমাদের অবস্থাটা তুলনা করতে পেরেছি বলেই তো 'পূর্ব বাংলা শ্মশান কেনো?' পোস্টার দেখে উত্তেজিত

হয়েছি আর নিজেদের অবস্থার আরো উন্নতির জন্য মুক্তিযুদ্ধে শরিক হয়েছি।' আমার জবাব শুনে ডাক্তার বোস অবাক হলেন। বললেন, 'সত্যিই বলছি, এদিকটা আমরা কোন সময়েই চিন্তা করিনি। তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশের চেহারাটা কি রকম দাঁড়াবে তা কেউ বলতে পারে না।'

উত্তরে বললাম, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, আমরা কিন্তু পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির আওতায় অনেকগুলি বছর ঘর করে আরাম-আয়েশে অভ্যস্ত হয়েছি। তাই মুজিবনগরের কষ্টের জীবনযাত্রা আমাদের অনেকেরই মনঃপূত নয়।' আমার উত্তর শুনে ডা. বোস একেবারে চুপ করে গেলেন। শুধু জোরে নিঃশ্বাসের আওয়াজ পেলাম। পরিবেশকে আবার হালকা করার জন্য হঠাৎ বলেই ফেললাম, "ডা. বোস, আমাদের ইতিহাসটা বড় অদ্ভুত। বাংলা অক্ষরমালায় 'ম'তে বলে একটা অক্ষর রয়েছে। এই 'ম'তে 'মালাউন'। ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলা থেকে 'মালাউন'দের তাড়িয়ে পাকিস্তান বানিয়ে আমরা বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তরা নিজেদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি করেছি। আবার 'ম'তে 'মাউড়া'। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এঁদের বিতাড়িত করে আমাদের অবস্থার আরও উন্নতি করতে বদ্ধপরিকর হয়েছি। সাতচল্লিশের দাংগা আর একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা জীবন আত্মাহুতি দিয়েছে ও দিচ্ছে তারা তো গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষ। এঁদের জীবনটা তো শুধু বঞ্চনার ইতিহাস!"

৩০

মার্ক্সীয় দর্শনের প্রবক্তা কার্ল মার্ক্স বিশ্বের সমস্ত দেশের মধ্যবিত্তদের ভূমিকা সম্পর্কে চমৎকার বিশ্লেষণ করে গেছেন। তিনি বলেছেন, সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী প্রতিটি দেশে যুগে যুগে সোচ্চার হয়েছে এবং শ্রমনতী জনতাকে প্রতিবাদ-মুখর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। ক্ষুরধার লেখনী আর জ্বালাময়ী বক্তৃতার মাধ্যমে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সর্বকালের সকল দেশে নিষ্পেষিত মানবগোষ্ঠীকে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে। কিন্তু যে মুহূর্তে বিপ্লবের বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়েছে কিংবা রক্তাক্ত সংগ্রামের সূচনা হয়েছে, তখনই এই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী হয় সযত্নে দূরে সরে গেছে, না হয় বিরোধিতার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল মহলের সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। কার্ল মার্কস আরও বলেছেন, মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী পার্টিগুলোর নেতৃত্ব মধ্যবিত্তদের কুক্ষিগত থাকলে সেসব পার্টির ভূমিকা বিতর্কমূলক হওয়া ছাড়াও তারা শোষিত গণমানুষের নেতৃত্ব গ্রহণে ব্যর্থ হতে বাধ্য।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় কার্ল মার্ক্সের ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তব রূপায়ণ দেখতে পেলাম। প্রায় দুই যুগ ধরে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর থাকা সত্ত্বেও একাত্তরের রক্তাক্ত যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এঁদের বিরাট অংশ সযত্নে দূরে সরে গেলেন। এঁদের একাংশ হানাদারদের সহযোগিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন এবং আর একদল মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মুজিবনগরে গিয়ে হাজির হলেন। মুজিবনগরে যেসব বুদ্ধিজীবী হাজির হলেন, তাঁদের একদল স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে যোগ দিলেন এবং বাকিরা হয় নানা শুভেচ্ছা মিশনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, না হয় বিভিন্ন সাহায্য সংস্থার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হলেন। গুটি কয়েক হাতেগোনা বুদ্ধিজীবী ছাড়া

আর কাউকে আসল লড়াইয়ের ময়দানে পাওয়া গেলো না। বাংলাদেশের দখলিকৃত এলাকায় অবস্থানকারী বুদ্ধিজীবীরাও নিজেদের জীবন ও জীবিকা রক্ষায় ব্যস্ত হলেন। একদিকে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা এবং আর একদিকে মুজিবনগরে অবস্থানকারী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের কেউই (জনা কয়েক ছাড়া) এই ভয়াবহ মুক্তিযুদ্ধের আসল চেহারাটা দেখতে পেলেন না এবং রণাংগনে অস্ত্র হাতে লড়াই করা তো দূরের কথা রণাংগনের বাস্তব অভিজ্ঞতা সংগ্রহে ব্যর্থ হলেন।

তাই তো আজ সুদীর্ঘ এগারো বছর পরেও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কোন সার্থক নাটক, উপন্যাস, গল্প কিংবা কবিতার সৃষ্টি হলো না। প্রত্যক্ষদর্শী না হয়ে শুধু শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে লেখাগুলো পড়লে কেন জানি না পান্‌সে মনে হয়। আর মুক্তিযুদ্ধের সময় রণাংগন থেকে ছ'হাজার মাইল দূরে লন্ডনে বসে লেখা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটকের প্রশংসায় ফুলঝুরি ছড়াতে হয়। স্বাধীনতা কিংবা বিজয় দিবসে টেলিভিশনে প্রেমভিত্তিক পূর্ণদৈর্ঘ্য ছায়াছবি দেখে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের সময় মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে প্রগতিশীল পার্টিগুলোর ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে তাকে দুঃখজনক বলে আখ্যায়িত করা যায়। পেটি বুর্জোয়া নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ পার্টির স্বাভাবিক লক্ষ্যই ছিল যাতে মুক্তিযুদ্ধে প্রগতিশীলদের অনুপ্রবেশ না ঘটে এবং পেটি বুর্জোয়ারা তাঁদের ভূমিকা সাফল্যজনকভাবে পালন করেছে। নানা বাহানায় তাঁরা প্রগতিশীলদের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিশেষ অনুপ্রবেশ করতে দেয়নি। তাই তো এক একটা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে হাজার হাজার যুবক জমায়েত হওয়া সত্ত্বেও রীতিমত এঁদের পূর্ব ইতিহাস পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর একেক দফায় কয়েক শ'য়ের বেশি ট্রেনিংয়ে পাঠানো হয়নি। অথচ 'লেজুড়বৃত্তি' করে যেসব প্রগতিশীল দল মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন দান করেছিল, তাদের মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব মুজবনগরে অহেতুক ছোটাছুটি করে কাল হরণ করলেন। দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থনদানের সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হলো বলা চলে। এঁরা এই ব্যাপারে মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে কোন আনুষ্ঠানিক আলোচনার পর্যন্ত ব্যবস্থা করতে পারলেন না।

অথচ এই মহলের জনৈক প্রভাবশালী নেতা দিব্যি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে আলোচনা করে জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত হলেন। এ সময় একদিন কোলকাতার বাংলাদেশ মিশনে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হলে পরিষ্কার বলে ফেললাম, 'সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে আপনি যার মোকাবেলায় পরাজিত হয়েছেন, তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে পূর্ব রণাংগনে অস্ত্র হাতে লড়াই করছেন। আর আপনি যাচ্ছেন নিউইয়র্কের পথে? আমার ধারণা ছিল ঠিক উল্টো। জাতিসংঘ প্রতিনিধি দলের সদস্য হওয়া উচিত ছিল ওই আওয়ামী লীগ নেতারা। আর আপনার মতো নেতাদের আমরা রণাংগনে দেখতে চেয়েছিলাম।' পরে চিন্তা করে দেখেছি ভদ্রলোকের বিশেষ দোষ নেই। তিনি যা করেছেন, তা মধ্যবিত্তসুলভ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

অন্যদিকে মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের কয়েকটা সংগ্রামী প্রগতিশীল পার্টি নানা তত্ত্বকথার মাধ্যমে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থন দানে অস্বীকৃতি প্রকাশ করলো। মেহনতী জনতার নেতৃত্ব ছাড়া নাকি মুক্তিযুদ্ধে পরিচালিত হতে পারে না। অথচ এঁরা নিজেরাই পার্টির নেতৃত্ব সর্বহারাদের কাছে ছেড়ে দিতে রাজি নন এবং বাস্তব ক্ষেত্রে 'ডিক্লাসড' অর্থাৎ স্বীয় শ্রেণীচ্যুত হতে অক্ষম।

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সম্ভবত পশ্চিম বাংলা, বিহার ও পার্বত্য ত্রিপুরায় নকশালদের প্রভাব অব্যাহত থাকায় এবং মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ভারতীয় একটা মহল উদ্বিগ্ন হলেন। তাঁদের মতে মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ার অর্থই হচ্ছে জাতীয়তাবাদীদের প্রভাবহ্রাস পাওয়া। কিন্তু তাঁরা একটি বিষয় বিবেচনা করতে পারেননি যে, বাংলাদেশের মার্কসীয় দলগুলোর নেতৃত্ব যুগের পর যুগ ধরে মধ্যবিত্তের কুক্ষিগত থাকায় এঁরা জাতীয়তাবাদীদের বিকল্প নেতৃত্ব নয়।

তবুও মুজিবনগর সরকারের অজান্তে পৃথকভাবে মুজিব বাহিনীর ট্রেনিং শুরু হলো। যতদূর জানা যায় মুজিব বাহিনীর নেতৃত্ব তখন সর্বজনাব সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমদ, আব্দুর রাজ্জাক, শেখ ফজলুল হক মণি, আ স ম আব্দুর রব, শাজাহান সিরাজ, নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুল কুদ্দুস মাখন প্রমুখের হাতে।

ষাট দশকের গোড়ার দিকে ঢাকায় আইয়ুববিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে এই উপদলের সৃষ্টি হয়। আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বে গঠিত সম্মিলিত বিরোধী দল সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হলে, ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে এই উপদল উগ্র জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার প্রচার শুরু করে। প্রগতিশীল ছাত্র সংস্থাগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্নে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও এঁরা পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিশ্বাসী ছিলেন। [illegible]রেই এই উপদল ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে এবং ছ'দফা আন্দোলনের সময় বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম হয়। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় এঁদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে এঁদের কর্মীরা গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপকভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা প্রচার করতে সক্ষম হয়েছিল। এতোদিন পর্যন্ত যেখানে আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে ছাত্রলীগ নিজেদের কর্মপন্থা গ্রহণ করতো, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পর উগ্র জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বে ছাত্রলীগই বিভিন্ন প্রশ্নে আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করলো। একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের সময় অনেকের মতে ছাত্রলীগের এই নেতৃত্ব আওয়ামী লীগকে সংগ্রামের পথ অনুসরণের জন্য চাপের সৃষ্টি করলো। এরই ফল হিসাবে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে পল্টনের ৩রা মার্চের ছাত্র জনসভায় প্রস্তাবিত জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হলো আর সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হলো। ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দের অনুরোধে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরের বাড়িতে বঙ্গবন্ধু স্বহস্তে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। এরপর বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণে উগ্র জাতীয়তাবাদী ছাত্রদের চিন্তাধারার প্রতিফলন দেখা গেলো। সুদীর্ঘ এগারো বছর পর বঙ্গবন্ধুর প্রদত্ত সাতই মার্চের ভাষণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে দক্ষিণপন্থীদের সন্তুষ্ট করার জন্য যেমন শর্তসাপেক্ষে প্রস্তাবিত গণপরিষদের অধিবেশনে যোগদানের কথা বলা হয়েছে, তেমনি আওয়ামী লীগের বামপন্থী উপদল ও উগ্র জাতীয়তাবাদী ছাত্র নেতৃত্বের চাপে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম' এ কথাও বলা হয়েছে। শোনা যায় সাতই মার্চের ভাষণের প্রস্তুতি হিসাবে শেখ মুজিব ছয়ই মার্চ প্রায় সমস্ত রাত ধরে দফায় দফায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও উগ্র জাতীয়তাবাদী ছাত্র নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পৃথক

পৃথক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। তবে একটা কথা ঠিক যে, এই ছাত্র নেতৃবৃন্দের ভূমিকার জন্য বাংলাদেশের মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রভাব ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়।

পঁচিশে মার্চ ঢাকায় হানাদার বাহিনীর বীভৎস হামলার পর উগ্র জাতীয়তাবাদী ছাত্র নেতৃবৃন্দ সীমান্ত অতিক্রম করলেও মুজিবনগরে আস্তানা স্থাপন করেননি এবং এদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে মুজিবনগর সরকার বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন বলে মনে হয় না। শেখ সাহেবের অনুপস্থিতির জন্য সম্ভবত এরাও মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। তবে এদেরও সব সময়ই লক্ষ্য ছিল স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা।

একাত্তরের অক্টোবর মাসে বিভিন্ন রণাংগন থেকে মুজিবনগরে নতুন ধরনের সংবাদ এসে পৌছলো। মুজিবনগর সরকার এবং এগারোজন সেক্টর কমান্ডারের কর্তৃত্বের বাইরে টাঙ্গাইল অঞ্চলে কাদেরিয়া বাহিনীর পর আর একটা বাহিনী অর্থাৎ মুজিব বাহিনীর আবির্ভাবে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করলেন। মুজিবনগরে বিভিন্ন মহলে যোগাযোগ করে জানা গেলো যে, উগ্র জাতীয়তাবাদী ছাত্র নেতৃবৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় এই মুজিব বাহিনী সৃষ্টি হয়েছে। মুক্তিবাহিনীর মতো মুজিব বাহিনীরও সুষ্ঠু ট্রেনিং হয়েছে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা মুজিবনগর সরকারের জ্ঞানমতো হয়েছে কিনা তা রহস্যের অন্তরালেই রয়ে গেলো। যতদূর মনে পড়ে বিভিন্ন সেক্টরের মুজিব বাহিনী সম্পর্কে অগ্রিম কোনো নির্দেশ না থাকায় বেশ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। এমনকি যশোর এবং আখাউড়া সেক্টরে মুক্তিবাহিনী ও মুজিব বাহিনীর অক্টোবর মাসে ছোটখাটো সংঘর্ষ পর্যন্ত হয়েছে। তবে স্বাধীনতাযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মুজিব বাহিনীর দশ সহস্রাধিক তরুণ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করেছিল এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মুক্তিবাহিনী ও মুজিব বাহিনীর মধ্যে সমঝোতার সৃষ্টি হয়েছিল। এ ব্যাপারে বোধহয় তো গবেষণা করে প্রকৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার সময় এসেছে। উপরন্তু ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য মুজিব বাহিনীর সঙ্গে জড়িত নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে আলোকপাত করবেন বলা যায়।

৩২

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্বাসিত মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধ পরিচালনা, দেশে ও বিদেশে ব্যাপক প্রচারণা, মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং প্রদান, মুক্ত এলাকায় প্রশাসন ব্যবস্থা সংগঠন ইত্যাদির দায়িত্ব বহন করলেও ইয়াহিয়া খানের সামরিক বাহিনীর হামলার ফলে যে লাখ লাখ ছিন্নমূল শরণার্থী সীমান্ত অতিক্রম করেছিল, স্বাভাবিকভাবেই ভারত সরকারকেই তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল। প্রাপ্ত হিসাব থেকে জানা যায় যে, শেষ পর্যন্ত এই শরণার্থীদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৯৮ লাখ ৯৯ হাজার তিনশ' পাঁচ জনে। এর মধ্যে পশ্চিম বাংলা, ত্রিপুরা, মেঘালয়, আসাম, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশে মোট ৮২৫টি উদ্বাস্তু শিবিরে ৬৭ লাখ ৯৭ হাজার দুইশ' পঁয়তাল্লিশ জনের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বাকি ৩১ লাখ দু'হাজার ৬০ জন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল।

একথা ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে, আজ থেকে প্রায় এগারো বছর আগে বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খানের সামরিক বাহিনীর হামলায় প্রায় ৯৯ লাখ বাঙালি শরণার্থীর আগমনে ভারত বিশ্বের দরবারে যথার্থভাবেই যে হৈচৈ করার সুযোগ পেয়েছিল, মাত্র আট

বছরের মাথায় আফগানিস্তানে রুশ সৈন্য বাহিনীর উপস্থিতিতে পাকিস্তানের মাটিতে প্রায় ৩০ লাখ আফগান মোহাজেরের আগমনে পাকিস্তানও পশ্চিমা দেশগুলোর কাছে সে ধরনেরই যুক্তি উত্থাপন করে সমর্থন আদায়ের সুযোগ পেয়েছে। তবে তফাৎটা হচ্ছে এই যে, একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও শরণার্থী প্রশ্নে পশ্চিমা দেশের প্রচার মাধ্যমগুলো সক্রিয় সাহায্য প্রদানে অপারগ ছিল। আর এখন আফগান প্রশ্নে পশ্চিমা দেশের ক্ষমতাসীন সরকারগুলো পাকিস্তানকে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করার পর বিশ্বজনমত সংগঠনে সচেষ্ট হয়েছে। কারণ অবশ্য একটাই। সোভিয়েত রাশিয়ার ভূমিকা। একাত্তরের রুশ-ভারত বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি রাশিয়ার সমর্থনদানের প্রেক্ষিতে পশ্চিমা দেশগুলোর নীতি-নির্ধারণ। আফগানিস্তানের মাটিতে খোদ রুশ সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতির ফলে পাকিস্তানে আগত আফগান মোহাজেরদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পরোক্ষভাবে গ্রহণ করা ছাড়াও পশ্চিমা দেশগুলো পাকিস্তানকে প্রয়োজনীয় সামরিক সাহায্য দিচ্ছে। তাহলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ন্যায়নীতির বড়াই করাটা কারো পক্ষে শোভনীয় নয়। বৃহৎ শক্তিগুলোর স্বার্থেই সব কিছু পরিচালিত হচ্ছে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

যাক, যা বলছিলাম। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যে ৯৯ লাখ শরণার্থী সীমান্ত অতিক্রম করেছিল, তার মধ্যে ৭৩ লাখ শুধু পশ্চিম বাংলাতেই আশ্রয় নিয়েছিল। সে আমলে পশ্চিম বাংলার লোকসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৪৪ লাখ। অর্থাৎ স্থানীয় অধিবাসীদের তুলনায় বাঙালি শরণার্থীদের অনুপাত দাঁড়িয়েছিল প্রতি ছ'জনে এক জন। পশ্চিম বাংলার সীমান্তবর্তী পশ্চিম দিনাজপুর, বালুরহাট, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা জেলাগুলোতে স্থানীয় অধিবাসী ও বাঙালি শরণার্থীদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ করে নদীয়া ও পশ্চিম দিনাজপুরে বাঙালি শরণার্থীদের সংখ্যা স্থানীয় জনসংখ্যাকে অতিক্রম করেছিল। এর অর্থই হচ্ছে একাত্তরের এপ্রিল-মে মাসের দিকে বাংলাদেশে কুষ্টিয়া, যশোর ও দিনাজপুরে তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পাল্টা আক্রমণে শহর ও জনপদগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল।

পূর্বাঞ্চলে ত্রিপুরা রাজ্যে স্থানীয় জনসংখ্যা যেখানে সাড়ে ১৫ লাখ ছিল, সেখানে বাঙালি শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় সোয়া ১৪ লাখের মতো। এ থেকেই কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চলে হানাদার বাহিনীর নিরীহ মানুষের ওপর আক্রমণের বীভৎসতার প্রমাণ পাওয়া যায়। একইভাবে উত্তর সীমান্ত মেঘালয়ে যেখানে জনসংখ্যা ছিল ৯ লাখ ৮৩ হাজার, সেখানে শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৬ লাখ ৬৮ হাজার।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের যুদ্ধ নিয়ে পশ্চিমা সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমগুলো যত সোচ্চার হয়েছে বিশ্বের সাম্প্রতিক ইতিহাসে আর কোন ইস্যু নিয়ে তা হয়নি। কারণ, প্রথমত, সত্তরের ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় দশ লাখ লোকের প্রাণহানিতে বিশ্ববাসীর ব্যাপক সহানুভূতি প্রকাশ ও সাহায্যদান সত্ত্বেও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতাসুলভ আচরণ। দ্বিতীয়ত, ইয়াহিয়া খানের সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে সাধারণ নির্বাচন মারফত গণতন্ত্রে উত্তরণের ওয়াদা এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানে গণতান্ত্রিক বিশ্বের আগ্রহ। তৃতীয়ত, একদিকে ধর্মান্ধ দক্ষিণপন্থী এবং অন্যদিকে বামপন্থী জোটকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে মধ্যপন্থী জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐতিহাসিক বিজয়। চতুর্থত, নির্বাচন মারফত একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিবের

নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে জেনারেল ইয়াহিয়ার অস্বীকার ও তৎকালীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সাফল্যজনকভাবে অসহযোগ আন্দোলন। পঞ্চমত, আকস্মিকভাবে পঁচিশে মার্চ ঢাকায় ইয়াহিয়ার সামরিক বাহিনীর বর্বর হামলা ও নির্বিচারে গণহত্যা। ষষ্ঠত, জাতীয়তাবাদী শক্তির নেতৃত্বে নির্বাচিত সরকার গঠন ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনা। সপ্তমত, বাংলাদেশের অধিকৃত অঞ্চলে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর হামলা অব্যাহত থাকায় প্রায় ৯৯ লাখ শরণার্থীর সীমান্ত অতিক্রম।

অল্প সময়ের মধ্যে এতোস[illegible] ঘটনার প্রেক্ষতে বিশ্বের সর্বত্র গণমাধ্যমগুলো প্রতিনিয়তই বাংলাদেশের ঘটনাবলীর [illegible] উপস্থিত করায় বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমতের সৃষ্টি হলো। স্বাভাবিকভাবেই ভা[illegible]ত ৯৯ লাখ বাঙালি শরণার্থীর ভরণ-পোষণের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করলো। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, এ সময় ভারত সরকার সর্বমোট ২৬ কোটি ৪৪ লাখ ৯৬ হাজার ৪৬২ ডলার সাহায্য লাভ করে। এছাড়া বর্মার প্রেরিত ৫০০ টন চাল এবং তুরস্কের প্রেরিত কিছু কম্বল, ওষুধ ও শিশু খাদ্য সাহায্য হিসেবে এসেছিল। মোট ৭৩টি দেশে জাতিসংঘের নয়াদিল্লিস্থ অফিসের মাধ্যমে এবং সরাসরি ভারত সরকারের নিকট বাঙালি শরণার্থীদের জন্য [illegible]৩ কোটি ৪৭ লাখ ১৩ হাজার ডলার সাহায্য পাঠিয়েছিল। এর মধ্যে সর্বোচ্চ সা[illegible] এসেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এবং তার পরিমাণ ৮ কোটি ৯১ লাখ ৫[illegible] [illegible]জার ডলার। এর পরেই ব্রিটেনের সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৮১ লা[illegible] [illegible] হাজার ১৩২ ডলার। তৃতীয় ও চতুর্থ সাহায্যদাতা ছিল যথাক্রমে কানাডা ([illegible] কোটি ২ লাখ ৬০ হাজার ৩০৭ ডলার) এবং সোভিয়েত রাশিয়া (২ কোটি [illegible])। ৭২টি দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন নমুনা হিসাবে সাহায্যের পরিমাণ ১২৬ ড[illegible] [illegible]য়েছিল দহোমী রাজ্য। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে লিবিয়া, ইরান, ইরাক, [illegible] ও ওমান-এর মোট সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৫ লাখ ৭৪ হাজার ১৬২ ডলার। জা[illegible]তিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার প্রদত্ত সাহায্য ৪৩ লাখ ৫২ হাজার ২৮০ ডলার। অন্যদিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ব্যক্তিগত সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ২ কোটি ৫৪ লাখ ৩০ হাজার ৭৬৩ ডলার। অর্থাৎ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি শরণার্থীদের করুণ কাহিনীর ফলশ্রুতি হিসেবে বিশ্ব বিবেক জাগ্রত হয়েছে এবং গড়ে ৭৩টি দেশের সাহায্যের তুলনামূলক হিসাব করলে প্রতি নয় ডলারে এক ডলার সাহায্য এসেছে ব্যক্তিগত চাঁদা থেকে।

আগেই বলেছি যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং ৯৯ লাখ শরণার্থীর সীমান্ত অতিক্রম সম্পর্কে বিশ্বের পত্র-পত্রিকায় যত প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে, সাম্প্রতিক ইতিহাসে আর কোন ইস্যু নিয়ে এতো হৈচৈ হয়নি। ভারতের পক্ষ থেকে জাতিসংঘে এ মর্মে পরিষ্কার বক্তব্য পেশ করা হলো যে, পার্শ্ববর্তী পূর্ব পাকিস্তানে ইয়াহিয়ার সামরিক বাহিনীর বর্বর হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকায় বন্যার স্রোতের মতো শরণার্থী সীমান্ত অতিক্রম করায় ভারতের পক্ষে বাধ্য হয়েই প্রতিবাদ জানাতে হচ্ছে। কেননা এতে ভারতে অর্থনীতির ওপর বিরাট চাপ সৃষ্টি হয়েছে এবং ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো ব্যাহত হচ্ছে। উপরন্তু অন্য দেশের এই বিপুল জনসংখ্যার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব মাসের পর মাস ভারত কেন বহন করবে? তাই শরণার্থীদের সীমান্ত অতিক্রমের কারণ খুঁজে বের করতে হবে। এই কারণটাই হচ্ছে ইয়াহিয়া খানের

সামরিক বাহিনীর সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল মোতাবেক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর না করে সামরিক বাহিনী দিয়ে গণহত্যা অব্যাহত রাখা। এই প্রেক্ষাপটে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমাধানে আগ্রহী।

পাকিস্তানের পক্ষ থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জাতিসংঘে বলা হলো যে, ভারতের মতলব হচ্ছে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বিনষ্ট করা। তাই ভারত জাতিসংঘের সনদের বরখেলাপ করে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রশ্নের ব্যাপারে ভারতের বক্তব্য পেশ করা তো দূরের কথা, আলোচনার অধিকার পর্যন্ত নেই। উপরন্তু ভারত 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' লোকদের সামরিক ট্রেনিং প্রদান করে 'সন্ত্রাসমূলক' কাজের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে পাঠানো ছাড়াও শরণার্থীদের সীমান্ত অতিক্রমে উৎসাহিত করছে।

কিন্তু এতো সতর্কতা অবলম্বন করেও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ইয়াহিয়ার সামরিক বাহিনীর ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নারী ধর্ষণের অব্যাহত ঘটনা লুকিয়ে রাখা সম্ভব হলো না। প্রতিনিয়তই বিশ্বের পত্র-পত্রিকায় এসব ঘটনা ফলাও করে প্রকাশিত হলো। এমনকি বিভিন্ন দেশের টেলিভিশনেও সচিত্র প্রতিবেদন প্রদর্শন অব্যাহত রইল। এসব বর্বরোচিত ঘটনায় সমগ্র সভ্য জগত স্তম্ভিত হওয়া ছাড়াও প্রতিবাদমুখর হলো।

এমন সময় ১৯৭১ সালের ১৫ই আগস্টে ওয়াশিংটনে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত জনাব আগা শাহী এবিসি টেলিভিশনে এক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে প্রশ্নের জবাবে সুস্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'আওয়ামী লীগের প্রোপাগাণ্ডায় কমপক্ষে ১ লাখ ৬০ হাজার সশস্ত্র লোক বিদ্রোহী হয়। ২৫শে মার্চ সামরিক বাহিনীকে এই ১ লক্ষ ৬০ হাজার সশস্ত্র লোককে শায়েস্তা করার নির্দেশ দেয়া হয়। এইসব লোক ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস আর সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীতে ছিল। এরা রিজার্ভ পুলিশের অস্ত্রাগার এবদং সরকারের অন্যান্য অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র লুণ্ঠন করেছিল। এছাড়া সশস্ত্র ছাত্ররা বহু বাড়িতে গিয়ে জোরপূর্বক অস্ত্র সংগ্রহ করেছে। আমার মনে হয়, অনেক আগেই এদের নিরস্ত্র করা উচিত ছিল।'

জনাব আগা শাহী ২৫শে মার্চ ঢাকায় পাকিস্তানি সামরিক হামলার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করতে গিয়ে বিপাকে পড়লেন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি তাঁর বক্তৃতা পেশ করার পর জনাব আগা শাহীর টেলিভিশন বক্তৃতার উল্লেখ করে বললেন, যেখানে পাকিস্তানই স্বীকার করছে যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এক লাখ ৬০ হাজার বিদ্রোহী সশস্ত্র পুলিশ, ইপিআর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ান যুদ্ধ করছে সেখানে ভারতের মাটিতে ট্রেনিং দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

এরকম এক নাজুক অবস্থায় ইয়াহিয়ার সামরিক কর্তৃপক্ষ এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, ভারত থেকে শরণার্থী ফিরিয়ে আনতে পারলে, ভারতের পক্ষে হৈচৈ করার আর অবকাশ থাকবে না। তাই একাত্তরের সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে জেনারেল ইয়াহিয়া 'সাধারণ ক্ষমা' ঘোষণা করে শরণার্থীদের দেশে ফেরার আহ্বান জানালেন। এর পরেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে বেশ কিছুসংখ্যক অভ্যর্থনা কেন্দ্র খোলা হলো। আর পাকিস্তান বেতার কেন্দ্রগুলো দিন-রাত শরণার্থীদের দেশে ফেরার জন্য অনুরোধমূলক ঘোষণা শুরু করলো।

এ ধরনের পরিস্থিতির মোকাবেলায় প্রবাসী সরকার বিব্রত হয়ে উঠলো। বেশ

কয়েক দফা উচ্চ পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠকগুলোতে এ মর্মে মত প্রকাশ করা হলো যে, শরণার্থীদের সঙ্গে আমাদের জীবন-মরণ সমস্যা ও স্বাধীনতার প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। অতএব দখলিকৃত এলাকায় কিছুতেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে দেয়া হবে না। কেননা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলেই শরণার্থী শিবিরগুলোতে দুর্বিষহ অবস্থায় দিনযাপনের চেয়ে শরণার্থীরা জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তনের তাগিদ অনুভব করবে। আর একবার দেশে ফেরার হুজুগ আরম্ভ হলে এঁদের আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তাই মুজিবনগর সরকার এগারোটা সেক্টরে যুদ্ধ জোরদার করা ছাড়াও গেরিলা এ্যাকশান বাড়াবার নির্দেশ দিলো। আর প্রতিটি শরণার্থী শিবিরে শত শত ট্রানজিস্টার রেডিও সরবরাহের ব্যবস্থা করে 'স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র'কে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হলো যে, এমনভাবে প্রোপাগাণ্ডা জোরদার করতে হবে, যাতে কোন শরণার্থী দেশে প্রত্যাবর্তন না করে। শেষ পর্যন্ত প্রোপাগাণ্ডার পুরো দায়িত্বটাই আমার ঘাড়ে এলো। এখনও স্পষ্ট মনে আছে যে, দিন কয়েক ধরে 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান মারফত এমন প্রোপাগাণ্ডা করে অভ্যর্থনা কেন্দ্রগুলো সম্পর্কে ভীতির সঞ্চার করেছিলাম যে, শরণার্থীরা 'সাধারণ ক্ষমা' ঘোষণা করা সত্ত্বেও দেশে প্রত্যাবর্তন করেনি বা করতে সাহসী হয়নি।

৩৪

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র পরিচালনার সময় হঠাৎ করে আমরা একটা বিশেষ সুবিধার বিষয় উপলব্ধি করলাম। বাঙালি গ্রামীণ সমাজে যেভাবে কুলবধূরা ভাসুরের নাম মুখে আনতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার ছ'টি বেতারকেন্দ্র তাদের প্রচার প্রোপাগাণ্ডার কোথাও 'স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র'র নাম ধরে গালাগাল করতে পারছে না। কেননা যখনই স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের নাম উল্লেখ করবে, তখনই মুজিবনগর সরকার ও বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের নিজস্ব পূর্ণাংগ বেতারকেন্দ্রের অস্তিত্বকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করতে হবে। এটা হানাদার বাহিনীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে আমরা প্রচার প্রোপাগাণ্ডার মাধ্যমে জোরালো ভাষায় যত অভিযোগই উত্থাপন করতাম, হানাদার বাহিনীর কবলিত বেতারকেন্দ্রগুলো তার সরাসরি জবাব দিতে অপারগ ছিল। তারা যেটুকু জবাব দিতো তার সবটাই ভারতের 'আকাশবাণী'কে গালাগাল করে দিতে হতো। এটা ছিল অনেকটা 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপাবার মতো।

তাই আমরা স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র পরিচালনার সময়ে আক্রমণাত্মক নীতি অব্যাহত রেখেছিলাম। আমাদের নীতি ছিল প্রথমত, মুক্তিযোদ্ধাদের শৌর্য-বীর্যকে বিশেষভাবে তুলে ধরা। দ্বিতীয়ত, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মারপ্যাঁচকে সহজ-সরল ভাষায় সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে উপস্থাপিত করা। তৃতীয়ত, নির্বাসিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কর্মকাণ্ডের প্রতি আলোকপাত করা। চতুর্থত, হানাদার বাহিনী কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপকে নস্যাৎ করার আহ্বান জানানো। পঞ্চমত, সমগ্র বাঙালি জাতির একাত্মতাবোধকে অব্যাহত রাখা। আর সর্বোপরি অধিকৃত এলাকায় হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড, নারী নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ও ধর্মীয় স্থান অপবিত্রকরণ সংক্রান্ত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ ববরণ প্রদান এবং শত বিপদ-আপদের মধ্যেও সাধারণ মানুষের মনোবলকে অব্যাহত রাখা।

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র পরিচালনায় এসব নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ, বেতারের দায়িত্বে নিয়োজিত ও টাংগাইল থেকে নির্বাচিত গণপ রিষদ সদস্য জনাব আব্দুল মান্নান এবং মুজিবনগর সরকারের তৎকালীন তথ্য সচিব জনাব আনোয়ারুল হক খানের অবদান অনস্বীকার্য। এতোগুলো বছর পরে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অতীতের এসব কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন করলে দেখতে পাই যে, বিদেশে মাটিতে বসে আর সীমিত লোকবল ও সম্পদ সত্ত্বেও আমাদের গৃহীত নীতি সুষ্ঠু ও স ঠিক ছিল। তাই তো আমরা লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছিলাম।

রাজনীতির অপার মহিমা রয়েছে। একাত্তরের ঘটনাবলী তার জ্বলন্ত প্রমাণ। অন্যায়-অবিচার ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি বড়ই করুণ। সামরিক তত্ত্বাবধায়নে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী পার্টির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকার করে পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে বেপরোয়া হত্যা, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের জন্য লেলিয়ে দেয়ার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ সবারই জানা। সমস্ত ন্যায়-নীতি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ক্ষমতায় বসাবার চক্রান্তে পাকিস্তান নামে দেশটাই দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলো।

আশ্চর্য হলেও একথা সত্য যে, একাত্তরের পঁচিশে মার্চ বাংলাদেশে হানাদার বাহিনীর গণহত্যা শুরু করার পর বিশ্বের দরবারে পাকিস্তান নিজেদের ঘৃণীত কার্যকলাপের যৌক্তিকতা প্রদর্শনে প্রয়াসী হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত জনাব শাহীর যে সাংবাদিক সাক্ষাৎকার মার্কিনি টেলিভিশন সংস্থা এবিসি'র মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল তার অংশবিশেষ থেকে একথা প্রমাণিত হবে।

বব ক্লার্ক : আপনি কি স্বীকার করেন যে, আপনাদের সৈন্যবাহিনী বেপরোয়াভাবে বেসামরিক লোক নিধনের জন্য দোষী?

আগা শাহী : খুবই কম। যদি হয়েও থাকে, খুবই কম।

বব ক্লার্ক : খুবই কম বলছেন?

আগা শাহী : যদি হয়েই থাকে খুবই কম। বুঝতেই পারছেন, এটা ছিল একটা সশস্ত্র ব্যবস্থা। আওয়ামী লীগের প্রোপাগাণ্ডায় কমপক্ষে এক লাখ ষাট হাজার সশস্ত্র বাহিনীর লোক (বাঙালি) বিদ্রোহ ঘোষণা করার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে তার মোকাবেলায় সামরিক বাহিনীকে নামাতে হয়েছিল। ২৫শে মার্চ সামরিক বাহিনীকে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, এই এক লাখ ষাট হাজার সশস্ত্র লোকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করো। এখন কিভাবে তারা এই ব্যবস্থা নিবে? স্বাভাবিকভাবেই তাদের শক্তির প্রয়োগ করতে হয়েছে। আর এই শক্তি প্রয়োগ করার সময় কিছু বেসামরিক লোকও নিহত হয়েছে। 'ক্রস ফায়ারের' মুখে এদের মৃত্যু হয়েছে। যদিও কিছু বেসামরিক লোক মারা গেছে– তবুও একথা ঠিক যে, সামরিক বাহিনীর অনিচ্ছায় এরা নিহত হয়েছে। সামরিক বাহিনী কিন্তু বেসামরিক জনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি।

বব ক্লার্ক : জনাব রাষ্ট্রদূত, গণহত্যার সংবাদ কিন্তু নানা সূত্র থেকে এসে পৌঁছেছে। এসব সূত্র হচ্ছে বিদেশী কূটনীতিবিদ, ধর্মীয় প্রচারক ও সাংবাদিক। এরা কিন্তু আপনাদের সশস্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণের আগে থেকেই ঘটনাস্থলে ছিল। পাকিস্তান থেকে সীমান্তের ওধারে যেসব শরণার্থী চলে গেছে, তাঁদের বক্তব্যের সঙ্গে এদের গণহত্যার বিবৃতির মিল থাকাটা কি অর্থবহ নয়?

আগা শাহী : বিদেশী কূটনীতিবিদরা ঢাকাতেই ছিল। অন্যান্য জায়গাতেও একইভাবে বেসামরিক লোক হত্যা হতে তারা দেখেনি।

টেড কপেল : আচ্ছা, জনাব রাষ্ট্রদূত, পূর্ব সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বলছি, আমি মার্চ মাসে ঢাকাতেই ছিলাম। ২৫শে মার্চ ভয়াবহ সশস্ত্র ব্যবস্থা শুরু হওয়ার পর আমাকে দেশের অভ্যন্তরে যেতে দেওয়া হয়নি। ঢাকাতেই আমি দেখেছি যে, বেসামরিক লোকের বিরুদ্ধে ট্যাংক ব্যবহার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কামানের গোলা নিক্ষেপ করা হচ্ছে। আমার মনে হয় না, এরপরেও কি আপনি বলবেন যে, এসব ঘটনা শুধুমাত্র ইস্ট বেঙ্গল রাইফেলস্ আর পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর লড়াই-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল? আসলে বেসামরিক লোককে হত্যা করা হয়েছে এবং এসব লোকের প্রতিরোধের কোন সুযোগই ছিল না।

আগা শাহী : হ্যাঁ। আমি তো বলিনি যে, কোন বেসামরিক হতাহত হয়নি। তবে গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস হয়নি। কিছু বাড়ি-ঘর ভস্মীভূত এবং বিনষ্ট হয়েছে।

বব ক্লার্ক : কিন্তু যেসব রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, ব্যাপক এলাকায় ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে এবং বহু গ্রাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

আগা শাহী : এই দেখুন– আমরা ঘটনার বাস্তবতা সম্পর্কে মতপার্থক্য প্রকাশ করছি। ধ্বংসের ব্যাপকতা এতো বেশি নয় যে, তা পুনর্গঠন করা যাবে না। কিছু ধ্বংস সাধিত হয়েছে। কিন্তু ধ্বংসের পরিমাণ এতো ব্যাপক নয় যে, এইসব বাড়ি-ঘর আর মেরামত করা সম্ভব নয় কিংবা শরণার্থীরা ফিরে এসে থাকতে পারবে না।

এই সাক্ষাৎকারে জনাব আগা শাহী আরও বললেন, যে ১,৬০,০০০ সশস্ত্র লোকের কথা বলেছি তাঁদের মধ্যে ইস্ট রেজিমেন্ট ছাড়াও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্ এবং সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা রয়েছে। এরা সরাসরি এবং রিজার্ভ পুলিশের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করা ছাড়াও বিভিন্ন জায়গা থেকে জোরপূর্বক অস্ত্র সংগ্রহ করেছে। উপরন্তু সশস্ত্র ছাত্ররা বাড়ি গিয়ে রাইফেল ইত্যাদি জোগাড় করেছে। এরা ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের অস্ত্রাগার থেকেও অস্ত্র নিয়ে গেছে। এদের নিরস্ত্র করার জন্যই পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে সশস্ত্র ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত জনাব আগা শাহী ২৫শে মার্চ সামরিক ব্যবস্থা নেয়ার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করতে গিয়ে বেশ অসুবিধায় পড়লেন। জাতিসংঘে ভারতীয় প্রতিনিধি মি. সমর সেন জনাব শাহীর ১৫ই আগস্টের টিভি সাক্ষাৎকারের উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই যখন ১,৬০,০০০ সশস্ত্র লোক প্রতিরোধ লড়াইয়ে লিপ্ত রয়েছে তখন ভারতে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং প্রদান ও অনুপ্রবেশ করানোর প্রশ্নই ওঠে না।

পাকিস্তানের তরফ থেকে জাতিসংঘে যখন অভিযোগ উত্থাপন করা হলো যে, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত হস্তক্ষেপ করছে, তখন ভারতের জবাব হলো পাকিস্তান তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মীমাংসা করতে গিয়ে এমন নারকীয় ব্যবস্থা নিয়েছে, যাতে প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতে এসে হাজির হয়েছে। এই শরণার্থীদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কেনো ভারত নেবে? এইসব শরণার্থীদের দেশে ফেরার ব্যবস্থার উদ্দেশ্যেই পূর্ব পাকিস্তানে যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশের প্রয়োজন, সেই পরিবেশের কথা বলাটা অভ্যন্তরীণ হস্তক্ষেপের শামিল হতে পারে না।

আবার জাতিসংঘে যখন পাকিস্তানের পক্ষ থেকে উপমহাদেশে শান্তির পরিবেশ

ফিরে আনার জন্য পাক-ভারত বৈঠকের প্রস্তাব করা হলো, তখন ভারতের উত্তর হচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক মীমাংসার ব্যাপারটা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। আর এ ব্যাপারে পাকিস্তান যদি আন্তরিকভাবে আগ্রহী হয় তাহলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উচিত হবে নির্বাচনে বিজয়ী পার্টির নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কথাবার্তা বলা। আর শেখ সাহেব তো পাকিস্তানের কারাগারেই রয়েছেন।

তৎকালীন পাকিস্তান সামরিক জান্তার কথা হচ্ছে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতার' অভিযোগ রয়েছে, আর তার বিচার হবে। তাই আগেই উল্লেখ করেছি যে, রাজনীতির অপার মহিমা রয়েছে। তা না হলে আজ থেকে প্রায় ২১/২২ বছর আগে ভারতের পক্ষ থেকে 'যুদ্ধ নয়' প্রস্তাব উত্থাপন করে পাকিস্তানকে দস্তখত করাবার জন্য কতই না অনুরোধ করা হয়েছিল। আর এখন, তার প্রায় দুই যুগ পরে পাকিস্তানই 'যুদ্ধ নয়' প্রস্তাব উত্থাপন করে, ভারতকে দস্তখত করাবার জন্য কতই না অনুরোধ-উপরোধ করা হয়েছিল। আর এখন, তার প্রায় দুই যুগ পরে পাকিস্তানই 'যুদ্ধ নয়' প্রস্তাব উত্থাপন করে, ভারতকে দস্তখত করাবার জন্য কইত না পীড়াপীড়ি করছে।

এজন্যই আমরা দেখতে পাই যে, জেনারেল আইয়ুবের নেতৃত্বে ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। আবার পাকিস্তানের দ্বিতীয় সামরিক জান্তা ১৯৭১ সালে জেনারেল ইয়াহিয়ার একগুঁয়েমির দরুন প্রথমে বাঙালির বিরুদ্ধে ও পরে ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল।

কি আশ্চর্য! আর এখন পাকিস্তানের তৃতীয় সামরিক জানতা জেনারেল জিয়াউল হক ভারতের কাছে 'যুদ্ধ নয়' প্রস্তাব উত্থাপন করে উপমহাদেশে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আগ্রহী হয়েছে।

একাত্তরের সেপ্টেম্বর মাসের কথা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী এলেন পশ্চিম বংগ সফরে। উদ্দেশ্য সরেজমিনে বাংলাদেশের শরণার্থীদের শিবিরগুলো পরিদর্শন করা। মুজিবনগর সরকারের তথ্য ও প্রচার বিভাগীয় অধিকর্তা হিসাবে আমাকেও মিসেস গান্ধীর সঙ্গে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। ফলে আমি সাংবাদিক দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হলাম। বাংলাদেশের শরণার্থীদের শিবির পরিদর্শনের জন্য আমরা জিপে কোলকাতা থেকে রওয়ানা হলাম। কয়েকটা শিবিরের অবস্থা দেখার পর আমরা একেবারে সীমান্ত এলাকার 'বয়রা ক্যাম্পে' হাজির হলাম। তখন বর্ষাকালের শেষ পর্যায়। তাই শরণার্থী শিবিরগুলোর পরিবেশ কিছুটা পরিচ্ছন্ন। তবুও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যেই নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করলেন।

দুপুরে পশ্চিম বাংলার জনা কয়েক সাংবাদিকের সঙ্গে 'পাইস হোটেলে' খেতে গেলাম। দোতলায় ছোট্ট একটা হোটেল। ভাত, ডাল, মাছ, সবজি দিয়ে পুরো বাঙালি খাওয়ার ব্যবস্থা। একদিকে টেবিল-চেয়ার আর অন্যদিকে মাটিতে 'আসন' পেতে খাওয়ার আয়োজন। ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউই 'আসনে' বসে খেতে পারবেন না। আমরা চারজনই টেবিল-চেয়ারে খেতে বসলাম। এমন সময় পরিবেশনকারী এসে বললেন, 'মাছের তরকারি দেবো কি'? বাংলাদেশ থেকে চমৎকার রুই মাছ এসেছে। আমার তিনজন সাংবাদিক বন্ধু একযোগে মাছের তরকারির অর্ডার দিলেন। আমি বললাম, আমাকে ডিমের কারি দিলে খুশি হবো।' মার্কিনি সংবাদ সংস্থা ইউ পি আই-এর কোলকাতাস্থ সংবাদদাতা অজিত দাস জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হলো মশায়, বাংলাদেশের রুই মাছ খাবেন না?' সশব্দে হেসে জবাব দিলাম, 'দাদা, এর মধ্যেই

মাছের টুকরোর সাইজ দেখেছি। মনে হয় ব্লেড দিয়ে কেটেছে। গোটা আট-দশেক টুকরোর নিচে আমার খাওয়া হবে না। পকেটে তো অতো পয়সা নেই। তাই খামখা এক-আধ টুকরো বাংলাদেশের মাছ খেয়ে মুখে চুলকানি উঠাতে চাই না। এর চেয়ে একই দামে দুটো সিদ্ধ ডিমের কারি অনেক ভালো মনে হচ্ছে।'

আমার জবাবে ভদ্রলোক বেশ কিছুটা বিব্রত হলেন। খেতে খেতে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে হোটেল মালিকের বুদ্ধির তারিফ করলাম। হোটেলের ম্যানেজার শ্লেট আর পেন্সিল নিয়ে বসে রয়েছেন। অলিখিতভাবে ছ'টা টেবিল ও ছ'টা আসনের নম্বর দেয়া আছে। হোটেল কর্মচারীদের এসব নম্বর একেবারে মুখস্থ। তাই আমাদের তিন নম্বর টেবিলে খাওয়ার অর্ডার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজার শ্লেটে তা লিখে ফেলছেন। এরপর অতিরিক্ত ভাত, ডাল নিলে তার জন্য 'হাতা' হিসেবে অতিরিক্ত পয়সা দিতে হবে। যে মুহূর্তে অজিতদা একটু ভাত চাইলেন, বেয়ারা বড় এক চামচে ভাত পরিবেশন করেই চিৎকার করে উঠলো, 'ভাত এক হাতা– তিন নম্বর।' ওদিকে ম্যানেজার বাবু তা শ্লেটে তিন নম্বর টেবিলের হিসাবে লিখে ফেললেন। আমি একটু ডাল চাইতেই আবার একইভাবে বেয়ারা ডাল পরিবেশন করেই চিৎকার করলো ডাল এক হাতা– তিন নম্বর।

খাওয়ার পর ম্যানেজার বাবুর কাছে পয়সা দিতে গিয়ে দেখি আমাদের তিন নম্বর টেবিলের হিসাবে শ্লেটের একটা ধার একেবারে ভরে গেছে। আমি একটু ইয়ার্কি করেই বললাম, 'বাব্বা, এতো হিসাবপত্র রাখার জন্য এম কম পাস করা ম্যানেজারের দরকার?' ম্যানেজার বাবু টাকা বুঝে নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে একটা কাষ্ঠ হাসি দিয়ে বললো, 'স্যার, আমি আটষট্টি সালে কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে এম কম পাস করে এতোদিন বেকার ছিলাম। মাস ছয়েক হয় এই হোটেলে চাকরি পেয়েছি।'

আমি হতভম্বের মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। অজিতদা'র ডাকে সম্বিত ফিরে এলা। 'কই মশায়, চলুন আমরা এলাকাটা একটু ঘুরে দেখতে যাবো।' হোটেল থেকে বেরিয়ে আমরা জিপে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের দিকে গেলাম। কিছু দূর এগিয়েই বিএসএফ ক্যাম্প। আমাদের পরিচয় জানতে পেরে ক্যাম্প কমান্ডার আমাদের সঙ্গে খুব সহৃদয় ব্যবহার করলেন। বললেন, এই বাইনাকুলার দিয়ে আপনারা বাংলাদেশ দেখতে পাবেন।

বাইনাকুলার দিয়ে প্রাণভরে সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশকে দেখলাম। মনে কেবল একটা প্রশ্ন উঠলো, কবে আমরা দেশে ফিরতে পারবো? আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা কি বিজয়ী হতে পারবে? বিএসএফের ক্যাম্প কমান্ডারের সঙ্গে চা খেতে খেতে অনেক আলাপ হলো। জাতিতে পাঞ্জাবি হিন্দু। নাম মহিন্দর ভক্ত। ভদ্রলোকের আদি বাসস্থান ও জন্মভূমি পাকিস্তান পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালাতে। ভারত বিভাগের সময় সাতচল্লিশের দাংগায় পিতা-মাতার সঙ্গে দিল্লিতে চলে এসেছেন। লাহোরেও তাঁদের নিজস্ব বাড়ি ছিল সবজিমণ্ডিতে। স্কুল জীবনে লাহোরে পড়াশোনা করেছেন। আমি বেশ ক'বার লাহোর গিয়েছি জেনে কর্নেল মহিন্দর খুশিতে ফেটে পড়লেন। বললেন, 'লাহোর দেখা জি? কেতনা খুব সুরত শহর? তামাম হিন্দুস্থান মে এতনা খুব সুরত শহর আর মেলেগি নেই। কেঁওজী, ম্যায় কেয়া সাচ্ বাতয়ে নেহি? ইয়ে বাঙালি লোগকো বাতাও না, লাহুর কেতনা খুব সুরত হ্যায়?'

কর্নেল মহিন্দরের বালকসুলভ চপলতা আমাকে বিমুগ্ধ করলো। দিব্য চোখে দেখতে

পেলাম আজ থেকে ২৫/২৬ বছর আগে বালক মহিন্দর বগলের নিচে একগাদা বই নিয়ে লাহোরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে স্কুলে যাচ্ছে। আর তার পকেট ভর্তি মার্বেল। আনন্দ আর উৎসবে ভরপুর জীবন। কিন্তু রাজনীতির আবর্তে সব কিছুই লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলো। পাকিস্তানের সৃষ্টি যখন ঠেকানো গেলো না, তখনই তো সে সময়কার পাঞ্জাবি হিন্দু আর শিখ নেতারা পাঞ্জাব বিভক্তের দাবি উত্থাপন করেছিল। সমগ্র উপমহাদেশে একমাত্র পাঞ্জাবেই 'টোটার এক্সোডাস' অর্থাৎ ধর্মীয় ভিত্তিতে পুরা জনগোষ্ঠীর 'হিজরত' হয়েছে। অনুসন্ধান করলে পূর্ব পাঞ্জাবেরও পথে-প্রান্তরে বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে যাওয়া মুসলিমদেরও এমন অনেক করুণ কাহিনী পাওয়া যাবে। আজকের পশ্চিম পাঞ্জাবে যেমন একটা হিন্দু কিংবা শিখ পরিবার পাওয়া যাবে না, তেমনি পূর্ব পাঞ্জাবেও আজকের দিনে একজন মুসলমানকেও দেখা যাবে না। এটাই হচ্ছে বাস্তব সত্য।

বিকালের পড়ন্ত রোদে আমরা কর্নেল মহিন্দর ভক্তর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। শুধু বললাম, 'কর্নেল সাহেব, তোমার কাছে যেমন লাহোর হচ্ছে সবচেয়ে প্রিয় শহর, আমার কাছে তেমনি প্রিয় হচ্ছে ঢাকা। তবে তফাৎটা হচ্ছে, তুমি আর কোন দিনই লাহোরে ফিরে যেতে পারবে না। কিন্তু আমরা আবার ঢাকায় ফিরবো বিজয় কেতন উড়িয়ে।'

৩৫

সভ্য জগতে একটা কথা চালু আছে যে, কোন ব্যক্তি পরলোকগমন করলে তিনি তখন সমালোচনার উর্ধ্বে। কিন্তু রাজনীতিবিদদের ক্ষেত্রে এই কথাটা প্রযোজ্য নয়। এই জন্যই ইতিহাস পুস্তকে আমরা বিভিন্ন রাজা-মহারাজা, সম্রাট-বাদশাহ আর রাজনীতিবিদদের কর্মকাণ্ড এবং কার্যকলাপের সমালোচনা দেখতে পাই। এমনকি তাঁদের ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ভালো-মন্দ দু'দিকেরই পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ও টিকা-টিপ্পনী লিপিবদ্ধ করা ঐতিহাসিকদের অন্যতম দায়িত্ব।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নেতৃত্বের মূল্যায়ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে যারা সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন, তাঁদের কাছে নিবেদন, প্রায় তেরো বছর আগে অনুষ্ঠিত এই যুদ্ধের প্রতিটি ঘটনা প্রতিবেদন এবং তৎকালীন নেতৃবৃন্দের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা সম্পর্কে মতামত প্রকাশের সময় এসেছে। ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য প্রকৃত ও সত্য তথ্য লিপিবদ্ধ অপরিহার্য। আর তা না হলে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের মতো অনেক কিছুই বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে যাবে। ফলে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত নন এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ভয়াবহ রক্তাক্ত চেহারা দেখেনি– এমন সব বুদ্ধিজীবীদের সংকলিত স্বাধীনতার অসম্পূর্ণ ইতিহাস পুস্তক নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে নেতৃবৃন্দের আত্মগোপন কিংবা প্রতিবেশী এলাকায় শরণার্থী হিসাবে সাময়িক অবস্থান কিছুতেই দোষণীয় বিবেচিত হতে পারে না। যতদিন পর্যন্ত নেতৃবৃন্দের আত্মগোপন কিংবা প্রতিবেশী দেশে সাময়িক অবস্থানের সঙ্গে দেশের আপামর জনসাধারণের ভাগ্য জড়িত এবং এতদসম্পর্কিত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে একাত্মবোধ অব্যাহত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এ ধরনের কার্যকলাপের যৌক্তিকতা নিঃসন্দেহে সমর্থনযোগ্য।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় একদিকে নির্বাচিত মুজিবনগর সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপ, এগারোটা সেক্টর কমান্ডারের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতাপূর্ণ যুদ্ধ,

দখলিকৃত এলাকায় গেরিলা শিবিরে দুঃসহ জীবনযাত্রা, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোটি কোটি আদম-সন্তানের ভয়াবহ পলাতকের জীবনযাত্রা আর পাকিস্তানের বন্দি শিবিরে বাঙালিদের দুর্বিষহ অবস্থায় কালাতিপাত সবই এক সূত্রে গাঁথা ছিল। তাই তো আমার উদ্দেশ্য হাসিলে সফল হয়েছিলাম।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা এ ধরনের বহু নজির দেখতে পাবো। পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচারের প্রাক্কালে পরিস্থিতির মোকাবেলায় রসূলে করিমকে মদিনায় সাময়িকভাবে হিজরত করতে হয়েছিল। কিন্তু স্বল্প দিনের ব্যবধানে তিনি মক্কা নগরীতে ইসলামের ঝাণ্ডা ওড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর তিরিশ দশকে জেনারেল ফ্রাংকের ফ্রাসিজমের বিরুদ্ধে স্পেনীয় বিপ্লবের সময় বহু দেশপ্রেমিককে ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। প্রায় চার যুগ পরে এঁরা দেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলারের নাজি জার্মানি ফ্রান্সকে পদানত করলে জেনারেল দ্য গলের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রবাসী সরকার গঠিত হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে এঁরা সগৌরবে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

সাম্রজ্যবাদী চক্রান্তে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্স-জর্ডানের একাংশ বিচ্ছিন্ন করে ইসরাইল রাজ্যের সৃষ্টির পর লাখ লাখ ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু পার্শ্ববর্তী আরব দেশগুলোতে আশ্রয় গ্রহণ করে আজও পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ অব্যাহত রেখেছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভিয়েতনামের ইতিহাস আরও চাঞ্চল্যকর। বহু যুগ ধরে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের পদানত থাকার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানি সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনাম দখল করে। কিন্তু যুদ্ধ সমাপ্তির পর মিত্র শক্তির চক্রান্তে পুনরায় ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনামের কর্তৃত্ব গ্রহণ করলে সেখানে রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় এবং প্রায় এক যুগ পরে ভিয়েতনামকে দ্বিখণ্ডিত করে ফরাসিরা বিদায় গ্রহণ করে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে পশ্চিমা শক্তির সমর্থিত শিখণ্ডি সরকার গঠিত হলে আবার দক্ষিণাঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। উত্তর ভিয়েতনাম প্রকাশ্যেই দক্ষিণ ভিয়েতনামি বিপ্লবীদের আশ্রয়দান ছাড়াও পূর্ণভাবে মদত্ জোগায়। ফলে সত্তর দশকের প্রথমার্ধে তৎকালীন সায়গন সরকার পাঁচ লাখ মার্কিনি সৈন্যের সমর্থনপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

আবার কম্পুচিয়ায় সংস্কারপন্থী নীতির সমর্থক ক্ষমতসীন প্রিন্স নরোদম সিহানুকের জাতীয়তাবাদী সরকারকে উৎখাত করার লক্ষ্যে মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদ জেনারেল লননলকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিলে সেখানে এক রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। এদিকে অচিরেই চীনা সমর্থনপুষ্ট খেমাররুজ পার্টি নির্বাসিত প্রিন্স নরোদম সিহানুককে নামকে ওয়াস্তে রাষ্ট্রপ্রধান ঘোষণা করে ক্ষমতা দখল করে নেয় এবং খেমাররুজ নেতা পলপট দলমত নির্বিশেষে বিরোধী দলের লাখ লাখ নেতা, কর্মী ও সমর্থকদের ছাড়াও বেপরোয়াভাবে ব্যাপক বুদ্ধিজীবী হত্যা করলে সমস্ত সভ্যজগত শিউরে ওঠে। রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও প্রিন্স নরোদম সিহানুক দেশে প্রত্যাবর্তন করতে অস্বীকার করেন। এরকম এক পরিস্থিতিতে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভিয়েতনামের লক্ষাধিক সৈন্যের সক্রিয় সহযোগিতায় রুশ সমর্থক হেং সের মিন পলপটের খেমাররুজ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে।

রাজনীতির অপার মহিমা রয়েছে। যে ভিয়েতনাম তার মাটিতে বছরের পর বছর ধরে বিদেশী মার্কিনি সৈন্যের উপস্থিতির জন্য প্রতিবাদমুখর ছিল আর এরা শান্তিপ্রিয় বিশ্বের নৈতিক সমর্থন পেয়েছিল, আজ সেই ভিয়েতনামের লক্ষাধিক সৈন্য হেং সের

মিন সরকারের সহায়তার জন্য কম্পুচিয়ার মাটিতে অবস্থান করছে। অন্যদিকে নির্বাচিত অবস্থায় চীনের মাটিতে প্রিন্স নরোদম সিহানুকের নেতৃত্বে গণহত্যার নায়ক পলপট্‌সহ অন্যান্য সব বিতাড়িত দলগুলো কোয়ালিশন সরকার গঠন করে পুনরায় কম্পুচিয়ার ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্যের ইরানে একদিন শাহের অত্যাচারে আয়াতুল্লাহ খোমেনী সদলবলে দেশ ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী ইরাকে আশ্রয় লাভ করে শাহবিরোধী কার্যকলাপ অব্যাহত রেখেছিল এবং ইরাক তাতে মদদ জুগিয়েছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে আয়াতুল্লাহ খোমেনী নিরাপত্তার খাতিরে ফ্রান্সে গমন করেছিলেন। তবুও তার সমর্থকরা রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে ইরানে আয়াতুল্লাহ খোমেনীকে ক্ষমতাসীন করেছে। কী আশ্চর্য! গত তিন বছর ধরে সেই ইরান আর ইরাকের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই প্রথমবারের মতো প্রায় এক লাখ রুশ সৈন্য সশরীরে বিদেশী রাষ্ট্র আফগানিস্তানের মাটিতে উপস্থিত হয়ে বারবাক-কারমাল সরকারকে ক্ষমতায় আসীন রেখে ভূমি সংস্কার ইত্যাদি দুরূহ সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়িত করে চলেছে। কিন্তু আফগানিস্তান আজ গৃহযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত। তিরিশ লাখ আফগান বাস্তুচ্যুত হয়ে পাকিস্তানের উদ্বাস্তু শিবিরে দুর্বিষহ জীবন-যাপন করছে আর পশ্চিমা দেশগুলোর সমর্থনে পাকিস্তানে নির্বাসিত আফগান নেতৃত্ব যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছে।

নিয়তির পরিহাস! প্রায় এগারো বছর আগে পাকিস্তানের তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের বীভৎস কার্যকলাপে বাংলাদেশের মাটি থেকে প্রায় এক কোটি বাঙালি বাস্তুচ্যুত হয়ে পার্শ্ববর্তী ভারতের শরণার্থী শিবিরগুলোতে আশ্রয় নিয়েছিল আর নির্বাসিত সরকারের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছিল। আজ সেই পাকিস্তানের মাটিতেই প্রতিবেশী আফগানিস্তান থেকে প্রায় তিরিশ লাখ মোহাজের অবস্থান করছে আর আফগানিস্তানের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান প্রকাশ্যে সক্রিয়ভাবে সমর্থন জোগাচ্ছে।

তাই দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে নেতৃবৃন্দের আত্মগোপন কিংবা প্রতিবেশী এলাকায় সাময়িকভাবে অবস্থান আর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় ভূরি ভূরি নজির ইতিহাসে রয়েছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে বাঙালিদের যখন ইস্পাত কঠিন একতা, অন্তত তখন মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্ব বলিষ্ঠ ও সাফল্যজনক ছিল, এ কথা স্বীকৃত হয়েছে। একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বরের পর বিভিন্ন পার্টি ও নেতৃবৃন্দের কার্যকলাপের মূল্যায়ন থেকে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়।

আবার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। একাত্তরের অক্টোবর মাস। কোলকাতার থিয়েটার রোডে মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী সচিবালয়। পাশাপাশি দুটো ছোট্ট কামরা। একটাতে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের থাকার ব্যবস্থা এবং আর একটাতে অফিস কক্ষ। সামনে ছোট্ট করিডোরে প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব ডক্টর ফারুক আজিজ খানের টেবিল। দর্শনার্থীদের বসার জন্য গোটা দুয়েক চেয়ার ও একটা বেঞ্চ। সেদিন বেলা এগারোটায় প্রধানমন্ত্রী নিজের অফিস কামরায় অন্যতম জোনাল এ্যাডমিনিস্ট্রেটর জহুর আহমদ চৌধুরীর সঙ্গে নিভৃতে সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনারত। এমন সময় আগরতলা থেকে আগত জনৈক প্রভাবশালী মুজিববাদী নেতা সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর অফিস কামরায় প্রবেশে উদ্যত হলে একান্ত

সচিব তাঁকে বাধাদান করলেন। বললেন, ভিতরে প্রধানমন্ত্রী গোপন আলোচনা করছেন। আগে থেকে আপনার কোন এপয়েন্টমেন্ট না থাকায় একটু বসতে হবে। জবাব এলো, আমার বসার সময় নেই। আমি এসেছি আগরতলা থেকে। উনি আমাকে ভালোভাবেই জানেন। আপনি রাস্তা ছাড়ুন। একান্ত সচিব ডক্টর ফারুক বললেন, 'আমি দুঃখিত। আপনাকে একটু অপেক্ষা করতেই হবে।'

এ ধরনের জবাবে তরুণ নেতা বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, 'এভাবে অপমানিত হবো জানলে এখানে আসতাম না।' তিনি ফিরে চলে গেলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও দু'জনের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হয়নি। অবশ্য ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট দু'জনেই খুন হয়েছেন।

৩৬

একাত্তরের আগস্ট মাস নাগাদ মুজিবনগরে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে, পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ নানাভাবে প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা চালিয়েও শরণার্থীদের দেশে ফিরিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশগুলোর বিশেষ মহল থেকে পাকিস্তানকে এ মর্মে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল যে, শরণার্থীদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে ফিরে নিতে পারলে ভারতের পক্ষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর 'আক্রমণাত্মক ডিপ্লোমেসি' চালানো সম্ভব হবে না। ফলে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা পাবে এবং ইসলামাবাদের কর্তৃপক্ষ নিজেদের 'সুবিধাজনক শর্তে' সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবে।

এই প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের শরণার্থী সংক্রান্ত সংস্থার প্রধান প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খানের পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গ সফরের প্রাক্কালে সীমান্ত এলাকায় বেশ কিছুসংখ্যক শরণার্থীদের দেশে ফেরানোর জন্য ব্যাপক প্রোপাগাণ্ডা শুরু হলো। এর জবাবে আমরাও স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে শরণার্থীদের মৃত্যু গুহায় না ফেরার আহ্বান জানিয়ে দখলদার বাহিনীর অব্যাহত হত্যাকাণ্ডের কাহিনী প্রচার করলাম। বিভিন্ন শিবিরগুলোতে দুর্বিষহ জীবনযাত্রা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত শরণার্থীরা দেশে প্রত্যাবর্তনে বিরত থাকলো। প্রচার-প্রোপাগাণ্ডার ক্ষেত্রে দখলিকৃত এলাকার ছ'টা বেতারকেন্দ্র আমাদের স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের মোকাবেলায় ব্যর্থ হলো।

অবশ্য এর পিছনে আরও একটা কারণ ছিল। কয়েক মাস যাবৎ লুট, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও হত্যা চালানোর পর দখলদার বাহিনীর জোয়ানদের আবার 'ডিসিপ্লিনে'র মধ্যে ফিরিয়ে আনা তখন কর্তৃপক্ষের মুশকিল হয়ে পড়েছিল। উপরন্তু দখলদার বাহিনীর সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা ও মদদে সৃষ্ট রাজাকারদের বেপরোয়া ও নৃশংস কার্যকলাপ বন্ধ করানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় মুক্তিবাহিনীর গেরিলা হামলা অব্যাহত থাকায় দখলদার বাহিনীর কর্তাদের পক্ষে জোয়ান ও রাজাকারদের 'কন্ট্রোল' করাটাও নাজুক ব্যাপার ছিল। তাই শরণার্থীদের দেশে ফেরা তো দূরের কথা, এদের সংখ্যা প্রতিদিনই আরও বৃদ্ধি পেলো।

এরকম এক পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচনী কমিশনার বিচারপতি আব্দুস সাত্তার এক সংশোধিত প্রেসনোট জারি করলেন। এ প্রেসনোটে বলা হলো যে, পূর্ব পাকিস্তানে ৭৮টা জাতীয় পরিষদ ও ১০৫টা প্রাদেশিক পরিষদের জন্যে যথাক্রমে ১২ই ও ২৩শে ডিসেম্বর উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

বিদেশী সাংবাদিকের মতে, এর আগে অত্যন্ত সঙ্গোপনে আরও দুটো ঘটনা

অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথমত, সোহ্‌রাওয়ার্দী-তনয়া মরহুম আখতার সোলায়মান করাচি থেকে ঢাকায় কয়েক দফা যাতায়াত করে দক্ষিণপন্থী আওয়ামী লীগ সদস্যদের একত্র করে পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থন সংগ্রহের প্রচেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু গুটি কয়েক ছাড়া বাকি সবাই সীমান্তের ওপারে থাকায় তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

দ্বিতীয়ত, পরবর্তীকালে বিদেশী সাংবাদিকরা এ মর্মে তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, এ সময়ে শেখ মুজিবের মুক্তির বিনিময়ে ছ'দফার ভিত্তিতে একটা কনফেডারেশন গঠনের মাধ্যমে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার শর্তে মুজিবনগরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে ইসলামাবাদের যোগাযোগ হয়। তবে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের দরুন এই মার্কিন 'ষড়যন্ত্র' ব্যর্থ হয়। বিষয়টি সম্পর্কে গবেষণা করা অপরিহার্য মনে হয়।

তবে একথা ঠিক যে, পশ্চিমা রাজনৈতিক মহল ছাড়াও প্রভাবশালী পত্র-পত্রিকাগুলো বার বার তৎকালীন পাকিস্তান সামরিক জান্তাকে শেখ মুজিবকে মুক্ত করে আলোচনায় বসার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল।

নিউইয়র্ক টাইমসের ২২শে সেপ্টেম্বর (১৯৭১) তারিখের সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয় যে..."উপমহাদেশে শরণার্থী পুনর্বাসন ও শান্তি ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘকে সক্রিয় কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ওপর আন্তর্জাতিকভাবে এমন মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে করে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে কারারুদ্ধ শেখ মুজিবুর রহমানকে পুনর্বাসিত করা সম্ভব হয়। জাতিসংঘ যদি নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে পাকিস্তানে একটা রাজনৈতিক সুরাহার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে, তাহলেই কেবলমাত্র পাক-ভারতের বিস্ফোরণমুখী সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার সম্ভব হবে এবং নিরন্ন ও ভুখা বাংলাদেশের মানুষদের বাঁচানো যাবে।'

২৫শে অক্টোবর (১৯৭১) লন্ডনের সানডে পোস্ট পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হলো যে, "পাকিস্তান যদি পূর্ব বাংলার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে, তাহলে পাকিস্তান আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হবে ও অস্তিত্ব বিপন্নের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া ছাড়াও অন্য দেশগুলোকে নানা অসুবিধার হাত থেকে রক্ষা করবে। এতো কিছুর পরেও সে আমলে ইংরেজরা গান্ধীকে কারামুক্ত করেছিল এবং ব্রিটিশ ভাইসরয় গান্ধীর সঙ্গেই আলোচনায় বসেছিল। কেননা গান্ধীই ছিলেন কোটি কোটি মানুষের প্রতিনিধি। আজকের দিনে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত, যেখানে দুর্বিষহ জীবনযাত্রা থেকে শরণার্থীরা দেশে ফিরতে পারে। কিন্তু তা না করে পশ্চিম পাকিস্তানে 'ভারতকে ধ্বংস করো' প্রোপাগাণ্ডা এখন তুঙ্গে উঠেছে।"

মার্কিন সাংবাদিক জোসেফ ক্রাফট ওয়াশিংটন পোস্টে ২৫শে নভেম্বর এক নিবন্ধে লিখলেন, 'এখন একথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, যখন গত মার্চ মাসে পূর্ব বাংলায় সামরিক শাসন চাপিয়ে দেয়া হয়, তখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পাকিস্তানি শাসনচক্র যতটুকু চিবুতে পারবে তার বেশি মুখ গহ্বরে গ্রহণ করেছিল। যদিও বহু লোককে হত্যা করা হয়েছে এবং লাখ লাখ আদম সন্তানকে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে, তবুও পাকিস্তানি সৈন্যরা পূর্ব বাংলায় পূর্ণ কর্তৃত্ব করতে পারেনি। উপরন্তু বাঙালিদের প্রধান নেতা মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করেও পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষ বাঙালিদের স্বাধীনতার আন্দোলনকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে,

মার্কিন প্রেসিডেন্ট এমন কতকগুলো সহজ শর্ত খুঁজে বেড়াচ্ছেন, যা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে গেলানো যাবে।

প্রেসিডেন্ট নিক্সন সীমান্তের দু'দিকেই জাতিসংঘ বাহিনী মোতায়েনের সুপারিশের কথা চিন্তা করছেন। প্রেসিডেন্ট নিক্সন এর মধ্যেই ইশারা দিয়েছেন যে, মুজিবুর রহমানের চেয়ে আর একটু নিচের স্তরের বাঙালি নেতৃত্বের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা সম্ভবপর। তবে পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ মর্যাদা কি হবে সেই আসল প্রশ্নটাই মি. নিক্সন এড়িয়ে গেছেন।

যুদ্ধ এড়াবার ব্যাপারে কারো আন্তরিক নিষ্ঠা থাকলে, তাকে আলোচনার জন্য একটা জায়গা থেকে শুরু করতে হবে। আর সে শুরুটা হচ্ছে পাকিস্তান ও পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নির্ধারণের উদ্দেশ্য 'ইয়াহিয়া ও মুজিবুর রহমানের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নতুন সমঝোতা।'

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এসব গার্জিয়ান থাকা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা প্রায় একই সঙ্গে তিনটা ব্যাপার করে বসলো। প্রথমত, শেখ মুজিবের বিচার, দ্বিতীয়ত, পূর্ব বাংলায় ১৮৩টা আসনে উপনির্বাচন আর তৃতীয়ত, ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের পাঁয়তারা। শেখ মুজিবের বিচার ব্যবস্থার অর্থই হচ্ছে আলোচনার পথ রুদ্ধ করা। উপনির্বাচনের মানেই হচ্ছে জনসাধারণ কর্তৃক বিধৃত ও আস্থাহীন রাজনীতিবিদদের নিয়ে পূর্ব বাংলায় শিখণ্ডী সরকার গঠন আর যুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বকে বোঝানো যে, পুরো গণ্ডগোলটাই হচ্ছে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে বৈরিতার বহিঃপ্রকাশ।

১৯৭১ সালের ৩রা আগস্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান টেলিভিশনের এক সাক্ষাৎকারে বললেন, বেআইনি ঘোষিত আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার করা হবে। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ রয়েছে। ৯ই আগস্ট এক সরকারি প্রেস নোটে ঘোষণা করা হয় যে, আগামী ১১ই আগস্ট থেকে শেখ মুজিবের বিচার শুরু হবে। ৩১শে আগস্ট জাতিসংঘে পাকিস্তানি প্রতিনিধি জনাব আগা শাহী জানান যে, আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে এই বিচার সমাপ্ত হবে।

১লা সেপ্টেম্বর প্যারিসের 'লা ফিগারো' পত্রিকায় ইয়াহিয়া খানের সাক্ষাৎকার ছাপা হলো।

প্রঃ কিন্তু সে (মুজিবুর রহমান) তো একই সঙ্গে আপনার প্রধান শত্রু।...

উত্তর : সে আমার ব্যক্তিগত শত্রু নয়। সে হচ্ছে পাকিস্তানের জনসাধারণের শত্রু। আপনাদের বিব্রত হওয়ার কারণ নেই। পাকিস্তানে সবাই জানে উনি কোথায় আছেন। কিন্তু কাউকে জিজ্ঞেস করা অর্থহীন। কেউই আপনাকে বলবে না।

প্রঃ কিন্তু আন্তর্জাতিক মতামত বলেও তো একটা কথা আছে?

উত্তর : আমার কার্যাবলীর সমর্থনে প্রচুর যৌক্তিকতা রয়েছে। আমি তো বলেছিই সে জীবিত আছে। আমার জবানের দাম দিতে হবে।

অক্টোবর মাসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্যারিসের বিখ্যাত পত্রিকা লা 'মন্ডের প্রতিনিধির সঙ্গে আর এক সাক্ষাৎকারে বললেন, 'যখন এই বিচার শেষ হবে এবং পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে আমি বিচারের বিস্তারিত প্রকাশ করবো। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে নয়।' সাংবাদিক মহোদয় তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এরকম একটা গুজব রটেছে যে, পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে মুজিবের সঙ্গে আপনার কথাবার্তা চলছে? জবাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বললেন, 'আবার আমি বলছি, যে

সামরিক বিধানে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, সেই সামরিক কোর্ট তাঁকে নির্দোষী না ঘোষণা করা পর্যন্ত আমি একজন বিদ্রোহীর সঙ্গে কথা বলতে পারি না। এটা তাঁকেই প্রমাণ করতে হবে যে, তিনি জাতির স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করেননি।"

৮ই নভেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া মার্কিনি সাপ্তাহিক নিউজ উইকের প্রতিনিধির সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারের বললেন, 'অনেক লোকই আমাকে বিশ্বাস করবে না। আমার মনে হয় আমি যদি মুজিবকে ছেড়ে দেই, আর যদি সে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যায়, তাহলে তাঁর নিজের লোকেরাই তাকে হত্যা করবে। এরা সব দুঃখ-কষ্টের জন্য মুজিবকেই দায়ী করছে। বিদ্রোহ দমন করা ছাড়া আমার কাছে আর কোন বিকল্প ছিল না। যে কোন সরকারই এ ধরনের ব্যবস্থা নিতো। কেমন করে আমি আবার সে লোকটাকে ডেকে আলোচনায় বসতে পারি?...আমি প্রথমে মুজিবকে গুলি করে হত্যার পর বিচারের ব্যবস্থা করিনি। অন্যান্য দেশে এ ধরনের উদাহরণ রয়েছে। শাস্তি ঘোষণার পর কি করা হবে, সেটা রাষ্ট্রপ্রধানের এক্তিয়ারভুক্ত। ঝোঁকের মাথায় আমি তাকে ছেড়ে দিতে পারি না। রাষ্ট্রীয় প্রধান হিসাবে এটা বিরাট দায়িত্ব। কিন্তু জাতি যদি তার মুক্তি চায়, তাহলে আমি তা করবো।'

৫ই নভেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া লাহোর সফরে আগমন করলে এয়ার মার্শাল (অবঃ) আসগর খান ও প্রখ্যাত কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজসহ ৪২ জন পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, সাংবাদিক, লেখক, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও ছাত্রনেতা এক যুক্ত বিবৃতিতে শেখ মুজিবকে মুক্তিদানের আবেদন জানালো।

৩৭

১৯৭১ সালের ৮ই আগস্ট মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ভারত সরকারের পক্ষ থেকে প্রেরিত এক বাণীতে বিশ্বের সমস্ত দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের শেখ মুজিবের মুক্তির দাবি জানিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ওপর চাপ সৃষ্টির আহ্বান জানালেন। ১৭ই আগস্ট জেনেভাস্থ আন্তর্জাতিক আইন সমিতির পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নিকট প্রেরিত তারবার্তায় শেখের মুক্তি দাবি করা হলো। ২০শে আগস্ট হেলসিংকি থেকে বিশ্ব শান্তি কাউন্সিল শেখ মুজিবের মুক্তি দাবি করলো। কুয়ালালামপুরে ১৩ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি সমিতির এক বৈঠকে ব্রিটেনের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. আর্থার বটমলি তাঁর ভাষণদানকালে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবি করলেন। তিনি বললেন যে, এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষ থেকে একমাত্র শেখের সঙ্গেই আলোচনা ফলপ্রসূ হতে পারে। ৪ঠা নভেম্বর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অধিবেশনে শ্রমিক দলীয় প্রভাবশালী সদস্য মি. পিটার শোর হুশিয়ার করে বললেন, ব্রিটিশ সরকার যেভাবে আবার পাকিস্তানকে সাহায্য দান শুরু করার জন্য পাঁয়তারা করছে, তার পরিণাম শুভ হবে না। পাকিস্তানে আসলে প্রয়োজন হচ্ছে একটা রাজনৈতিক সমাধান। আর এ ধরনের একটা সমাধান পূর্ব বাংলার জনগণের গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অন্যতম সদস্য মি. রিজিনালড্ ফ্রিসন প্রশ্ন করলেন : ব্রিটিশ সরকার কি শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবিতে চাপ সৃষ্টি করবে?

জবাবে ব্রিটেনের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার এ ডগলাস হিউম বললেন, আমাদের পক্ষে পাকিস্তানের ওপর পূর্বশর্ত আরোপ করা বাঞ্ছনীয় হবে না। তবে পূর্ব

বাংলা এবং সমগ্র পাকিস্তানের জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এমন একটা সমাধান খুঁজে বের করতেই হবে। পশ্চিম পাকিস্তানে যাঁরা ক্ষমতায় রয়েছেন এবং পূর্ব বাংলার জনসাধারণের পক্ষে যাঁরা আস্থাভাজন দাবি করতে পারেন, এই দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। বিদেশী কোন রাষ্ট্রের পক্ষে প্রকাশ্যে পাকিস্তানের করণীয় সম্পর্কে কিছু বলা বাঞ্ছনীয় নয়। আমরা শুধুমাত্র আশা প্রকাশ করতে পারি যে, পাকিস্তানে উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা হওয়াটা কাম্য। তবে কিভাবে আলোচনা হবে, আর তার ধরনটা কি হবে, এসব কিছুই পাকিস্তান সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত।

৩০শে সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনের ইভিনিং স্টার পত্রিকায় প্রখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক ক্রশবি নেইস লিখলেন,..."বর্তমানের এই জটিল ও ভয়াবহ পরিস্থিতিতে একজন মাত্র লোক রয়েছেন, যিনি কোন রকমে গ্রহণযোগ্য একটা সমাধান করতে পারেন। তিনি হচ্ছেন সম্প্রতি বেআইনি ঘোষিত আওয়ামী লীগ পার্টির প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান। গত ডিসেম্বরের নির্বাচনে তাঁর পার্টি জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভে সক্ষম হয়েছে।

"২৫শে মার্চ সামরিক এ্যাকশন নেয়ার পর শেখ মুজিবুর গ্রেফতার হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে রয়েছেন। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গোপনে একটা মিলিটারি কোর্টে তাঁর বিচার হয়েছে। এই বিচারের সর্বোচ্চ সাজা হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু এই শাস্তি এখনও ঘোষণা করা হয়নি।

"শেখ মুজিবুরই হচ্ছেন একমাত্র বাঙালি নেতা, যাঁর ইজ্জত ও ব্যক্তিগত বিরাট সমর্থন রয়েছে এবং তিনিই দেশকে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবর্তে অন্য কোন সমাধান এখন তাঁর পক্ষেও মানিয়ে নেয়া খুবই মুশকিল হবে।

"অন্যদিকে এটা খুবই সন্তোষজনক যে, পাকিস্তান সরকার এতদূর বিবেকসম্পন্ন হবে যে, শেখকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় বসবে। এই বাঙালি নেতাকে বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসি দিয়ে সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দেয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ পর্যন্ত পাকিস্তানে সাহায্যদান অব্যাহত রাখায় সীমাবদ্ধ প্রভাব ব্যবহারের যে সুযোগ রেখেছে, চূড়ান্ত বিপর্যয়ের আগেই তার সবটুকু ব্যবহারের সময় এসেছে।..."

সত্যি কথা বলতে কি, এসময় মুজিবনগরে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন ছিলাম যে, আমাদের বাদ দিয়ে ছ'দফার ভিত্তিতে যদি একটা সমঝোতা হয়ে যায়, তাহলে উপায়টা কোথায়? ভারতের একটা মহলও এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ছিল বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ ছিল। এদিকে শেখ সাহেবের সাথে ২৫শে মার্চের পর থেকে কোনরকম যোগাযোগ না থাকায় মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দের এ ধরনের চিন্তা করাটা অমূলক ছিল না। তবুও ভরসা ছিল যে, শেখ হচ্ছেন একজন পরিপক্ব নেতা এবং ভারতের অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার আগে তিনি কোনরকম কথাবার্তায় সম্মত হবেন না। তাই আমাদের 'স্ট্রাটেজি' ছিল মুক্তিযুদ্ধ, গেরিলা এ্যাকশন আর প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা ব্যাপকভাবে জোরদার করে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা, যেখানে বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া আর কোন রাস্তা যেন খোলা না থাকে।

পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক জান্তা নিজেদের একগুঁয়েমী মনোভাবের জন্য 'ফায়দা' নিতে পারলো না। পশ্চিমা দেশগুলো থেকে প্রস্তাবিত আলোচনার মাধ্যমে

আপস করার ইশারা-ইংগিত সব কিছুই জেনারেল ইয়াহিয়া বুঝতে অস্বীকার করলো। আগেই উল্লেখ করেছি যে, সামরিক জান্তার কট্টরপন্থী উপদল আর ধর্মীয় রাজনীতিবিদদের সমর্থনে ইয়াহিয়া খান বিকল্প হিসাবে তিনটা বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করলেন। প্রথমটা শেখ মুজিবের বিচার ত্বরান্বিত করে আলোচনার সমস্ত রাস্তা বন্ধ করা, দ্বিতীয়টা হচ্ছে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে মোট বাছাই করা ১৮৩টি আসনে উপনির্বাচনের ব্যবস্থা আর ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের পাঁয়তারা। এর অর্থই হচ্ছে ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তার মতে– শেখের সঙ্গে আলোচনার স্তর পার হয়ে গেছে এবং উপনির্বাচনের মাধ্যমে অনেক কিছুই ধামাচাপা দেয়া সম্ভব হবে। উপরন্তু ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পাঁয়তারা– এমনকি যুদ্ধ শুরু করলে মিত্র দেশ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন এগিয়ে আসবে। আর পূর্ব বাংলার সন্তান হিসাবে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপক লড়াইয়ের ইস্যুটা এড়ানো সম্ভব হবে। এতে পূর্ব বাংলার মুক্তিযুদ্ধ রূপান্তরিত হবে পাক-ভারত যুদ্ধ হিসেবে।

ফলে পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটলো। এমনকি পাশ্চাত্য মহল থেকে অত্যন্ত সংগোপনে আপস আলোচনার পথ সুগম করার জন্য মুজিবনগরের দক্ষিণপন্থীদের একটা মহলের সঙ্গে যে যোগাযোগ করা হয়েছিল, তাও প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং ভেস্তে গেলো। আর মুজিবনগর সরকার এবং মুক্তিযোদ্ধারা ঐক্যবদ্ধভাবে দ্বিগুণ উৎসাহে গেরিলা যুদ্ধের পরিধি সম্প্রসারিত করলো।

পূর্ব বাংলায় মোট ১৮৩টি জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের উপনির্বাচনের ঘোষণা গণতান্ত্রিক বিশ্বের দৃষ্টিতে একটা প্রহসন বলে আখ্যায়িত হলো। কেননা ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচন ইয়াহিয়া খানের সামরিক সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর সে নির্বাচনে পূর্ব বাংলা থেকে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের ১৬৭টি আর প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০ আসনের ২৯৮টি আসনে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়।

ইয়াহিয়া খানের এই তথাকথিত উপনির্বাচনের সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, বেআইনি ঘোষিত সর্ববৃহৎ পার্টি আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। আর পাকিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তর রাজনৈতিক দল ভুট্টোর পিপলস পার্টি কর্তৃক এই নির্বাচন বয়কট ঘোষণা করলো। পিপলস পার্টির করাচি শাখার সেক্রেটারি মিরাজ মোহাম্মদ খান এক বিবৃতিতে বললেন যে, উপনির্বাচনের জন্য আমাদের পূর্ব বাংলায় যাওয়া অর্থহীন। গত নির্বাচনে সেখানে যারা পরাজিত হয়েছেন এবং গণধিকৃত তারা সরকারি ছত্রছায়ায় আসন বন্টনের ব্যবস্থা প্রায় পাকাপাকি করেছেন। ভুট্টো বললেন, 'আমরা খুবই সন্ত্রস্ত অবস্থায় একজন পাকিস্তানি আর একজন পাকিস্তানিকে হত্যার ব্যাপারটা লক্ষ্য করছি। সমগ্র জাতি এখন বিপদসংকুল পর্যায়ে এসে হাজির হয়েছে।'

তবুও সামরিক কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পাকিস্তানের তৎকালীন নির্বাচনী কমিশনার বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের দফতর থেকে ৩রা অক্টোবর প্রকাশিত প্রেসনোটে ঘোষণা করা হলো যে, পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ৮৮টি শূন্য ঘোষিত আসনে ১৯৭১ সালের ১৮ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২ সালের ৭ই জানুয়ারির মধ্যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

১০ই নভেম্বর পর্যন্ত ১০৮টি জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হলো।

তৃতীয় 'স্ট্রাটেজি' হিসাবে পাকিস্তানে যুদ্ধের পাঁয়তারা তুঙ্গে উঠলো। জেনারেল ইয়াহিয়া ২রা আগস্ট তারিখে বিবিসির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বললেন, 'পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতের সীমান্ত বরাবর (আসলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াই) সংঘর্ষ অব্যাহত থাকলে, তা ভয়াবহ যুদ্ধে পরিণত হতে পারে। আমি আমার সৈন্যবাহিনীকে পড়ে পড়ে মার খেতে বলতে পারি না। আমার দেশকে রক্ষার প্রশ্ন যেখানে জড়িত সেখানে আমি জোয়ানদের আর একটি গাল পেতে দিতে বলতে পারি না। আমি কিন্তু পাল্টা আঘাত হানবো।"

১১ই আগস্টে ইয়াহিয়া খান মার্কিনি টিভি সংস্থা সিবিএস-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বললেন, 'দুটো দেশই এখন যুদ্ধের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। আমি হুঁশিয়ার করে দিতে চাই যে, পাকিস্তানকে [illegible]ার জন্য আমরা যুদ্ধ করবো।'

১লা সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্যারিসের প্রখ্যাত 'লা-ফিগারো' পত্রিকায় এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বললেন, 'অনেক ধৈর্য সহকারে আমি সব কিছু লক্ষ্য করছি। আমি সমগ্র বিশ্বকে এ মর্মে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, ভারত যদি মনে করে থাকে যে, বিনা যুদ্ধে তারা আমার এক বিন্দু জমি দখল করতে পারবে, তবে তারা মারাত্মক ভুল করছে। এর অর্থই হবে সর্বাত্মক যুদ্ধ– অবশ্য আমি যুদ্ধকে ঘৃণা করি। কিন্তু আমার মাতৃভূমি রক্ষার জন্য এ ব্যাপারে আমি পিছপা' হবো না।'

পাকিস্তানের জং পত্রিকায় ২৯শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ ইউসুফ বললেন, আমাদের সৈন্যবাহিনী এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং একটা যুদ্ধের জন্য আমাদের এখন কোন নোটিশের প্রয়োজন নেই।

৭ই অক্টোবর ইস্টার্ন কমান্ডার ও সামরিক আইন প্রশাসক (পূর্ব পাকিস্তান) লে. জেনারেল এ এ কে নিয়াজী ঘোষণা করলেন (পাকিস্তান টাইমস-এ প্রকাশিত), 'যদি ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ লাগবেই হয় তাহলে সে যুদ্ধ ভারতের মাটিতে হবে।'

মার্কিনী সংবাদ সংস্থা এসোসিয়েটেড প্রেসের সঙ্গে ২৫শে নভেম্বর এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে ইয়াহিয়া খান বললেন, 'আর দশ দিনের মধ্যে আমি এই রাওয়ালপিন্ডিতে নাও থাকতে পারি। আমি তখন যুদ্ধ করবো।'

জেনারেল ইয়াহিয়া তাঁর কথা রেখেছিলেন। ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর বিকাল পৌনে ছ'টা নাগাদ পাকিস্তান বিমান বাহিনী অমৃতসর, পাঠান কোট, শ্রীনগর, অবন্তীপুর, উত্তরলাই, যোধপুর, আম্বালা ও আগ্রার এয়ার ফিল্ডগুলোতে বোমা বর্ষণ করলো।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, উপমহাদেশের দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনার প্রেক্ষাপটে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমত, মাসের পর মাস ধরে একদিকে পূর্ব বাংলার অভ্যন্তরে তৎকালীন পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর অকথ্য অত্যাচার এবং অন্যদিকে এর মোকাবেলায় মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা হামলা আর প্রায় এক কোটি মানুষের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ ও দেশের অভ্যন্তরে আরও কয়েক কোটি বাস্তুচ্যুত লোকের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ছাড়াও সীমান্ত এলাকায় বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের দরুন গণতান্ত্রিক বিশ্ব এসব ব্যাপারে আলোচনার মাধ্যমে একটা ফয়সালা করার উদ্দেশ্যে সোচ্চার হয়ে উঠলো। এ ব্যাপারে পাশ্চাত্য জগতের পত্র-পত্রিকাগুলো ছাড়াও বুদ্ধিজীবী মহলের ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

· মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় কয়েকশ' অধ্যাপক একাত্তরের ১২ই নভেম্বর এক যুক্ত বিবৃতিতে পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে আবেদন জানালেন। এদের মধ্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত মনীষী পল স্যামুয়েলসন্, সালভাডর লুরিয়া ও সাইমন কুজনেট্জ্ অন্যতম। বিবৃতিটি নিম্নরূপ :

"পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধ এবং পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধের হুমকির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর বিরাট দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরে স্বায়ত্তশাসনের দাবিদার বলে পরিচিত একটা রাজনৈতিক দলের পক্ষে মাত্র কয়েক মাস আগে জনসাধারণ অভাবনীয় সমর্থন দেয়ায় তারা নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছে। সামরিক সরকার জনগণের এই রায় মেনে নিতে পারেনি। গত মার্চ মাসে পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী পূর্ব বাংলার জনসাধারণের ওপর ব্যাপকভাবে হামলা চালিয়েছে। তিন লাখের মতো হত্যা করা হয়েছে। প্রায় নব্বই লাখ বাঙালি শরণার্থী এর মধ্যেই সীমান্তের ওপারে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে এবং এখনও প্রতিদিন প্রায় ৩০ হাজার শরণার্থী সীমান্ত অতিক্রম করছে। পশ্চিম পাকিস্তানি হামলার জের হিসাবে ভারত সরকারকে এ ধরনের একটা সমস্যার মোকাবেলা করতে হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ায় এখন পশ্চিম পাকিস্তানই শান্তির প্রতি হুমকি হওয়া ছাড়াও যুদ্ধ বাধাতে চাচ্ছে। এতে শুধু ভারত ও পাকিস্তান জড়িত হবে, তাই-ই নয়; চীন, সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও জড়িত হয়ে পড়বে।

"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে পাকিস্তানের সামরিক মিত্র এবং যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্বের প্রতি সমর্থনের নীতি গ্রহণ করেছে। আমরা মার্কিনিরাই পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান করছি। সামরিক সাহায্য বন্ধ ঘোষণা করা সত্ত্বেও আমরা পাকিস্তানকে তা প্রদান অব্যাহত রেখেছি। এর সপক্ষে এ মর্মে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, সামরিক সাহায্য প্রদান অব্যাহত রেখে পাকিস্তানের ওপর প্রভাব খাটানো সম্ভব হবে এবং তা শান্তি রক্ষায় অপরিহার্য। কিন্তু এই নীতি ভারত ছাড়াও বাংলাদেশের জনগণকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। উপরন্তু এর ফলে পাকিস্তানি সরকারকে ভয়াবহ পথ পরিহার করে একটা রাজনৈতিক সমাধানে সম্মত হওয়ার জন্য প্রভাব বিস্তারে এই নীতি ব্যর্থ হয়েছে। এ ধরনের একটা নীতি গ্রহণের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন একটা সরকারের সমর্থক হয়ে পড়েছে, যে সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে জাতীয়ভিত্তিক একটা নির্বাচনের রায়কে অস্বীকার করেছে আর পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে প্রত্যাখান করেছে। উপরন্তু এরা নিরস্ত্র জনসাধারণকে নির্বিচারে হত্যা করছে। আমাদের জাতীয় স্বার্থের খাতিরে যুক্তরাষ্ট্রের এ ধরনের নীতির যথার্থতা প্রমাণ করা যায় না। পাকিস্তানের একনায়কত্বসুলভ সরকার সেখানে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার বিরুদ্ধে নৃশংস ও ভয়াবহ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং যা কোন সময়েই জয়যুক্ত হবে না, তা সমর্থন করা নিশ্চিতভাবে বোকামির পরিচয়। ন্যায়বিচার, মানবতা এবং জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করলে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে তার নীতির পরিবর্তনের যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে।

আমরা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলো উপস্থাপন করছি :

১. পূর্ব বাংলার নির্বাচিত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের সঙ্গে একটা রাজনৈতিক মীমাংসায় না আসা পর্যন্ত পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য অথবা অর্থনৈতিক সহযোগিতা যুক্তরাষ্ট্র প্রদান করবে না এবং পাইপ লাইনের সাহায্য বন্ধ করবে এবং দেনা পরিশোধের কিস্তি আপাতত স্থগিত সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করবে।

২. পাকিস্তানকে দেয় এ ধরনের সমস্ত সাহায্য ভারতে অবস্থানকারী পূর্ব বাংলার শরণার্থীদের দেয়া হবে। যতদিন পর্যন্ত এসব শরণার্থী দেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না, ততদিন পর্যন্ত এই সাহায্য প্রদান অব্যাহত থাকবে এবং শরণার্থীদের বাবদ ভারতকে প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

৩. জাতিসংঘের উদ্যোগে পূর্ব বাংলার জনসাধারণের জন্য অর্থনৈতিক সাহায্য বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হোক।

৪. পাকিস্তানকে এ মর্মে অবহিত করা হোক যে, পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের মতো যুক্তরাষ্ট্র এবার ভারতের প্রতি সাহায্য প্রদান স্থগিত রাখবে না।

৫. মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ, বিশেষত ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ইরান ও তুরস্ককে এ মর্মে আভাস দেয়া হোক যে, পূর্ব বাংলার আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একটা রাজনৈতিক সমাধানে আসার জন্য পাকিস্তানকে উৎসাহিত করলে যুক্তরাষ্ট্র তা অভিনন্দিত করবে।

আমাদের রাজনৈতিক স্বার্থে এবং মানবিক কারণে প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের সামরিক জান্তার নেতৃত্বের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার ছাড়াও বাঙালিদের দাবির প্রতি আমাদের আন্তরিকতা প্রদর্শন এবং শরণার্থীদের ভরণ-পোষণের জন্য ভারতকে আরও অধিকতর সাহায্য প্রদান যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আশু কর্তব্য। এই মুহূর্তে চীনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এরই পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার পরিস্থিতি যেখানে বিরাজমান, সেখানে আমাদের নীতির পুনঃপরীক্ষার মাধ্যমে সংশোধিত হওয়া নিতান্ত অপরিহার্য।"

এর আগে কানাডার টরেন্টো নগরীতে পূর্ব বাংলার ভয়াবহ ঘটনাবলী সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এটাই 'টরেন্টো ঘোষণা' হিসেবে বিখ্যাত হয়েছে। ঘোষণায় বিশ্বের সমস্ত দেশের প্রতি পাঁচ দফা দাবি জানানো হয়। এই পাঁচটি দফা হচ্ছে নিম্নরূপ :

১. পাকিস্তানকে দেয় সমস্ত সমরাস্ত্র বন্ধ ঘোষণা।

২. পাকিস্তানকে দেয় সমস্ত অর্থনৈতিক সহযোগিতা বন্ধ ঘোষণা।

৩. জরুরি অবস্থা বিধায় সম্ভাব্য সকল সাহায্য সংগ্রহ করে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে পূর্ব বাংলার অভ্যন্তরে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা।

৪. শরণার্থীদের ভরণ-পোষণের জন্য ভারতকে প্রয়োজনীয় রিলিফ প্রদানের ব্যবস্থা।

৫. শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন রক্ষার জন্য হস্তক্ষেপ করা।

এই ঘোষণায় যাঁরা স্বাক্ষর দান করেন তাদের মধ্যে জাতিসংঘের প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল হিউ কিন্নে সাইড, ব্রিটেনের প্রাক্তন মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য মিসেস জুডিথ হার্ট, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য মিসেস বার্নাড ব্রেইন, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টাবলি উলপোর্ট, চীনে কানাডার প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত চেস্টার রোর্নিং, আন্তর্জাতিক ধর্মীয় শান্তি সংস্থার সেক্রেটারি হোমার জ্যাক ও আন্তর্জাতিক জুরিস্ট কমিশনের জেটি থরসন। এছাড়া বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এম আর সিদ্দিকী (প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ও প্রাক্তন মন্ত্রী) ও এ এম এ মুহিত (প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী) এবং ভারতের পক্ষ থেকে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক নূরুল হাসান ও টাইমস্ অব ইন্ডিয়ার বোম্বের আবাসিক সম্পাদক অজিত ভট্টাচার্য সম্মেলনে যোগ দেন। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধি দল সরকারের অনুমতি না

পাওয়ায় সম্মেলনে যোগ দিতে পারেননি।

টরেন্টো সম্মেলনে যোগদানকারী মার্কিনি প্রতিনিধিরা মূল ঘোষণায় স্বাক্ষর করা ছাড়াও একটা পৃথক বিবৃতি প্রকাশ করলেন। বিবৃতিতে বলা হলো, আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তান সরকারকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সমরাস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রাখার নিক্সন সরকারের নীতির তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি। এই সাহায্য দক্ষিণ এশিয়ায় আরও সংঘর্ষের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে। এই নীতি মার্কিনি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এবং বিশ্ব বিবেকের নৈতিকতা বিরোধী।

ব্রিটিশ এমপি পরিবর্তনকালে মন্ত্রী পিটার শোর পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান সফরান্তে এক বিবৃতিতে বললেন, 'বাস্তব সত্য হচ্ছে, পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। শুরু থেকেই ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে এক হাজার মাইলের তফাত রয়েছে। এখন রাজনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে তারা বিপরীতমুখী হয়ে গেছে। পাকিস্তানের দুই অংশের বাঁধন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে। যেভাবে ঘটনাপ্রবাহ চলছে এবং যার ফলে প্রতি মাসে প্রায় দশ লক্ষাধিক শরণার্থী সীমান্ত অতিক্রম করছে, সেখানে পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের গৃহীত নানা পন্থা, ভয়-ভীতি আর বীভৎসতার দরুন আর পাকিস্তানের দুই অংশকে একটা রাজনৈতিক পরিমণ্ডলীর মধ্যে আনা সম্ভব নয়। পশ্চিম পাকিস্তান সরকার যদি পূর্ব বাংলা থেকে সরে না যায় তাহলে সেখানকার গৃহযুদ্ধ এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, যার ফলে বেশ ক'টা রাষ্ট্র যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়বে।'

তাই একথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে, পূর্ব বাংলার পরিস্থিতির একটা সন্তোষজনক মীমাংসার উদ্দেশ্যে উভয় পক্ষকে (পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ও নির্বাচিত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ) আলোচনায় লিপ্ত হওয়ার জন্য বিশ্বের পত্র-পত্রিকা, বুদ্ধিজীবী মহল ও পাশ্চাত্য কোন কোন দেশ নানাভাবে প্রচেষ্টা করছে। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। উপরন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন চীনের নয়া বন্ধুত্বের ব্যাপারে এতো বেশি উদগ্রীব ও অন্ধ ছিল যে, চীনের অকৃত্রিম বন্ধু পাকিস্তানের ওপর সরকারিভাবে কোনরকম চাপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আগ্রহী হয়নি। তাই প্রকাশ্যভাবে কোন মার্কিনি উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি।

এদিকে যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট টিটো মার্কিনি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল "ইরানের শাহ আমাকে জানিয়েছে যে, শাহের এ রকম ধারণা হয়েছে যে, ইয়াহিয়া খান যথেষ্ট নমনীয় হয়েছে। অবশ্য আমি ইয়াহিয়া খানকে বলেছি যে, এই ব্যাপারটা ভারত ও পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এটা পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্ন। এখানে প্রাসংগিক হবে বলে উল্লেখ করছি যে, পরবর্তীকালে সাংবাদিক লিফসুজ এমন তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, একাত্তরের শেষার্ধে মুজিবনগর সরকারের অজান্তে মার্কিনি উদ্যোগে ইরানের শাহের মাধ্যমে পাকিস্তানের সমঝোতার কথাবার্তা হয়েছিল। তবে কি এর পিছনে কিছুটা সত্যতা ছিল? আর পাকিস্তানের সামরিক জান্তার রাজনৈতিক পরিপক্বতার অভাবহেতু এবং অনীহা প্রদর্শনের ফলে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। এর সঙ্গে একটা বিরাট প্রশ্ন থেকে যায়। তা হচ্ছে, এ ধরনের মার্কিনি প্রচেষ্টা গোপনে কেন করা হয়েছিল আর তাও মুজিবনগর সরকারের অজান্তে কেন?

জাতিসংঘে প্রেরিত বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা শেষ মুহূর্তে পরিবর্তন কেন করা হয়েছিল? একাত্তরের ২৭শে নভেম্বর মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ কেন নয়াপররাষ্ট্র সচিব নিয়োগ করেছিলেন?

৩৯

আগেই উল্লেখ করেছি যে, মুজিবনগর সরকারের অজান্তেই একটা মহল থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তিদানের শর্তে ছ'দফার ভিত্তিতে একটা কনফেডারেশনের আওতায় পাকিস্তানের (উভয় অংশ) ভৌগোলিক সীমারেখা অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে যুদ্ধ বিরতির জন্য ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল। এমনকি এই উদ্দেশ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটা ক্যাম্পে প্রচারপত্র পর্যন্ত বিলি করা হয়েছিল। প্রকাশ, ইরানের পরলোকগত শাহের মধ্যস্থতায় তেহরানে উভয় পক্ষের মধ্যে এই প্রস্তাবিত বৈঠক অনুষ্ঠানের কথা। যুগোস্লাভিয়ার প্রয়াত নেতা মার্শাল টিটো সিবিএস টেলিভিশন সাক্ষাৎকারেও এই তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। আমার মনে হয় এতগুলো বছর গত হওয়ার পর এ ব্যাপারে এখন প্রয়োজনীয় গবেষণা হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্তত ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে বিষয়টা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকা দরকার। কোন্ প্রেক্ষাপটে এসব ঘটনার অবতারণা হয়েছিল তার হদিস করাটা অযৌক্তিক হবে না। মার্কিনি মধ্যস্থতা সত্ত্বেও জেনারেল ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা কেন এই সমঝোতায় সম্মত হলেন না, তাও জানার সময় এসেছে। এখনও মনে আছে, একাত্তরের নভেম্বর থেকে মুজিবনগর সরকারের জন্য মারাত্মক এক সংকটজনক সময় শুরু হয়েছিল। নানা উপদলে সরকার তখন বিভক্ত। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে স্থানীয় জনসংখ্যা থেকে বাংলাদেশের উদ্বাস্তু সংখ্যা বেশি হওয়ায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, রণক্ষেত্রে মুজিবনগর সরকারের আওতার বাইরে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুজিব বাহিনীর উপস্থিতি, মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত করার জন্য রাজনৈতিক চাপ ইত্যাদি ছাড়াও পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতার প্রচেষ্টার সংবাদে মুজিবনগর সরকার তখন ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। অথচ বিজয় তখন আমাদের দ্বার প্রান্তে।

প্রতিটি ফ্রন্টে মুক্তি বাহিনীর পাল্টা আক্রমণে হানাদার বাহিনী তখন অস্থির এবং সীমান্তবর্তী বহু এলাকা মুক্ত। কয়েকটি শহর এলাকা ছাড়া বাংলাদেশের সর্বত্রই বাংকার থেকে শত্রু সেনাদের বাইরে আসা নিষিদ্ধ এবং সম্ভবপর নয়।

এমন এক অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধকে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে মুজিবনগর সরকারের মধ্যে একতা বজায় রাখার জন্য পর্দার অন্তরালে বেশ কয়েকজন রাজনীতিবিদ তৎপর ছিলেন। এদের মধ্যে টাঙ্গাইলের এ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান, দিনাজপুরের অধ্যাপক ইউসুফ আলী, কুষ্টিয়ার ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, সিলেটের আবদুস সামাদ আজাদ, নোয়াখালীর ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ও ঢাকার শামসুল হক অন্যতম। জনাব মান্নান একদিন সকালে আমাকে সঙ্গে করে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম দু'জনের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করলেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত রকম ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে এই সংকটজনক অবস্থায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে হবে। মূল বক্তব্য থাকবে 'বাংলাদেশের এক ইঞ্চি জমি হানাদার বাহিনীর কবজায় থাকা পর্যন্ত রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধ অব্যাহত থাকবে। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত দুনিয়ার কোন শক্তিই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ থেকে ক্ষান্ত করতে পারবে না।'

দুই নেতাই এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। বেলা তিনটা নাগাদ ভাষণ তৈরি হলো।

বেশ কিছুদিন পরে দু'জনে একত্রে কোলকাতার বালীগঞ্জে অবস্থিত স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের অস্থায়ী রেকর্ডিং স্টুডিওতে এলেন। দুই নেতাকে একত্রে দেখে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের কর্মীদের মধ্যে কাজের উৎসাহ আরও বৃদ্ধি পেলো। সিদ্ধান্ত হলো দুই নেতার ভাষণ বাংলা ছাড়া ইংরেজিতেও প্রচারিত হবে। তৎক্ষণাৎ ইংরেজি অনুষ্ঠানের দুইজন কর্মী আলী জাকের ও আলমগীর কবির নেতাদের ভাষণের ইংরেজি অনুবাদ শুরু করলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যে সমাপ্ত করলেন। তৎকালীন তথ্য সচিব জনাব আনোয়ারুল হক খান এই ভাষণের কপি সাংবাদিকদের মধ্যে বিতরণের জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ এক নম্বর বালীগঞ্জে সার্কুলার রোডে মুজিবনগর সরকারের তথ্য দফতরে, দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের জমায়েত করে বক্তৃতার কপি বিতরণ করলাম। সাংবাদিকদের বিদায় করে রেডিওর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে দুই নেতার ভাষণ শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ফলে আর কোন বিভ্রান্তির অবকাশ রইলো না।

প্রস্তাবিত তেহরানের গোপন বৈঠকের জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া কেন আশানুরূপ সাড়া দিলেন না, তা রহস্যের অন্তরালে রয়ে গেলো। উপরন্তু জেনারেল ইয়াহিয়া এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে ২৫শে নভেম্বর ঘোষণা করলেন, 'আগামী দশ দিনের মধ্যে আমি রাওয়ালপিন্ডিতে নাও থাকতে পারি। আমি রণক্ষেত্রে একটা যুদ্ধ পরিচালনা করবো।" অবশ্য তিনি কথা রেখেছিলেন।

এ রকম এক পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের যুদ্ধ প্রস্তুতির গোপন সংবাদে ভারতের সামরিক বাহিনীও ব্যাপক লড়াইয়ের জন্য তৈরি হলো। কিন্তু সভ্য জগতকে বুঝাতে হবে যে, ভারতই প্রথম আক্রান্ত হয়েছে। তাই পাল্টা হামলার জন্য ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণের পর ভারতের মন্ত্রিসভার সদস্যরা সরকারি কাজের বাহানা করে দিল্লির বাইরে চলে গেলেন। তারিখটা হচ্ছে ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর। ভারতীয় অর্থমন্ত্রী সেদিন পাটনাতে, দেশ রক্ষামন্ত্রী বোম্বেতে আর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কোলকাতায়।

কোলকাতায় তখন 'ব্ল্যাক আউট' চলছে। সন্ধ্যায় জানতে পারলাম চরম উত্তেজনাকর সংবাদ। বিকেল ঠিক সাড়ে পাঁচটায় পাকিস্তান বিমান বাহিনী একই সঙ্গে ভারতের অমৃতসর, পাঠানকোর্ট, শ্রীনগর, অবন্তীপুর, উত্তরালই, যোধপুর, আম্বালা এমনকি দিল্লির সন্নিকটে আগ্রার বিমান ঘাঁটি আক্রমণ করেছে। প্রথম প্রতিক্রিয়াতেই মনে হলো পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত ভারতের পাতা ফাঁদে পা দিল।

রাত ন'টায় খবর পেলাম একটা বিশেষ বিমানে ইন্দিরা গান্ধী সন্ধ্যার পরেই দিল্লি রওয়ানা হয়ে গেছেন। রাতেই মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠক। এর পরেই তৎকালীন ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি কর্তৃক ভারতের জরুরি অবস্থা ঘোষণা। মধ্যরাতের একটু পরেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণ দিলেন। রাত সাড়ে এগারটায় ভারতীয় বিমানবাহিনীর শুরু হলো পাল্টা হামলা। ১৯৭১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ দু'জনে যুগ্ম দস্তখত করে চিঠি লিখলেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে। চিঠির মূল বক্তব্য হচ্ছে, স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দানের দাবি।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট বাংলাদেশ সরকারের পত্র

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সিলমোহর) ৪-১২-৭১

প্রেরক : সৈয়দ নজরুল ইসলাম, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী।

প্রাপক : মাননীয়া ইন্দিরা গান্ধী, ভারতের প্রধানমন্ত্রী, নয়াদিল্লি।

মহামান্য,

আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানতে পেরেছি যে, ৩রা ডিসেম্বরের অপরাহ্নে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা আপনার দেশের বিরুদ্ধে নগ্নভাবে হামলা চালিয়েছে। ইয়াহিয়া খানের এই সর্বশেষ পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক বিধি নিষেধ বেপরোয়াভাবে অমান্য করার পরিচয় বহন করছে এবং চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করছে যে, ইয়াহিয়া খান এই উপমহাদেশের রাষ্ট্রগুলোতে উত্তেজনা, ধ্বংসযজ্ঞ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টিতে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশের জনসাধারণ পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের এই ধরনের মনোবৃত্তির ব্যাপারে সজাগ এবং প্রায় নয় মাস পূর্বে নিজেদের স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু করেছে। ঘটনার বাস্তবতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দান করে আমরা গত ১৫ই অক্টোবর এবং ২৩শে নভেম্বর আপনাকে পত্র মারফত জানিয়েছি। আমরা পরিষ্কার ভাষায় আপনাকে অবহিত করেছি যে, হানাদার বাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই অব্যাহত থাকবে। এক্ষণে ইয়াহিয়া খান ও তাঁর সমরনায়করা যেভাবে আপনার দেশের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে তাতে এই আগ্রাসনকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে ভারত ও বাংলাদেশের জনসাধারণের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশিভাবে দেখা দিয়েছে। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা করা এবং এ ধরনের অন্যান্য মূল্যবোধকে অর্জন করার উদ্দেশ্য দু'দেশের মধ্যে যে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তার জন্য আমরা সম্মিলিতভাবে লড়াই করতে প্রস্তুত।

জনাব প্রধানমন্ত্রী, আপনাকে জানাতে চাই যে, ৩রা ডিসেম্বর তারিখে আপনার দেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সরাসরি আগ্রাসনের প্রেক্ষিতে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের যে কোন সেক্টরে অথবা ফ্রন্টে হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত ও জোরদার করতে প্রস্তুত রয়েছে। তাই আমরা যদি আনুষ্ঠানিকভাবে পারস্পরিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি, তাহলে পাকিস্তানের সামরিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আমাদের সম্মিলিত প্রতিরোধ ব্যাপ্তি লাভ করবে। এই প্রেক্ষাপটে আমরা আপনাদের সমীপে পুনরায় অনুরোধ করতে চাই যে, ভারত সরকার অবিলম্বে আমাদের দেশ ও সরকারকে স্বীকৃতি দান করুক। এই উপলক্ষে আমরা আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতে চাই যে, উভয় দেশের এই ভয়াবহ বিপদের সময় বাংলাদেশের সরকার ও জনগণ আপনাদের সঙ্গে রয়েছে। আমাদের আন্তরিক আশা রয়েছে যে, আমাদের যৌথ প্রতিরোধের ফলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের হীন পরিকল্পনা ও জঘন্য ইচ্ছা ব্যর্থ হতে বাধ্য এবং আমরা সফল হবো।

আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আপনাদের ন্যায়-নিষ্ঠা সংগ্রামের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি।

আপনাদের প্রতি সহযোগিতার পুনরুল্লেখ করছি।

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৭১

ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত অবহিত করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নিকট ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পত্র

৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে মাননীয় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং আপনি যে বাণী আমার কাছে পাঠিয়েছেন, তাতে আমার সহকর্মীবৃন্দও আমি খুবই অভিভূত হয়েছি। পত্র পাওয়ার পর আপনাদের সাফল্যজনক নেতৃত্বে পরিচালিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দান সংক্রান্ত আপনাদের অনুরোধ ভারত সরকার পুনরায় বিবেচনা করেছে। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, বর্তমানে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার প্রেক্ষাপটে ভারত সরকার আপনাদের স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আজ সকালে আমি পার্লামেন্টে এ ব্যাপারে একটা বিবৃতি দান করেছি। তার অনুলিপি এতদসঙ্গে পাঠালাম।

বাংলাদেশের জনসাধারণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কালযাপন করছে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য আপনাদের যুব সম্প্রদায় নিঃস্বার্থভাবে আত্মাহুতির মাধ্যমে এক মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে। ভারতের জনসাধারণও একই মূল্যবোধকে রক্ষার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি সন্দেহাতীতভাবে বলতে চাই যে, আমাদের মহান উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে এই অধ্যবসায় ও আত্মদান আমাদের দুই দেশের জনসাধারণের মধ্যে বন্ধুত্বকে আরো সুদৃঢ় করবে। পথ যতই দীর্ঘ হউক না কেন এবং ভবিষ্যতে আমাদের জনসাধারণের যতই ত্যাগ করতে হউক না কেন, বিজয়মাল্য আমরা বরণ করবোই।

এই উপলক্ষে আমি আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে এবং আপনার সহকর্মী ও বাংলাদেশের বীর জনতাকে আমার শুভাশীষ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি আপনার মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে আমাদের পূর্ব সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করছি।

আপনার বিশ্বস্ত

(স্বা-) ইন্দিরা গান্ধী

মাননীয় জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ
প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুজিবনগর

মার্কিনি সাপ্তাহিক নিউজউইক পত্রিকায় বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের ইন্টারভিউ

৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

"আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা অপূর্ব পারদর্শিতা প্রদর্শন করছে। আমরা এখন সুসংগঠিত এবং পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষম। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের দেশপ্রেম আমাদের সামরিক অগ্রাভিযানের জন্য সহায়ক হচ্ছে। দেশের সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় আমাদের পক্ষে রয়েছে। আমার মনে হয় না যে, আর বেশি সময়ের প্রয়োজন হবে। আপনি নিজেই অধিকৃত ও মুক্ত এলাকায় দেখেছেন যে, আমাদের প্রতি কি ব্যাপক সমর্থন রয়েছে।

এর পুরোটাই আমাদের কৃতিত্ব এবং ভারতের পক্ষ থেকে কোন রকম চাপ নেই ...। কম্যুনিস্টরাও আমাদের সমর্থন করছে এবং আমার সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে। অবশ্য এটা কোন বড় ব্যাপার নয়।

মার্কিনি পত্রিকাগুলো মূল প্রশ্নগুলোর ব্যাখ্যা দান করেছে। এসব ঘটনা এখন সবারই জানা। এর ফলে আপনাদের কংগ্রেসও আমাদের সমর্থন করছে। কিন্তু আমরা বুঝতেই পারি না যে, কেন মার্কিনি সরকার আমাদের বিরোধিতা করছে।

যদি ইয়াহিয়া খান দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পায় যে, স্বাধীনতা (বাংলাদেশের) হবেই, তাহলে আর রক্তপাত ছাড়া আমরা যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারি। কিন্তু প্রথমে তাঁকে মুজিবকে ছাড়তে হবে এবং স্বাধীনতাকে স্বীকার করতে হবে। তখন যুদ্ধ থামানো যেতে পারে এবং সৈন্য প্রত্যাহার করা সম্ভব। যদি ইয়াহিয়া খান সমঝোতা করতে এবং শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চায়, তবে তাঁকে (মুজিবকে) ছেড়ে দিতেই হবে। যদি সে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে সম্মত না হয়, তাহলে আমরা শেষ পর্যন্ত রক্তাক্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবো।

(সাপ্তাহিক নিউজ উইক ৬-১২-৭১)

৬ই ডিসেম্বর মুজিবনগরে তুমুল উত্তেজনা। সুদীর্ঘ নয় মাস পর ভারত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করেছে। স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের সংবাদ কক্ষে একটার পর একটা খবর এসে পৌঁছাচ্ছে। কামাল লোহানী, সুব্রত বড়ুয়া জালাল, আলী জাকের, আলমগীর কবির কারো বিশ্রাম নেয়ার সময় নাই। অন্য বেতারের সংবাদ বুলেটিন থেকে আমাদের বুলেটিনে কিছু বেশি সংবাদ দিতে হবে। রাতেই খবর এলো লালমনিরহাটে মুক্তিবাহিনী প্রবেশ করেছে। সিলেট ও মওলবীবাজার মুক্ত হওয়ার পথে। ভারতীয় বাহিনী ঢোকার আগেই দুঃসাহসিক মুক্তিযোদ্ধারা এসব এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। এর পরের খবর হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে যশোরের পতন ঘটবে। সীমান্ত এলাকা থেকে হানাদার বাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পশ্চাদপসরণ করেছে। বেতারকেন্দ্রের এক কোণায় প্রচণ্ড শীতে একটা চাদর জোগাড় করে মেঝেতে শুয়ে মুক্তিযুদ্ধে শরিক হতে পেরে নিজের জীবনকে ধন্য মনে হলো। পরম করুণাময়ের দরগায় প্রার্থনা করলাম সবার মঙ্গল কামনায়। এত ত্যাগ, এত তিতিক্ষার পর স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে চলেছে।

৪১

একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসের একেবারে গোড়ার দিকে আমরা মুজিবনগরে বসে যুদ্ধের খতিয়ান করে দেখলাম যে, দেশের এক-চতুর্থাংশ এলাকা হয় মুক্তিবাহিনীর পুরোপুরি দখলে, না হয় মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। অনেক এলাকাতেই মুজিবনগর সরকারের নির্দেশে বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এগারোটা সেক্টর কমান্ডারের অনেকেই এ সময় বাংলাদেশের মাটিতে অস্থায়ী ক্যাম্প হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেছে।

খুলনার পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের মাঝ দিয়ে গোপালগঞ্জ ও বরিশালের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের উপকণ্ঠে গেরিলাদের হামলার তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আখাউড়া সেক্টরের ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ে আমাদের সাফল্য অর্জিত হয়েছে। কিশোরগঞ্জের হাওড় এলাকা থেকে পাকিস্তানি

সৈন্যবাহিনী পশ্চাদপসরণ করেছে। টাঙ্গাইল জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা মুক্ত হওয়ার পর স্বাধীন দেশের বেসামরিক প্রশাসন চালু হয়েছে। তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী সমস্ত চরাঞ্চল মুক্তিবাহিনীর দখলে। সিলেট জেলার ছাতক, হবিগঞ্জ ও জকীগঞ্জসহ চা বাগানগুলো আমাদের দখলে। কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় মহকুমা এখন মুজিবনগর সরকারের নিয়ন্ত্রণে। রাজশাহী, কুষ্টিয়া ও যশোরের বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে হানাদার বাহিনী প্রত্যাহার করা হয়েছে। এছাড়া পাবনা, বগুড়া, ঢাকা, ফরিদপুর, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চল থেকে প্রতিনিয়তই সংঘর্ষের খবর এসে পৌঁছেছে।

আমাদের হিসাবমতে, কাদেরিয়া বাহিনী, আফসান বাহিনী, হালিম বাহিনী, হেমায়েত বাহিনী, মুজিব বাহিনী ছাড়া মুক্তি বাহিনীর প্রায় লক্ষাধিক সশস্ত্র যোদ্ধা এখন বাংলাদেশে যুদ্ধরত অবস্থায় রয়েছে। এঁদের সংখ্যা প্রায় দুই লাখের মতো। বিভিন্ন ট্রেনিং ক্যাম্পে প্রশিক্ষণরত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল প্রায় পনেরো হাজারের মতো। এছাড়া বিভিন্ন ক্যাম্পগুলোতে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য প্রায় ৩০/৪০ হাজার যুবক অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে।

তাই একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আরও কিছুদিনের জন্য দীর্ঘায়িত হলে আমরা নিজেরাই বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে সক্ষম হতাম। কেননা, শত বাধা-বিপত্তি এবং ভয়-ভীতি সত্ত্বেও দেশের আপামর জনসাধারণ আমাদের সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করেছিল।

কিন্তু অবস্থার প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের সামরিক জান্তার পক্ষে সেদিন পাকিস্তান ও মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধকে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যেকার যুদ্ধে পরিণত করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কারণ সেক্ষেত্রে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধবিরতির জন্য উভয় পক্ষকে বাধ্য করে পর্যবেক্ষক মোতায়েন করলেই পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যবাহিনীর পক্ষে বাংলার মাটিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান করা সম্ভব হতো এবং কার্যত বাংলাদেশ দ্বিধাবিভক্ত হতো।

এই প্রেক্ষাপটেই সেদিন মুজিবনগর সরকার ভারতের স্বীকৃতির জন্য মারাত্মক চাপের সৃষ্টি করেছিল। পাকিস্তান চিন্তাও করতে পারেনি যে, ভারতের এই স্বীকৃতি প্রদানের পর ভারত-বাংলাদেশ মিত্রবাহিনী সৃষ্টি করে পাল্টা আঘাত হানবে। উপরন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন না হচ্ছে এবং হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ না করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়া নিরাপত্তা পরিষদে যে কোন যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অবিরাম ভেটো প্রয়োগ করবে।

এই ছিল সেদিনকার কূটনৈতিক খেলাধুলার রকমফের।

তাহলে এই প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক যে, ৯৩ হাজার সশস্ত্র সৈন্য এবং প্রচুর সমরাস্ত্র হাতে থাকা সত্ত্বেও সেদিন হানাদার বাহিনী শেষ পর্যন্ত লড়াই না করে আত্মসমর্পণ করলো কেন? প্রথমত, মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে হানাদার বাহিনীর অত্যন্ত দ্রুত শক্তি ক্ষয় হচ্ছিল এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রণ প্রস্তুতির জন্য নর্দার্ন রেঞ্জার্স, গিলগিট স্কাউট ও আর্মড পুলিশের কিছু প্যারামিলিশিয়া ছাড়া পূর্ব রণাংগনে আর সৈন্য পাঠানো সম্ভব হচ্ছিল না। দ্বিতীয়ত, হানাদার বাহিনীর হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় নৈতিক মনোবল ভেঙ্গে পড়েছিল। তৃতীয়ত, মুক্তিবাহিনীর কোন বন্দি শিবির না থাকায় দৃত পাকিস্তানি সৈন্যদের অস্তিত্ব সম্পর্কে নানা লোমহর্ষক কাহিনী হানাদার সৈন্যদের

শিবিরগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ ব্যাপারগুলো জেনারেল রাও ফরমান আলী ও মেজর জেনারেল নিয়াজীর কাছে খুব ভীতিপ্রদ মনে হচ্ছিল। হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পে এই ভীতিটা দারুণভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই তো এ রকম বহু নজির আছে, যেখানে আত্মসমর্পণের প্রাক্কালে হানাদার সৈন্যদের চিৎকার করে বলতে শোনা গেছে যে, 'সারেন্ডার করুংগা– মগর মুক্তিকাপাস নেহি, হিন্দুস্তানি ফৌজ্‌কা পাস করুংগা।' চতুর্থত, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর ভারতীয় বিমানবাহিনীর শক্তি দক্ষতা বৃদ্ধি।

এই প্রসঙ্গে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত ও পাকিস্তানের সামরিক শক্তির তুলনামূলক হিসাবটা উল্লেখ করছি :

বিষয়	পাকিস্তান	ভারত
	স্থলবাহিনী	স্থলবাহিনী
মোট সৈন্য	৩ লাখ ৫০ হাজার	৮ লাখ ২৮ হাজার
সাঁজোয়া ডিভিশন	২টি	১টি
সাঁজোয়া ব্রিগেড	১টি	–
পদাতিক ডিভিশন	১২টি	১৩টি
এয়ারফোর্স ব্রিগেড	১টি	–
মাউন্টেন ডিভিশন	–	১০টি
ছত্রী ব্রিগেড	–	২টি
প্যাটন ট্যাংক	[illegible]	–
টি-৫৯-(চীনা)	২০০	–
টি-৫৪-৫৫ (রুশ)	২৫০	৪৫০
এম-২৪ শোফে	২০০	–
এম-৪১	৭৫	–
পিটি-৪৬	৩০	–
এইচ-১৩ হেলিকপ্টার	২০	–
হালকা হেলিকপ্টার	৪০	–
বৈজয়ন্তী ট্যাংক	–	৩০০

(ভারতের ট্যাংক তৈরির নিজস্ব কারখানা রয়েছে)

	বিমান বাহিনী	
বিমান লোকবল	১৫ হাজার	৯০ হাজার
জঙ্গি বিমান	১৭০	৬২৫
ক্যানবেরা বোমারু	১১	৫০
বি-৫৭	২ স্কোয়াড্রন	৮ স্কোয়াড্রন

আর বি-৫৭ মিরাজ	১০	–
মিগ-১৯	৫ স্কোয়াড্রন	–
মিগ-২১	–	১২০
এফ ১০৪ এ	১ স্কোয়াড্রন	–
এফ-৮৬ জঙ্গি বিমান	৭ স্কোয়াড্রন	–
মিরাজ ৩ ই-	১ স্কোয়াড্রন	–
পরিবহন বিমান	১৬	২৭৬
হেলিকপ্টার	২৫	২২১
টি-৬, টি ৩৩ মিরাজ ৩ ডি	৮০	–
ন্যাট	–	১৫০
মারুু ৩	–	২৫
মিস্‌টের	–	৬০
সুপার কন্‌স্টিলেশন	–	৮
ভাম্পায়ার	–	৫০
এস ইউ-৭ বি জঙ্গি বোমারু	–	১৪০

নৌবাহিনী

নৌ-সেনা	৯ হাজার ৫ শত	৪০ হাজার
ক্রুইজার	[illegible]	২
ডেস্ট্রয়ার	[illegible]	৪
ডেস্ট্রয়ার এসকট	৩	৭
ফ্রিগেট	২	৮
মাইন সুইপার	৮	৪
পেট্রোল বোট	৬	–
সাবমেরিন	৪	৪
বিমানবাহী জাহাজ	–	১
ল্যান্ডিং শিপ	–	১
ল্যান্ডিং ক্রাফ্‌ট	–	৩
পেট্রোল ক্রাফ্‌ট	–	১০

১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর বিকাল পৌনে ছ'টার সময় পাকিস্তান বিমান বাহিনীর আকস্মিক হামলার মাঝ দিয়ে যে সর্বাত্মক যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল, মাত্র ১৩ দিনের মাথায় পূর্ব রণাংগনে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্যের আত্মসমর্পণের মাঝ দিয়ে সে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলো। উপমহাদেশে জন্ম হলো বাংলাদেশ নামে এক নতুন স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র।

৪২

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকার কে কোন্ ধরনের স্ট্রাটেজি গ্রহণ করেছিল তা' বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আগেই বলেছি এই কয়েক মাসে তিনটি পক্ষ থেকে যে কত বিবৃতি দেয়া হয়েছে এবং কত চিঠি লেখা হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। কত ধরনের রাজনীতি ও কূটনীতি হয়েছে তার সঠিক উল্লেখ করাও মুশকিল। এছাড়া প্রতিটি পক্ষে অভ্যন্তরীণ বিবাদ-কলহের হিসাব দেয়াটাও দুরূহ ব্যাপার।

প্রথম ভারতের কথা

১. ভারতের তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের বিরোধীরা ভেবেছিলেন শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্বাধীন হবে না। পূর্ণোদ্যমে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধ মীমাংসার জন্য জাতিসংঘে বাহিনী মোতায়েন হলেই বাংলাদেশে একটা দীর্ঘস্থায়ী অচলাবস্থা দেখা দেবে। ব্যাপারটা তখন রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ইন্দিরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

২. কংগ্রেস বিরোধীদের আরও হিসাব ছিল যে, পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রকাশ্যে সক্রিয় সহযোগিতা করার প্রতিক্রিয়া ভারতেও দেখা দিতে বাধ্য। ২২টি রাজ্য এবং ১৩টি ইউনিয়ন টেরিটরির দেশ ভারতে পরবর্তীকালে স্বাভাবিকভাবেই বিচ্ছিন্নতাবাদীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।

৩. দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি উদ্বাস্তুর ভরণ-পোষণ এবং যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ের প্রেক্ষাপটে ভারতের অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেবে। রাজনৈতিক ইস্যু হিসাবে এই বিষয়টা ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

৪. ক্ষমতাসীন দলের হিসাবটা ছিল, পাকিস্তানের দুই অংশ একত্র থাকলে পশ্চিমা শক্তিগুলো সব সময়েই ভারত ও পাকিস্তানকে একই দৃষ্টিতে অবলোকন করে সহযোগিতার পরিমাপ করছে। ফলে ৬০ কোটি লোকের দেশ ভারত ও ১২ কোটি লোকের পাকিস্তান প্রায় একই সমান সাহায্য ও সহযোগিতা পাচ্ছে। উপরন্তু ভারতের পক্ষে দর কষাকষি করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই বাংলাদেশ স্বাধীন হলে, পশ্চিমা দেশগুলো ভবিষ্যতে আর কোন দিনই ভারত-পাকিস্তানকে একই পাল্লায় তুলতে সাহসী হবে না।

৫. দ্বিতীয়ত, তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের মতে, পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অংগ থাকলে বিপুল অর্থ ব্যয়ে সব সময়ের জন্য পূর্বাঞ্চলেও সৈন্য এবং প্যারা মিলিশিয়া মোতায়েন রাখতে হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে পূর্বাঞ্চলে সৈন্য ও প্যারা মিলিশিয়া মোতায়েন রাখার জন্য ব্যয়ভার বহন করতে হবে না।

৬ তৃতীয়ত, যেহেতু বাংলাদেশের এক কোটি উদ্বাস্তু সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থান করছে, সেহেতু যুদ্ধের ডামাডোলে নকশাল আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়তে বাধ্য।

৭. জাতীয়তাবাদের উন্মেষের ভিত্তিতে সৃষ্ট বাংলাদেশের অবস্থান ভারতের পূর্বাঞ্চলে মার্কসীয় দর্শনের দ্রুত বিস্তৃতির পথে বাধাস্বরূপ। ফলে পূর্বাঞ্চল এলাকায়

মার্কসীয় দর্শনের বিস্তৃতির পরিবর্তে বেশ কিছু আঞ্চলিকতাবাদ দেখা দিতে বাধ্য। বৃহত্তর স্বার্থে সীমিত পরিমাণ আঞ্চলিকতাবাদ দিল্লির পক্ষে সব সময়েই গ্রহণযোগ্য।

নির্বাসিত বাংলাদেশ সরকারের এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দলগুলোর স্ট্রাটেজি কি ছিল?

১. সত্তরের নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর অস্বীকার করে গণহত্যা শুরু করলে, বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে একবার যখন অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হয়েছে তখন সমঝোতার সব পথই রুদ্ধ। তাই চূড়ান্ত লড়াই ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

২. লড়াইয়ের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করতে না পারলে সীমান্ত অতিক্রমকারী এক কোটি বাঙালির ভবিষ্যৎ অন্ধকার এবং তাঁদের অবস্থা ভারতে প্রায় দশ বছর ধরে অবস্থানকারী তিব্বতীয় রিফিউজিদের মতো হতে বাধ্য। আর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বসবাসকারী বাঙালিরা দাস শ্রেণীতে পরিণত হবে। তাই হয় স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে, না হয় নিশ্চিহ্ন হতে হবে।

৩. ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসীরা যাতে করে অনুপ্রবেশ করতে না পারে, সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং ব্যবস্থা নেয়া। অবশ্য সার্বিকভাবে দ্বিধাবিভক্ত মার্কসিস্টদের একটা বিরাট উপদল, হয় এই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে, না হয় নিরপেক্ষ ছিল।

৪. বিভিন্ন সেক্টর কমান্ডারদের মধ্যে সমঝোতা বজায় রেখে মুজিবনগর সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীনে যুদ্ধ অব্যাহত রাখা।

৫. মুজিবনগর সরকার, স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সুকৌশলে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সরাসরি হস্তক্ষেপ পরিহার করা এবং একই সঙ্গে সুসম্পর্ক অব্যাহত রাখা।

৬. মুজিবনগর সরকারের ভিতরের ও বাইরের দক্ষিণপন্থী মহল অর্থাৎ যাঁরা এরকম পরিস্থিতির পরেও একটা কনফেডারেশনের ভিত্তিতে পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখার উদ্দেশ্যে গোপনে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, তাঁদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা এবং প্রচেষ্টা ব্যর্থ করা।

৭. উগ্র জাতীয়তাবাদের সমর্থক ছাত্র ও যুব নেতৃবৃন্দ মুজিবনগর সরকারের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ হয়ে নিজস্ব কর্মপন্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাঁদের মতে মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে বিশ্বের অন্যান্য মুক্তিকামী দেশগুলোর মতো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বও মার্ক্সিস্টদের হাতে চলে যেতে পারে। তাই অগ্রিম সতর্কতা হিসাবে উগ্র জাতীয়তাবাদের আদর্শে দীক্ষিত পৃথক বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এরই ফলে মুজিব বাহিনীর সৃষ্টি হয়। পূর্ণ ট্রেনিং গ্রহণের পর বাংলাদেশের রণাঙ্গনে এঁদের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত মুজিবনগর সরকার এ ব্যাপারে বিশেষ ওয়াকেফহাল ছিলেন না। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে, ভবিষ্যতের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণও এঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

৮. ন্যাপ মুজাফফর, কম্যুনিস্ট পার্টি (মণি সিং) এবং বাংলাদেশ কংগ্রেস পার্টির (মনোরঞ্জন ধর) অন্যতম স্ট্রাটেজি ছিল মুজিবনগর মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত হয়ে ভবিষ্যতে ক্ষমতা ভাগাভাগি করার পথ প্রশস্ত করা।

৯. মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ অক্টোবর মাস নাগাদ এগারো জন যুদ্ধরত সেক্টর কমান্ডারের সমবায়ে সামরিক কাউন্সিল কমান্ড গঠন এইসব কমান্ডারদের স্ট্রাটেজি হিসাবে গণ্য করা যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চেয়ারম্যানের পদ দখলের প্রশ্নে মতবিরোধের সৃষ্টি হলে সামরিক কাউন্সিল কমান্ড গঠনের সিদ্ধান্ত ভেস্তে যায়।

পাকিস্তানের সামরিক জান্তা, পিপলস পার্টির ভুট্টো এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর কোন ধরনের স্ট্রাটেজি ছিল?

১. সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে অবিভক্ত পাকিস্তানে পিপলস পার্টি দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হওয়া সত্ত্বেও ছলে বলে কৌশলে ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা করা। এই প্রেক্ষাপটেই জুলফিকার আলী ভুট্টো কর্তৃক প্রথমে আলোচনার মাধ্যমে শেখ মুজিবকে ছ'দফার প্রশ্নে নমনীয় করার প্রচেষ্টা করা হয়। নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার লাভের পর মুজিব কর্তৃক ছ'দফাকে জনগণের ম্যান্ডেট হিসাবে ঘোষণা করায় মুজিব-ভুট্টো আলোচনা ব্যর্থ হলে ভুট্টো কর্তৃক দুই পার্লামেন্টের প্রস্তাব কার্যত পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব। তবুও পিপলস পার্টিকে ক্ষমতায় আসতে হবে। তাই ভুট্টো কর্তৃক বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার গণহত্যার ব্লু-প্রিন্টে সমর্থন দান।

২. ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর ২৫শে মার্চ রাতে করাচি প্রত্যাবর্তনের পর জেনারেল ইয়াহিয়া কর্তৃক আওয়ামী লীগকে বেআইনি ঘোষণা এবং শেখ মুজিবকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' হিসাবে অভিযুক্ত করা ভুট্টোর কূটবুদ্ধি ও সমর্থনের ফল।

৩. পাকিস্তানের সামরিক জান্তার হিসাব ছিল যে, গণহত্যার মাধ্যমে লাখ দুয়েক বাঙালিকে নিশ্চিহ্ন করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ধর্মীয় শ্লোগানের আড়ালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণপন্থী এবং অবাঙালিদের মোর্চা গঠন করে একটা শিখণ্ডি সরকার গঠন এবং কেন্দ্রে ভুট্টোকে ক্ষমতায় বসানো সহজ হবে।

৪. সামরিক জান্তা কর্তৃক গণহত্যা শুরু করার পর বাঙালিদের পূর্ণাঙ্গ মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারটা জেনারেল ইয়াহিয়ার পরামর্শদাতাদের হতবুদ্ধি করায় পরিস্থিতির মোকাবেলায় জেনারেল টিক্কা খানের জায়গায় ডাক্তার এ এম মালেককে গভর্নর নিয়োগ করতে হয়েছিল।

৫. সত্তরের মে মাস নাগাদ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণে আনার পর সীমান্ত অতিক্রমকারী প্রায় এক কোটি উদ্বাস্তুকে দেশে প্রত্যাবর্তন করানোর স্ট্রাটেজি সামরিক জান্তা গ্রহণ করেছিল। ভারতের যেখানে যুক্তি ছিল যে, প্রায় এক কোটি বাঙালি উদ্বাস্তু ভারতে আগমন করায় এবং এদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ভারতকে বহন করতে হচ্ছে বলে এ ব্যাপারে ভারতের বক্তব্য রয়েছে। ভারতের এসব বক্তব্য অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ নয়। এর মোকাবেলায় ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা উদ্বাস্তু ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করলো।

৬. একদিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জোয়ানরা এবং রাজাকার ও আল বদরের দল হত্যা, লুণ্ঠন ও ধর্ষণে লালায়িত হওয়ায় শৃংখলা বিনষ্ট এবং অন্যদিকে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের অবিরাম প্রচারণার ফলে উদ্বাস্তু ফিরিয়ে নেয়ার পাকিস্তানি স্ট্রাটেজি ব্যর্থ হলো।

৭. এরপরেই পাকিস্তানিরা নয়া স্ট্রাটেজি গ্রহণ করে। মাস কয়েকের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের পাল্টা হামলার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেলে এই নয়া স্ট্রাটেজি পাকিস্তানকে

গ্রহণ করতে হয়। বাংলাদেশের মাটিতে মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তানি সৈন্যদের সংঘর্ষ অব্যাহত থাকায় এবং এসব লড়াইয়ের খবর পশ্চিমা দেশগুলোতে ফলাও করে প্রচারিত হওয়ায় পাকিস্তানি সামরিক জান্তাকে বেশ অসুবিধার মোকাবেলা করতে হয়। প্রথমত, সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতা হস্তান্তরে সামরিক জান্তার অস্বীকৃতি; দ্বিতীয়ত, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও গণহত্যার জের হিসাবে অন্য রাষ্ট্রে প্রায় এক কোটি উদ্বাস্তু প্রেরণ এবং তৃতীয়ত, নির্বাসিত সরকার গঠন ও মুক্তিযোদ্ধাদের পাল্টা হামলা সব কিছুই তো পাকিস্তানি সামরিক জান্তার এ্যাকশনের ফল। তাই নতুন স্ট্রাটেজি হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তানি সৈন্যের যুদ্ধের পট পরিবর্তন করে একে পাক-ভারত যুদ্ধে রূপান্তরিত করা।

৮. এর প্রস্তুতি হিসাবে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ভারতকে যুদ্ধে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে ১৪ই অক্টোবর থেকে ২রা ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ব রণাঙ্গনে সীমান্ত অতিক্রম করে হামলা অব্যাহত রাখে।

৯. কিন্তু এই নীতি সফল না হওয়ায় এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপক সফলতার প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা সর্বশেষ স্ট্রাটেজি হিসাবে উপায়ন্তরহীন অবস্থায় পাকিস্তান ও মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াইকে সরাসরি পাক-ভারত যুদ্ধে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে ৩রা ডিসেম্বর ভারতের কয়েকটি স্থানে একসঙ্গে বিমান হামলা করে।

১০. পাকিস্তানের স্ট্রাটেজি ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে পাক-ভারত যুদ্ধে রূপান্তরিত করতে পারলে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের মতো কিংবা জাতিসংঘের উদ্যোগে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হলেই জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকদের নিয়ন্ত্রণে পূর্ব পাকিস্তান ভারত সীমান্তে নিরপেক্ষ সৈন্যবাহিনী মোতায়েনের ফল হিসাবে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান করা সম্ভব হবে এবং বাংলাদেশ আর স্বাধীন হবে না।

১১. পাকিস্তানের এই স্ট্রাটেজিও ব্যর্থ হয়। পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হওয়ায় ভারত-বাংলাদেশ মিত্র বাহিনী গঠিত হয় এবং ভারত সরাসরি পাল্টা আক্রমণের সুযোগ লাভ করে। অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়া ঢাকার পতন না হওয়া পর্যন্ত ভোট দানের মাধ্যমে জাতিসংঘে যুদ্ধ বিরতির সকল প্রস্তাব বাতিল করে।

এতসব কূটনীতি, বিবৃতি স্ট্রাটেজি আর লড়াই-এর ফলাফল হচ্ছে নিম্নরূপ :

ক. বাংলাদেশের স্বাধীনতা;
খ. ৯৩ হাজার সৈন্যসহ পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ;
গ. ভুট্টো কর্তৃক খণ্ডিত পাকিস্তানের ক্ষমতা লাভ;
ঘ. উপমহাদেশের শক্তির নতুন ভারসাম্য সৃষ্টি;
ঙ. বাংলাদেশে আপোষের রাজনীতি ও অবিশ্বাস;
চ. মুক্তিযোদ্ধাদের বেকারত্বের অভিশাপ।

৪৩

আটই ডিসেম্বর (১৯৭১) আমার জীবনের এক স্মরণীয় দিন। মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের দফতর থেকে আগের দিন আমাকে খবর পাঠানো হয়েছিল যে, পরদিন ৭ই ডিসেম্বর কোলকাতার গ্র্যান্ড হোটেলের সামনে থেকে কয়েকটা জিপ ও মাইক্রোবাসযোগে বিদেশী সাংবাদিক আর টেলিভিশন ক্যামেরাম্যানদের যশোরে নিয়ে

যেতে হবে।

৬ই ডিসেম্বর থেকে যশোর শহর মুক্ত হয়েছে এবং সেখানে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। সমস্ত মনেপ্রাণে আমার দারুণ উত্তেজনা আর দেহে শিহরণ। সুদীর্ঘ নয় মাসের রক্তাক্ত যুদ্ধের পর আমাদের স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে। আবার নিশ্চিত মনে আমার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে ফিরে যেতে পারবো।

৭ই ডিসেম্বর রাত এগারোটা নাগাদ পার্ক সার্কাসের একটা ছোট্ট অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। এখানেই অফিস শেষ হবার পর আমার বন্ধু কবি ফয়েজ আহমদের রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা। বেচারা একটা বড় টেবিলের ওপর সবেমাত্র নিদ্রার আয়োজন করছিল। আমি তাকে বললাম, 'যদি যশোর যেতে চাও আর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ দেখতে চাও, তাহলে ভোর সাড়ে পাঁচটায় গ্র্যান্ড হোটেলের সামনে হাজির থেকো।' কথা ক'টা বলে ওর সঙ্গে আনন্দে কোলাকুলি করে বিদায় নিলাম।

ভোর সোয়া পাঁচটা নাগাদ গ্র্যান্ড হোটেলের গাড়ি বারান্দায় হাজির হলাম। তখনও ঠিকভাবে ভোরের আলো ফোটেনি। অন্ধকারেই দেখি আমার বন্ধু ফয়েজ দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই সাদা দাঁতগুলো বের করে হেসে উঠলো। বহুদিন পরে আবার ফয়েজের অমায়িক হাসি দেখলাম। এক গাদা নস্যি নাকে দিয়ে বললো, 'তাড়াতাড়ি কর।' উত্তরে বললাম, 'এ বেটা সাদা চামড়ার জার্নালিস্টদের আর তাগাদা দিতে হবে না। ওই দেখ ওদের টিভির ক্যামেরা আর অন্যান্য জিনিসপত্র এর মধ্যেই গাড়িতে উঠে গেছে।'

ভোর ছ'টা নাগাদ আমরা যশোরের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেলাম। লেক টাউন দমদম থেকেই রাস্তার দু'পাশে শুধু দেখলাম বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য শত শত রিফিউজি ক্যাম্প। ভিতরে দারুণ শীতে সবাই কুঁকড়ে আছে। মাঝে-মধ্যে শিশুদের কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে আর কুকুরের ঘেউ ঘেউ।

রাস্তায় বুঝতে পারলাম যে, আমাদের গাড়িগুলোর একটা বিরাট কনভয় সীমান্তের দিকে এগিয়ে চলেছে। সামনে একটা সিকিউরিটি গাড়ি। তার পরেই মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের গাড়ি। বেলা আটটা নাগাদ বাংলাদেশ সীমান্তে এসে হাজির হলাম। ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসার ছাড়াও বেসামরিক প্রশাসক কামাল সিদ্দিকী (বীর বিক্রম) আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে অভ্যর্থনা জানালেন। তখনকার আমার মনের অনুভূতির কথা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। একদিকে প্রিয়জন হারানোর দুঃখে ভারাক্রান্ত মন আর অন্যদিকে বিজয়ের আনন্দ। অভ্যর্থনার পরেই আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো কয়েকটি বিধ্বস্ত পাকিস্তানি বাংকার দেখাবার জন্য। তখনও হানাদার সৈন্যের লাশ পড়ে রয়েছে। লাশগুলোর ওপর অসংখ্য মাছি ভন্‌ভন্ করছে। বিকট দুর্গন্ধ পেলাম। বাংকারের মধ্যে ছিন্ন শাড়িও দেখতে পেলাম।

আবার আমাদের কনভয় রওয়ানা হলো। এবার সামনে ভারতীয় বাহিনীর একটা মাইন-সুইপার রয়েছে। বুঝলাম, হানাদার বাহিনী পশ্চাদপসারণ করার সময় রাস্তায় মাইন পুঁতে রেখে গেছে। আমাদের নিরাপত্তার জন্য এই মাইন-সুইপারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া পরাজিত সৈন্যরা রাস্তা ও রেললাইনের সমস্ত ব্রিজ ও কালভার্টগুলো উড়িয়ে দিয়ে গেছে। ভারতীয় সৈন্য এসব জায়গায় পন্টুন ব্রিজের ব্যবস্থা করছে।

পথে যাওয়ার সময় মুক্তিবাহিনীর ছেলেপিলে ছাড়া বেসরকারি খুব কম লোকেরই

দেখা পেলাম। বাড়িঘরগুলো শূন্য হয়ে পড়ে আছে। মাঠে গবাদিপশু পর্যন্ত নাই। সমগ্র এলাকাটাই ভৌতিক মনে হচ্ছিল। বাজারগুলো একবারে শ্মশান। যশোরের কাছাকাছি পৌঁছতেই দেখলাম সাইকেল ও মোটরসাইকেলে বহু মুক্তিযোদ্ধা জেলা-শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কয়েকটা বাস ও ট্রাক ভর্তি লোক বিজয় উল্লাস করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে। বিদেশী সাংবাদিকরা টিভি ক্যামেরায় এ সবেরই ফটো গ্রহণ করছে।

যশোর শহরে ঢোকার মুখে আবার অভ্যর্থনা। এবার ভারত-বাংলাদেশ মিত্রবাহিনীর পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা জানালেন জেনারেল দলবীর সিং। উনি শুধু বললেন, 'পাকিস্তানিরা ঠিকভাবে লড়াই করলে যশোরের পতন ঘটাতে নিদেনপক্ষে এক মাস সময়ের প্রয়োজন হতো। অথচ ওরা সারেন্ডার করলো। তাই আমরা ওদের খুলনা ও ঢাকার দিকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছি। ওদের কিছু সৈন্য এখনও ক্যান্টমেন্টের ওপর দিয়ে কামানের গোলা নিক্ষেপ করে ভয় দেখাচ্ছে মাত্র।'

সার্কিট হাউসেই আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরপরেই জনসভা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন সাহেব সার্কিট হাউসে না গিয়ে সরাসরি জেলখানায় হাজির হয়ে জেলের দরজা খুলে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। একজন ডেপুটি জেলারকে সঙ্গে নিয়ে তাজউদ্দিন সাহবে হুড়মুড় করে জেলের মধ্যে ঢুকলেন। চিৎকার করে বললেন, 'মশিউর রহমান সাহেব কোন সেলে?' ডেপুটি জেলার অনেক কষ্টে খবরটা বরলেন, 'ওনাকে তো অনেক আগেই হত্যা করা হয়েছে। শুনেছি খুব কষ্ট দিয়ে ওনাকে মারা হয়েছে।'

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তাজউদ্দিন সাহেব বললেন, 'উনি যে সেলটাতে ছিলেন সেই সেলটা আমি দেখতে চাই।'

একটু পরে আমরা সবাই সেই সেলের সামনে গিয়ে হাজির হলাম। হঠাৎ কান্নার আওয়াজে চমকে উঠলাম। সুদীর্ঘ ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার সময় যে ব্যক্তিকে সব সময়েই মনে হয়েছে আল্লাহ্ বোধহয় ওনার হৃদয়টাকে পাথর দিয়ে বানিয়েছেন– একাত্তরের ৮ই ডিসেম্বর যশোর জেলখানার ভিতরে তাঁকে প্রথম কাঁদতে দেখলাম। প্রাক্তন মন্ত্রী মশিউর রহমান ছিলেন যশোরের কৃতী সন্তান। তিনি ছিলেন শিক্ষিত ও সজ্জন। অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের চোখেও ছিলেন শ্রদ্ধাভাজন।

দুপুরে জনসভার পর সার্কিট হাউসেই মধ্যাহ্নভোজন করলাম। সুদীর্ঘ ন'মাস পর বাংলার বুকে প্রথম আহার গ্রহণ করলাম। খাওয়ার পর ভাবলাম রান্নাঘরে গিয়ে বাবুর্চিদের একটু ধন্যবাদ জানিয়ে আসি। ধন্যবাদ জানিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় দেখি একজন বয়স্ক বেয়ারা স্বগতোক্তি করছে। তাকে প্রশ্ন করলাম, 'কি কথা বলছো?' উত্তরে যা বললো তাতে হতবাক হয়ে গেলাম। বেয়ারা বললো, 'স্যার দিন তিনেক আগে, এই ডাইনিং রুমে খান-সেনাদের খানা সার্ভ করেছি। সেই থালাবাসন, সেই চামচ-গ্লাস সবই এক রয়েছে, খালি দেখলাম ওরা নেই। আপনারা মুজিবনগর থেকে এসে হাজির হয়েছেন। আল্লাহ্ আমাকে এক জীবনে আর কতো কিছু দেখাবেন?'

ফেরার পথে মনে হলো যশোর সার্কিট হাউসের বেয়ারা আমার মনের কথাই প্রতিধ্বনিত করেছে। ঠিকই তো, 'আল্লাহ্ আমাকে এক জীবনে আরও কত কিছু দেখাবেন?'

একাত্তরের ৮ই ডিসেম্বর বিকেলে আবার গাড়িতে স্বাধীন যশোর থেকে মুজিবনগরের দিকে ফিরে চললাম। মাথায় একটাই চিন্তা, কবে নাগাদ রাজধানী ঢাকা নগরী মুক্ত হবে? ঢাকায় বন্ধু-বান্ধব আর পরিচিত লোকজন কেমন আছে? সীমান্ত থেকে মাইল কয়েক আগে চা খাওয়ার জন্য গাড়ি থামানো হলো। রাস্তার পাশে ছোট একটা চায়ের দোকান। বেঞ্চিতে সবাই বসে চায়ের অর্ডার দিয়ে গল্পে মশগুল হলাম। মাথা ঘোরাতেই দেখলাম, বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ মাঠ। মাঝে-মধ্যে ক্ষেতে ধান লাগানো হয়েছে। বুঝলাম অনেক জমির মালিকই হানাদার বাহিনীর হামলায় ওপার চলে গেছে।

হঠাৎ একটা ব্যাপার আমার নজরে এলো। মাঠে গরুর সংখ্যা কম। দোকানের মালিককে কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। পান খাওয়া খয়েরি রঙের দাঁতগুলো বের করে এক গাল হাসি দিয়ে বললো, 'আমরা যখন জানতে পারলাম যে, খান সেনারা গেরামে তাঁবু গাড়লেই সব গরু খাইয়া ফ্যালায়, তখন ও বেটার ছাইল্যারা আসার আগেই আমরা তা জবাই করে এই কয় মাসে খাইয়্যা ফ্যালাইলাম। দেখেন না, এখনও গরুর গোস্ত টাকায় দুই সের করে?'

ভদ্রলোকের কথায় আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠলাম। এরপর শুনলাম খান সেনাদের পলায়ন আর ব্রিজ কালভার্ট ভেঙে দেয়ার কাহিনী। ৫ই ডিসেম্বর বিকেল পাঁচটা থেকে পরদিন সকাল দশটা পর্যন্ত হানাদার বাহিনী সমস্ত এলাকায় কারফিউ জারি করে লোকচক্ষুর অন্তরালে তাদের অবশিষ্ট সৈন্য উঠিয়ে নিয়ে যায়। যশোর রোড বরাবর সারারাত ধরে গ্রেনেড দিয়ে সংঘটিত হয় রোড ও রেলওয়ে ব্রিজ ধ্বংস করার কাজকর্ম।

সন্ধ্যা নাগাদ মুজিবনগরে পৌঁছলাম। রাতেই লিখলাম স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের জন্য চরমপত্রের স্ক্রিপ্ট। এই স্ক্রিপ্টে লিখেছিলাম যশোর সেক্টর থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদের ঢাকা ও খুলনার দিকে পলায়নের কাহিনী। এই বেতার প্রতিবেদনের দুটো লাইন তখন বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। লাইন দুটো হচ্ছে–

'হায় ইয়াহিয়া, তুমনে ইয়ে কেয়া কিয়া?
হামলোক্ তো আভি নাংগা মোছুয়া বন্‌গিয়া।'

পরদিন সকালে অফিসে গিয়ে নিউইয়র্কের বাংলাদেশ মিশন থেকে পাঠানো একটা লম্বা টেলেক্স পেলাম। টেলেক্সটা হচ্ছে ঢাকা থেকে জাতিসংঘ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মচারীদের নিরাপদ স্থানে অর্থাৎ ব্যাংককে অথবা সিঙ্গাপুরে সরিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা সংক্রান্ত সেক্রেটারি জেনারেল উথান্টের প্রদত্ত রিপোর্টের কপি। এ থেকে ঢাকার প্রকৃত অবস্থাটা জানতে পারলাম। চাঞ্চল্যকর রিপোর্টের অংশ বিশেষ হচ্ছে নিম্নরূপ :

১. জাতিসংঘের পূর্ব পাকিস্তানস্থ রিলিফ অপারেশনের সঙ্গে কার্যরত ৪৭ জন জাতিসংঘের কর্মচারীসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার ২৪০ জন কর্মচারী এক্ষণে ঢাকায় আটকে পড়ায় সেক্রেটারি জেনারেল উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং প্রকৃত অবস্থা নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের কাছে উপস্থাপিত করেছে।

২. পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি ক্রমাবনতি হওয়া সত্ত্বেও ১৮৭১ সালের নভেম্বর মাসে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, 'ইউনিপ্রো'র রিলিফ অপারেশনের কাজ

সেখানে অব্যাহত থাকবে। যেসব কর্মচারী অত্যাবশ্যকীয় নয় তাঁদের ব্যাংকক-সিঙ্গাপুরে সরিয়ে নিতে হবে। বাকি ৪৮ জন শুধু ঢাকায় কার্যরত থাকতে হবে।

৩. ৩রা ডিসেম্বর পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। এই দিন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরের ওপর ব্যাপক বিমান হামলা শুরু হয়। ফলে জাতিসংঘের (ইউনিপ্রো) ৪৬ জন রিলিফ কর্মীর পক্ষে কাজ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং ৩৬ জনকেই নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ৪৭তম কর্মচারীকেই 'ইউনিপ্রো' এবং 'ইউনিসেফ'-এর অফিস প্রাঙ্গণে রক্ষিত যন্ত্রপাতির 'কাস্টডিয়ান' হিসাবে ঢাকায় অবস্থানের নির্দেশ জারি করা হয়।

৪. ঢাকা, নয়াদিল্লি এবং ব্যাংককে অবস্থানকারী জাতিসংঘের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল নিউইয়র্কস্থ হেডকোয়ার্টার থেকে ঢাকায় আটকে পড়া কর্মচারীদের নিরাপদ স্থানে সরাবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

বেশ কিছুদিন থেকে ঢাকার সঙ্গে স্থল এবং জলপথে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। একমাত্র যোগাযোগ হচ্ছে বিমান পথে। কিন্তু সেটাও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি ভারতীয় বিমানবাহিনী ঢাকায় বিমান হামলা চালিয়েছে এবং 'ইউনিপ্রো'র দুটো বিমান অকেজো হয়ে গেছে। ঢাকা বিমানবন্দর থেকে সমস্ত এয়ার লাইনের যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে এবং বাণিজ্যিক বিমান কোম্পানিগুলো ঢাকায় চার্টার্ড বিমান নিয়ে যেতেও আপত্তি জানাচ্ছে।

৫. ৪ঠা ডিসেম্বর কানাডীয় সরকার ঢাকায় আটকে পড়া জাতিসংঘে কর্মচারীদের উদ্ধারের জন্য একটা সি-১৩০ বিমান ব্যবহারে অনুমতি দেয়। বিমানটি তখন ব্যাংককে অবস্থান করছিল। এই প্রেক্ষিতে ৫ই ডিসেম্বর উদ্ধার কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্রয়োজন দেখা দেয়। উদ্ধার ফ্লাইটের নিরাপদ যাতায়াতের জন্য ঢাকা বিমানবন্দর ও তার আশপাশের এলাকাসহ ব্যাংকক-ঢাকা এয়ার করিডর বরাবর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সাময়িক বিমান যুদ্ধ বন্ধ করাতে হবে। সেক্রেটারি জেনারেল প্রাথমিক পর্যায়ে ৫ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান সময় ১০-৩০ থেকে ১৮-৩০ পর্যন্ত বিমান যুদ্ধবিরতির জন্য উভয় পক্ষকে জ্ঞান করে।

৬. ৪ঠা ডিসেম্বর সন্ধ্যা নাগাদ পাকিস্তান সরকার তাদের সম্মতির কথা সেক্রেটারি জেনারেলকে জানিয়ে দেয়, কিন্তু ভারতের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি।

৭. ইতিমধ্যে ঢাকায় আটকে পড়া 'ইউনিপ্রো'র সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল বিভিন্ন দূতাবাস থেকে তাঁদের কর্মচারী ও পরিবারবর্গের উদ্ধারের জন্য ফোনে বহু অনুরোধ পেতে থাকেন। সেক্রেটারি জেনারেল সদয় অনুমতি লাভের পর এঁদের তালিকাভুক্ত করা হয়। এঁদের মধ্যে ৪৬ জন জাতিসংঘের, চার জন আন্তর্জাতিক রেডক্রসের, ৮৭ জন বিভিন্ন দূতাবাসের এবং ৮০ জন্য শিশু ও মহিলা। পরে এই সংখ্যা ২৪০ জনে দাঁড়ায়। এঁদের মধ্যে অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, হাংগেরি, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, জাপান, নেপাল, রুমানিয়া, সিঙ্গাপুর, রাশিয়া, ব্রিটেন, তাঞ্জানিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুগোস্লাভিয়ান নাগরিক রয়েছেন। ফলে জাতিসংঘ প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজের একটি ৭০৭ বোয়িং অতিরিক্ত বিমান চার্টার্ড করে। এই দ্বিতীয় বিমানটির ঢাকায় ৭ই ডিসেম্বর অবতরণের কথা।

৮. ৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সেক্রেটারি জেনারেলকে জানায় যে, ৬ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান সময় ১০-৩০ থেকে ১২-৩০ পর্যন্ত অনুরোধ মোতাবেক যুদ্ধবিরতি সম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংককে অবস্থানরত কানাডীয় সি-১৩০ বিমানের পাইলটকে সংবাদ জানিয়ে দেয়া হয়।

৯. ৬ই ডিসেম্বর ঢাকাস্থ 'ইউনিপ্রো' অফিস থেকে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলকে জানানো হয় যে, কানাডীয় সি-১৩০ বিমানটি যখন পূর্ব নির্ধারিত সময়ে ঢাকা থেকে মাত্র ৭০ মাইল দূরে (বিমানে মাত্র ১০ মিনিট সময়ের দূরত্ব) তখন ভারতীয় বিমান বহর আবার ঢাকা বিমানবন্দরে আক্রমণ চালিয়েছে এবং পাকিস্তানি বিমান বিধ্বংসী কামানগুলো অবিরাম গোলাবর্ষণ করে চলেছে। তখন আটকে পড়া বিদেশী যাত্রীদের প্রথম বাসটি রানওয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। বাসের যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে শিশু ও মহিলা। অবিলম্বে বাস থামিয়ে যাত্রীদের নিকটবর্তী ট্রেঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়। ট্রেঞ্চের মাত্র ২৫ মিটার দূরে একটা বোমা বিস্ফোরিত হলো। ভাগ্যক্রমে কেউই হতাহত হলো না। কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে কানাডীয় বিমানটিকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। বিমানটি ব্যাংককে ফিরে গেছে।

১০. ঢাকাস্থ 'ইউনিপ্রো'র বিমান উপদেষ্টা জানিয়েছেন যে, ৬ই ডিসেম্বর সকাল ০৯-৩০ থেকে ০৯-৪২ (পূর্ব পাকিস্তান সময়) পর্যন্ত ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রথম আক্রমণ এবং ১৩-১০-এ দ্বিতীয় দফায় আক্রমণ অনুষ্ঠিত হয়। ফলে রানওয়ের অনেকগুলো জায়গায় গর্ত হয়ে গেছে।

১১. জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের পক্ষ থেকে অবিলম্বে নিউইয়র্কে ভারতীয় স্থায়ী প্রতিনিধি দলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। সেক্রেটারি জেনারেল ৭ই ডিসেম্বর প্যান আমেরিকানের একটি ৭০৭ বোয়িং কানাডীয় সি-১৩০ দুটো বিমান ঢাকায় পাঠাবার নির্দেশ দেন। ভারত ও পাকিস্তান উভয় পক্ষ থেকেই ০৮-৩০ থেকে ১২-৩০ মি. পর্যন্ত এ ব্যাপারে যুদ্ধ বিরতির সম্মতি দিলে ৭ই ডিসেম্বর নতুনভাবে উদ্ধার কাজের পরিকল্পনা করা হয়।

১২. পরিকল্পনা মোতাবেক সি-১৩০ বিমান প্রথমে অবতরণের কথা। এরপর রানওয়ের অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট পাওয়ার পর ৭০৭ বিমান অবতরণ করবে।

১৩. ৭ই ডিসেম্বর সকাল ০৬-৪৫ মিনিটে সি-১৩০ বিমান ঢাকার উদ্দেশ্যে ব্যাংককে বিমানবন্দর ত্যাগ করে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে বিমানটি ব্যাংককে প্রত্যাবর্তন করেছে।

১৪. বিমানের কমান্ডারের রিপোর্ট হচ্ছে, বিমানটি রেঙ্গুন এলাকায় পৌঁছলে ঢাকা কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে জানানো হয় যে, ঢাকা রানওয়ে বিমান অবতরণের উপযোগী নয়। তখন বিমানটি এক ঘণ্টা ২৬ মিনিট যাবৎ রেঙ্গুনের আকাশে চক্কর দিতে থাকে। এরপর ঢাকার কন্ট্রোল থেকে জানানো হয় যে, বিমানটি ঢাকার আকাশে এসে রানওয়ে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। বিশ হাজার ফুট উপর দিয়ে বিমানটি ঢাকার আকাশে এসে দুটো ফাইটার বিমান উড্ডীয়মান অবস্থায় দেখতে পায়। একটু পরেই একটাতে আগুন ধরে যায় এবং কালো ধোঁয়া বেরুতে থাকে। এরপর কানাডীয় বিমান লক্ষ্য করে পাকিস্তানি বিমান বিধ্বংসী কামান থেকে গোলা নিক্ষেপ করা হয়। তখন কমান্ডার অবিরাম 'মে ডে' শান্তি সূচক সিগনাল প্রচার করতে থাকে। এরপর বিমানটির ব্যাংককে ফিরে যাওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না।

১৫. ঘটনার সময় কানাডীয় বিমানটি তার নির্ধারিত ব্যাংকক-ঢাকা এয়ার করিডরে ছিল। বিমানের কোন ক্ষতি হয়নি।

১৬. সেক্রেটারি জেনারেল ঢাকা থেকে উদ্ধারকার্য চালাবার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। আন্তর্জাতিক রেডক্রস এবং জাতিসংঘের প্রতিনিধিদের জরুরি ভিত্তিতে এ ব্যাপারে উদ্যোগে গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এটাই হচ্ছে একাত্তরের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে বিমানে একটা ব্যর্থ উদ্ধার কার্যের ঘটনাবহুল ইতিহাস। এ থেকেই ৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকার অবস্থা পরিষ্কারভাবে আঁচ করা যায়।

বিস্মৃতির অন্তরালে এসব ইতিহাস হারিয়ে যাওয়ার আগে লিপিবদ্ধ করে রাখা এক বিরাট নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করছি।

৪৫

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রায় তেরো বছর পরে স্মৃতিচারণ করছি। অনেক ঘটনাই বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে যাচ্ছে। ডাইরির ছেঁড়া পাতা আর কিছু রেকর্ড-পত্র থেকে লিখে যাচ্ছি সেদিনের ঘটনা। ভবিষ্যতে যদি কেউ গবেষণা করে মুক্তিযুদ্ধের আসল ইতিহাস লিখতে আগ্রহী হয়, তাহলে আমার এই লেখাগুলো সহায়ক দলিল হিসাবে পরিগণিত হবে বলে বিশ্বাস।

আমাদের উত্তরসূরিদের জানা উচিত যে কোন প্রেক্ষাপটে এবং কিভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সবকিছু একটা স্বচ্ছ ধারণা থাকা উচিত যে, এই মুক্তিযুদ্ধে কারা কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাই যতদূর সম্ভব একটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই স্মৃতিচারণ করছি। একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতি হিসাবে আমাদের অতীত ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকা অপরিহার্য।

দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে, আমরা যাঁরা বুদ্ধিজীবী হিসাবে গর্ব অনুভব করি, তাঁদের অধিকাংশ যে কোন কারণেই হোক না কেনো মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারিনি। মুজিবনগরে যারা ছিলাম, তাঁদের অনেকেই ৯ মাসকাল রুজি-রোজগারের সন্ধানে সময় অতিবাহিত করেছি। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা ঢাকায় ছিলাম, তাঁরা মার্চের ধকল কাটিয়ে ওঠার পর ৩রা ডিসেম্বর ভারতীয় বিমান হামলার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিভাবে লড়াই চলছে, সে সম্পর্কে অনেকটা অজ্ঞ ছিলাম। নিজেদের পরিবার-পরিজনদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পর দূর থেকে কেবল পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। আর আমরা যাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম যে আমরা চাকরিচ্যুত এবং আমাদের স্থান বন্দিশিবিরে।

নিয়তির পরিহাস। সেদিন কার্যোপলক্ষে ঢাকার মোহাম্মদপুরে গিয়েছিলাম। পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় শিবিরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম, ওরা জনাকয়েক হুইল চেয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হলো, রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এই তাঁদের পরিণতি। প্রতি বছর ১৬ই ডিসেম্বর আর ২৬শে মার্চ ছাড়া আমরা এদের কোন খবরই রাখি না। এখনও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ কোটার উল্লেখ করে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি : 'প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বয়ঃসীমা ৩০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।' কিন্তু একবারও কেউই চিন্তা করছি না, ২০ বছরের তরুণ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তাঁর বয়স তখন ৩২ পেরিয়ে গেছে। তাহলে বাকিদের

অবস্থাটা কী? আমরা কী প্রহসন করছি?

মোহাম্মদপুরে পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় শিবির হাতের ডান দিকে রেখে একটু সামনে যেতেই পেলাম 'জেনেভা ক্যাম্প।' হাজার হাজার আদম সন্তান এখানে দুর্বিষহ আর বীভৎস জীবনযাপন করছে। এ বছর বাংলাদেশের অকাল বর্ষায় এই ক্যাম্পে যে ভয়াবহ অবস্থা হয়েছে, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এঁরা সবাই নিজেদের পাকিস্তানি হিসাবে ঘোষণা করেছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় এঁরা পাকিস্তানি সৈন্যদের পক্ষে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু আজ? পাকিস্তান এঁদের ফেরত নিতে গড়িমসি করছে। অথচ সুদীর্ঘ বারো বছর ধরে এরা মেথরপট্টি থেকেও খারাপ অবস্থার মধ্যে এই ক্যাম্পে জীবনযাপন করছে। এরা এখন বিদেশী নাগরিক। তাই এদের আয়ের পথ প্রায় রুদ্ধ। ক্ষুধার তাড়নায় রাতের অন্ধকারে অনেক যুবতীই আদিম পেশায় লিপ্ত হয়েছে। ক্যাম্পে জন্মগ্রহণের পর যে শিশুর বয়স এখন ১১/১২ বছর, তারা তো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি। জন্মের পর জ্ঞান হতেই দেখে এক নারকীয় পরিবেশে সে বেড়ে উঠছে। এই বিশ্বে জন্মগত অধিকার থেকে সে বঞ্চিত। শিক্ষালাভ তো দূরের কথা, আজও পর্যন্ত সে একবেলাও পেট ভরে খেতে পায়নি। বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্যাম্পে অবস্থানকারী পাকিস্তানিদের সংখ্যা কয়েক লাখের মতো।

সবকিছু দেখে মনটা বিষণ্নতার মেঘে ভরে উঠেছিল। মোহাম্মদপুর থেকে ফিরে আসার সময় দেখলাম পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় শিবিরের রাস্তার উপরে জেনেভা ক্যাম্পের এক কিশোর ছোট্ট একটা পানের ডালা নিয়ে বসেছে। আর হুইল চেয়ারে এক পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা সেই পানের দোকান থেকে দুই শলা সিগারেট কিনছে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে এরা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের জন্য বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছে এবং অনেক পঙ্গু অথবা দুর্বিষহ বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে বেঁচে আছে। আর জেনেভা ক্যাম্পের লোকগুলো হানাদার বাহিনীর মদদ জোগাবার পর 'হাবিয়া দোজখের' অভিশাপ নিয়ে গত বারো বছর ধরে রাত্রি যাপন করছে। তাহলে সবই কি একটা বিরাট প্রহসন?

যাক, আবার একাত্তরের স্মৃতিচারণের অধ্যায়ে ফিরে আসি। একাত্তরের ডিসেম্বর মাসের ঘটনাপ্রবাহ এত দ্রুত অনুষ্ঠিত হয় যে, তার সঙ্গে তাল রাখাই মুশকিল ছিল। তবুও ডাইরিতে যে ঘটনাগুলো লিখে রেখেছিলাম, তাই সংক্ষিপ্তভাবে এখানে তুলে ধরছি :

৩রা ডিসেম্বর : আজ গড়ের মাঠে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম। মুজিবনগর সরকারকে স্বীকৃতি দানের কথা না বলায় আমাদের সবার মধ্যে অসন্তোষ।

সন্ধ্যায় বাসায় ফিরেই শুনলাম যে, বিকেল পৌনে ছ'টায় পাকিস্তান বিমানবাহিনী আকস্মিকভাবে ভারতের বিভিন্ন এয়ারফিল্ড আক্রমণ করেছে। ভারতের রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে। ভারতীয় বিমানবাহিনী রাতেই পাল্টা বিমান হামলা চালালো।

৪ঠা ডিসেম্বর : মধ্য রাতের পর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। কিন্তু এ বক্তৃতাতেও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দানের সম্পর্কে কোনই উল্লেখ নেই। পাকিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। বাংলাদেশের মাটিতে অনেকগুলো সেক্টরে যুদ্ধরত মুক্তিবাহিনীর পাশে ভারতীয় বাহিনী এসে হাজির হয়েছে। এখন থেকে যৌথ কমান্ডে যুদ্ধ পরিচালিত হবে। নাম মিত্রবাহিনী।

৫ই ডিসেম্বর : অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদে যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছিল, আজ সোভিয়েত রাশিয়া সে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভেটো প্রয়োগ করলো। এখন যুদ্ধবিরতির অর্থই হচ্ছে বাংলাদেশ আর স্বাধীন হবে না। পশ্চিম রণাঙ্গনে ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ভারতীয় নৌবাহিনীর হামলায় পাকিস্তানের দুটো ডেস্ট্রয়ার 'খাইবার' ও 'শাহজাহান' করাচির অদূরে ডুবে গেলো।

৬ই ডিসেম্বর : ভারতীয় পার্লমেন্টে বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করলো। ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের আম্রকাননে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের ৭ মাস ১৮ দিন পরে বহু প্রতীক্ষিত এই স্বীকৃতি। ভারতীয় বাহিনীর আগেই মুক্তিবাহিনী রংপুর জেলার লালমনিরহাটে প্রবেশ করে হানাদার মুক্ত করলো। ভারতীয় নৌ-বাহিনী খুলনা, চালনা, মঙ্গলা ও চট্টগ্রাম বন্দরে মারাত্মক আক্রমণ চালিয়েছে। মুজিবনগর সরকারের সচিবালয়, বাংলাদেশ হাইকমিশন ও 'জয় বাংলা' পত্রিকা অফিস, স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র আর বাঙালি শরণার্থী শিবিরগুলোতে তুমুল উত্তেজনা।

৭ই ডিসেম্বর : যশোর বিমানবন্দরের পতন। ভারতীয় ও মুক্তিবাহিনীর একযোগে যশোর শহরে প্রবেশ। তবে পাকিস্তানি সৈন্যদের ঢাকা এবং খুলনার দিকে পলায়নের সুযোগ দেয়া হলো। সিলেট ও মওলভী বাজার শহরের আশপাশে অবস্থানরত মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা দেখতে পেল হেলিকপ্টার থেকে দুটো জায়গায় ভারতীয় সৈন্যরা অবতরণ করছে। (স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের ওয়ার করেসপনডেন্টদের প্রেরিত সংবাদ)

৮ই ডিসেম্বর : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে বেশ কিছু বিদেশী সাংবাদিক নিয়ে আজ প্রায় সারাদিন যশোর কাটিয়ে ফিরলাম ভারতের চিফ অব আর্মি স্টাফ জেনারেল মানেক শ' আজ পূর্ব রণাঙ্গনে পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণের অনুরোধ জানালো।

রাতেই খবর পেলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কুমিল্লা শহর থেকে মুক্ত। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সৈন্যরা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এ মর্মে প্রস্তাব পাস হলো যে, পাকিস্তান ও ভারত যে এই মুহূর্তে যুদ্ধবিরতি করে স্ব স্ব এলাকায় ফিরে আসে। এই প্রস্তাব বাধ্যতামূলক নয়।

৯ই ডিসেম্বর : চাঁদপুর ও দাউদকান্দি এখন মুক্ত। ভারতীয় বাহিনী ও খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বাধীন দুই নম্বর সেক্টরের মুক্তিবাহিনী ঢাকার দিকে যাচ্ছে বলে খবর এলো।

পশ্চিম রণাঙ্গনে উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে 'রানা অব কচ্ছ' পর্যন্ত ভয়াবহ লড়াই চলছে। তুলনামূলকভাবে ভারতীয় বাহিনী বেশি এলাকা দখল করেছে। চম্ব সেক্টরে পাকিস্তানিরা ব্যাপক আক্রমণ চালিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্মিত পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ সাবমেরিন 'গাজী' বিশাখাপট্টমের অদূরে ভারতীয় নৌবাহিনীর আক্রমণে নিমজ্জিত হয়েছে। এছাড়া করাচি বন্দরের সমস্ত তৈলাধারগুলোতে এক প্রজ্বলিত শিখা। বন্দর প্রায় অকেজো হয়ে গেছে।

১০ই ডিসেম্বর : আজ জানতে পারলাম যে, কসবা-আখাউড়া থেকে দুর্বার গতিতে খালেদ মোশাররফ তার বাহিনী নিয়ে ঢাকার দাউদকান্দি পর্যন্ত এসে হাজির হওয়া

সত্ত্বেও, মিত্র বাহিনীর কর্তৃপক্ষ তাঁকে বাহিনীর পথ পরিবর্তন করে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। অথচ খালেদ মোশাররফের দুই নম্বর সেক্টরের ক্র্যাক্ প্লাটুনের প্রধান ক্যাপ্টেন হায়দার তাঁর দলবল নিয়ে ঢাকার নিকটে মুগদাপাড়া, কমলাপুর ও ডেমরার আশপাশে পরবর্তী নির্দেশের জন্য 'পজিশন' নিয়ে বসে আছে। এরা ত্রিমোহনী দিয়ে এসেছিল। একটা বিব্রতকর অবস্থায় খালেদ মোশাররফ চট্টগ্রামের দিকে রওয়ানা হলো। কিন্তু ক্যাপ্টেন হায়দার তাঁর গেরিলা বাহিনী নিয়ে ঢাকার আশপাশে অবস্থান করতে লাগলো।

আরও জানতে পারলাম যে, মিত্রবাহিনীর সব রুম সেক্টর থেকে ঢাকার দিকে অগ্রসরমান তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানকে তাঁর 'জেড ফোর্সকে নিয়ে সিলেট যাওয়ার জন্য এবং সিলেট এলাকা থেকে তৎকালীন মেজর শফিউল্লাকে তাঁর 'এস' ফোর্স নিয়ে রাজধানী অভিমুখে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ব্যাপারগুলো একটু রহস্যজনক মনে হচ্ছে।

বিকাল নাগাদ খবর পেলাম, লাকসামে অবস্থানকারী পাকিস্তানি কমান্ডিং চার্টার্ড বিমান ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করতে পারলো না।

আমাদের সবার মনে বিরাট প্রশ্ন। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হলে আমাদের প্রাণপ্রিয় ঢাকা নগরী তো বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। আর পরিচিত কত লোককে যে আত্মাহুতি দিতে হবে তা কে জানে।

১১ই ডিসেম্বর : আজকের গরম খবর হচ্ছে, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উথান্টের কাছে প্রেরিত এক তারবার্তায় আত্মপক্ষ সমর্পণের কথা বলেছে। জেনারেল ফরমান তাঁর প্রেরিত বার্তায় পাকিস্তানি সমস্ত সৈন্য ও বেসামরিক অবাঙালি নাগরিকদের নিরাপত্তার অনুরোধ জানিয়েছে।

রাতের খবর হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতিসংঘে উথান্টের কাছে একটা পাল্টা তারবার্তা পাঠিয়েছে। ইয়াহিয়ার বার্তা হচ্ছে জেনারেল ফরমানের তারবার্তা যেন অবজ্ঞা করা হয়। এছাড়া ইয়াহিয়া খান জাতিসংঘে অবস্থানরত পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোকেও প্রতিবাদ জানাবার নির্দেশ দিয়েছে।

এদিকে জেনারেল মানেক শ' আর এক বার্তা পাঠিয়েছেন রাও ফরমানের কাছে। মানেক শ' বার্তায় বলেছেন যে, পালিয়ে যাওয়ার যে কোন প্রচেষ্টার পরিণাম হবে খুবই ভয়াবহ।

রাতের খবর হচ্ছে, হিলি এবং খাদিমনগরে ভয়াবহ যুদ্ধের পর বগুড়া ও ময়মনসিংহ এখন মুক্ত। এ দু'জায়গাতেই বেশ কিছু ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়েছে। এছাড়া কুষ্টিয়া ও নোয়াখালীতে এখন স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে।

১২ই ডিসেম্বর : আজ ভারতীয় বাহিনী প্যারাস্যুটে ঢাকার উপকণ্ঠে বেশ কিছুসংখ্যক কমান্ডো অবতরণ করিয়েছে। এদিকে নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, কালিয়াকৈর, নরসিংদী প্রভৃতি এলাকা থেকে হাজার হাজার মুক্তিবাহিনী ঢাকার দিকে রওয়ানা হয়েছে। রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, সিরাজগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ এখন মুক্ত।

সপ্তম নৌবহর ভারত মহাসাগরের দিকে রওয়ানা রয়েছে বলে খবর এসেছে। তবে দিল্লি থেকে আমাদের জানানো হয়েছে যে, রুশ সাবমেরিন বহর মার্কিন নৌবহরের পিছনেই রয়েছে।

১৩ই ডিসেম্বর : জেনারেল মানেক শ' আজ মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর কাছে মাইক্রো ওয়েভে তৃতীয় বার্তা পাঠিয়েছেন। বার্তায় বলা হয়েছে যে, মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা ঢাকা ঘেরাও করে ফেলেছে। আত্মসমর্পণ করা বাঞ্ছনীয় হবে। বৃথা আর রক্তপাত করে লাভ নেই। তবে আত্মসমর্পণ করা সৈন্যদের জেনেভা কনভেশন অনুযায়ী ব্যবহার করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ আমাদের তিনজনকে আজ মুজিবনগর সরকারের সচিবালয়ে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সংসদ সদস্য মান্নান সাহেব, তথ্য সচিব আনোয়ারুল হক এবং আমি গিয়েছিলাম। প্রধানমন্ত্রী একটা ব্যাপারে জোর প্রোপাগাণ্ডা করতে বললেন, তা হচ্ছে, জনসাধারণ যেন নিজের হাতে আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বভার গ্রহণ না করে। সমস্ত অপরাধীকেই বিচার করে শাস্তি দেয়া হবে।

১৪ই ডিসেম্বর : ভারতীয় দেশরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রাম আজ পার্লামেন্টে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে খতিয়ান দিয়েছেন। ভারতীয় সৈন্য নিহত : ১,৯৭৮, নিখোঁজ : ১,৬৬২ এবং আহত : ৫,০২৫। বিমানবাহিনীর ৫১ জন পাইলট হয় নিহত না হয় নিখোঁজ হয়েছে। ভারতীয় জাহাজ আই এন এস 'খুক্‌রী' নিমজ্জিত হওয়ায় আটজন অফিসারসহ ১৭৩ জন নৌ-সেনা নিহত অথবা নিখোঁজ হয়েছে। পাকিস্তানের পক্ষে ক্ষয়ক্ষতি আরও ব্যাপক ও ভয়াবহ।

সন্ধ্যার খবর হচ্ছে, ঢাকায় গভর্নর আব্দুল মালেকসহ উচ্চপদস্থ বেসামরিক কর্মচারীরা পদত্যাগ করে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের নিকট নিরাপত্তা দাবি করেছেন।

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে বসে রাতেই খবর পেলাম, ৯৩, পাক ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার কাদের ও তার সহকর্মী দু'জন লে. কর্নেল একজন মেজরসহ ঢাকার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

১৫ই ডিসেম্বর : হানাদার বাহিনীর প্রধান লে. জেনারেল এ এ কে নিয়াজী আত্মসমর্পণের জন্য জেনারেল মানেক শ'-এর কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন। জবাবে ভারতীয় আর্মি চিফ পরদিন ১৬ই ডিসেম্বর সকাল ৯টায় ঢাকায় পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণের সময় ধার্য করেছেন। আজ বিকাল পাঁচটা থেকে ভারতীয় বিমানবাহিনীর হামলা বন্দের নির্দেশ দেয়া হলো।

প্রতি ঘণ্টায় আমরা ঢাকার খবর পেতে শুরু করলাম।

১৬ই ডিসেম্বর : সকালে খবর এলো যে, আত্মসমর্পণের সময় পিছিয়ে বেলা সাড়ে চারটা করা হয়েছে। আর এক খবরে বলা হয়েছে যে, দুই নম্বর সেক্টরের ক্র্যাক প্লাটুনের প্রধান ক্যাপ্টেন হায়দার তাঁর দলবলসহ ঢাকায় ঢুকে বেতার ভবন দখল করেছে। কিন্তু এর আগেই কাদের সিদ্দিকী মীরপুর ব্রিজ দিয়ে ঢাকায় ঢুকে পড়েছে। বেলা দশটা নাগাদ দৌড়ালাম মুজিবনগর সরকারের সচিবালয়ে। প্রথমেই দেখা হলো দিনাজপুরের সন্তান মীর্জা আবুলের সঙ্গে। ইনি বহুদিন পাকিস্তান বিমানবাহিনীর দক্ষ পাইলট ছিলেন। এঁর কাছ থেকে শুনলাম যে, বিমানবন্দরে একটা হেলিকপ্টার তৈরি হয়ে আছে মুজিবনগর সরকারের জনৈক উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাঁকে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে হবে। কিন্তু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সেনাধ্যক্ষ তৎকালীন (অবসরপ্রাপ্ত) কর্নেল আতাউল গণি ওসমানী অজ্ঞাত কারণে (সম্ভবত অনিশ্চিত অবস্থার জন্য) এই অনুষ্ঠানে যোগদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন

করায় বিমানবাহিনী প্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকারকে ঢাকায় যাওয়ার জন্য তাজউদ্দিন সাহেব নির্দেশ দিয়েছেন। ব্যাপারটা আজও পর্যন্ত রহস্যের অন্তরালেই রয়ে গেলো। খন্দকার সাহেব এক বস্ত্রে হেলিকপ্টারে ঢাকায় রওয়ানা হলেন।

বিকাল ৪-৩১ মিনিটে আত্মসমর্পণের এই ঐতিহাসিক দলিল স্বাক্ষরিত হলো। পাকিস্তানের পক্ষে পরাজিত লে. জেনারেল নিয়াজী এবং মিত্র বাহিনীর পক্ষে ভারতীয় লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা দস্তখত করলেন। উপমহাদেশের মানচিত্রে স্থান করে নিলো একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র– বাংলাদেশ।

আজ ১৬ই ডিসেম্বর সারারাত আমরা না ঘুমিয়ে হৈচৈ করে কাটালাম আর ঢাকায় ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। যখন আমার বয়স ১৮ বছর, তখন 'হাতমে বিড়ি মুমে পান, লড়কে লেংগে পাকিস্তান' শ্লোগান দিয়ে যে দেশটা বানিয়েছিলাম, রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাঝ দিয়ে সে দেশের একাংশ নিয়ে গড়লাম একটি স্বাধীন বাংলাদেশ।

৪৬

মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ের ঘটনাবলীর কথা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করার আগে বিশেষ করে মার্কিনি সাংবাদিকদের বক্তব্য উল্লেখের প্রয়োজন অনুভব করছি। 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার প্রখ্যাত সাংবাদিক সিডনি এইচ সেনবার্গ ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে 'পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত' এই শিরোনামায় একটি তথ্যমূলক নিবন্ধ প্রকাশ করেন।

মি. সেনবার্গ একাত্তরে বেশ কয়েকবার যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করা ছাড়াও ভারতে অবস্থিত বাঙালি শরণার্থীদের শিবির পরিদর্শন করেন। ২৫শে মার্চ রাতে তিনি ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অবস্থান করছিলেন। সত্তরের ঘূর্ণিঝড়ের পর তিনি রিপোর্ট সংগ্রহের জন্য সর্বপ্রথম তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চল সফর করেছিলেন।

এক্ষণে সংক্ষেপে মি. সেনবার্গের লেখা, 'পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত' নিবন্ধ থেকে উল্লেখ করছি :

ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ক্ষমতার ভারসাম্য এবং নির্বাচনী রায়– এসব কিছুর সমন্বয়েই পূর্ব পাকিস্তানের সংকট। বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টায় ২৫শে মার্চের রাত থেকে পাকিস্তানি সৈন্যরা আকস্মিকভাবে হামলা চালানোর পর থেকে স্বাভাবিক যুক্তি-তর্ক ও নৈতিকতাবোধের পরিসমাপ্তি ঘটে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এই হামলা পরিচালনার সময় যে নৃশংসতা ও বর্বরতার পরিচয় দিয়েছে তা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, সামরিক জান্তা ছলে-বলে-কৌশলে এবং যে কোন মূল্যে পূর্ব পাকিস্তানকে পদানত রাখার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। এরই মোকাবেলায় পূর্ব পাকিস্তানে গেরিলা যুদ্ধের সূচনা হয় এবং তারা পাল্টা আঘাত হানায় ব্যাপক গোলযোগ ও হাঙ্গামা দেখা দেয়। বেসামরিক জনগোষ্ঠীর ওপর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী প্রতিটি হামলায় জন্ম হয় নতুন নতুন বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা। এরপর মনে হয়, প্রতিশোধের উদগ্র বাসনায় বাঙালিরা পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য একটা দীর্ঘস্থায়ী মুক্তিযুদ্ধের জন্য মনেপ্রাণে প্রস্তুত হয়েছে। পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে স্বায়ত্তশাসন প্রদান বা এ ধরনের অন্য কোন আলোচনা এখন অর্থহীন।

অধিকাংশ পশ্চিমা কূটনীতিবিদের মতে, পাকিস্তানের কারাগারে আটক নেতা শেখ মুজিবুর রহমান একটা সমাধান দিতে সক্ষম। কিন্তু পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান এর মধ্যে ঘোষণা করেছেন যে, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গোপনে অধুনা বেআইনি ঘোষিত আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের বিচার হবে। অপরাধ প্রমাণিত হলে মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। অবশ্য এই নিবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত এই মামলার রায় ঘোষিত হয়নি।

এ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের ৭১ মিলিয়ন জনগোষ্ঠীর সাত মিলিয়নের বেশি শরণার্থী হিসাবে সীমান্ত অতিক্রম করেছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বর হামলার মুখে এদের পক্ষে আর কোন গত্যন্তর ছিল না। এ রকম পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে হত্যা ও দুর্ভিক্ষের ভয়ে সীমান্ত অতিক্রমকারী শরণার্থীদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। এই বাঙালি শরণার্থীরা ভারতের জন্য অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিরাট বোঝাস্বরূপ ছাড়াও ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজনৈতিক অবস্থার জন্য বিপদের কারণ। কেননা, গত কয়েক বছর ধরেই ভারতের পূর্বাঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজমান এবং সেজন্য দিল্লি সরকার উদ্বিগ্ন।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, পশ্চিমা দেশগুলো বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই উপমহাদেশের ঘটনাবলীর প্রতি সঠিক ও সুষ্ঠু গুরুত্ব আরোপে ব্যর্থ হয়েছে। ওয়াশিংটন কর্তৃপক্ষ একটা রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কূটনীতিবিদ ও পর্যবেক্ষকদের মতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া আর কোন পথই খোলা নেই। মার্কিনি সরকার পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য অব্যাহত রেখে এ মর্মে যুক্তি দেখাচ্ছে যে, এতে করে সমস্যার সমাধানের জন্য মার্কিনিরা পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু এ পর্যন্ত এর কোন প্রমাণই পাওয়া যাচ্ছে না।

পূর্ব পাকিস্তানে গোলযোগের প্রাথমিক পর্যায়ে বাঙালিরা সামরিক শাসনের অবসান এবং স্বাধীকার আদায়ের লক্ষ্যে পাকিস্তানের পতাকা এবং পাকিস্তানের জন্মদাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ফটো পোড়ানো ছাড়াও পাকিস্তানি আর্মি ইউনিটগুলোর প্রতি বিদ্রূপ করেছে। শেষ পর্যন্ত বাঙালিরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে 'বয়কট' করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্য এসব হচ্ছে দারুণ অপমানকর। জনৈক মার্কিনি কূটনীতিবিদের মতে, 'জাতীয় পতাকা, জিন্না এবং সেনাবাহিনীর গৌরব– এসব কিছুই হচ্ছে তাদের (পশ্চিম পাকিস্তানিদের) জন্য ধর্মীয় ব্যাপারের মতো। তারা অপমান সহ্য করতে পারে না। এর ফলে তাদের মধ্যে প্রতিহিংসার জন্ম হয়েছে।"

অবস্থার প্রেক্ষিতে মনে হয় যে, বাঙালি জনসাধারণের ওপর সেনাবাহনীকে লেলিয়ে দেয়ার পিছনে পাকিস্তান সরকার কর্তৃপক্ষ ধর্মান্ধতার বশবর্তী হয়ে সমস্ত রকম যুক্তি বিসর্জন দিয়েছিল। তাই একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, পাকিস্তান হচ্ছে একটা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র এবং এখানে প্রায়ই জনমতকে অবজ্ঞা করা হয়। ২৫শে মার্চের রাতে যখন পাকিস্তানি সৈন্যরা প্রথমবারের মতো হামলা চালালো, মনে মনে তারা এসব উপভোগ করছিল। নিরস্ত্র বাঙালিদের হত্যার পর পাঞ্জাবি পেট্রোল পার্টির সদস্যরা দু'হাত উপরে তুলে ধ্বনি দিয়েছে।

প্রায় এক হাজার মাইল দূরে অবস্থিত পাকিস্তানের দুটি অংশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রদায়গত ঘৃণাই এই সংঘর্ষের মূল কারণ। এই দুই জনগোষ্ঠীর ভাষা, খাদ্য ও

সংস্কৃতি সব কিছুই পৃথক ও পরস্পর বিরোধী। পাঞ্জাবিরা যেখানে সেনাবাহিনীর চাকরি এবং ক্ষমতাসীন সরকারের সঙ্গে থাকতে পছন্দ করে, সেখানে বাঙালিরা সাহিত্য ও রাজনীতি চর্চা ভালবাসে। শ্যামবর্ণ ও লম্বা গড়নের পাঞ্জাবিরা যেখানে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগমন করেছে বলে দাবি করে, সেখানে বাদামি ও মাঝারি গড়নের বাঙালিরা হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। কেবলমাত্র দুই জনগোষ্ঠীর ধর্ম এক।

গত দুই যুগ ধরেই পশ্চিম পাকিস্তান পরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করছে। উন্নয়ন তহবিল, শিল্প স্থাপন, নির্মাণ কাজ, বৈদেশিক সাহায্য, আমদানি এবং দেশ রক্ষার বিরাট সুযোগ-সুবিধা পশ্চিম পাকিস্তান লাভ করছে। অথচ লোকসংখ্যার দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ৭১ মিলিয়ন আর পশ্চিম পাকিস্তানে ৬১ মিলিয়ন। বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের নেতৃবৃন্দ এ মর্মে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন যে, তুলনামূলকভাবে ব্রিটিশদের চেয়েও পশ্চিম পাকিস্তানিদের ঔপনিবেশমূলক শোষণের মাত্রা অনেক বেশি।

পরবর্তীকালে দুটো ঘটনা উভয় পক্ষের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি করে। প্রথমটা হচ্ছে, সত্তরের নভেম্বরে পূর্ব বাংলায় ঘূর্ণিঝড়। বাঙালিরা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করে যে, ফেডারেল সরকার রিলিফ দেয়ার ব্যাপারে দারুণভাবে গড়িমসি করছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানিরা সাহায্য প্রদান তো দূরের কথা, সামান্য সমবেদনাটুকু পর্যন্ত প্রকাশ করেনি। এর মাত্র এক মাস পরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ আরও অতিরিক্ত ভোট লাভ করে।

দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে সাধারণ নির্বাচন। এটাই হচ্ছে পাকিস্তানের ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন। এর জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে কৃতিত্ব দেয়া উচিত। একটা রক্তাক্ত গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে দশ বছর স্থায়ী আইয়ুব খানের শাসনের অবসান ঘটলে ১৯৬৯ সালে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা লাভের সময় যেসব ওয়াদা করেছিল, তার মধ্যে নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচনের ওয়াদা ছিল অন্যতম।

অনেক কূটনীতিবিদের মতে, সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান পর্যন্ত ইয়াহিয়া খান নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর সরকারের বড় বড় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সামরিক জান্তার জনাকয়েক জেনারেলের মতামত সর্বোচ্চ বলে বিবেচিত হলো।

এঁরা সবাই হচ্ছেন কট্টরপন্থী। এঁরা ভেবেছিলেন যে, সাধারণ নির্বাচনের পরেও পরিস্থিতি তাঁদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তাই তাঁরা সাধারণ নির্বাচনের পক্ষে মত দিয়েছিলেন। তাঁরা এ ধরনের একটা নির্বাচনী ফলাফল ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করতে পারেনি। তাঁদের ধারণা ছিল যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাধিক্য আসন ছাড়াও পূর্ব পাকিস্তান থেকে বেশ কিছু সংখ্যক আসন ধর্মীয় দক্ষিণপন্থী দলগুলো দখল করতে পারবে। এতে করে দক্ষিণপন্থীরাই পাকিস্তানের জাতীয় সরকার গঠন করবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে অবস্থাটা জয়যুক্ত হয়ে জাতীয় পরিষদে সংখ্যাধিক্য অর্জন করলো।

ভুট্টোর পিপলস পার্টিসহ পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনৈতিক দলগুলো আওয়ামী লীগের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে কিছুটা আপোষমূলক হবার দাবি জানালো। কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদী ছাত্রদের ক্রমাগত চাপের ফলে শেখ মুজিবের পক্ষে কোন আপোষ সম্ভব হলো না। পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘোষণা করলেন যে, সেক্ষেত্রে

তাঁদের পক্ষে ৩রা মার্চের আসন্ন জাতীয় পরিষদের বৈঠকে যোগদান সম্ভব হবে না। এই বৈঠকে পাকিস্তানের জন্য একটা শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কথা।

এদিকে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গোলযোগ দেখা দিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গুলিবর্ষণ করে বেশ কিছু বাঙালি হত্যা করলো। শেখ মুজিব অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান করে এর জবাব দিলো। এই আন্দোলনের মাধ্যমেই একরকমভাবে বলতে গেলে আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হলো। এর মোকাবেলায় পাকিস্তান সরকার প্রতি রাতেই বিমানে করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য আনতে শুরু করলো। ১৫ই মার্চ ইয়াহিয়া খান নিজেই ঢাকায় এলেন শেখের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে। বাঙালিদের প্রায় সবাই এবং অনেক বিদেশী পর্যবেক্ষক পর্যন্ত বুঝতে পারলো যে, এই আলোচনা হচ্ছে কালক্ষেপণের জন্য একটা উছিলা মাত্র। বিমান পথে আরো সৈন্য আমদানির জন্য এই সময়ের প্রয়োজন। পূর্ণ শক্তি সঞ্চয় হওয়া মাত্রই আঘাত হানা হবে। (আক্রমণের সঠিক সময় গোপন ছিল। তবে একটা কথা পরিষ্কার যে, এই আঘাত হানার সময় পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছিল)।

যাই হোক, মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক চলাকালীন ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ট্যাংক, রকেট এবং অন্যান্য ভারি সমরাস্ত্র নিয়ে নিরস্ত্র জনতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কোন কোন জায়গায় এরা বস্তির পর বস্তি ধূলিসাৎ করলো এবং গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত করলো। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পাকিস্তানি সৈন্যরা দেশের সর্বত্র হামলা চালালো।

এই নিবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত বিদেশী কূটনীতিবিদদের মতে এরা প্রায় ২,০০,০০০ বাঙালিকে হত্যা করেছে। এতসব করেও দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলো না। পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে শুরু হলো মুক্তিবাহিনীর পাল্টা হামলা। পাকিস্তানি সৈন্য হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলো। জনসাধারণের প্রায় সবাই এই সৈন্যদের বিরুদ্ধে (অবাঙালি বিহারি ও কিছু সংখ্যক দক্ষিণপন্থী ছাড়া) মনোভাব প্রকাশ করলো।

এখন অখণ্ড পাকিস্তানের আর প্রশ্ন ওঠে না। সামরিক জান্তা শক্তির দাপট দেখিয়ে কিছুদিনের জন্য কলোনি হিসাবে পূর্বপাকিস্তানকে পদানত রাখতে পারে মাত্র। তবু পাকিস্তানি জেনারেলদের মনে এ বোধোদয় হলো না যে, পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক ব্যবস্থাটা ব্যর্থ হয়েছে। উপরন্তু বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে ঘৃণা ও বিদ্বেষের ব্যাপক বিস্তার হলো। বাংলা ভাষাকে দমানো হলো। রাস্তাঘাটের বাংলা নামের পরিবর্তন হলো। দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে বাঙালিদের সরানো হলো। বাঙালিদের যাঁরা গ্রামাঞ্চলে কিংবা ভারতে চলে গেছে, তাদের বাড়িঘর ও দোকানপাট অবাঙালি ও দালালদের দেয়া হলো।

৪৭

বাংলাদেশের পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া ভারতের জন্য বেশ ভয়াবহ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী 'গরিবি হটাও' স্লোগান দিয়ে পুনরায় ক্ষমতায় নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশের লাখ লাখ শরণার্থীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করার জন্য ভারতকে তা উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থ বরাদ্দ করতে হলো। ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকারত্ব, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এসব সমস্যার আপাতত সমাধানের কোন প্রচেষ্টা হলো না।

এরই পাশাপাশি ভারতের বেশ কিছু সংখ্যক রাজনীতিবিদ ও জনমত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের মতো চরম ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করার জন্য চাপ অব্যাহত রাখলো। এই ব্যবস্থার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে নির্বাচিত বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতি অন্যতম। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর উপদেষ্টাদের মত হচ্ছে, এ ধরনের স্বীকৃতির মোকাবেলায় পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে অথচ মিসেস গান্ধী এই যুদ্ধকে পরিহার করতে চাচ্ছে।

যদিও ভারত সীমান্ত বরাবর আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তবুও অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, যুদ্ধ ঘোষণা কিংবা আক্রমণ এ ধরনের কোন পদক্ষেপই ভারত প্রথমে গ্রহণ করবে না। পাক-ভারত তৃতীয় যুদ্ধের দায়িত্ব ভারত গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দান, ট্রেনিং প্রদান ও অন্যান্য সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। এতে অবশ্য যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আশংকাকে এড়ানো সম্ভব নয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ইতিহম্যে হুশিয়ারি দিয়েছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি গেরিলাদের ঘাঁটি স্থাপনে ভারত সহায়তা করলে, 'বিশ্বাসী জেনে রাখুক যে, আমি একটা সর্বাত্মকে যুদ্ধ ঘোষণা করবো।' উপরন্তু ভারতের সহায়তায় বাঙালি শক্তিশালী হওয়ার অর্থই হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে গোলযোগের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়া, আর এর ফল হিসাবে ভারতের মাটিতে বাঙালি শরণার্থীদের আগমন আরও বৃদ্ধি পাবে।

একটা মূল ব্যাপারে ভারত সব সময়েই সতর্ক রয়েছে এবং এই ব্যাপারটা হচ্ছে পাকিস্তানের পক্ষে। সেটা হচ্ছে, যুদ্ধ বাধলে সমগ্র বিশ্ব এই সংঘর্ষকে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে অন্যান্য বারের মতো আর একটা সংকট হিসাবে গ্রহণ করবে। এতে করে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল ইস্যুটা ধামাচাপা পড়বে। ভারতের ধারণা হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যে যুদ্ধের হুংকার দিচ্ছেন, তা মূল ইস্যুটা এড়াবার জন্য এবং পূর্ব পাকিস্তানে গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে তার প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ।

এই প্রেক্ষাপটে ভারতীয় বিশারদদের মতে পাকিস্তান এখন অনিবার্যভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। মুক্তিযোদ্ধাদের পাল্টা আক্রমণের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে পরাজিত হওয়াটা পাকিস্তানি জেনারেলদের জন্য সবচেয়ে বেশি অপমানজনক এবং ইতিহাসের সবচেয়ে কালিমাময় অধ্যায়। উপরন্তু এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানেরও বিভিন্ন অংশে বেলুচি ও পাঠানদের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন দ্রুত গণঅভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হতে পারে। বাঙালিদের মতো এরাও পাঞ্জাবি আধিপত্যে ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছে।

কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ করে পরাজিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে হারালে অন্তত পাকিস্তানি জেনারেলদের মুখ রক্ষা হবে এবং সেক্ষেত্রে ভারতবিরোধী ঘৃণা প্রচারের মাধ্যমে পাকিস্তানের পশ্চিম অঞ্চলকে একত্রে রাখা সম্ভব হবে। পাক-ভারত যুদ্ধ হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া ও কম্যুনিস্ট চীনের মতো বৃহৎ শক্তিগুলোর পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা মুশকিল হবে। মোটামুটিভাবে চীন হচ্ছে পাকিস্তানের পক্ষে এবং ভারত হচ্ছে সোভিয়েত রাশিয়ার সমর্থনপুষ্ট। ওয়াশিংটন কর্তৃপক্ষের মতে বিপদ দেখা দিলে যাতে মধ্যস্থতা করা যায় এবং ইসলামাবাদের ওপর প্রভাব বিস্তার সম্ভব সেজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গতানুগতিক নীতি গ্রহণ করেনি। ভারতের মাটিতে অবস্থানকারী বাঙালি শরণার্থীদের ভরণ-পোষণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র বিপুল পরিমাণে সাহায্য দিচ্ছে। আর পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য প্রদান যুক্তরাষ্ট্র অব্যাহত রেখেছে।

১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের পর উভয় দেশের সম্পর্ক বেশ তিক্ত এবং গত কয়েক বছর ধরে পরাশক্তিগুলোর মধ্যে চীন হচ্ছে পাকিস্তানের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতম রাষ্ট্র। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাকিস্তানকে চীন সবচেয়ে বেশি সমরাস্ত্র সরবরাহ করেছে। পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে চীন সৈন্য দিয়ে পাকিস্তানকে সাহায্য করবে কিনা তা সবারই অজানা। কিন্তু ইসলামাবাদে অবস্থানকারী কূটনীতিবিদদের মতে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি গেরিলাদের কার্যকলাপ শুরু হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানে চীনা সাহায্যের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। দুটো দেশের মধ্যে এ মর্মে চুক্তি হয়েছে যে, চীনারা নতুনভাবে এক ডিভিশন পাকিস্তানি সৈন্যর জন্য সমস্ত রকমের সমরাস্ত্র দেবে। এই নতুন ডিভিশন পূর্বাঞ্চলে লড়াইয়ের জন্য পাঠানো হবে। (এসব কূটনীতিবিদের মতে চীন কিন্তু প্রকাশ্যভাবে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার সংগ্রামকে নিন্দাবাদ করেনি)।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সম্প্রতি যে বলেছেন, যুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তান 'একা থাকবে না' এই বক্তব্যে তিনি পিকিংয়ের সক্রিয় সাহায্যের ইংগিত দিয়েছেন। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও সঙ্গে সঙ্গে এর জবাবে পার্লামেন্টে বলেছেন যে, এরকম পরিস্থিতিতে ভারতও একা থাকবে না। এর মাধ্যমে তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার কথা বলেছেন বলে বোঝা যায়। যদিও সমগ্র ষাট দশক ধরে সোভিয়েত রাশিয়া ক্রমাগতভাবে ভারতকে সামরিক সাহায্য দিয়েছে এবং এখনও দিচ্ছে, তবু রাশিয়া কিন্তু পাকিস্তানেও সমরাস্ত্র প্রদান অব্যাহত রেখেছে। অবশ্য গত দু'বছর ধরে ভারতের আপত্তির জন্য এই সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। মস্কো অবস্থার প্রেক্ষিতে পাকিস্তানকে পুরোপুরিভাবে চীনের হাতে ছেড়ে দিতে পারে না। এই জন্যে রাশিয়া সাম্প্রতিক সংকটের মোকাবেলায় ইসলামাবাদে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান বন্ধ করেনি। কিন্তু এর পরিমাণ খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়। রুশ-ভারত ২০ বছর মেয়াদি বন্ধুত্ব চুক্তি এটাই প্রমাণ করে যে, রাশিয়া তার মিত্র হিসাবে ভারতকেই গ্রহণ করেছে।

এরকম একটা সংকটজনক পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন মহলে এই নীতি সমালোচনর সম্মুখীন হয়েছে। ভারত মনে করে যে, মার্কিনি নীতি হচ্ছে ভারতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং ভারত-মার্কিনি সম্পর্ক এখন খুবই শীতল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, ওয়াশিংটনের সিদ্ধান্ত হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীকে পাক-ভারত সংকট থেকে পৃথকভাবে দেখা যায় না এবং পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য প্রদান বন্ধ কিংবা পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর হামলার প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করার উল্টা ফল হতে পারে। এছাড়া পাকিস্তানে যে বিপুল মার্কিনি অর্থ বিনিয়োগ রয়েছে, সেখান থেকে হাত গোটানো যায় না। এমনকি অতীতে যে বিপুল পরিমাণে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য পাকিস্তানে দেয়া হয়েছে, তা যে ইপ্সিত ফল লাভে ব্যর্থ হয়েছে তাও স্বীকার করা যায় না। এই সাহায্য কেবলমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানেই ব্যয়িত হয়েছে এবং এতেই সৃষ্টি হয়েছে বাঙালিদের মনে মারাত্মক তিক্ততা। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত পাক-মার্কিন সম্পর্কের দরুন মার্কিনিরা পাকিস্তানে সুদক্ষ সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে এবং পাকিস্তান কম্যুনিস্ট বিরোধী সামরিক জোট সেন্টো ও সিয়াটোর সদস্য হয়েছে। এই সময় পাকিস্তান যখন রাশিয়া ও চীনের জন্য সমস্যার মোকাবেলা করছিল তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ১.১৭ বিলিয়ন ডলার পাকিস্তানকে কেবলমাত্র সামরিক সাহায্য হিসাবে প্রদান করেছে। এর চেয়েও বেশি পরিমাণ টাকা অর্থনৈতিক সাহায্য হিসেবে দেয়া হয়েছে।

১৯৬৫ সালের পর নাটকীয়ভাবে সম্পর্কের কিছুটা অবনতি ঘটে। এর পিছনে

নানা কারণ রয়েছে। ১৯৬২ সালের চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের পর পাকিস্তান ও চীনের মধ্যে উষ্ণ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। ১৯৬৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের কাছে সমরাস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। তুলনামূলকভাবে পাকিস্তান এই সমরাস্ত্র সরবরাহের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ওপর বেশি নির্ভরশীল ছিল। চীন ও রাশিয়া উভয়ে এই শূন্যতা পূরণে আগ্রহী হলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৭ সালে আংশিকভাবে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। এই প্রেক্ষাপটে সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা বাঞ্ছনীয় হবে।

২৫শে মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক হামলার পর স্টেট ডিপার্টমেন্ট এ মর্মে ঘোষণা করে যে, পাকিস্তানে সমরাস্ত্র সরবরাহের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে এবং পাইপলাইনে কোন মিলিটারি সাপ্লাই নেই। কিন্তু জুন মাসের শেষ ভাগে সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যে জানা গেলো যে, মার্কিন বন্দরগুলো থেকে পাকিস্তানি জাহাজে সমরাস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে। মার্কিনি কংগ্রেস এই সরবরাহ বন্ধে ব্যর্থ হলো। ওয়াশিংটনের কর্তৃপক্ষীয় মহল থেকে বলা হলো যে, প্রেসিডেন্ট নিক্সন ব্যক্তিগতভাবে পাকিস্তানে সমরাস্ত্র সরবরাহের নীতি গ্রহণ করেছেন।

ইতিমধ্যে পাকিস্তানে মার্কিনি অর্থনৈতিক সাহায্য সাময়িকভাবে স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। (স্টেট ডিপার্টমেন্টের ভাষায় 'পরীক্ষাধীন' রয়েছে) স্টেট ডিপার্টমেন্ট অবশ্য বলেছে যে, অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করে পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করার কোন ইচ্ছা নেই। পর্যবেক্ষকদের মতে যুক্তরাষ্ট্র এখন পাকিস্তানে অর্থনৈতিক সাহায্য অব্যাহত রাখতে চায় না। জুন মাসে সরেজমিনে তদন্তের পর বিশ্বব্যাংকের একটা বিশেষ রিপোর্টে বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানে এমন ভয়াবহ সামরিক হামলা হয়েছে এবং ধ্বংসের ব্যাপকতা এত বেশি যে, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সাহায্য 'খুব কমই কাজে আসবে' তাই আগামী বছর এবং আরও কিছুদিনের জন্য অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান বন্ধ থাকাই বাঞ্ছনীয় হবে।

বাস্তবে পাকিস্তানের এই অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রয়োজন খুবই বেশি। এই সাহায্যের পরিমাণ প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন ডলারের মতো (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর মধ্যে ২০০ মিলিয়ন দেয়ার কথা) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তান তার মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে বৈদেশিক অর্থ সাহায্য (রিজার্ভ একেবারে শূন্যের কোটায়) পাওয়ার জন্য, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় শতাধিক জাতিসংঘের পর্যবেক্ষণ মোতায়েনে সম্মত। এদের দায়িত্ব হবে ভারত থেকে বাঙালি শরণার্থীদের দেশে প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টায় পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা এবং পূর্ব পাকিস্তানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য পরামর্শ দেয়া।

জাতিসংঘ ভারতের মাটিতেও এ ধরনের পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাব করলে ভারত রাগান্বিতভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। ভারতের বক্তব্য হচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর বর্বরতা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত শরণার্থী আগমন বন্ধ হবে না এবং এজন্যে ভারতের মাটিতে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েন করে কোন ফায়দা হবে না। নয়াদিল্লি আরও বলেছে যে, শরণার্থী প্রত্যাবর্তনে ভারত বাধা দিচ্ছে বলে পাকিস্তান যে প্রোপাগাণ্ডা করছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন (অবশ্য ভারত যথার্থভাবে চায় যে, শরণার্থীরা দেশে প্রত্যাবর্তন করুক)। ভারত পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছে যে, দুটো দেশে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েনের অর্থই হচ্ছে পুরো ব্যাপারটাই পাক-ভারত সংকট হিসাবে বিবেচিত হবে এবং পাকিস্তানের মতো ভারতকেও সমভাবে সমস্যার দায়িত্ব নিতে হবে। উপরন্তু ভারত আরও অনুধাবন করতে পেরেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে

মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক দলের উপস্থিতির দরুন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড ও বর্বরতা হ্রাস পাবে এবং এতে শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। এতে আপাত দৃষ্টিতে ব্যাপারটা ইতিবাচক পদক্ষেপ বৈকি। কিন্তু বিভিন্ন শরণার্থী শিবির পরিদর্শন এবং অসংখ্য সাক্ষাৎকার গ্রহণের পর অন্যান্য বিদেশী সাংবাদিকের মতো আমারও মনে এ ধারণা হয়েছে যে, শরণার্থীদের অধিকাংশই আর কোন দিন ফিরে যাবে বলে মনে হয় না। এটা বাস্তব সত্য যে, শরণার্থীদের ঘরবাড়ি ও সহায় সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়েছে এবং তাদের জমিজিরাত সেনাবাহিনীর সাহায্যকারীদের (রাজাকারদের) দান করা হয়েছে। অন্যদিকে শরণার্থীদের অধিকাংশই হচ্ছে হিন্দু এবং এরা হিন্দুপ্রধান ভারতে অবস্থানকে নিরাপদ মনে করছে। পাকিস্তানি সেনাবহিনী যে ধরনের বর্বরতা করেছে, তাতে এদের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

অন্যদিকে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতি সত্ত্বেও গেরিলাদের হামলা বন্ধ থাকবে না। এতে করে পাকিস্তানি সৈন্য প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত গোলযোগ অব্যাহত থাকবে। অবশ্য এতে করে ভারত যে গেরিলাদের সহায়তা করছে তা জাতিসংঘে সমালোচনা হবে। এটা অবশ্য পাকিস্তান স্বাগত জানাবে।

সীমান্তের অপর পারে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক দলের উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে ভারতের পক্ষে উদ্বেগের কারণ হবে। কেননা এতে করে ভারত কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় প্রদান এবং ট্রেনিং ও সাহায্যদানের ব্যাপারটা কিছুটা স্তিমিত হতে বাধ্য। সীমান্তের উভয় দিকে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুরব্বীয়ানায় হয়েছে বলে খবর প্রকাশিত হওয়ায় মার্কিন-ভারত সম্পর্কের আরও অবনতি হয়েছে। এশীয় পরিস্থিতি সম্পর্কিত পর্যবেক্ষকদের মতে উপমহাদেশের বর্তমান সংকটকে মার্কিনি সরকার কর্তৃক পাক-ভারত সংকট বলে বিবেচনা করা এবং ভারসাম্যের প্রশ্নে পাকিস্তান ও ভারতকে সমমর্যাদায় বিবেচনা করার নীতি অবাস্তব ও সুদূরপ্রসারী নয়। এদের মতে পাকিস্তানকে কোন অবস্থাতেই ভারতের সমতুল্য হিসাবে বিচার করা ন্যায়সঙ্গত নয়। ভারতের আয়তন, গুরুত্ব, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য এবং সরকারের স্থায়িত্বের কথা চিন্তা করে ওয়াশিংটনের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নীতি নির্ধারণ করা উচিত।

পূর্ব পাকিস্তানের মৌলিক রাজনৈতিক প্রশ্ন থেকে শরণার্থী ও মানবিক প্রশ্নগুলোকে পৃথক করে দেখার মার্কিনি নীতিও ভ্রমাত্মক। উপমহাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল এ রকম বিশেষজ্ঞদের মতে পূর্ব পাকিস্তান ও ভারত সীমান্তের উভয় দিকে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েন সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র যে পাঁয়তারা করছে তাতে সাময়িকভাবে কাগজে-কলমে আসল সংকট এড়ানো সম্ভব হলেও হতে পারে। পাকিস্তান যে দ্বিখণ্ডিত হতে চলেছে, তা সাময়িকভাবে ঠেকানো গেলেও শেষ পর্যন্ত এটা অবধারিত।

[নিবন্ধ : পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত : নিউইয়র্ক টাইমস, অক্টোবর ১৯৭১, লেখক-সিডনি এইচ সেনবার্গ]

[বিশ্বের মানচিত্রে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সংবাদ কিভাবে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, কয়েকটি অধ্যায়ে তার সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপনা করা প্রাসংগিক মনে করছি।—লেখক]

ঢাকা, ১৬ই ডিসেম্বর : একদিকে বাঙালিরা হর্ষোৎফুল্ল আনন্দ ধ্বনি করে চলেছে, আর অন্যদিকে আজ ভারতীয় বাহিনী ঢাকায় প্রবেশ করল।

মেজর জেনারেল নাগরার নেতৃত্বে ভারতীয় বাহিনী রাজধানীর উপকণ্ঠে সংযোগকারী ব্রিজে হাজির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানি গেরিলাও বিদ্যুৎ গতিতে সেখানে উপস্থিত হয়। এর পরেই খবর এলো যে, আত্মসমর্পণে তাঁরা সম্মত হয়েছে।

জেনারেল নাগরা বলেন, তিনি স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে আটটায় পাকিস্তানি মিলিটারী হেড কোয়ার্টারে সংবাদ পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে জবাব পেয়েছেন যে, পাকিস্তানিদের পক্ষ থেকে আর কোন প্রতিরোধ হবে না। এর পরেই তিনি লোক-লস্করসহ শহরে প্রবেশ করেন।

এখানে আজ সকাল ১০টা নাগাদ তিনি লে. জেনারেল এ এ কে নিয়জীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। নাগরা বলেন, 'কলেজ জীবন থেকেই আমরা দু'জনে পুরাতন বন্ধু।'

এরপরে তিনি ইস্টার্ন কমান্ডের চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জে এফ আর জেকবকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য ঢাকা বিমানবন্দরে উপস্থিত হলেন। জেনারেল জেকব কোলকাতা থেকে হেলিকপ্টারে এলেন। জনাতিনেক ভারতীয় সৈন্য নিয়ে মেজর জেনারেল নাগরা তার বসকে অভ্যর্থনা জানালেন। এ সময় বিমানবন্দর রক্ষায় নিয়োজিত পাকিস্তানি সৈন্যরা রানওয়ের আর এক প্রান্তে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছিল।

আজ সকাল থেকে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত রাস্তায় ভারতীয়দের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যায় পাকিস্তানি সৈন্যদের চলাচল হয়েছে। ইতস্তত গোলাগুলির খবরও পাওয়া গেছে। এতে জনাকয়েক ভারতীয় ও পাকিস্তানি সৈন্যের মৃত্যু হয়েছে। এমনকি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে একজন ভারতীয় অফিসারকে হত্যা করা হয়েছে।

মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা বেসামরিক লোকদের সঙ্গে মিশে গিয়ে হৈচৈ করছে, আর মাঝে মাঝে বিজয়ের আনন্দে আত্মহারা হয়ে আকাশের দিকে অবিরাম গুলি ছুড়ছে। এদিকে উত্তেজনার মধ্যে অহেতুক গোলযোগের আশংকায় মেজর জেনারেল নাগরা কালবিলম্ব না করে ৯৫তম মাউন্টেন ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার এইচএস ক্লারকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে পাঠিয়েছেন। আন্তর্জাতিক রেডক্রসের উদ্যোগে এই হোটেলকে নিরপেক্ষ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে বেশ কিছু সংখ্যক বিদেশী নাগরিক ও প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের উচ্চপদস্থ বেসামরিক কর্মচারী আশ্রয় নিয়েছেন। এদের রক্ষা করা অপরিহার্য। ব্রিগেডিয়ার ক্লার রাস্তার প্রচণ্ড ভিড় অতিক্রম করে অনেক কষ্টে হোটেলে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

এখানে উল্লেখ, ব্রিগেডিয়ার ক্লারকে সঙ্গে করে উত্তর দিক থেকে মেজর জেনারেল নাগরা ৪ঠা ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সীমা অতিক্রম করে অনেক ক'টা ছোট-বড় লড়াইয়ের পর ঢাকার দিকে এগিয়ে আসেন। এঁদের সঙ্গে দুই ব্রিগেডের কিছু বেশি সৈন্য ছিল। প্রতিটি শহরে যুদ্ধ করে এঁদের প্রায় ১৬০ মাইল রাস্তা অতিক্রম করতে হয়েছে। কখনও পায়ে হেঁটে আর কখনওবা গরুর গাড়ির সহায়তা নিতে হয়েছে।

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে নাগরা বললেন, 'আমার মনে হয় এখন এখানে সব কিছুই শান্ত আর শান্তিপূর্ণ রয়েছে। আমরা এ মর্মে গ্যারান্টি দিয়েছি যে,

পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের পূর্ণ নিরাপত্তার সঙ্গে রক্ষা করা হবে। আমরা এই প্রতিশ্রুতি পরিপূর্ণভাবে পালন করতে বদ্ধপরিকর।'

হেলিকপ্টার থেকে জেকব অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে জনাকয়েক বেসামরিক বাঙালি দৌড়ে এলো। একজন মাথাটা পিছনে ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে বিদেশী সাংবাদিকদের একজনকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কোন্ দেশের লোক?' জবাব এলো 'আমেরিকা।'

বাঙালি প্রশ্নকর্তা মাটিতে থু থু ফেলে করমর্দন করতে অস্বীকার করে বললো, "আমরা মার্কিনিদের ওপর খুবই নারাজ।"

প্রেসিডেন্ট নিক্সন পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধের সময় বরাবর কেন্দ্রীয় সরকারকে সমর্থন করায় এবং চূড়ান্ত যুদ্ধে পাকিস্তানকে মদদ দেয়ায়, বাঙালিরা যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র সমালোচনা করছে।

নাগরার একজন সহকর্মী একটা বাংলাদেশের পতাকা এনে উড়িয়ে দিলো। তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো মেজর জেনারেল জেকব। বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে যেদিকে তাকাচ্ছি বাড়িঘর, গাড়ি সর্বত্রই শুধু বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। আর রাস্তায় জনতার ঢল নেমেছে। এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

রাস্তার দু'পাশের কিনার ধরে পরাজিত পাকিস্তানি সৈন্য ও পুলিশের দল সারিবদ্ধভাবে হেঁটে চলেছে কুর্মিটোলার দিকে। এদের সবারই কাছে অস্ত্র রয়েছে। কুর্মিটোলার একটা নির্দিষ্ট স্থানে এনে এঁদের নিরস্ত্র করা হবে।

আমার কাছে মনে হয় যে, সকালের দিকে কয়েক ঘণ্টা দোটানা অবস্থার পর ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর আগমন আর আত্মসমর্পণের দুটো ব্যাপারই আকস্মিক ও ত্বরিতভাবে হচ্ছে। এটা না হলে ভারতীয়দের ঘন ঘন বিমান আক্রমণ আর ঘাঁটিতে ভয়াবহ যুদ্ধে ঢাকায় মৃতের সংখ্যা এবং ধ্বংসলীলা আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পেতো।

স্থানীয় সময় সকাল সড়ে ন'টায় পূর্ব ঘোষণা মতো ভারতীয় বিমান আক্রমণ বন্ধ হয়। ন'টার একটু আগে জাতিসংঘ আর রেডক্রসের কর্মকর্তারা জানতে পারলেন যে, পাকিস্তানি কমান্ড দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে কথাবার্তা আর আদান-প্রদান হচ্ছে না।

ঢাকাস্থ পাকিস্তানি মিলিটারি হেডকোয়ার্টারে ত্বরিতভাবে একটা বৈঠক হয়েছে। মেজর জেনরেল নিয়াজীর পক্ষে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী বৈঠক সভাপতিত্ব করার পর জাতিসংঘ ও রেডক্রস কর্মকর্তাদের জানালেন যে, নয়াদিল্লির সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। রাও ফরমান আলীই এখন আত্মসমর্পণের ব্যাপারে দায়িত্বে রয়েছেন। এরপর জাতিসংঘের রেডিও যোগাযোগের ব্যবস্থার মাধ্যমে দিল্লিতে রাও ফরমানের বার্তা পাঠানো হলো। তখন সকাল ৯-২০ মিনিট। এর আগে ভারতীয়রা জানিয়েছিল যে, সকাল ৯-৩০ মিনিটের মধ্যে আত্মসমর্পণে রাজি না হলে আবার বোমাবর্ষণ শুরু হবে। নির্ধারিত সময়ের মাত্র ১০ মিনিট আগে আত্মসমর্পণের সম্মতির কথা দিল্লিতে গিয়ে পৌঁছলো।

স্থানীয় সময় বিকেল পাঁচটায় রেসকোর্স ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ হলো। তখন চারদিকে চলছে গগনবিদারী চিৎকার আর মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের অস্ত্র থেকে খোলা আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত অসংখ্য গুলির আওয়াজ।

লি লেসকেজ, ওয়াশিংটন পোস্ট, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১।

ঢাকা, ১৬ই ডিসেম্বর : ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণের দলিল দস্তখতের জন্য একটা টেবিল বসানো হয়েছে। তখন ডিসেম্বরের শীতের পড়ন্ত রোদ। দূর থেকে অবিরাম গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে। আর জনতা মুহুর্মুহু চিৎকার করছে। একটু পরেই গম্ভীর ও কালো মুখে লে. জেনারেল এ এ কে নিয়াজী আত্মসমর্পণের দলিলে দস্তখত করলেন। ভারতীয় সৈন্যরা প্রায় পুরো ময়দানটাই 'কর্ডন' করে বাঙালি জনতাকে তখন অনেক কষ্টে ঠেকিয়ে রেখেছে। জেনারেল নিয়াজীকে যখন ফেরত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন তাঁর চোখে পানি আর বাঙালি জনতা চারদিক থেকে চিৎকার করছে।...

ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে সর্বপ্রথম মেজর জেনারেল নাগ্‌রা ঢাকায় প্রবেশ করেছেন অথচ সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত নাগ্‌রা ঢাকার উপকণ্ঠে যুদ্ধ করেছেন। এ সময় তার কাছে ঢাকাস্থ পাকিস্তানি মিলিটারি হেডকোয়ার্টার থেকে বার্তা এলো যে, পাকিস্তানি সৈন্যরা আত্মসমর্পণে সম্মত রয়েছে। বেলা দশটায় জেনারেল নাগ্‌রা এসে জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

ভারতীয় দ্বিতীয় প্যারাস্যুট রেজিমেন্টের কর্নেল পান্নু বললেন, 'জেনারেল নিয়াজী বাহ্যিক মনোবল দেখিয়েছেন। তাই আমরা সৈন্য হিসেবে সৈন্যের ভাষাতেই কথাবার্তা বলেছি। এমনকি সামরিক বাহিনীর মধ্যে চালু রসিকতাও হয়েছে।

লে. কর্নেল রিক্‌খে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের বললেন, 'প্রথা অনুযায়ী অরোরা এসে নিয়াজীর কাঁধ ও বুক থেকে পদবি নির্দেশক চিহ্নগুলো সরিয়ে নিলেন। অস্ত্র জমা দেয়ার পর এটাই হচ্ছে সামরিক প্রথা।'...

–পিটার ও লগ্‌লিন, দি টেলিগ্রাফ, লন্ডন ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭১

'আমাদের উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ' –ইন্দিরা

ঢাকা, ১৭ই ডিসেম্বর : পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাঘ্র হিসাবে পরিচিত লে. জেনারেল এ এ কে নিয়াজী গতকাল (১৬ই ডিসেম্বর) অস্ত্র সংবরণ করেছেন। যে সামরিক নেতা এক সময় সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর জওয়ানরা 'শেষ পর্যন্ত লড়াই' করবে, তিনি ৮০,০০০ আটকেপড়া সৈন্যসহ বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করেছেন।

ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কর্তা লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার হাতে জেনারেল নিয়াজীর এই আনুষ্ঠানিক পরাজয়ের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে ২৪ বছর ব্যাপী পাকিস্তানি শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটলো।

ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে রক্ষিত টেবিলে বসে আত্মসমর্পণের দলিলে দস্তখতের সময় 'টাইগার' নিয়াজীকে খুবই বিমর্ষ মনে হচ্ছিল। এই সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের পর যখন তাঁকে 'হাউস-এ্যারেস্টের' জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তাঁর চোখ দুটো ছিল অশ্রুসজল।

আত্মসমর্পণের মাত্র মিনিট পাঁচেক সময়ের মধ্যে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দ্রিরা গান্ধী দিল্লিতে হর্ষোৎফুল্ল পার্লামেন্টে ঘোষণা করলেন, 'ঢাকা নগরী এখন একটা স্বাধীন দেশের মুক্ত রাজধানী।'

এরপরেই তিনি জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে বললেন, 'পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীর বাংলাদেশে আত্মসমর্পণের প্রেক্ষিতে দুই দেশের বর্তমান সংঘর্ষকে আর অব্যাহত রাখা অর্থহীন।'

আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সীমাবদ্ধ– তা হচ্ছে, ভয়াবহ রাজত্বের নাগপাশ থেকে স্বাধীন হওয়ার লড়াইয়ে বাংলাদেশের অকুতোভয় জনসাধারণকে সহায়তা করা।'

গতকাল ঢাকায় শীতের বিকেলে আত্মসমর্পণের দলিলে দস্তখত হলো। অবশ্য সকালের দিকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ভারতীয় সামরিক কর্তারা বললো, সকালের দিকেই তারা বিভিন্ন এলাকায় অবস্থানরত পাকিস্তানি সৈন্যদের কাছে প্রেরিত নিয়াজীর বেতারবার্তা গোপনে লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। বার্তায় সৈন্যদের অস্ত্র সংবরণের কথা বলা হয়েছে। সকালে নাস্তা খাওয়ার সময় মেজর জেনারেল নাগরা জানতে পারলেন যে, 'টাইগার' আত্মসমর্পণে ইচ্ছুক। জেনারেল নাগরার বাহিনী তখন ঢাকা নগরীকে ঘেরাও করে বসে রয়েছে। মাত্র দু'ঘণ্টা পূর্বেই তিনি জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জে এফ আর জেকব কোলকাতা থেকে হেলিকপ্টারে এসে ঢাকায় হাজির হলেন। নিয়াজীর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজের সময় আত্মসমর্পণের বিস্তারিত আলাপ হবে।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হলো। বাঙালি জনতা আনন্দে মাতোয়ারা হলো আর ময়দানটা কর্ডন করে ভারতীয় সৈন্যরা অনেক কষ্টে তাঁদের নিরাপদ দূরত্বে রাখতে সক্ষম হলো। এদিকে আরও ভারতীয় সৈন্য এসে ঢাকায় প্রবেশ করলো। একটা সামরিক খোলা জিপ বোঝাই করে পাগড়ি মাথায় শিখ সৈন্যরা যখন রাজপথে বেরোলে জনতা তাদের অভিনন্দিত করলো। দূর থেকে তখনও মুক্তিবাহিনীর গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে। শুনলাম মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা কোলাবরেটারদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। আবার কোন কোন পকেটে ধর্মান্ধ পাকিস্তানি সৈন্যের দল আত্মসমর্পণে অস্বীকার করে 'ডিফেন্স' নিয়েছে।

উপর্যুপরি দিন দশেক ধরে গুলি ও বোমার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যাঁরা লুকিয়ে ছিল, এখন তারা হাজার হাজার বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। আনন্দে তারা জয়ধ্বনি করছে।

আত্মসমর্পণের ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই বিদেশী সাংবাদিকদের জানানো হলো যে, বাংলাদেশের বেসামরিক সরকারের চার জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এসে পৌঁছুবেন। এরাই বেসামরিক সরকার পুনর্গঠিত করবেন।

এখন আমরা আত্মসমর্পণের পুরো ঘটনা জানতে পারলাম। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল মানেক শ' নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ১৬ই ডিসেম্বরের সকাল সাড়ে ন'টা পর্যন্ত ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে ভারতীয় বিমান বাহিনীর আক্রমণ ও যুদ্ধ বন্ধ রাখতে হবে। এইটুকু সময়ের মধ্যে 'টাইগার' নিয়াজীকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, 'তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন অথবা মৃত্যুকে বরণ করবেন।' এই সময়সীমা শেষ হওয়ার মাত্র ১০ মিনিট আগে পাকিস্তানিদের পক্ষ থেকে দিল্লিতে বার্তা পৌঁছলো– নিয়াজী আত্মসমর্পণ করবেন। এর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ঢাকাবাসী ভীত-সন্ত্রস্তভাবে মনে করছিল যে, আবার ভয়াবহ লড়াই শুরু হবে।

মাত্র ১২ দিনের মধ্যে এই ভয়াবহ ও চূড়ান্ত লড়াইয়ের অবসান হলো। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছেন যে এই যুদ্ধে তাঁদের সশস্ত্র বাহিনীর প্রায় ৪০০০ লোক নিহত, নিখোঁজ এবং আহত হয়েছে। পাকিস্তানিদের ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। তবে তুলনামূলকভাবে এই সংখ্যা বেশি হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

আত্মসমর্পণের শর্ত হিসাবে ভারত আশ্বাস দিয়েছে যে, জেনেভা চুক্তি অনুসারে জেনারেল নিয়াজী ও তার সৈন্যদের যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে ব্যবহার করা হবে। আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যদের প্রতিও একই ধরনের ব্যবহার প্রযোজ্য হবে। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে যে, ন'মাস আগে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও অন্যান্য মারাত্মক ধরনের অপরাধ করেছে।

আত্মসমর্পণের শর্ত হিসাবে ভারত আরও আশ্বাস দিয়েছে যে, সকল বিদেশী নাগরিক, পশ্চিম পাকিস্তানি নাগরিক এবং অবাঙালি মুসলিমদের মতো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিরাপত্তা দেয়া হবে।

(দি সান, বালটিমোর, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১)

'টাইগারের' চোখে পানি

ঢাকা, ১৬ই ডিসেম্বর : পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত জেনারেল 'টাইগার' নিয়াজী একদিন গর্ব ভরে বলেছিলেন যে, তিনি 'শেষ পর্যন্ত লড়াই করবেন', আজ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণের দলিলে দস্তখতের পর সেই জেনারেল নিয়াজীর চোখে অশ্রু দেখতে পেলাম। দস্তখতের পরেই তিনি ডান দিকের কাঁধ থেকে র‍্যাংক নির্দেশক ব্যাজ ছিঁড়ে ফেললেন। জেনারেল নিয়াজী নিজের হাতে কোমরের রিভলবার থেকে গুলি বের করে পাগড়িওয়ালা শিখ জেনারেল অরোরার হাতে দিলেন। এরপর আত্মসমর্পণের বিধি মোতাবেক তিনি ভারতীয় জেনারেলের কপালের সঙ্গে নিজের কপাল ঘষে আনুগত্য দেখালেন।'

আত্মসমর্পণের ঘটনা বহ্নিশিখার মতো ছড়িয়ে পড়লো, আর সমস্ত নগরীতে লাখ লাখ হর্ষোৎফুল্ল বাঙালি জনতার উল্লাস ধ্বনি। এর মধ্যে বিক্ষিপ্ত দুর্ঘটনার খবর এলো। একটা পাকিস্তানি ট্যাংক স্কোয়াড্রন আর তার পিছে গোটা কয়েক সামরিক মোটরযান লাইন করে সামরিক ঘাঁটির দিকে ফিরে যাচ্ছিল। হঠাৎ করে একটা জিপ থেকে জনতার ওপর মেশিনগানের গুলি হলো। দুটো লাশ রাস্তার ওপর পড়লো। চারদিকে ছুটাছুটি আর বিভ্রান্তি। ভারতীয় ৫৭তম ডিভিশনের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ডি এন মিশ্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আমি ব্যাপারটা বিশ্বাসই করতে পারছি না।' অভিযুক্ত দু'জন পাকিস্তানি সৈন্যকে নিরস্ত্র করে কোর্ট মার্শালের জন্য নিয়ে যাওয়া হলো।

ভারতীয় সৈন্যরা এরপর পাকিস্তানি এই বাহিনীর কাছ থেকে সবগুলো সামরিক যানের দায়িত্ব নিলো। দুঃখ-ভারাক্রান্ত ও বিষাদ-মলিন পাকিস্তানি সৈন্যদের চোখে তখন ভীতির চাহনি।

এর আগেই অবশ্য পরপর দশটি হেলিকপ্টারযোগে জেনারেল অরোরা এবং মেজর জেনারেল জেকবসহ ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনীর হর্তাকর্তারা ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন। তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে এরা গাড়ির মিছিল করে রেসকোর্স ময়দানের আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন।

(দি ডেইলি টেলিগ্রাফ, লন্ডন, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭১)

বাংলাদেশে যুদ্ধবিধ্বস্ত ধ্বংস্তূপের মধ্যে একগাদা মোহ শায়িত অবস্থায় রয়েছে। এবারের যুদ্ধে সেইসব মোহের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নানাভাবে ভারতকে সাহায্য অব্যাহত রেখেছিল। শেষ পর্যন্ত মার্কিনিরা প্রভাব বিস্তার করে ভারতের নীতির পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। তাই অর্থের বিনিময়ে আনুগত্য কেনা যায় বলে যাঁরা স্বপ্নে বিভোর ছিলেন, তাঁদের মোহমুক্তি ঘটেছে।

(দি ডেইলি এক্সপ্রেস, লন্ডন, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭১)

পূর্ব বাংলার কথা যদি বলতে হয়, তাহলে বলতেই হয় যে, বাংলাদেশের অভ্যুদয় এখন বাস্তব সত্য। জনাব জেড এ ভুট্টোর সঙ্গে যোগসাজশে পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী যে রকম ব্যবহার করেছে তা পূর্ব বাংলা কোন দিনই ভুলে যাবে না। জনাব ভুট্টোর নিজের স্বার্থে এখন বাস্তবতার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করা উচিত। এর ফলেই তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণকে শান্তি ও প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।

তা না করলে ইয়াহিয়া খানের মতো তাকেও একই ভাগ্যকে বরণ করতে হবে।

(নবীন খবর, কাঠমুন্ডু, ২২শে ডিসেম্বর ১৯৭১)

এখন বাড়ি ফেরার পালা

নিরস্ত্র জনতার ওপর সামরিক বাহিনীর হামলা ও পরবর্তী সময়ে রক্তাক্ত যুদ্ধের পরিণতি বড় ভয়াবহ। সম্ভবত দশ লাখ মানব সন্তান নিহত হয়েছে, এক কোটির মতো শরণার্থী, হাজার হাজার লোক হয়েছে গৃহহারা, ক্ষুধার্ত ও রুগ্ন। যাক এই হফ্‌তার শেষে আবার এই শরণার্থীরা দেশে ফিরতে শুরু করবে। বহু বিপদ-সংকুল পথ অতিক্রম করে এঁরা ভারতে এসেছিলো নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। এখন এঁদের যাওয়ার পালা। সেখানে প্রায় শূন্য অবস্থা থেকে এঁদের আবার ঘর-সংসার, সবকিছু গড়ে তুলতে হবে। এঁদের কেউ কেউ আনন্দঘন পরিবেশে আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মিলিত হবে। আবার অনেকের ভাগ্যে অপেক্ষা করছে শুধু অশ্রু। এঁদের প্রিয়জনরা আর কোন দিনই ফিরে আসবে না– তাঁরা পার্থিব জগতের সব কিছুর উর্ধ্বে চলে গেছে। তবে একটা কথা ঠিক যে, নতুন দেশটার চারদিকে শুধু সবুজ আর মাটি খুব উর্বর।

(দি টাইম ম্যাগাজিন, ইউএসএ ২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১)

পাকিস্তানের পরাজয়ের কারণ

অন্তত একটা বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা ভুল করেনি। তাঁদের অভিমত ছিল যে, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ তা ক্ষণস্থায়ী হবে এবং কোন অবস্থাতেই তিন সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হতে পারে না। তবুও অনেককেই হতবাক করেছে। কেননা, মার্কিনি সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ দফতরের কর্মকর্তাগণ ছাড়াও বেশ কিছুসংখ্যক ইউরোপীয় জেনারেলদের ধারণা ছিল যে এশিয়া মহাদেশে পাকিস্তানি সৈন্য বাহিনী হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। যা হোক, এ ধরনের ভুল রিপোর্ট মার্কিনি গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষে এই প্রথম নয়।

ভারত যে পক্ষকালের এই যুদ্ধে জয়লাভ করেছে, তার কারণ শুধু অধিক সংখ্যক সৈন্য ও সমরাস্ত্র নয়, ভারতের যুদ্ধ সম্পর্কিত কৌশল, সংগঠন এবং তিন বাহিনীর মধ্যে

সহযোগিতার অবদান সবচেয়ে বেশি। সোভিয়েত পরামর্শদাতারা অবস্থার প্রেক্ষিতে দ্রুত পরিবর্তন কৌশল গ্রহণের যেসব নকশা প্রণয়ন করেছিল, ভারতীয় সৈন্যরা তা চমৎকারভাবে অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছিল। সবশেষে এবারের পাক-ভারত যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী অপরূপ শৃংখলা প্রদর্শন করেছে এবং ভারতীয় বাহিনীর মনে বিজয় সম্পর্কে পূর্ণ আস্থা ছিল।

অন্যদিকে প্রকৃত সংঘর্ষ শুরু হওয়ার আগেই দিল্লি কর্তৃপক্ষ পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর প্রতি সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারিত করেছিল। অস্ত্র না দিলেও মুক্তিবাহিনীর সংগঠন তৈরির ব্যাপারে এই সহযোগিতা কার্যকরী ছিল। আর এই মুক্তিবাহিনী ক্রমাগতভাবে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীকে হয়রানি করেছে, তাদের বেশ কিছু শক্তিশালী ঘাঁটিকে বিব্রত করেছে, সরবরাহের বিঘ্ন সৃষ্টি করে নৈতিক মনোবল বিনষ্ট করেছে এবং বিশেষ করে এই মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা পাকিস্তানি সমরাস্ত্র ও পেট্রোলের ডিপোগুলোতে অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে।

একদিকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, জেনারেল পীরজাদা ও জেনারেল হামিদের দল এবং অন্যদিকে জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বের বেসামরিক মন্ত্রীদের গ্রুপের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্নে মতবিরোধ ইসলামাবাদ কর্তৃপক্ষকে বেশ অগোছালো করে তুলেছিল। উপরন্তু একজন দাম্ভিক এবং কার্যত অদক্ষ জেনারেল স্টাফের কর্তৃত্বে সেনাবাহিনীকে ছেড়ে দেয়াটা ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার।

দু'জন জেনারেলের নেতৃত্বে পাকিস্তানের পুরো অপারেশন পরিচালিত হয়। এঁদের একমাত্র কৃতিত্বই হচ্ছে, রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে এঁদের বন্ধুত্ব। প্রথমজন হচ্ছেন, কাশ্মীর সেক্টরের কমান্ডার জেনারেল টিক্কা খান। বেসামরিক জনসাধারণ নিধন করে ইনি এর মধ্যেই 'বেলুচিস্তান ও বাংলার কসাই' নামে কুখ্যাত হয়েছেন। সামরিক যোগ্যতার সম্পর্কে বলতে হলে, এটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে যে, এ'কে যখন লে. জেনারেল পদে প্রমোশন দেয়া হয়, তখন তাঁর উর্ধ্বতন অফিসার 'গোপন রিপোর্টে' জেনারেল স্টাফকে লিখেছিলেন যে, 'উচ্চতর দায়িত্বপূর্ণ পদের জন্য এই অফিসার অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।'

ইয়াহিয়া খানের আরেকজন দক্ষিণ হস্ত হচ্ছেন জেনারেল নিয়াজী। যদিও এঁকে 'দি টাইগার' বলা হয়, তবুও ইনি যুদ্ধের কৌশলগত দিক থেকে তাঁর বন্ধু টিক্কা খানের চেয়ে বেশি দক্ষতা প্রমাণ করতে পারেননি। নৃশংস, দয়াহীন ও স্থূল বুদ্ধির এই জেনারেল পূর্ব বাংলায় কমান্ডার হিসাবে জেনারেল টিক্কা খানের স্থলাভিষিক্ত হবার পর দম্ভভরে পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহী জনসাধারণকে পদানত রাখার উদ্দেশ্যে তাঁর বাহিনীকে নির্বিচারে হত্যা ও লুণ্ঠনের জন্য লেলিয়ে দিয়েছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে এ ধরনের যেসব অফিসার কলংকিত করেছে, তার বিরুদ্ধে জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নেতৃত্বে ভারতীয় বাহিনীর রণকৌশল ও অন্যান্য সুসংগঠিত পদ্ধতি প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছে। ফলে শত্রুপক্ষ হতবাক ও বুদ্ধিহীন হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

(জর্জেস অ্যানডারসন দি কমব্যাট, প্যারিস, ডিসেম্বর ১৯৭১)

বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে আর বদলানো যাবে না

জনাব ভুট্টোকে বাংলাদেশে গণহত্যার দায়িত্ব নিতে হবে। অবশ্য এর মধ্যেই বাংলাদেশের জনসাধারণ ও নেতৃবৃন্দ একটা নতুন জাতি হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে। বিদেশে পাকিস্তানি দূতাবাসগুলোর বাঙালি কর্মচারীরা স্বাধীন

বাংলাদেশের প্রতি নিজেদের আনুগত্য ঘোষণা করেছে। এখন ভুট্টো শক্তি প্রয়োগ করে পূর্ব পাকিস্তানকে ফেরত নিতে পারে। কিন্তু এটা ধারণার বাইরে। রক্তাক্ত ঘটনাবলীকে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ কোন দিন ক্ষমাও করতে পারবে না, ভুলতেও পারবে না।

এটা ধ্রুব সত্য যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ম্যাপে যে পরিবর্তন হয়েছে, তা আর কোন দিনই বদলানো যাবে না। ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম ছাত্র সংস্থা অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য ইন্দোনেশীয় সরকারের কাছে যে দাবি জানিয়েছে, তার পিছনে এটাই হচ্ছে মুখ্য কারণ।

(জাকার্তা টাইমস, ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১)

একটি নতুন জাতির জন্ম

শাসকবর্গের বিরুদ্ধে চরম বিরক্তির পরিণতি হিসাবেই পাকিস্তানের ম্যাপ থেকে পূর্ব পাকিস্তান উধাও হয়ে গেলো। পূর্বাঞ্চলের জনসাধারণ উপলব্ধি করেছিল যে, তাঁরা ইসলামাবাদ কর্তৃক অবহেলিত। যখন এঁরাই দেশের বেশির ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে, তখন পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে বিরাট বৈষম্যের সৃষ্টি করে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্বাঞ্চলকে শিল্পায়িত করেনি।

তাই শেষ পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলের জনসাধারণ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পৃথক হওয়ার লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে পাক-ভারত যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয় হওয়ায় এটা বাস্তবায়িত হয়েছে। পাকিস্তানের এই পরাজয়ের মাঝ থেকে বাংলাদেশ নামে একটা নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে...।

ভয়াবহ যুদ্ধের ক্ষতির মোকাবেলায় পুনর্গঠনের জন্য বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রয়োজন। ...তাই আমরা মুসলিম দেশগুলোর প্রতি এ মর্মে আহ্বান জানাচ্ছি যে, তারা যেনো বাংলাদেশে তাঁদের ভাইদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। বাংলাদেশের জনসাধারণকে এ মর্মে আশ্বাস দেয়া কর্তব্য যে, তাঁরা নিজেদের মাতৃভূমিতে শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী জীবনযাপন করতে পারবে।

(উটসান মালয়েশিয়া, ২০ ডিসেম্বর ১৯৭১)

আত্মসমর্পণের পূর্বে বুদ্ধিজীবী হত্যা

...একথা কেউ কোন দিন বলতে পারবে না যে, সবসুদ্ধ কতজন বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, ডাক্তার ইত্যাদি হত্যা করা হয়েছে। এঁদের অধিকাংশ কোন দিনই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। তবুও এঁদের আর কোন খোঁজখবর পাওয়া যায়নি। এঁরা চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছেন।...ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আনোয়ার পাশার স্ত্রী মোহসিনাকে রাজধানীর উপকণ্ঠে একটা বিরাট গর্তের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতে দেখলাম। এখানে অসংখ্য বাঙালি বুদ্ধিজীবীর গলিত ও দুর্গন্ধময় লাশ পড়ে আছে। মোহসিনা এই গলিত লাশগুলোর মধ্যে তাঁর স্বামীর লাশটা শনাক্ত করার বৃথাই চেষ্টা করছে।...

(পিটার হেজেলহার্স্ট : দি টাইমস, লন্ডন : ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৭১)

৪৮

একাত্তরের নয় মাসকাল ঢাকায় উপস্থিত পাকিস্তানিদের দৃষ্টিভঙ্গিতে মুক্তিযুদ্ধ কিভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার কিছু ঘটনার উল্লেখ বাঞ্ছনীয় মনে হচ্ছে। সাতই ডিসেম্বর সর্বপ্রথম মনে হলো যে, ইস্টার্ন কমান্ডের লে. জেনারেল এ এ কে নিয়াজী বেশ কিছুটা নেতিয়ে পড়েছেন। তখন খবর এসে পৌঁছেছে যে, যশোর ও ঝিনাইদহের পতন হয় এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নবম ও ষোড়শ ডিভিশনের যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হবার উপক্রম হয়েছে, আর কুমিল্লা-ফেনী এলাকায় অস্থায়ী ৩৯তম ডিভিশনও আক্রান্ত হয়েছে।

সন্ধ্যার মধ্যেই গভর্নর ভবনে জেনারেল নিয়াজীর ডাক পড়লো। বিভিন্ন সূত্রে বিভ্রান্তিকর সংবাদ পাবার পর ৭৪ বৎসর বয়স্ক গভর্নর ডা. আব্দুল মোতালেব মালেক যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা জানতে চান। সন্ধ্যার পর গভর্নর মালেক, জেনারেল নিয়াজী এবং আরও দুই উচ্চপদস্থ কর্মচারী বসে খুবই নিচু সুরে আলাপ করলেন। খুব বেশি একটা কথাবার্তা হলো না। কথাবার্তার প্রায় সবটুকুই গভর্নর ডা. মালেকই বললেন। শেষ পর্যায়ে তিনি কিছুটা সান্ত্বনার স্বরে বললেন, মানুষের জীবনে উত্থান-পতন রয়েছে। কখনও ঘটনা পরম্পরা ভালো হয়– আবার কখনও বিপরীতও হয়। একইভাবে একজন জেনারেলের জীবনেও উত্থান-পতন হওয়া স্বাভাবিক। কখনও গৌরব এসে জেনারেলের জীবনকে উজ্জ্বল করে তোলে আর কখনও পরাজয়ের গ্লানি এসে পূর্বের সমস্ত গৌরবকে ম্লান করে দেয়।

এটুকু কথা শোনার পর, জেনারেলের বিশাল দেহটা থরথর করে কেঁপে উঠলো আর তিনি হঠাৎ করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। তিনি টেবিলের ওপর দুটো হাত ভাঁজ করে রেখে তার মধ্যে মুখ লুকিয়ে ছোট্ট শিশুর মতো কাঁদতে থাকলেন। গভর্নর ডা. মালেক তাঁর একটা হাত জেনারেল নিয়াজীর কাঁধে রেখে বললেন, 'জেনারেল সাহেব আমি জানি যে, একজন কমান্ডারকে সংকটপূর্ণ জীবনের মোকাবেলা করতে হয়, কিন্তু ভেঙ্গে পড়া উচিত হবে না। আল্লাহ্ মহান।'

যখন জেনারেল নিয়াজী কাঁদছিলেন তখন হঠাৎ করে একজন বাঙালি বেয়ারা ট্রে হাতে ঘরে ঢুকে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধমক দিয়ে বের করে দেয়া হলো। ঘর থেকে বেরিয়েই সে অন্য বাঙালি বেয়ারাদের কাছে বললো, 'শুনেছেন, সাহেবরা সব কাঁদাকাটি করছেন।' গভর্নরের মিলিটারি সেক্রেটারি এই কথাগুলো শুনতে পেয়ে বেয়ারাদের চুপ থাকার নির্দেশ দিলেন।

এদিকে ডা. মালেক বললেন, 'পরিস্থিতির যখন এতোখানি অবনতি হয়েছে তখন আমার মনে হয় যুদ্ধ বিরতির আয়োজনের অনুরোধ করে আমি প্রেসিডেন্টের কাছে একটা তারবার্তা পাঠিয়ে দেই।' জেনারেল নিয়াজী কয়েক মুহূর্তে চুপ থেকে মাথা নিচু করে বললেন, 'আমি আনপার কথা মেনে নিবো।' এরপর গভর্ণর যথারীতি তারবার্তা পাঠিয়ে দিলেন।

জেনারেল নিয়াজী হেডকোয়ার্টারে ফিরে এসে দু'-চারটা জরুরি কথা ছাড়া নিশ্চুপ রইলেন এবং প্রায় বিনিদ্র রজনী যাপন করলেন। এর মধ্যে প্রতিটি রণক্ষেত্র থেকেই শুধু পশ্চাদপসরণ ও পরাজয়ের খবর এসে পৌঁছলো। বিভিন্ন বেতারকেন্দ্র থেকে পাকিস্তানের পরাজয়ের খবর অতিরঞ্জিত করে বলতে লাগলো। রেডিও পাকিস্তান উল্টা খবর প্রচার করেও সুবিধা করতে পারলো না। বাঙালিরা এসব বিশ্বাস করে না। তারা ভারতীয় ও অন্যান্য রেডিও শোনে।

এর মধ্যে একদিন বিবিসি থেকে এ মর্মে সংবাদ প্রচার করা হলো যে, জেনারেল নিয়াজী তার সৈন্যদের ফেলে রেখে পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে গেছে। এতে জেনারেল সাহেব খুবই রাগান্বিত হলেন এবং ১০ই ডিসেম্বর হঠাৎ করে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে হাজির হয়ে চিৎকার করে বললেন, 'কোথায় বিবিসির লোক? আমি তাকে বলতে চাই যে, আমি এখন পূর্ব পাকিস্তানে রয়েছি। আমি কখনও আল্লাহ্‌র রহমতে জওয়ানদের ফেলে যাবো না, 'কথা ক'টা বলেই তিনি কুর্মিটোলায় ফিরে গেলেন।'

পরদিন গভর্নর ডা. মালেক আবার প্রেসিডেন্টের কাছে তারবার্তা পাঠালেন। কিন্তু মনে হচ্ছে যে, জেনারেল নিয়াজির কাছ থেকে যুদ্ধ বিরতির অনুরোধ না পাওয়া পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পূর্ববর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না। শেষ পর্যন্ত ৯ই ডিসেম্বর জেনারেল পরিস্থিতি সংকটজনক স্বীকার করে প্রেসিডেন্টের কাছে তারবার্তা পাঠালেন। এরপর প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে গভর্নরের নিকট এবং চিফ অব স্টাফ জেনারেল আব্দুল হামিদের কাছ থেকে জেনারেল নিয়াজির কাছে আত্মসমর্পণের অনুমতিসূচক সিগন্যাল এসে পৌছলো। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য গভর্নর ডা. মালেককে ক্ষমতা দেয়া হলো এবং বলা হলো যে, জেনারেল নিয়াজী এই সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন। বিশ্বের বেশ কয়েকটা বেতার কেন্দ্র থেকে এই সংবাদ প্রচারিত হলো। তবুও সৈন্যদের মধ্যে একটা গুজব প্রচারিত হলো যে, বন্ধু দেশ থেকে শেষ মুহূর্তে সাহায্য এসে পৌছাবে। পাকিস্তানি সৈন্যরা দিন দুয়েকের মতো আকাশ (চীনাদের) এবং সমুদ্রের (মার্কিনিদের) দিকে তাকিয়ে রইলো। কিন্তু সাহায্যের জন্য কেউই এলো না।

এদিকে প্রতিটি রণাংগন থেকে পরাজয়ের খবর বিরামহীনভাবে এসে পৌছানো অব্যাহত রইলো। ১১ই ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজী সামরিক হাসপাতাল পরিদর্শনে গেলে ছ'জন পশ্চিম পাকিস্তানি নার্স 'বর্বর মুক্তিবাহিনীর' সম্ভাব্য হামলার হাত থেকে রক্ষার আবেদন জানালেন। নিয়াজী বললেন, 'চিন্তা করো না, তোমরা মুক্তিবাহিনীর হাতে পড়ার আগে আমরাই তোমাদের গুলি করে হত্যা করবো।'

এ সময় চাঁদপুর থেকে ভয়ংকর সংবাদ এসে পৌছলো। ৫৩তম ব্রিগেড ও ১১৭তম ব্রিগেড নিয়ে পশ্চাদপসরণ করার সময় নৌযানের অভাবে এই দুটো ব্রিগেড একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। অনেক কষ্টে মেজর জেনারেল মোঃ রহিম খান আহত অবস্থায় ঢাকা এসে পৌছেছেন।

১২ই ডিসেম্বর জেনারেল রাও ফরমান আলীর বাসভবনে আহত অবস্থায় জেনারেল রহিম শুয়ে রয়েছেন। পাশে বসে কথা বলছিলেন ফরমান আলী। এমন সময় সেখানে জেনারেল নিয়াজী ও জেনারেল জমসেদ এসে হাজির হলেন। জেনারেল রহিম হঠাৎ তিনজন জেনারেলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমার মনে হয় এখন যুদ্ধবিরতি বাঞ্ছনীয় হবে।' জেনারেল ফরমান আশ্চর্য হয়ে জবাব দিলেন, 'এতো জল্‌দি তুমি ধৈর্যহারা হয়ে পড়লে?' জেনারেল নিয়াজী একান্তে জেনারেল রহিমের সঙ্গে আলাপ করে জেনারেল ফরমানকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তাহলে পিন্ডিতে সিগন্যাল পাঠিয়ে দাও।' মনে হয় ঠাণ্ডা মাথার লোক রহিমের কথায় নিয়াজী রাজি হলেন। জেনারেল নিয়াজী একান্তে জেনারেল ফরমানকে কিছু বলার আগেই চীফ সেক্রেটারী মোজাফ্‌ফর হোসেন এসে কথাটুকু শুনে বলেই ফেললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। সিগন্যাল এখান থেকেই পাঠানো যায়।' শেষ পর্যন্ত চিফ সেক্রেটারিই এই ঐতিহাসিক সিগন্যালের খসড়া প্রণয়ন করলেন। বার্তায় বলা হলো যে, যুদ্ধ বিরতি ছাড়া নিরীহ প্রাণগুলোকে বাঁচাবার আর কোন পথ নেই।

১৩ই ডিসেম্বর সবাই মিলে গভর্নর ভবনে পিন্ডি থেকে জবাবের জন্য প্রতীক্ষা করলেন। কিন্তু সেদিন কোন জবাব এলো না।

১৪ই ডিসেম্বর যখন গভর্নর ভবনে বৈঠকের আয়োজন হচ্ছিল, ঠিক সেই সময় বেলা সোয়া এগারোটায় শত্রু পক্ষের তিনটা মিগ বিমান গভর্নর ভবনকে লক্ষ্য করেই বোমাবর্ষণ শুরু করলো। বিমান আক্রমণ বন্ধ হবার পর গভর্নর, চিফ সেক্রেটারি, পুলিশের আই জি, ঢাকা বিভাগের কমিশনার, পূর্ব পাকিস্তানের বেশ কয়েকজন সচিব ও অন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কচ্ছেদ সূচক আবেদনপত্র লিখে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের নিরপেক্ষ এলাকায় গিয়ে হাজির হলেন।

১৪ই ডিসেম্বর বেলা দেড়টায় পিন্ডি থেকে যুদ্ধবিরতির জরুরি তারবার্তা পাঠানো হলো। ঠিক দু'ঘণ্টা পরে এই বার্তা জেনারেল নিয়াজীর হাতে এসে পৌঁছলো। নিয়াজী এর পর রাও ফরমানকে সঙ্গে করে হাজির হলেন ঢাকাস্থ মার্কিনি কনসাল জেনারেল লি. স্পিভ্যাকের বাসায়। মার্কিনি কূটনীতিবিদ জানালেন যে, তাঁর পক্ষে সরাসরি এ ব্যাপারে দূতিয়ালী করা সম্ভব নয়। তবুও বললেন যে, অন্তত বার্তাটি দিল্লিতে পাঠানো সম্ভব হবে। ওখানে বসেই জেনারেল মানেক শ'র জন্য বার্তার খসড়া তৈরি হলো। বার্তাতে বলা হলো যে, পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী যুদ্ধ বিরতিতে শর্তাধীনে সম্মত রয়েছে। শর্তগুলো হচ্ছে, পাকিস্তানের সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর সদস্যদের নিরাপত্তা, মুক্তিবাহিনীর সম্ভাব্য হামলার হাত থেকে পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যশীল নাগরিকদের রক্ষা করতে হবে আর আহত ও রুগ্ন সৈনিকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

মার্কিনি কূটনীতিবিদ জানালেন যে, মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে এই বার্তা দিল্লিতে পৌঁছে যাবে। আসলে কিন্তু বার্তাটি ওয়াশিংটনে পাঠানো হয়েছিল। মার্কিনি সরকার সেখান থেকে ইয়াহিয়া খানকে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। কথিত আছে যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তেসরা ডিসেম্বরের পর স্বীয় অফিসেই যাননি। কখনও কখনও ম্যাপের দিকে তাকিয়ে বলতেন, 'আমি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আর কিই-ইবা করতে পারি?'

১৫ই ডিসেম্বর জেনারেল (পরে ফিল্ড মার্শাল) মানেক শ'র জবাব এলো। এরপরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। ১৬ই ডিসেম্বর সকালে তিনটি হেলিকপ্টারের একটিতে আহত জেনারেল রহিম এবং অন্য দুইটি কিছু অসুস্থ অফিসারকে নিয়ে বর্মা চলে গেলো। তবে আটজন নার্সকে পাঠানো গেলো না।

১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বিকেল চারটা নাগাদ আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হলো।

স্বাক্ষর করলেন জেনারেল নিয়াজী ও জেনারেল অরোরা। নিয়াজী তাঁর কোমরের রিভলবারটা বের করে জেনারেল অরোরার হাতে দিলেন আত্মসমর্পণের প্রথামত। পাকিস্তানের মানচিত্র থেকে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। নতুন দেশের নাম হলো বাংলাদেশ।

২০শে ডিসেম্বর বেলা সাড়ে তিনটায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটা ট্রান্সপোর্ট বিমানে লে. জেনারেল নিয়াজী, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী, রিয়ার অ্যাডমিরাল শরীফ, এয়ার কমডোর ইমানুল হক এবং আরও কয়েকজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাকে যুদ্ধবন্দি হিসাবে কোলকাতায় নিয়ে যাওয়া হলো। এখানে এদের

আপাতত : রাখা হলো ফোর্ট উইলিয়ামে।

এখানেই যুদ্ধের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল।

প্রশ্ন : পাকিস্তান ভাঙ্গার দায়িত্ব কি আপনাকে বহন করতে হবে না?

জেনারেল নিয়াজী : আমি কেনো এর জন্য দায়ী হবো? সব দোষই জেনারেল ইয়াহিয়া খানের।

প্রশ্ন : আপনি কি কখনও ইয়াহিয়া খান কিংবা জেনারেল হামিদকে বলেছেন যে, পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য সৈন্য সংখ্যা যথেষ্ট নয়?

জেনালে নিয়াজী : তাঁদের তো জানা উচিত যে, তিন ডিভিশন সৈন্য দিয়ে অভ্যন্তরীণ ও বাইরের আক্রমণ ঠেকানো সম্ভব নয়।

প্রশ্ন : পিছনে যে কারণই থাক না কেন, রাজধানী ঢাকার পতনের পূর্ব কোনো লড়াই হলো না এবং ঢাকাকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় 'ডিফেন্স' না থাকাটা 'কলংকজনক' নয় কি?

জেনারেল নিয়াজী : পিন্ডিই এর জন্য দায়ী। নভেম্বরের মাঝামাঝি ৮টি ইনফ্যানট্রি ব্যাটালিয়ন পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু তারা পাঠালো মাত্র পাঁচ ব্যাটালিয়ন। আমি ভেবেছিলাম পরবর্তী তিন ব্যাটালিয়ন ঢাকায় রাখবো। কিন্তু তা আর হলো কই? পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু হওয়ার সেই প্রতিশ্রুত তিন ব্যাটালিয়ন আর এলো না। এদিকে বিভিন্ন রণাংগন থেকে আমার পক্ষে ঢাকার প্রতিরক্ষার জন্য আর সৈন্য উঠিয়ে আনা সম্ভব হলো না।

প্রশ্ন : ঢাকায় যেটুকু সৈন্য ছিল, আরও কিছুদিন তো যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করা যেতো?

জেনারেল নিয়াজী : কি ফায়দা হতো? এর ফলে আরো হত্যা, আরো সম্পত্তি ধ্বংস হতো। লাশের পাহাড় হতো। ঢাকার [illegible]গুলো পচা লাশে ভরে যেতো। চারদিকে দেখা দিতো মহামারী। অথচ শেষ পর্যন্ত একই ফলাফল হতো। আমি ৯০,০০০ যুদ্ধবন্দিকে একদিন পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হবো। তা না হলে তো ৯০,০০০ বিধবা আর প্রায় ৫ লাখ এতিম বাচ্চার মুখ আমাকে দেখতে হতো। আত্মত্যাগের কোন ফায়দা দেখিনি। ভাগ্যের লিখন তো একই থাকতো।

[সিদ্দিক সালিকের পুস্তক থেকে তথ্য সংগৃহীত]

৪৯

একাত্তরের পঁচিশে মার্চ রাতে ঢাকা শহরে তৎকালীন পাকিস্তানির সামরিক বাহিনীর হামলা শুরু হওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমানকে কিভাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং বাহাত্তরের আটই জানুয়ারি কোন্ অবস্থায় তাঁকে পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল তার সঠিক তথ্য সুদীর্ঘ এক যুগ পরেও পাওয়া মুশকিল। অবশ্য পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু নিজেই প্রখ্যাত ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের কাছে এসব তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। তবুও ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে গবেষণা হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। সে সময় ঢাকায় কর্মরত জনৈক পাকিস্তানি সামরিক অফিসারের জবানবন্দিতে শেখ মুজিবের গ্রেফতারের সারাংশ মালয়েশিয়ার ইংরেজি পত্রিকা দি 'সানডে মেইল' পত্রিকায় মুক্তিলাভের বর্ণনা এই নিবন্ধে উপস্থাপিত করছি।

একটা বিষয় আগেই নির্ধারিত ছিল যে, ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা ব্যর্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা এবং আরো কয়েকটি এলাকায় একযোগ 'এ্যাকশন' শুরু করা হবে। এই 'এ্যাকশনের' নামকরণ করা হয়েছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'। এই 'অপারেশনে' মোট ষোলটি পরিচ্ছেদে সামরিক বাহিনীর প্রতি প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী লিপিবদ্ধ ছিল। 'এ্যাকশনের' সামগ্রিক দায়িত্বে ছিলেন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী আর মেজর জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা। এদের মধ্যে রাও ফরমান আলীকে ঢাকা শহরের জন্য খাদেম হোসেন রাজাকে বাকি এলাকার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।

'অপারেশন সার্চলাইটে'র দশ নম্বর পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদেই বাড়ি ভেঙ্গে শেখসহ বাড়িতে উপস্থিত সমস্ত লোকজনকে গ্রেফতারের নির্দেশ ছিল।

পঁচিশে মার্চ বেলা এগারোটা নাগাদ মেজর জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা ঢাকার সেকেন্ড ক্যাপিটালে তার অফিসে লে. জেনারেল টিক্কা খানের কাছ থেকে ফোন পেলেন, 'খাদেম, আজ রাতেই ঘটনা।' এর অর্থ হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঢাকা ত্যাগের পর আজ রাতে 'অপারেশন সার্চলাইটের' নির্দেশ মোতাবেক 'এ্যাকশন' শুরু হবে।

১৪তম ডিভিশন হেড কোয়ার্টারের জেনারল স্টাফের নিকট থেকে প্রদেশের বিভিন্ন গ্যারিসনে জরুরি বার্তা পাঠানো হলো। ঢাকা শহরকে নিয়ন্ত্রণে আনবার জন্য রাও ফরমান আলীর অধীনে ব্রিগেডিয়ার আরবাব ৫৭তম ব্রিগেড নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলো আর খাদেম হোসেন রাজা প্রদেশের অন্যান্য গ্যারিসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে শুরু করলেন। এদিকে লে. জেনারেল টিক্কা খান স্বয়ং তার ব্যক্তিগত স্টাফ নিয়ে সেকেন্ড ক্যাপিটালে মার্শাল ল' হেড কোয়ার্টারে রাত্রি অতিবাহিত করলেন। তিনি অপারেশনের অগ্রগতির প্রতিটি মুহূর্তের খবরাখবরের জন্য উদগ্রীব রইলেন।

রাত এগারোটা নাগাদ কমান্ডিং অফিসার এবং কোম্পানি কমান্ডার মেজর বেলালের অধীনে একটা কমান্ডো প্লাটুন শেখকে গ্রেফতারের জন্য রওনা হলো। সেকেন্ড ক্যাপিটালের হেড কোয়ার্টারে বসেই রকেট নিক্ষেপের আওয়াজ পাওয়া গেলো। এরা প্রথমেই রকেট বর্ষণ করে মীরপুর রাস্তার সমস্ত ব্যারিকেড উড়িয়ে দিল। বিদ্যুৎগতিতে এই কমান্ডো প্লাটুন শেখ সাহেবের বাড়ি ঘেরাও করে ফেললো। পঞ্চাশ জন্য কমান্ডো চার ফুট উঁচু দেয়ালের উপর উঠে প্রথমে স্টেনগান থেকে বাড়িটার দিকে এক ঝাঁক গুলিবর্ষণ করলো। এরপর বাড়ির আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে নিজেদের উপস্থিতি ঘোষণা ছাড়াও শেখ সাহেবকে বেরিয়ে আসার জন্য বললো। দোতলায় উঠে কমান্ডোরা শেখের শোয়ার ঘরের দরজায় গুলি করতেই উনি বেরিয়ে এলেন। মনে হলো উনি গ্রেফতারের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। কমান্ডোরা বাড়ির সবাইকে আটক করলো। এর মিনিট খানেকের মধ্যেই ওয়ার্লেসে মেজর জাফরের গলার স্বর ভেসে এলো, 'বড় পাখি খাঁচায় ...বাকি পাখিরা বাসায় নেই...ওভার।'

এরপর সাদা পাঞ্জাবি পরিহিত 'বড় পাখিকে' একটা সামরিক জিপে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় নিয়ে যাওয়া হলো। সেকেন্ড ক্যাপিটালের হেডকোয়ার্টারে কে যেন বললো, জেনারেল টিক্কা খান চাইলে শেখকে তার সামনে হাজির করা যায়। টিক্কা খান বলেন, 'আমি ওনার মুখ দেখতে চাই না।'

রাতের জন্য শেখ সাহেবকে আদমজী হাই স্কুলে রাখার ব্যবস্থা করে তাঁর গৃহভৃত্যদের মুক্তি দেয়া হলো। এর পরদিন তাঁকে ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউসে স্থানান্তরিত করা

হলো এবং তিন দিন পরে তাঁকে বিমানযোগে করাচি নিয়ে যাওয়া হলো। পরে একদিন মেজর বেলালকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'গ্রেফতারের হৈচৈয়ের মধ্যে কেনো শেখকে খতম করা হলো না?' মেজর বেলাল জবাব দিয়েছিলেন, 'জেনারেল মিঠা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ওঁকে জীবিত অবস্থায় আটক করতেই হবে।'

(সিদ্দিক সালিক– 'উইটনেস টু সারেন্ডার' পুস্তক থেকে সংক্ষিপ্তাকারে উদ্ধৃতি)।

মুজিবের মুক্তিলাভ

"আজ (৮ই জানুয়ারি ১৯৭২) খুব ভোরে শেখ মুজিবুর রহমান রাওয়ালপিন্ডি থেকে লন্ডনে এসে পৌঁছেছেন। লন্ডন বিমানবন্দরের ভিআইপি লাইঞ্জে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ্ অফিসের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। আগেই তাঁকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

মাত্র এক বছর আগে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবের পার্টির চাঞ্চল্যকর জয়লাভের ফলে দেশের পূর্বাঞ্চলে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল, তারই চরম পরিণতিতে এই নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে।

পাকিস্তানের তৎকালীন সৈনিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে গত মার্চ মাস থেকে পূর্ব পাকিস্তানে হত্যাকাণ্ডের 'এ্যাকশন' শুরু হবার পর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী শেখকে গ্রেফতার করেছিল।

বিশেষ বিমানটি লন্ডন বিমানবন্দরে অবতরণ না করা পর্যন্ত ঢাকা অথবা নয়াদিল্লির কর্তৃপক্ষ শেখের গন্তব্য সম্পর্কে কিছুই জানতো না। কারণ শেখের বহনকারী বিশেষ বিমানটি রাওয়ালপিন্ডি ত্যাগ করার কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত এক গন্তব্যস্থলের কোন খবর ছিল না। রেডিও পাকিস্তানের খবরে বলা হয়েছিল যে, পাকিস্তান সরকারের চার্টার্ড করা বিমানে শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানি সময় ভোর তিনটায় (মালয়েশীয় সময় সকাল সাড়ে পাঁচটা) রাওয়ালপিন্ডি ত্যাগ করেছেন।

রেডিওর ঘোষণায় আরও বলা হয়েছে যে, শেখ মুজিব এই মর্মে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে যে, তিনি কোথায় যাচ্ছেন এ ব্যাপারে যেনো কিছুই বলা না হয়। তিনি নিজে পরে ঘোষণা করবেন। শেখের এই ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে।

রয়টার থেকে ঢাকায় রেডক্রস কর্মকর্তা ও বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তাঁরাও এ ব্যাপারে কিছুই অবহিত নন বলে জানান। রেডিও পাকিস্তানের সংবাদের একটু অতিরিক্ত তথ্য হচ্ছে যে, নয়া প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো রাওয়ালপিন্ডি বিমানবন্দরে শেখকে বিদায় সংবর্ধনা জানিয়েছেন।

এদিকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ আজ (৮ই জানুয়ারি) এই মর্মে প্রেসিডেন্ট ভুট্টোকে হুশিয়ারি দিয়েছেন যে, উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তির খাতিরে অবিলম্বে শেখ মুজিবকে দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয় হবে।

৫১ বৎসর বয়স্ক শেখকে গ্রেফতারের পর গোপনে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং পরে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতার' অভিযোগে বিচার করা হয়।

যুদ্ধ শেষে প্রেসিডেন্ট ভুট্টো ক্ষমতা নেয়ার পর শেখ মুজিবকে ২২শে ডিসেম্বর কারাগার থেকে এনে একটা গৃহে আটক করে রাখা হয়।"

(সানডে মেইল, মালয়েশিয়া, ৯ই জানুয়ারি, ১৯৭১)

"গত রাতে (৮ই জানুয়ারি) ১০ নম্বর ডাইনিং স্ট্রিটে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মি. হিথ-এর সঙ্গে এক ঘণ্টাকাল বৈঠকের সময় শেখ মুজিব স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ব্রিটেন কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্ন উত্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী এ মর্মে বিশ্লেষণ করেন যে নয়া সরকারকে আশ্বাস দিতে হবে যে, পরিস্থিতি তাঁদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং তাঁদের প্রতি দেশের অধিকাংশ লোকের সমর্থন রয়েছে। অবশ্য মি. হিথ পরিষ্কারভাবে শেখ মুজিবকে বুঝাতে পেরেছেন যে, বাংলাদেশের প্রতি ব্রিটেন খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ। হোয়াইট হলে সবার মনে ধারণা, অদূর ভবিষ্যতে ব্রিটেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করবে।

এই বৈঠকে বেশ আন্তরিকতা ও হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। শেখ সাহেব যেসব ঘটনার প্রেক্ষাপটে এই যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেসব ঘটনাবলীর বিস্তারিত তথ্য জানিয়েছেন। পাকিস্তানের কারাগারে যখন বন্দি হিসাবে চরম শাস্তির জন্য দিন অতিবাহিত করছিলেন তখন তাঁর জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে মি. হিথ যে প্রচেষ্টা নেন, শেখ মুজিব তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরে শ্রমিক নেতা উইলসন প্রায় তিরিশ মিনিটব্যাপী সৌজন্য সাক্ষাৎকারের শেখ মুজিবের সঙ্গে মিলিত হন।"

(দি সানডে টাইমস, লন্ডন, ৯ই জানুয়ারি ১৯৭২)

৫০

[বাংলাদেশ স্বাধীন হবার অব্যবহিত পরেই নিউইয়র্কের ডব্লিউ এন ই ডব্লিউ-টিভি কোম্পানির পক্ষ থেকে 'দি ডেভিড ফ্রস্ট শো'তে প্রচারের উদ্দেশ্যে (১৮ই জানুয়ারি, ১৯৭২) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রখ্যাত সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টকে ঢাকায় পাঠানো হয়।

এই সাক্ষাৎকারে একাত্তরের পঁচিশে মার্চ দিবাগত রাতে শেখ সাহেব কিভাবে গ্রেফতার হয়েছিলেন, নিজেই তার বিবরণ দিয়েছেন। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর শেখ মুজিব তখন কেবলমাত্র দেশে ফিরে এসেছেন। প্রাসঙ্গিক হবে মনে করে সেই সাক্ষাৎকারের অংশ বিশেষ এখানে দেয়া হলো। –লেখক]

ডেভিড ফ্রস্ট : ...যে রাতে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী আক্রমণ শুরু করলো, তখন তো আপনি বাসায় ছিলেন। আমার মনে হয় আপনি ফোনে খবর পেয়েছিলেন যে সৈন্যরা শহরের দিকে রওয়ানা হয়েছে। তাহলে কেন আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন বাসায় অবস্থান করে গ্রেফতার হবার জন্য?

শেখ মুজিব : দেখুন, এখানে খুবই মজার ও অদ্ভুত কাহিনী রয়েছে। সেদিন সন্ধ্যা থেকেই কমান্ডোরা আমার বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছিল এবং তারা আমাকে হত্যা করতেই চেয়েছিল। ...আমি জানি যে, ওরা খুবই বর্বর এবং ওদের মধ্যে সভ্যতার লেশমাত্র নেই। ওদের উদ্দেশ্য ছিল আমার সমস্ত লোকদের হত্যা করা। তারা একটা গণহত্যা করবে। আমি ভাবলাম, আমি যদি মৃত্যুকে বেছে নেই, তাহলে যে জনসাধারণকে এতো ভালবাসি তারা অন্তত রক্ষা পাবে।

ডেভিড ফ্রস্ট : আপনি তো সম্ভবত কোলকাতাতেও চলে যেতে পারতেন।

শেখ মুজিব : আমি যদি তৈরি থাকতাম, তাহলে আমি যে কোন জায়গাতে যেতে পারতাম। কিন্তু আমার লোকদের পিছনে ফেলে রেখে তা কেমন করে সম্ভব। আমি একটা জাতির নেতা। আমি যুদ্ধ করে মৃত্যুকে বেছে নিতে পারি। আমি সবাইকে প্রতিরোধের আহ্বান জানালাম।

ডেভিড ফ্রস্ট : নিশ্চয়ই আপনি সঠিক পথ বেছে নিয়েছিলেন। আর এজন্যই গত ন'মাস ধরে গণমানসে আপনি এতো উচ্চাসন লাভ করেছেন। জনসাধারণ আপনাকে প্রায় মহামানব হিসাবে দেখে।

শেখ মুজিব : আমি তা বলি না। কিন্তু আমি বলি যে, তারা আমাকে ভালবাসে। আমি তাদের ভালবাসি এবং তাদের জীবন বাঁচাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এই বর্বরগুলো আমাকে গ্রেফতার করে আমার বাড়ি ধ্বংস করেছে। আমার বাপ-মা যে গ্রামের বাড়িতে ছিল ওরা সেই বাড়িও ধ্বংস করেছে। আমার পিতার বয়স এখন ৯০ বছর এবং মায়ের বয়স ৮০। তাঁরা গ্রামে আমাদের পূর্বপুরুষদের বাড়িতে বসবাস করতো। কিন্তু সেখানেও সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়েছিল। আমার পিতা-মাতাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে তাঁদের চোখের সামনে বাড়িটা পোড়ানো হয়েছে। তারা হলো গৃহহীন। ভোরেই সৈন্যবাহিনীর লোকেরা সব কিছুকেই ভস্মীভূত করেছে।

আমি মনে করেছিলাম যে, আমাকে যদি ওরা গ্রেফতার করতে পারে, তাহলে অন্তত ওরা আমার ভাগ্যাহত জনসাধারণকে নির্বিচারে হত্যা করবে না। কিন্তু আমি জানতাম যে, আমার পার্টি যথেষ্ট শক্তিশালী। জনতার সমর্থনে আমি এমন একটা পার্টি সংগঠিত করেছি, যারা পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে সক্ষম। আমি বলেছিলাম, তোমরা প্রতিটি ইঞ্চির জন্য সংগ্রাম করবে। আমি একথাও বলেছিলাম যে, তোমরা মুক্তি অর্জন না করা পর্যন্ত (সম্ভবত এটাই আমার শেষ নির্দেশ) তোমরা লড়াই চালিয়ে যাও।

ডেভিড ফ্রস্ট : ওরা আপনাকে কোন্ অবস্থায় গ্রেফতার করলো? তখন তো রাত দেড়টা ছিলো– তাই না? এরপর কি হয়েছিল?

শেখ মুজিব : ওরা প্রথমেই মেশিনগান থেকে আমার বাড়ির দিকে গুলিবর্ষণ করলো।

ডেভিড ফ্রস্ট : আপনি তখন কোথায় ছিলেন? আর ওরা কখন এসে হাজির হলো?

শেখ মুজিব : আমার শোবার ঘরে আমি বসেছিলাম– এটাই হচ্ছে আমার শোয়ার ঘর। ওরা ঐ পাশ থেকে মেশিনগানের গুলি শুরু করলো। এদিকটাতেও কয়েকটা মেশিনগান ছিল। ওরা জানালায় গুলি করলো।

ডেভিড ফ্রস্ট : তাহলে এসব কিছু ধ্বংস হলো?

শেখ মুজিব : সব কিছুই বিনষ্ট হলো। আমি আমার পরিবারকে নিয়ে এখানেই অবস্থান করছিলাম। আমার ছয় বছরের বাচ্চা বিছানায় ঘুমাচ্ছিল। আর আমার স্ত্রী দুটো ছেলেকে নিয়ে এ ঘরেই ছিল।

ডেভিড ফ্রস্ট : পাকিস্তানি সৈন্যরা কোন্ দিক দিয়ে এসে ঢুকলো?

শেখ মুজিব : সব দিকে দিয়েই। ওরা জানালা লক্ষ্য করে গুলি করতে লাগলো।

তখন আমি স্ত্রীকে দুটো ছেলেকে নিয়ে এখানে বসে থাকতে বসলাম। আর আমি ঘরের বাইরে এলাম।

ডেভিড ফ্রস্ট : আপনার স্ত্রী তখন কি বললো?

শেখ মুজিব : একটা শব্দও করলো না। বিদায়ের প্রাক্কালে আমি ওকে চুমু খেলাম। আমি দরজা খুলে বেরিয়ে এসেই সৈন্যদের গুলি থামাতে বললাম। আমি চিৎকার করে উঠলাম, গুলি বন্ধ কর। এই যে, আমি এখানে। কেনো তোমরা গুলি করছো? কিসের জন্য? তখন খোলা বেয়োনেট হাতে চার্জ করার জন্য সৈন্যরা সবদিক দিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এলো। আমার কাছেই দাঁড়িয়ে একজন অফিসার। সে আমাকে ধরে ফেলেই হুকুম দিল ওকে হত্যা করো না।

ডেভিড ফ্রস্ট : কেবল একজন অফিসার ওদের থামাতে পারলো?

শেখ মুজিব : হ্যাঁ। এরপর ওরা আমাকে নিয়ে চললো। ওরা আমাকে এই জায়গা থেকে হেঁচড়ে নিতে শুরু করলো। আর আমার পিছনের দিকে ঘুষি মারা ছাড়াও আগ্নেয়াস্ত্রের কুঁদা দিয়ে গুঁতোতে লাগলো। আর্মি অফিসার আমার হাত ধরে রাখা সত্ত্বেও সৈন্যরা আমাকে নিচে নেয়ার জন্য টানতে লাগলো। আমি চিৎকার করে উঠলাম 'আমাকে টানাটানি করো না। দাঁড়াও আমি আমার পাইপ আর তামাক নিয়ে আসি। না হলে আমার স্ত্রীকে ওসব নিয়ে আসতে দাও। পাইপ আমাকে সঙ্গে নিতে হবে।'

এরপর আমি আবার ঘরে এলাম। দেখলাম আমার স্ত্রী দুটো ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরা আমাকে পাইপ আর একটা ছোট স্যুটকেস দিল। আমি চলে এলাম। দেখলাম আশপাশে আগুন জ্বলছে। এখান থেকে ওরা আমাকে নিয়ে গেলো।

ডেভিড ফ্রস্ট : আপনি যখন এই ৩২ নম্বর ধানমণ্ডির এই বাসা ছেড়ে চললেন, তখন কি আপনার একবারও মনে হয়েছিল যে, আবার আপনি এখানে ফিরে আসতে পারবেন?

শেখ মুজিব : না, আমি ফিরে আসার কথা চিন্তাও করিনি। আমার মনে হয়েছিল এই আমার শেষ যাত্রা। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল যে, মাথা উঁচু করে যদি মৃত্যুকে বরণ করতে পারি তাহলে আমার দেশবাসীর লজ্জার কিছুই থাকবে না। কিন্তু নীতির প্রশ্নে আমি যদি আত্মসমর্পণ করি, তাহলে আমার দেশবাসী সারা বিশ্বে আর মুখ দেখাতে পারবে না। জনসাধারণের সম্মান অক্ষুণ্ন রেখে মৃত্যুকে বরণ করা অনেক শ্রেয়।

ডেভিড ফ্রস্ট : আপনি একবার বলেছিলেন, 'যে লোক মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত তাকে হত্যা করা হয় না, তাই-ই না?'

শেখ মুজিব : আমি তাদের বলেছিলাম, যে ব্যক্তি মৃত্যুর জন্য তৈরি, কেউই তাঁকে হত্যা করতে পারে না। আপনি দৈহিকভাবে একজন মানুষকে হত্যা করতে পারেন, কিন্তু তাঁর আত্মাকে হত্যা করা যায় না। এটা আমার বিশ্বাসের অংগ। আমি একজন মুসলমান এবং একজন প্রকৃত মুসলমানের মৃত্যু একবারই হয়– দুইবার নয়।

আমি একজন মানুষ। তাই আমি মানবাত্মাকে ভালবাসি। আমি এই জাতির নেতা। এঁরা আমাকে ভালবাসে, আমিও এঁদের ভালবাসি। এখন এঁদের কাছ থেকে আমার পাওয়ার আর কিছুই নেই। তাঁরা আমার জন্য সর্বস্ব দিয়েছে। কারণ আমিও সব কিছু দিতে প্রস্তুত ছিলাম। আমি এঁদের মুক্ত করতে চেয়েছিলাম। এখন আর আমার

মৃত্যু ভয় নেই। ....আমি এঁদের সুখী দেখতে চাই।...

ডেভিড ফ্রস্ট : আমি জানতে পেরেছি যে, যখন ইয়াহিয়া খান জনাব ভুট্টোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করছিল তখনও নাকি বলেছিল যে, আপনাকে ফাঁসি দেয়া উচিত ছিল। একথা কি সত্য?

শেখ মুজিব : নিখুঁত সত্য। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে মজার ঘটনা ভুট্টো নিজেই আমাকে এই ঘটনার কথা বলেছে। ইয়াহিয়া খান তাঁকে বলেছিল, 'আমি শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা না করে সবচেয়ে বড় ভুল করেছি।'

ডেভিড ফ্রস্ট : এ কথা বলেছিল?

শেখ মুজিব : হ্যাঁ, ভুট্টো আরও বলেছে যে, ইয়াহিয়া তাঁকে অনুরোধ করেছিল, 'ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে আমাকে দয়া করে একটা ব্যাপার করতে দেয়া হোক। আগের কোনো তারিখের আদেশ দেখিয়ে মুজিবুর রহমানকে ফাঁসি দেয়ার অনুমতি দেয়া হোক।' কিন্তু ভুট্টো এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিল।

ডেভিড ফ্রস্ট : ভুট্টো জবাবে কি বলেছিল, সে কথা কি আপনাকে বলেছিল?

শেখ মুজিব : হ্যাঁ।

ডেভিড ফ্রস্ট : ভুট্টো কি জবাব দিয়েছিল?

শেখ মুজিব : ভুট্টো বলেছিল, "আমি এটা করতে দিতে পারি না। কেননা তখন এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হবে। এক লাখ কুড়ি হাজার সামরিক বাহিনীর সদস্য ও বেসামরিক ব্যক্তি বেঙ্গলকে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্মিলিত ফোর্সের হাতে আটক রয়েছে। এছাড়া পাঁচ থেকে দশ লাখ অবাঙালি বাংলাদেশে বসবাস করছে। যদি আপনি মুজিবুর রহমানকে এখন হত্যা করেন এবং আমি ক্ষমতা গ্রহণ করি, তাহলে আর কোন দিন বেঙ্গল থেকে একজনও পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে আসতে পারবেন না। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হবে এবং তা আমার জন্য খুবই 'বিরূপ অবস্থার সৃষ্টি করবে।' আমি ভুট্টোর কাছে বেশ কৃতজ্ঞ। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

ডেভিড ফ্রস্ট : আপনি যদি আজ ইয়াহিয়া খানের মুখোমুখি হন, তাহলে আপনি কি বলবেন?

শেখ মুজিব : সে একজন অপরাধী। আমি তার ফটো পর্যন্ত দেখতে চাই না। সে তার সৈন্যবাহিনী দিয়ে বাংলাদেশের ৩০ লাখ লোককে হত্যা করেছে।

৫১

চরমপত্রে স্মৃতিচারণ লেখার যখন প্রায় শেষ পর্যায় তখন অনুরোধ এসেছে, একাত্তরের নয় মাসকাল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আসলে অবস্থাটা কিরকম ছিল আর 'বিচ্ছু পোলাপানরা' কিভাবে লড়াই করেছিল সে সম্পর্কে বিস্তারিত লেখার জন্য। সত্যিকারভাবে বলতে গেলে, স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের 'চরমপত্রে'র লেখক ও পাঠক হিসাবে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সেক্টর ছাড়াও দেশের সব অঞ্চল থেকে অনেক খবরই আমার কাছে পৌছাতো। এছাড়া আমি তখন ছিলাম মুজিবনগর সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রচার অধিকর্তা। তাই স্বাভাবিকভাবে সরকারি সূত্রের খবরও আমার হাতে আসতো। উপরন্তু বিদেশী পত্র-পত্রিকা নিয়মিতভাবে আমার দফতরে পাঠানো হতো। কিন্তু এতগুলো বছর পরে একাত্তরে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় স্থানীয়ভাবে লড়াই

এবং হামলার বিস্তারিত তথ্য আমার পক্ষে উপস্থাপিত করা সম্ভব নয়। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একসূত্রে গাঁথা থাকলেও প্রতিটি জেলার লড়াইয়ের নিজস্ব একটা স্বকীয়তা ছিল।

ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে শত্রু পক্ষের হামলা প্রতিরোধ এবং পাল্টা আঘাত হানার পরিকল্পনা সবকিছুই মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ৬/৭ মাস পর্যন্ত জেলাভিত্তিক এবং অনেক জায়গায় মহকুমাভিত্তিকভাবে গড়ে উঠেছিল। এটা নিঃসন্দেহে রিসার্চের বিষয়বস্তু।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এরকম ব্যক্তি বিশেষ কিংবা ব্যক্তিবর্গকে দিয়ে এ ধরনের কাজ সম্পন্ন করা যথার্থ হবে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এ ব্যাপারে আজও পর্যন্ত কোন সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি বললেই চলে।

প্রাসঙ্গিক হবে বিধায় এখানে নিজের দুটো অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করতে চাই। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭৩ সালে আমি 'চরমপত্র' প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির দ্বারস্থ হয়েছিলাম। কিন্তু একাডেমির তৎকালীন কর্তৃপক্ষ 'চরমপত্র' পুস্তকাকারে প্রকাশে মৌখিকভাবে অস্বীকৃতি জানায়। আবার ১৯৭৯ সালে 'চরমপত্রের' পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য তৎকালীন সরকারের নিকট আমার পক্ষে মরহুম হাসান হাফিজুর রহমান সুপারিশ করেছিলেন। এবারও কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে অপারগতা জ্ঞাপন করেন।

যাক যা বলছিলাম। বিস্তারিতভাবে সবকিছু বলা সম্ভব না হলেও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্তভাবে কিছু ঘটনা উপস্থাপিত করছি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় সর্বপ্রথম মুজিবনগর সরকারের নিয়ন্ত্রণে মুক্তি বাহিনীকে সংগঠিত করা হয়। পরবর্তীকালে মুজিবনগর সরকারের আওতাতেই লড়াইয়ের ময়দানে মুজিববাহিনীর আবির্ভাব হয়। কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রতিটি এলাকাতেই স্থানীয়ভাবে বেশ কিছু বাহিনী বা দল গড়ে উঠেছিল। শত্রুর হাত থেকে অস্ত্র দখল করে এরা নিজেদের সংগঠিত করেছিল। মানিকগঞ্জে ক্যাপ্টেন হালিম চৌধুরীর দল, টাঙ্গাইলে কাদেরিয়া বাহিনী, গোপালগঞ্জে হেমায়েত বাহিনী, গফরগাঁওয়ে আফসান বাহিনী ছাড়াও বহু জানা-অজানা গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। সবারই লক্ষ্য ছিল এক ও অভিন্ন– বাংলাদেশকে স্বাধীন করা। এই জানা-অজানা বাহিনী ও গোষ্ঠীর কত তরুণ যে এই যুদ্ধে আত্মাহুতি দিল তার তা' কোন হিসাব দেখি না? এরা নিম্নমধ্যবিত্ত আর গ্রামের সন্তান বলেই কি এই অবহেলা?

ঢাকা শহরে এদের দুঃসাহসী অভিযান শুরু হয় একাত্তরের অক্টোবর মাসে। ১১ই অক্টোবর গভীর রাতে ঢাকার পুরনো এয়ারপোর্টের কাছে মর্টারের দুটো শেল এসে বিস্ফোরিত হলে শত্রু পক্ষ হতচকিত হয়। এরপরের ঘটনা ২৩শে অক্টোবর সবাইকে স্তম্ভিত করে প্রাক্তন গভর্নর মোনেম খানের হত্যাকাণ্ড। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের পার্শ্ববর্তী বনানী আবাসিক এলাকায় স্বীয় বাসভবনের ড্রইং রুমে বসে তিনি জনৈক প্রাক্তন মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করছিলেন। পাশেই নৌবাহিনীর সদর দফতর। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের একটা দল অসীম সাহসিকতার সঙ্গে দিনের বেলায় আক্রমণ করলো। প্রাক্তন গভর্নর মোনেম খানকে হত্যা করে এরা কোনরকম ক্ষয়-ক্ষতি ছাড়াই পালিয়ে গেলো। পরে শুনেছিলাম ওরা কার্য সমাধার পর গুলশানের লেকে এসে নৌকাযোগে বাড্ডা গিয়ে নিরাপদ এলাকায় চলে গিয়েছিল।

দিন কয়েক পরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ডা. মালেক মন্ত্রিসভার জনৈক সদস্যদের গাড়ি বিধ্বস্ত হলো। এরপর অক্টোবর মাসেই ঢাকার মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় বিচ্ছুদের এ্যাকশনে পাঁচজন নিহত ও তেরোজন গুরুতররূপে আহত হলে কর্তৃপক্ষ বিচলিত হয়ে পড়লো। কিন্তু স্থানীয় গেরিলারা ঢাকায় তাঁদের হামলা অব্যাহত রাখলো। স্ট্রেট ব্যাংক, যাত্রাবাড়ী ব্রিজ, ডিআইটি ভবনে টিভি স্টেশন আর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে বোমাবাজি হলো। বিশ্বের পত্র-পত্রিকায় এসব খবর ফলাও করে ছাপা হলো।

এর পরের ঘটনা আরো চাঞ্চল্যকর ও ভয়াবহ। ঢাকার অদূরে সিদ্ধিরগঞ্জে বিদ্যুৎ কেন্দ্র গেরিলাদের আক্রমণে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে অবিলম্বে তা মেরামতের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কর্তৃপক্ষ বাঙালি প্রকৌশলীদের বিশ্বাস করতে পারছে না বলে পশ্চিম পাকিস্তান 'ওয়াপদা' থেকে জরুরি ভিত্তিতে পাঁচজন প্রকৌশলীর একটা দলকে আনা হলো। এদের মধ্যে ছিলেন দু'জন সহকারী ইঞ্জিনিয়ার, একজন লাইন সুপারিন্টেনডেন্ট, একজন সহকারী ফোরম্যান এবং একজন লাইনম্যান। তারিখটা ছিল ৩০ অক্টোবর দিনের বেলা। হঠাৎ গুলির আওয়াজ শুনে প্রহরারত পুলিশ ও রাজাকারের দল কয়েক মিনিটের মধ্যে পলায়ন করলো। পশ্চিম পাকিস্তানি পাঁচজন প্রকৌশলীই এই হামলায় নিহত হলো। মাত্র ২৪ ঘণ্টা পরে এই পাঁচজনের লাশ বিমানে করাচিতে ফিরে গেলো।

এদিকে মফস্বল এলাকায় নতুন ধরনের উপসর্গ দেখা দিল। তা হচ্ছে রাজাকারদের মধ্যে মনোবলের অভাব। উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী ও বগুড়ার কোন কোন এলাকায় রাজাকাররা প্রকাশ্যেই মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সমঝোতার প্রস্তাব করলো। তখন সন্ধ্যার পর বাংকার এবং ক্যাম্প থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদের বাইরে যাতায়াত (নির্দেশ জারি করে) বন্ধ হয়ে গেছে। সন্ধ্যার পর শান্তি ও শৃংখলার দায়িত্ব পুলিশ ও রাজাকারদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে। ভীতসন্ত্রস্ত রাজাকারদের প্রস্তাব হচ্ছে, সন্ধ্যার পর মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা হামলার জন্য এলে রাজাকাররা তাদের কোন রকম 'অসুবিধা' করবে না। এর বদলে রাজাকারদের প্রাণে রক্ষা করতে হবে।

এখানে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ ও লৌহজং থানার ঘটনার উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হবে। লৌহজং থানা পাহারার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ ও রেঞ্জার্সের তিরিশ জন সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে ৫৭ জন স্থানীয় রাজাকার মোতায়েন ছিল। ২৮শে অক্টোবর রাতে হঠাৎ করে দেখা গেলো এই ৫৭ জন উধাও হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানি সশস্ত্র পুলিশের দল একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। পরদিন রাতে ২৯শে অক্টোবর মুক্তিবাহিনী লৌহজং থানা আক্রমণ করে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করলো। ৩০ জন পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশই নিহত হলো।

একই দিনে ঢাকার নবাবগঞ্জে থানা আক্রান্ত হলো। এখানে থানা প্রহরার জন্য মোট ৩৯ জন রাজাকার ছিল। কিন্তু আশপাশের ঘটনায় এরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো। ২৯শে অক্টোবর সকালে দেখা গেলো ৩২ জন রাজাকার পলায়ন করেছে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা নবাবগঞ্জ থানা আক্রমণ করলে বাকি সাত জন আত্মসমর্পণ করলো। অচিরেই বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই একই ধরনের ঘটনা অনুষ্ঠিত হলো। মুজিবনগর সরকারের হিসাব মতো নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে

সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রায় পাঁচ হাজার বর্গমাইল এলাকা মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এছাড়া দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থানীয় বাহিনীগুলো বিরাট এলাকা মুক্ত করে নিজেদের প্রশাসন ব্যবস্থা পর্যন্ত কায়েম করেছে। তাই মুক্তিবাহিনীর পক্ষে দেশের অভ্যন্তরে যাতায়াত ও সংসদ আদান-প্রদান ছাড়াও নিরাপদে শিবির স্থাপন পর্যন্ত সম্ভবপর হয়েছে। অনেকের মতে যেভাবে যুদ্ধ জোরদার হচ্ছিল তাতে ১৯৭২ সালের শেষ নাগাদ মুক্তিবাহিনীর পক্ষে একাই দেশ স্বাধীন করা সম্ভব হতো।

এই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই পাকিস্তানি বাহিনীর অধিনায়ক সর্বাত্মক যুদ্ধের 'স্ট্রাটেজি' গ্রহণ করলো। এই 'স্ট্রাটেজি' অনুসারে বাংলাদেশের দশটি শহরে যথাক্রমে যশোর, ঝিনাইদহ, বগুড়া, রংপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, ভৈরববাজার, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে দুর্গ সৃষ্টির মাধ্যমে অবস্থান দৃঢ় করতে হবে। এসব দুর্গে কমপক্ষে সৈন্যদের জন্য ৪৫ দিনের রেশন ও ৬০ দিনের জন্য লড়াই চালাবার মতো গোলাবারুদ মজুত রাখতে হবে। এছাড়া হিলি দিয়ে ভারতীয় এলাকা আক্রমণ করতে হবে এবং রাজশাহী থেকে ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য সীমান্তের ওপারে কমান্ডো পাঠাতে হবে।

অন্যদিকে জেনারেল নিয়াজী তার সৈন্য বাহিনীকে পাঁচটি কমান্ডের অধীনে সংগঠিত করলো।

১. ঢাকা সেক্টর : লে. জেনারেল নিয়াজীর সরাসরি অধীনে। হেড কোয়ার্টার : ঢাকা।

২. যশোর সেক্টর : মেজর জেনারেল এম এইচ আনসারীর অধীনে। হেডকোয়ার্টার : যশোর। ১০৭তম ব্রিগেড যশোরে, ৫৭তম ব্রিগেড যশোরে, ৫৭তম ব্রিগেড ঝিনাইদহে এবং আর্টিলারির দুটো ফিল্ড রেজিমেন্ট ও একটি আর এ্যান্ড এস ব্যাটেলিয়ন।

৩. নর্থ বেঙ্গল সেক্টর : মেজর জেনারেল হোসেন শাহের অধীনে। হেডকোয়ার্টার : নাটোর। ২৩তম ব্রিগেড রংপুরে, ২০৫তম ব্রিগেড বগুড়ায় এবং আর্টিলারির একটা ফিল্ড রেজিমেন্ট, দুটোর মর্টার ব্যাটারিজ, একটা আর এ্যান্ড এস ব্যাটেলিয়ন ও একটা আর্মড রেজিমেন্ট।

৪. ইস্টার্ন বর্ডার সেক্টর : মেজর জেনারেল আবদুল মজিদ কাজীর অধীনে। হেডকোয়ার্টার : ঢাকা। কুমিল্লায় ১১৭তম ব্রিগেড, ময়মনসিংহে ২৭তম ব্রিগেড, সিলেটে ২১২তম ব্রিগেড এবং আর্টিলারির একটি ফিল্ড রেজিমেন্ট, দুটো মটার ব্যাটারিজ ও চারটা ট্যাংক।

৫. চিটাগাং সেক্টর : ব্রিগেডিয়ার আতাউল্লার অধীনে। হেডকোয়ার্টার : চট্টগ্রাম। স্থল বাহিনী ছাড়াও সমগ্র নৌবাহিনী।

এছাড়াও জেনারেল নিয়াজী আরও দুইটি অস্থায়ী ডিভিশন গঠন করলেন। প্রথমটি মেজর জেনারেল জমসেদের অধীনে ঢাকায় এবং দ্বিতীয়টি ডেপুটি মার্শাল ল' এ্যাডমিনিস্ট্রেটর মেজর জেনারেল রহিম খানের অধীনে চাঁদপুরে।

এসব সেক্টরগুলোতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতার জন্য প্রায় ৫০ হাজার পুলিশ ছাড়াও প্রায় ৭৩ হাজার প্যারামিলিশিয়াকে জমায়েতের নির্দেশ দেয়া হলো। এছাড়া বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীও সম্ভাব্য সাহায্যের জন্য তৈরি হলো।

এটা হলো একাত্তরের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের অবস্থা।

একাত্তরের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশের অভ্যন্তরের চিত্রের কিছুটা বর্ণনা আগেই দিয়েছি। মেজর জেনারেল নিয়াজী পাঁচটি স্থায়ী এবং দুটি অস্থায়ী কমান্ডের অধীনে তার সমস্ত সৈন্যবাহিনী ও প্যারামিলিশিয়াকে মোতায়েন করে নির্দেশ জারি করলেন যে, 'কমপক্ষে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ সৈন্য হতাহত না হওয়া পর্যন্ত কোন পজিশন থেকে পশ্চাদপসরণ করা যাবে না। এর পরেও পশ্চাদপসরণ করার আগে সংশ্লিষ্ট জি ও পি'র অনুমতি নিতে হবে।'

এক বেসামরিক হিসাবে দেখা যায় যে, একাত্তরের এপ্রিল মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত অর্থাৎ পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রায় ৩৩ দিন আগে পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষে পাকিস্তান সৈন্য বাহিনীর প্রায় ৪০০ অফিসারসহ চার হাজার সৈন্য নিহত এবং ৭/৮ হাজার আহত হয়েছে। এছাড়া এসব সংঘর্ষে পশ্চিম পাকিস্তান আর্মড পুলিশ, রেঞ্জার্স, গিলগিট স্কাউট এবং রাজাকারদের প্রায় কুড়ি হাজার হতাহত হয়েছে। একাত্তরের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এমন একটা অবস্থা বিরাজ করছিল, যখন মাগরেবের আজানের পর কোন বাংকার বা ক্যাম্প থেকে পাকিস্তান সৈন্যদের বাইরে আসা বন্ধ হয়ে গেছে। অর্থাৎ রাতের অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের কয়েকটা শহরাঞ্চল, ক্যান্টনমেন্ট আর মেইন ক্যাম্পগুলো ছাড়া বাকি সমস্ত এলাকাতে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা ঘোরাফেরা করতে সক্ষম।

এ সময় সীমান্তবর্তী প্রায় পাঁচ হাজার বর্গমাইল এলাকা মুক্ত করে মুক্তিবাহিনী তাঁদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে। আট নম্বর ও নয় নম্বর সেক্টরের বিরাট এলাকায় পাকিস্তানি সৈন্যরা আর টহল দিতে সাহসী নয়। রাজশাহী, দিনাজপুর ও রংপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায় একই অবস্থা বিদ্যমান। পাবনা, টাঙ্গাইল, মাদারীপুর, বরিশাল ও ঢাকার এলাকা বিশেষ দিনের বেলাতেও পাকিস্তানি সৈন্যদের যাতায়াত প্রায় বন্ধ।

এরকম এক পরিস্থিতিতে মেজর জেনারেল নিয়াজীর নির্দেশে পাকিস্তানি সৈন্যরা ১২ই নভেম্বর যশোর সেক্টরে কয়েকটি স্থানে মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের ওপর আঘাত হানলো। প্রথমে ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের দুটি কোম্পানি ও পরে এক স্কোয়াড্রন ট্যাংক এবং আর্টিলারির একটি ফিল্ড রেজিমেন্টের সহায়তায় ২১তম ও ৬ষ্ঠ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট এই আক্রমণে অংশগ্রহণ করলো। ভৌগোলিক কারণবশত পাকিস্তানি ট্যাংকগুলো বেশি দূর অগ্রসর হতে পারলো না।

এদিকে ২০ থেকে ২৫শে নভেম্বরের মধ্যে পাকিস্তানি সৈন্যরা সিলেটের জকিগঞ্জ ও আটগ্রাম এবং দিনাজপুরের হিলি ও পঞ্চগড় এলাকায় মুক্তিবাহিনীর অবস্থানগুলোর ওপর আক্রমণ করলো। একটা সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে সীমান্ত পর্যন্ত এলাকা পুনরুদ্ধারই এসব আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের কাছে এ মর্মে খবর ছিল যে, ট্রেনিং সমাপ্তির পর হাজার হাজার মুক্তিবাহিনী সদস্য সমস্ত দেশ ছেয়ে যাবে। কিন্তু পাকিস্তানিদের সব ক'টা আক্রমণই ব্যর্থ হলো। এদিকে কসবা-আখাউড়া সেক্টরে খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ে শুধু পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষই নয়, ভারতীয় সমরবিদদেরও স্তম্ভিত করলো।

এর পাশাপাশি দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর মনোবল দ্রুত হ্রাস পেলো। এই অবস্থায় পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষ এই মর্মে এক খবর পেলো যে, ১৯শে নভেম্বর

ঈদের দিনে মুক্তিবাহিনী দেশের অভ্যন্তরে ব্যাপক হামলা চালাবে। সংবাদের সত্যতা যাচাই না করেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কমান্ডে হুশিয়ারি বার্তা প্রেরণ করা হলো। ঢাকা থেকে ৫৩তম ব্রিগেডকে ফেনীতে এবং ডেপুটি চিফ মার্শাল ল' এ্যাডমিনিস্ট্রেটর মেজর জেনারেল রহিমকে চাঁদপুরে পাঠানো হলো। এতে ঢাকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও দুর্বল হয়ে পড়লো এবং মুক্তিবাহিনীর দলগুলো খোদ ঢাকা শহরেই বেপরোয়া এ্যাকশন শুরু করলো।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে মাটির নিচে অবস্থিত পাকিস্তানি বাহিনীর 'টেকনিক্যাল হেডকোয়ার্টারে মেজর জেনারেল নিয়াজী অন্যান্য সেনাধ্যক্ষদের নিয়ে পরামর্শ বৈঠক করলেন। দেয়ালে লাল-নীল পিন লাগানো বিরাট ম্যাপ আর টেবিলের পর টেবিল ভর্তি ওয়ারলেস ও টেলিফোন। ১৯শে নভেম্বর ঈদের দিনেই 'অর্ডার অব দি ডে' জারি ব্যবস্থা হলো : 'এখন থেকে সৈন্যরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশের অপেক্ষা না করেই শত্রুর ওপর আঘাত হানতে পারবে। সব সময় মনে রাখতে হবে যে, পশ্চাদপসরণ করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রত্যাহারের পর যাওয়ার আর জায়গা নেই। তাই সবাইকে শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে হবে।' এই পরামর্শ বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে মেজর জেনারেল জমসেদ, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী এবং রিয়ার এডমিরাল শরীফ উপস্থিত ছিলেন।

বরিশাল, পটুয়াখালী, ফরিদপুর, খুলনা, যশোর ও কুষ্টিয়া এলাকার দায়িত্বে নিয়োজিত পাকিস্তানের নবম ডিভিশনে সর্বপ্রথম 'ফাটল' সৃষ্টি হলো। মুক্তিবাহিনীর অষ্টম ও নবম সেক্টরের যোদ্ধারা বিরাট এলাকায় পাকিস্তানি সৈন্যদের ওপর অতর্কিত হামলা অব্যাহত রেখে পাকসেনাদের অবস্থান বিপর্যস্ত করে তুললো। কয়েকটি শহর এলাকা ছাড়া পাকিস্তানি সৈন্যদের যাতায়াত পর্যন্ত বিপর্যস্ত করে তুললো। এ সময় আট নম্বর ও নয় নম্বর সেক্টরের মুক্তিবাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন তৎকালীন মেজর এম এ মঞ্জুর ও মেজর এ জলিল।

৫৩

গল্লামারী। খুলনা শহরের উপকণ্ঠে যেখানে বেতারকেন্দ্রের পুরনো ট্রান্সমিটার অবস্থিত সেই জায়গার নাম। এলাকাটা একেবারে লোকালয়বিহীন। ছোট্ট রাস্তার একপাশে খুলনা বেতারকেন্দ্রে ট্রান্সমিটার ভবন আর অন্য পাশে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ আর মাঠ। এ জায়গাই হচ্ছে গল্লামারী। এক ভয়াবহ নাম।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসকাল এই গল্লামারীতে কত বাঙালিকে যে ধরে এনে হত্যা করা হয়েছে তা কেউই বলতে পারে না। প্রতিনিয়ত গল্লামারীর বীভৎস হত্যার বিবরণ যখন মুজিবনগরে এসে পৌঁছতো তখন আমরা শিউরে উঠতাম। একটা সূত্র থেকে জানতে পারলাম যে, পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের দেয়া 'আইডেন্টিটি কার্ড' বা পরিচয়পত্র বহনকারীর প্রাণে রক্ষা পাচ্ছে। অবিলম্বে নমুনা হিসাবে এ রকম কার্ড নয় নম্বর সেক্টরের জনৈক মুক্তিযোদ্ধার কাছ থেকে সংগ্রহ করে মুজিবনগরে পুনঃমুদ্রণের কথা চিন্তা করলাম। সেদিনের কথা এখনও স্পষ্ট মনে রয়েছে। বালু হক্কাক লেনে 'জয় বাংলা' পত্রিকা অফিসে বসে টাঙ্গাইল থেকে নির্বাচিত পরিষদ সদস্য জনাব আবদুল মান্নানকে সব বুঝিয়ে বলার পর তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন। দিন কয়েকের মধ্যেই তিন ভাষায় মুদ্রিত কয়েক লাখ 'কার্ড' আট এবং নয় নম্বর সেক্টর এলাকায় বিতরণের ব্যবস্থা করা হলো।

এরকম একটা 'কার্ড' জয় বাংলা পত্রিকার সম্পাদক (প্রধান সম্পাদক ছিলেন আহমদ রফিক, ছদ্মনামে মান্নান ভাই স্বয়ং) মোহাম্মদ উল্লাহ্ চৌধুরী হাতে নিয়ে বললো, 'দিন কয়েকের জন্য যশোরে শ্বশুরবাড়ি থেকে ঘুরে আসি। বেচারী বউটা আর ছেলেমেয়েগুলো বড্ড কষ্টে আছে।' মোহাম্মদ উল্লাহ্ দিব্যি কার্ডটার মধ্যে নিজের নাম বসিয়ে লুঙ্গি পরে হাতে একটা পোঁটলা নিয়ে পর দিনই যশোর রওয়ানা হয়ে গেলো। পোঁটলায় অন্যান্য কাপড়-চোপড়ের মধ্যে সযত্নে একটা কিস্তি টুপিও নিয়ে গেলো।

সপ্তাহ দুয়েক পরে একদিন বালু হক্কাক লেনে গিয়ে দেখি, সাদা দাঁতগুলো বের করে মোহাম্মদ উল্লাহ্ হাসছে। শুধু বললো, 'তোমাদের ছাপা কার্ড আর 'মছুয়াগো' কার্ডের মধ্যে কোনই ফারাক নেই। হ ভাই, বউ-পোলাপান আছে এক রকম। বুঝলি না, কিছু টাকা বউটার হাতে দিয়া আসলাম।'

মোহাম্মদ উল্লাহ্ চৌধুরীর আদি বাড়ি নোয়াখালীতে। একই সঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাকে চাকরি করতাম। আমি ছিলাম রিপোর্টিংয়ে আর মোহাম্মদ উল্লাহ্ ছিল সাব এডিটর। দৈনিক ইত্তেফাকের তৎকালীন বার্তা সম্পাদক প্রখ্যাত সাংবাদিক সিরাজ উদ্দীন হোসেন নিজের ভগ্নীর সঙ্গে মোহাম্মদ উল্লাহ্র বিয়ে দিয়েছিলেন। তাই ওকে 'ঘর জামাই' বলে অনেক সময় ঠাট্টা করতাম। মান্নান ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করে এই মোহাম্মদ উল্লাহ্কে দিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকায় সিরাজ উদ্দীন হোসেনের কাছে খবর পাঠালাম মুজিবনগরে চলে আসার জন্য। সিরাজ সাহেব একটা জবাবও দিয়েছিলেন। 'শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকবো কিনা জানি না। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এতোগুলো বাচ্চা নিয়ে আমার পক্ষে ওপারে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সবার মঙ্গল কামনা করছি।'

১৯৭১ সালের ১০ই ডিসেম্বর রাতে সিরাজ উদ্দীন হোসেনকে ঢাকায় 'আল বদর' আর আল শামস'-এর লোকেরা বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করেছে। আর মোহাম্মদ উল্লাহ চৌধুরী বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর জাতীয় সংসদে জনসংযোগ অফিসার হিসাবে চাকরিকালীন একদিন প্রাতঃভ্রমণের সময় আকস্মিকভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে পরলোকগমন করেন। নিয়তির পরিহাস। তৎকালীন স্পিকার মির্জা গোলাম হাফিজ জনসংযোগ অফিসার হিসাবে জনাব চৌধুরী বেতনের স্কেল পর্যন্ত নির্ধারণ করে দেননি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একাত্তরের ২৫শে মে তারিখে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের প্রথম অনুষ্ঠানের পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ছিল এই মোহাম্মদ উল্লাহ চৌধুরীর কণ্ঠে। আর তিনিই ছিলেন সাপ্তাহিক 'জয় বাংলা' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। এসব কাহিনী তো বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে যাওয়া নয়? তাহলে তো ইতিহাসকে অস্বীকার করতে হয়।

যাক যা বলছিলাম। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর সেনাপতিরা প্রায় ১৮ হাজার নিয়মিত সৈন্য দিয়ে গঠিত নয় নম্বর ডিভিশনকে কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর ও বরিশাল এলাকায় মোতায়েন করেছিল। এই ডিভিশনের দায়িত্বে ছিলেন মেজর জেনারেল এমএইচ আনসার। তাঁর অধীনে ছিল ১০৭ নং এবং ৫৭ নং ব্রিগেড। এছাড়া আর্টিলারির দুটো ফিল্ড রেজিমেন্ট ও একটা আর এ্যান্ড এস ব্যাটালিয়ান এবং খুলনায় একটা অস্থায়ী ব্রিগেড। উপরন্তু, পুলিশ, আমর্ড পুলিশ, রাজাকার, 'ইপকাপ', আল্ শামস, আল বদর, শান্তিবাহিনী এবং সশস্ত্র অবাঙালির দল। এছাড়া ছিল এক স্কোয়াড্রন এম-২৪ ট্যাংক বাহিনী এবং কমান্ডার গুল জরীনের অধীনে খুলনায় নেভাল বেস।

এর মোকাবেলায় মুজিবনগর সরকারের নির্দেশক্রমে কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুরের

অধিকাংশ এলাকা ও দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক বাদে খুলনা জেলা নিয়ে গঠিত আট নম্বর এবং দৌলতপুর-সাতক্ষীরা থেকে দক্ষিণে খুলনা জেলার বাকি অংশ, বরিশাল জেলা ও সমগ্র পটুয়াখালী জেলা নিয়ে গঠিত নয় নম্বর সেক্টরের মুক্তিবাহিনী। একাত্তরের আগস্ট মাস পর্যন্ত আট নম্বর সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন তৎকালীন মেজর আবু ওসমান চৌধুরী এবং আগস্ট থেকে তৎকালীন মেজর এম এ মঞ্জুর এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর নয় নম্বর সেক্টর ডিসেম্বরের দ্বিতীয় (?) সপ্তাহ পর্যন্ত ছিল তৎকালীন মেজর এ জলিলের অধীনে। এরপর এই সেক্টরের সার্বিক দায়িত্ব ছিল মেজর এম এ মঞ্জুরের হাতে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই দুটো সেক্টরেই মুক্তিবাহিনী অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছিল এবং পাকিস্তানি বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়েছিল। সবচেয়ে 'খারাপ' সময়েও নয় নম্বর সেক্টরের মাঝ দিয়ে মুজিবনগরের সঙ্গে ঢাকায় অবস্থানরত মুক্তিবাহিনীর যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। এর প্রমাণ হিসাবে একথা বলা যায় যে, পাক-ভারত আসল যুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মিত্রবাহিনী খোদ যশোর শহরের পতন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। এই দুটো সেক্টরের কোন উল্লেখযোগ্য মুখোমুখি লড়াই হয়নি বললেই চলে।

কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালী এলাকায় নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকেই পাকিস্তানি সৈন্যরা মুখোমুখি যুদ্ধের পরিবর্তে শুধুমাত্র পশ্চাদপসরণের প্ল্যান নিয়ে ব্যস্ত ছিল। অবস্থাদৃষ্টে একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, মুক্তিযোদ্ধারা অবিরাম এ্যাকশনের মাধ্যমে মাসের পর মাস ধরে এদের এতোই বিপর্যস্ত করে তুলেছিল যে, আসল যুদ্ধ শুরু হলে মিত্র বাহিনীর মোকাবেলার কথা এরা চিন্তাই করতে পারছিল না। পশ্চাদপসরণরত পাকিস্তানি সৈন্যরা নিজেদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তুলনামূলকভাবে এই এলাকায় সর্বাধিক সংখ্যক ব্রিজ, পুল ও কালভার্ট ধ্বংস করেছে। পরবর্তীকালে দেখা গেছে যে, একমাত্র বেনাপোল-যশোর রোডে এ ধরনের ধ্বংসপ্রাপ্ত সেতুর সংখ্যা উনত্রিশটি। এমনকি পশ্চাদপসরণরত এইসব পাকিস্তানি সৈন্যরা হার্ডিঞ্জ ব্রিজের পর্যন্ত ক্ষতিসাধন করেছিল। এছাড়া ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে বঙ্গোপসাগরে মার্কিনি সপ্তম নৌবহরের আগমনের সংবাদও এদের যুদ্ধ-বিমুখ করে খুলনার দিকে পশ্চাদপসরণের জন্য উৎসাহিত করেছিল।

৬ই ডিসেম্বর লড়াই শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গরীবপুর-আফ্রা এলাকা থেকে ৬ নং পাঞ্জাব, ১২ নং পাঞ্জাব, ২১ নং পাঞ্জাব এবং ২২ নং ফ্রন্টিয়ারের সৈন্যরা দ্রুত পশ্চাদপসরণ করলো। ব্রিগেড কমান্ডার মাখমাদ্ হায়াৎ নিজের সিদ্ধান্তেই প্রচুর সমরাস্ত্র খুলনায় পাঠিয়ে ২২ নং ফ্রন্টিয়ারের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল শামস্‌কে বাহিনী নিয়ে নাভারনে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিলো। এদিকে দুটো কোম্পানি বেনাপোল থেকে দ্রুত শার্শা ও ঝিকরগাছায় সরে এলো। ছয়ই ডিসেম্বর সকালে মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের লড়াইয়ের পর ৮ নং পাঞ্জাবের মেজর ইয়াহিয়া বেলা ১টায় ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে খবর পাঠিয়ে চৌগাছা থেকে পশ্চাদপসরণ করলো। এ সংবাদ ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে ব্রিগেডিয়ার হায়াতের হাতে পৌঁছালো বেলা তিনটায়।

চারদিক থেকে এ ধরনের বিপর্যয়ের খবর খেয়ে ব্রিগেডিয়ার হায়াৎ তাঁর বাহিনী নিয়ে বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ যশোরের ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার পরিত্যাগ করলো। এই ব্রিগেড যশোরকে রক্ষা করার জন্য একটা গুলি পর্যন্ত খরচ করলো না। সবচেয়ে

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, পরদিন বেলা ১১টা পর্যন্ত যশোরে মিত্র বাহিনীর প্রবেশ হয়নি। এমনকি ৬ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা পর্যন্তও যশোর, ঝিনাইদহ এবং যশোর-মাগুরা রোডে মিত্র বাহিনীর কোন যাতায়াত শুরু হয়নি। ৯ই ডিসেম্বর দুপুর নাগাদ মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ মুজিবগনর থেকে যশোর উপস্থিত হলেন। একদল বিদেশী সাংবাদিকদের মতে কোন ব্রিগেডের এভাবে পশ্চাদপসরণের ঘটনা ইতিহাসে বিরল। এরা কিছুই ধ্বংস করে যায়নি। সব কিছুই অক্ষত রয়েছে। এমনকি টাইপ রাইটার মেশিনে অর্ধেক টাইপ করা কাগজ পর্যন্ত একই অবস্থায় রয়েছে। শুধু ব্রিগেডের সৈন্য আর অফিসাররা নেই। সবগুলো তাঁবুই শূন্য।

এদিকে ১০৭ নং ব্রিগেডকে নাভারনে পিছিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। ৬ এবং ৭ই ডিসেম্বর এরা নাভারনের দিকে রওয়ানা হলো। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর হামলায় বিপর্যস্ত এবং মিত্রবাহিনীর অগ্রাভিযানে ভীতসন্ত্রস্ত এই ব্রিগেড ১১ই ডিসেম্বর নাগাদ অনেক কষ্টে দৌলতপুর এসে পৌছালো। এখানেই তারা জানতে পারলো যে, খুলনার অস্থায়ী ব্রিগেড ৭ ডিসেম্বর খুলনা ত্যাগ করে ঢাকার দিকে চলে গেছে এবং নৌবাহিনীর কমান্ডার গুল জরীন খান রাতে দলবল নিয়ে সরে পড়েছে। খুলনায় ভালোভাবে লড়াইয়ের জন্য হেলিকপ্টারে যেসব সমরাস্ত্র পাঠানো হয়েছিল, ১০৭ নং ব্রিগেড সেই পয়েন্ট পর্যন্ত পৌছাতেই পারলো না। তার আগেই নয় নম্বর সেক্টরের মুক্তিবাহিনী খুলনা শহর ও শিল্পাঞ্চলকে অবরোধ করে বসলো।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টারে ৯/১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোন খবরই পাই নাই যে, যশোর ও খুলনা এলাকায় ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং রেডিও পাকিস্তানের সংবাদ বুলেটিনে অবিরত প্রচার করা হচ্ছে যে, যশোর, খুলনা এলাকায় উভয়পক্ষে তুমুল লড়াই হচ্ছে। কারো কারো মতে, বিদেশী সাংবাদিকদের কাছ থেকে ঢাকা ইস্টার্ন কমান্ডের কর্তৃপক্ষ এই বিপর্যয়ের সংবাদ সর্বপ্রথম লাভ করেছিল। কাহিনীর এখানেই শেষ নয়।

নবম ডিভিশনের আর একটি ৫৭ নং ব্রিগেড প্রথম থেকেই ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুরের নেতৃত্বে ঝিনাইদহে অবস্থান করছিল। এর অধীনে ছিল ২৯ নং বালুচ, ১৮নং পাঞ্জাব, ১২ নং পাঞ্জাবের আর এ্যান্ড এস-এর একটি কোম্পানি, ৫০ নং পাঞ্জাবের দুইটি কোম্পানি, আর্টিলারির একটি রেজিমেন্টের এক স্কোয়াড্রন এম-২৪ ট্যাংকা বাহিনী। কিন্তু লড়াইয়ের সুবিধার জন্য ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর ঝিনাইদহকে অরক্ষিত রেখে চুয়াডাংগায় ঘাঁটি গাড়লো।

৬ই ডিসেম্বর দিনের শুরুতেই দর্শনার পতন হলে তিনি প্রমাদ গুনলেন। সীমান্তের সমস্ত পোস্ট থেকে সৈন্য উঠিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন। এদিকে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক রাস্তা প্রদর্শনের ফলে ঘটনার দ্রুত পরিবর্তন ঘটলো। ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর উপলব্ধি করলেন যে, দর্শনা, কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ এলাকায় এমনভাবে মিত্র বাহিনী এগিয়ে আসছে এবং অবস্থান সুদৃঢ় করছে যার ফলে ৫৭ নং ব্রিগেড যশোর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সাতই ডিসেম্বর নাগাদ দক্ষিণে যাওয়ার ব্যাপারে তার সব রাস্তাই বন্ধ হয়ে গেছে এবং ব্রিগেডের মূল ঘাঁটি ঝিনাইদহের কোন খবরই নেই। ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর পরিস্থিতির আসল অবস্থা জানার জন্য চুয়াডাঙ্গা থেকে মেজর জাহিদের নেতৃত্বে একটা প্লাটুনকে পাঠালেন। কিন্তু রাস্তা বন্ধ দেখে প্লাটুন ফিরে এলো। এই শ্বাসরুদ্ধকর

অবস্থায় ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর আর বেশি সময় চুয়াডাঙ্গায় অবস্থান বিপজ্জনক মনে করলেন। ৯ ডিভিশনের মেজর জেনারেল আনসারীর সঙ্গে যোগাযোগ করে আর কোন ফল হবে না চিন্তা করে ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর কুষ্টিয়া শহরের ওপর দিয়ে পাক্‌শীতে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ অতিক্রমের সিদ্ধান্ত করলেন। ঢাকা থেকে তাকে মাগুরার দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। কিন্তু তা পালন করতে সাহসী হলেন না। তিনি পুরো সৈন্য বাহিনী নিয়ে দুই দিন কুষ্টিয়াতে অবস্থানের পর হার্ডিঞ্জ ব্রিজ অভিমুখ রওয়ানা হলেন। এমন সময় খবর এলো যে, ঝিনাইদহ থেকে মিত্রবাহিনী কুষ্টিয়ার দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের ঠেকিয়ে রাখার জন্য ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর ১৮ নং পাঞ্জাব এবং কিছু ট্যাংক পাঠালেন। ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া রাস্তার মাঝামাঝি জায়গায় কয়েক ঘণ্টাব্যাপী এক ভয়াবহ লড়াই হলো। এই কয়েক ঘণ্টা সময়ে ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর ৫৭ নং ব্রিগেড নিয়ে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ অতিক্রম করে ঈশ্বরদীতে হাজির হলেন। আর মিত্রবাহিনী যাতে পশ্চাদ্ধাবন করতে না পারে তার জন্য ডিনামাইট দিয়ে ব্রিজের অংশ বিশেষ উড়িয়ে দিলেন সমগ্র কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনায় পাকিস্তানি বাহিনীর এটাই ছিল একমাত্র লড়াই। এই লড়াইয়ে পরাজিত কিছু পাকিস্তানি সৈন্য বিধ্বস্ত ট্যাংকগুলো পিছনে ফেলে কোনক্রমে পদ্মা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল। বাকিদের লাশ উন্মুক্ত রাস্তার পাশে পড়ে রইল।

৫৪

একাত্তরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের কথা। মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম আর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থা সরেজমিনে দেখার জন্য বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলগুলো পরিদর্শনে এলেন। সফরের এক পর্যায়ের সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং তাজউদ্দিন আহমদ দুটো গ্রুপে বিভক্ত হলেন।

সৈয়দ সাহেব গেলেন পূর্ব রণাংগনে আর তাজউদ্দিন সাহেব রওয়ানা হলেন উত্তর রণাংগনে। হিলি, বেদা, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়, চিলাহাটি, ডোমার প্রভৃতি এলাকা সফরের পর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন এসে হাজির হলেন পাটগ্রাম। এই পাটগ্রামের দক্ষিণ দিয়ে প্রবাহিত তিস্তা নদী লালমনিরহাটের ওপর দিয়ে চিলমারীতে যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) নদীর সঙ্গে মিলিত হওয়ায় তিস্তার উত্তরাঞ্চল অর্থাৎ কুড়িগ্রাম মহকুমার একটা পৃথক অস্তিত্ব বিরাজমান। এজন্য পাকিস্তানি বাহিনী কোন সময়েই এই এলাকায় 'স্ট্রাটেজির' কারণেই ঘাঁটি সুরক্ষিত করেনি এবং সব সময়েই মুক্তিবাহিনীর হামলায় বিপর্যস্ত অবস্থায় কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট শহরের আত্মরক্ষায় লিপ্ত ছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে এই এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াইয়ের ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকার কথা। লড়াইয়ের প্রথমদিকে একাত্তরের মে-জুন মাস নাগাদ যখন হানাদার বাহিনী সমস্ত রণাংগনে সীমান্ত পর্যন্ত নিজেদের ঘাঁটি সুরক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিল, তখন কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারি, রৌমারী আর পাটগ্রাম ছিল তার ব্যতিক্রম। বাঙালি জাতির এই দুঃসময়ে এই এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের এ্যাকশনের খবর স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে ফলাও করে প্রচারের মাধ্যমে অন্যান্য এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করা সম্ভব হয়েছিল।

হঠাৎ করে সেই পাটগ্রাম এলাকায় প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদকে পেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সে কি উৎসাহ আর উদ্দীপনা! তার সঙ্গে অন্যদের মধ্যে ছিলেন ছয় নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক ও তৎকালীন উইং কমান্ডার এম কে বাশার (ডিকেন)। পেশায় একজন সুদক্ষ বোমারু বৈমানিক হওয়া সত্ত্বেও উইং কমান্ডার বাশার এই ছয় নম্বরের সেক্টর কমান্ডার হিসাবে অভূতপূর্ব সাফল্যের প্রমাণ দিয়েছেন। বগুড়ার সন্তান বাশার স্বাধীন বাংলাদেশের বিমান বাহিনীর প্রধান হিসাবে কার্যরত থাকাকালীন মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে ১৯৭৬ ১লা সেপ্টেম্বর এক মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় (?) নিহত হন।

তিনি যুদ্ধের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ৬ নম্বর সেক্টরের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এমনকি স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত তিনি ব্রিগেড কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন এবং ৬ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার বাশার দু'জনেই আর ইহজগতে নেই।

যাক, যা বলছিলাম। তৎকালীন উইং কমান্ডার বাশার তাজউদ্দিন সাহেবকে সঙ্গে করে পাটগ্রাম এসে হাজির হলে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেলো। গার্ড অব অনার প্রদানের পর মুক্তিযোদ্ধারা প্রায় সমস্ত দিন ধরে যুদ্ধের মহড়া প্রদর্শন করলো। সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী ও সেক্টর কমান্ডার স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মাটিতে বসে শানকিতে ভাত খেলেন। এরপর মুজিবনগর থেকে আগত সবাইকে হতবাক করে প্রদর্শিত হলো মুক্তিযোদ্ধাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শুনলাম ওরাই নাকি আবার ভোর রাতে এ্যাকশনে যাবে। পরদিন সকালে প্রধানমন্ত্রী যাবেন ভুরুঙ্গামারী, রৌমারী এলাকায়। কিন্তু রাত সাড়ে দশটায় তিনি পাটগ্রামের একটা অস্থায়ী হাসপাতাল পরিদর্শনে গেলেন। বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি এই অস্থায়ী হাসপাতালে রয়েছেন কিছু আহত মুক্তিযোদ্ধা। এদের শুশ্রূষা করছেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের জনা-কয়েক ছাত্র এবং স্থানীয় একজন এলএমএফ ডাক্তার। বাঙালি জাতির সেই একাত্মতাবোধ এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বিশ্বের পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের যেসব জনপদের নাম সবচেয়ে ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে ভুরুঙ্গামারী, রৌমারী, চিলমারী, পাটগ্রাম, চিলাহাটী, তেঁতুলিয়া, পচাগড়, বোদা, বিরল, চরখাই, ফুলবাড়ী, চিরাই আর হিলি অন্যতম। একাত্তরের নয় মাসকাল সময় এসব এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধারা অসীম সাহসিকতার সঙ্গে আঘাতের পর আঘাত হেনে হানাদার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করা ছাড়াও মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছিল।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলা নিয়ে গঠিত এলাকার জন্য পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী ১৬তম ডিভিশন মোতায়েন করেছিল। মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহের অধীনে এই ডিভিশনে চারটা ব্রিগেড ছিল। বগুড়ায় ব্রিগেডিয়ার তাজাম্মুলের অধীন ২০৫ নং, রংপুরে ব্রিগেডিয়ার আনসারীর অধীনে ২৩ নং এবং নাটোরে ব্রিগেডিয়ার নইমের অধীনে ৩৪ নং ব্রিগেড ছাড়াও রাজশাহীতে একটা অস্থায়ী ব্রিগেড অবস্থান করছিল। উপরন্তু এদের সহায়তার জন্য ২৯ নং ক্যাভেলরির পুরো ট্যাংক রেজিমেন্ট মোতায়েন ছিল। এই ট্যাংকগুলো উত্তরাঞ্চলের তিনটা জায়গায় ঠাকুরগাঁও, পাঁচবিবি ও পাকশীতে 'পজিশন' নিয়ে অবস্থান করছিল। কোরিয়ার যুদ্ধের সময় এ ধরনের এম-২৪ ট্যাংক খুবই সাফল্য

অর্জন করেছিল।

১৬তম ডিভিশনকে সাহায্যের জন্য সংগঠিত করা হয়েছিল পুলিশ, আর্মড পুলিশ, রাজাকার, আল শামস, আল বদর, ইপকাফ, শান্তিবাহিনী এবং কয়েক লাখ সশস্ত্র অবাঙালির দল। বগুড়ায় চেলোপাড়ায়, রাজশাহীতে মতিহারে, রংপুরে কারমাইকেল কলেজের ধারে আর দিনাজপুর খর্খরা নদীর পাড়ে এদের হাতে কত নিরীহ প্রাণ যে আত্মাহুতি দেয় তার ইয়ত্তা নেই।

এদের মোকাবেলায় রংপুর জেলায় এবং ঠাকুরগাঁও মহকুমা নিয়ে গঠিত ছয় নম্বর সেক্টরের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তৎকালীন উইং কমান্ডার এম, কে, বাশার আর দিনাজপুর সদর, বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলা নিয়ে গঠিত সাত নম্বর সেক্টরের কমান্ডার হিসাবে নিয়োগ করা হলো মেজর কাজী নুরুজ্জামানকে।

চিলমারী, রৌমারী, ভুরুঙ্গামারী, পাটগ্রাম, তেঁতুলিয়া, বোদা প্রভৃতি এলাকায় মাসের পর মাস ধরে মুক্তিবাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হওয়ার পর ১৬তম ডিভিশনের প্রধান মেজর জেনারেল নজর হোসেন এ মর্মে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, পাকিস্তানি বাহিনীর মনোবল বৃদ্ধির জন্য হিলি এলাকায় ট্যাংক বাহিনীর সহায়তায় সীমান্ত অতিক্রম করে অগ্রবর্তী ঘাঁটি স্থাপন করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক পাঁচবিবি, হিলি এলাকায় সৈন্য মোতায়েন করা হলো। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে লে. জেনারেল নিয়াজী ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারযোগে পাঁচবিবি, হিলি এলাকায় এসে জোয়ানদের উৎসাহিত করে গেলেন। ঢাকার বাইরে এটাই ছিল জেনারেল নিয়াজীর শেষ সফর।

এই আক্রমণের জন্য নিয়মিত বাহিনী ছাড়াও পাকশী এলাকা থেকে কিছু ট্যাংক এনে দাংগাপাড়ায় মোতায়েন করা হলো। আর এলো ৪ নং ফ্রন্টিয়ার 'ক্র্যাক ফোর্স', ৩৪ নং পাঞ্জাবের আর এ্যান্ড এস ব্যাটালিয়ন এবং মেজর আকরামের 'সি' কোম্পানি। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণের অসহযোগিতা এবং পিছন থেকে মুক্তিবাহিনীর অবিরাম হয়রানি এদের বিব্রত করে ফেললো। ফলে হামলাকারী বাহিনী সীমান্তের অপর পারে কয়েক দফায় কামানের গোলা নিক্ষেপ করা ছাড়া সামরিক দিক দিয়ে খুব একটা সুবিধা করতে সক্ষম হলো না।

আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণার আগেই পাকিস্তানি বাহিনী কাসিম, বাবর, নবপাড়া এবং আত্তর সীমান্ত ঘাঁটি থেকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হলো। অবশ্য দিন কয়েক পরে মিত্র বাহিনীর সঙ্গে পাকিস্তান বাহিনীর এক ভয়াবহ লড়াই অনুষ্ঠিত হয়। এই লড়াইয়ের স্থান হচ্ছে হিলি থেকে মাইল সাতেক উত্তরে চিরাইয়ে। চিরাইয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকা জলাভূমি বলে পাকিস্তানি বাহিনী এই মুখোমুখি লড়াইয়ের জন্য পাঁচবিবি, হিলির সমভূমিকেই প্রকৃষ্ট স্থান হিসাবে বেছে 'পজিশন' নিয়েছিল। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর পরামর্শে মিত্রবাহিনী অবিশ্বাস্য এক পথ দিয়ে ফুলবাড়ী আর হিলির বধ্যবর্তী চিরাই এলাকায় হাজির হলে হানাদার বাহিনী প্রমাদ গুনলো। তখন মিত্রবাহিনী সরাসরি পূর্বদিকে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ বরাবর রংপুর-বগুড়া সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য অগ্রসর হলে উপায়ন্তবিহীন অবস্থায় পাকিস্তান বাহিনী চিরাইয়ে বাধা দান করলো।

এটাই হচ্ছে একাত্তরের পাক-ভারত যুদ্ধে উত্তর রণাংগনে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের কয়েক হাজার সৈন্য হতাহত হয়েছিল। মিত্র বাহিনী

এখানে সর্বপ্রথম ১০০ এমএম কামান ব্যবহার করেছিল আর পাকিস্তানের পক্ষে পুরো ট্যাংক বাহিনী অংশ নিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি বাহিনী পরাজিত হলেও সি কোম্পানির সৈন্যরা মেজর আকরামের নেতৃত্বে দারুণ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল। ৪ নং ফ্রন্টিয়ার 'ক্রাক ফোর্স' এবং সি কোম্পানি সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও মেজর আকরাম নিশান-ই হায়দার নিহত হলে শুরু হলো পলায়নের পালা। পথে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা পলায়নরত পাকিস্তানি সেনাদের দফায় দফায় আক্রমণ করলো। শেষ পর্যন্ত 'সি' কোম্পানির মাত্র ৪৫ জন সৈন্য বগুড়ায় ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছিল। চিরাইয়ের যুদ্ধে জয়লাভের পর মিত্রবাহিনী দ্রুত পীরগঞ্জে এসে রংপুর-বগুড়ার সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল।

সেদিন ছিল ৭ই ডিসেম্বর। মেজর জেনারেল নজর রংপুর থেকে বগুড়ায় জিপে আসার পথে পীরগঞ্জে আকস্মিকভাবে মিত্রবাহিনীকে দেখতে পেয়ে আবার বিকল্প এক পথ ধরে রংপুরে প্রত্যাবর্তন করলেন। এদিকে ঢাকায় খবর এলো যে জেনারেল নজর নিখোঁজ হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে 'ইপকাফ'-এর ডিজি এবং ৩৯ অস্থায়ী ডিভিশনের প্রধান মেজর জেনারেল জমসেদকে হেলিকপ্টারে ১৬তম ডিভিশনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য পাঠানো হলো। কিন্তু রাতের অন্ধকারে জেনারেল জমসেদের হেলিকপ্টার রংপুর কিংবা বগুড়া কোথাও অবতরণ করতে না পেরে ঢাকায় ফিরে এলো। পরে অবশ্য মেজর জেনারেল নজর রংপুর থেকে নিজের নিরাপদের কথা ঢাকায় জানালেন। কিন্তু তখন ১৬তম ডিভিশন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। সামরিক বাহিনীর মধ্যে একটা কথা চালু আছে যে, 'ডিভিশন বিভক্ত হওয়া আর ডিভিশন ধ্বংস হওয়া একই কথা।' পাকিস্তানের ১৬তম ডিভিশনের সেই অবস্থা হলো।

এদিকে মুক্তিবাহিনীর ক্রমাগত হামলার মুখে ২৮শে নভেম্বরের মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনী উত্তর সীমান্তবর্তী সমস্ত ফাঁড়ি পরিত্যাগ করেছ এবং ঠাকুরগাঁও ও ডোমার শহর ছাড়া এতদঞ্চলে আর কোথাও এদের দেখা যায়নি। এদের পরিত্যক্ত বাংকারগুলোতে পাওয়া গেলো কিছু ছেঁড়া শাড়ি। এর পুরো বিবরণ না দেয়াই বাঞ্ছনীয়।

কুড়িগ্রাম-লালমনিরহাট এলাকায় হানাদার বাহিনীর আরও করুণ অবস্থার সৃষ্টি হলো। ভৌগোলিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং মুক্তিবাহিনীর উপর্যুপরি আক্রমণের ফলে নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের পর তিস্তা নদীর উত্তরে আর কোন পাকিস্তানি সৈন্য ছিল না। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য এরা ৪ঠা ডিসেম্বর রাতে লালমনিরহাটের ব্রিজ ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিলো। এখানে পাকিস্তানি সৈন্যদের আর এক বিপদ দেখা দিলো। তা হচ্ছে এইসব এলাকার লক্ষাধিক অবাঙালি অধিবাসী পশ্চাদপসরণরত হাজার হাজার পাকিস্তানি সৈন্যদের পিছে পিছে এরাও এসে হাজির হলো রংপুর আর বগুড়া শহরে।

একদিকে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ আর অন্যদিকে রংপুর-বগুড়া সড়কের পীরগঞ্জে মিত্রবাহিনীর অবস্থান পাকিস্তানিদের জন্য শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি করলো। আর সর্বত্র শুরু হলো মুক্তিযোদ্ধাদের বেপরোয়া হামলা। পাকিস্তানি সৈন্যদের মুখে তখন একটাই মাত্র কথা 'মুক্তিকো পাস্ নেহি– হিন্দুস্তানি ফৌজকা পাস সারেন্ডার করুঙ্গা।'

সাতই ডিসেম্বর লে. কর্নেল সুলতান ৩২ নং বেলুচ নিয়ে বগুড়া থেকে মহাস্থান দিয়ে এগিয়ে মিত্র বাহিনীর ওপর হামলা চালালো। কিন্তু কয়েক ঘন্টার যুদ্ধে ৩২ নং বেলুচ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। মহাস্থানের মুক্তিযোদ্ধারা এদের একজনকেও আর বগুড়ায়

ফিরতে দেয়নি। এবার ২০৫ ব্রিগেডিয়ার তাজাম্মুল স্বয়ং ৮ নং বালুচ এবং ৩২ নং পাঞ্জাব নিয়ে মহাস্থানের কাছে পলাশবাড়ীতে মিত্রবাহিনীর মোকাবেলা করতে গেলো। ১৬ নং ডিভিশনের আর একটি ২৩ নং ব্রিগেড বিচ্ছিন্ন হয়ে রংপুরে তখনও অবরুদ্ধ। পলাশবাড়িতে মিত্রবাহিনীর হাতে দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে ব্রিগেডিয়ার তাজাম্মুল অনেক কষ্টে বগুড়া শহরে ফিরে এলো। ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে তখন চিকিৎসার অভাবে আহতদের আর্তচিৎকার। ক্যাম্পগুলোতে খালি চাপ চাপ রক্ত নিয়ে আহত সৈন্যরা এক বীভৎস দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যে পাকিস্তানি কিছু সৈন্য ছোট ছোট দল বেঁধে সাদা পতাকা হাতে জিপ আর ট্রাকে করে মহাস্থানের ওধারে গিয়ে মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে শুরু করলো। আবার কিছু সৈনিক পরাজয়ের অপমানে আত্মহত্যা করতে লাগলো। আর মুক্তিবাহিনীর সৈন্যরা খুঁজতে শুরু করলো 'কোলাবরেটার' ও অবাঙালি জল্লাদদের। সে এক ভয়াবহ অবস্থা। এর মধ্যে জেনারেল নিয়াজীর ম্যাসেজ এলো, 'আত্মসমর্পণ আত্মসমর্পণ করো'।

৫৫

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীন বাংলাসহ বিশ্বের বিভিন্ন বেতারকেন্দ্র থেকে প্রায় প্রতিদিনই পূর্ব রণাংগনের উত্তরাংশের যেসব জায়গার নাম উচ্চারিত হতো, সেগুলো হচ্ছে আখাউড়া, দুলাই, শ্রীমঙ্গল, শমসেরনগর, কমলারা, জুরি, আটগ্রাম, লাতু, রাধানগর, ছাতক আর সুনামগঞ্জ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নয় মাসকাল এসব এলাকায় হানাদার বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে কত যে লড়াই হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তাই পূর্ব রণাংগনের উত্তরাংশের যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাকিস্তানের ইস্টার্ন কমান্ডের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ ও শক্তিশালী ১৪ ডিভিশনকে এই এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছিল। কুমিল্লার নিকটবর্তী সালদা নদী থেকে শুরু করে উত্তরে সমগ্র সিলেট জেলা এই ডিভিশনের দায়িত্বে দেয়া হয়েছিল। ১৪ ডিভিশনের প্রধান ছিলেন মেজর জেনারেল আবদুল মজিদ কাজী। এর অধীনে ছিল তিনটি শক্তিশালী ব্রিগেড। আখাউড়া-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-ভৈরববাজার এলাকায় আস্তানা গেড়েছিল ব্রিগেডিয়ার সাদুল্লার অধীনে ২৭তম ব্রিগেড। ব্রিগেডিয়ার সলিমুল্লার অধীনে ২০২তম ব্রিগেড অবস্থান করেছিল খোদ সিলেট শহরে। আর ব্রিগেডিয়ার ইফতেখার রানার ৩১৩তম ব্রিগেড আখাউড়া ও সিলেটের মধ্যবর্তী মওলবিবাজারে পজিশন নিয়েছিল। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল যে, ৩৩১তম ব্রিগেড প্রয়োজন দেখা দিলে ২৭ কিংবা ২০২ ব্রিগেডকে সাহায্য করবে, কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, জেনারেল নিয়াজী এই ৩১৩ ব্রিগেডকে সীমান্ত অতিক্রম করে আগরতলা আক্রমণের জন্য রেখেছিল। দুটো মাত্র জায়গায় নিয়াজী সীমান্ত অতিক্রম করে শত্রু এলাকা দখলের পরিকল্পনা করেছিল বলে মনে হয়। একটা হচ্ছে পাঁচবিবি-জয়পুরহাট থেকে হিলি দিয়ে বালুরঘাট আক্রমণ করা আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে মওলবিবাজারে অবস্থানরত ব্রিগেডিয়ার ইফতেখার রানার ৩১৩তম ব্রিগেডকে দিয়ে আগরতলা আক্রমণ করা। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর কৃতিত্বের জন্য এই দুটো জায়গাতেই হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের মাটিতে যুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়েছিল।

ব্রিগেডিয়ার সা'দুল্লার ২৭ ব্রিগেডের মধ্যে ছিল ৩৩ বালুচ, ১২ ফ্রন্টিয়ার এবং ২১ আজাদ কাশ্মির ফোর্স। এছাড়া বেশ কিছুসংখ্যক ফিল্ড গান, চারটা ট্যাংক ও ৪৮ পাঞ্জাবের আর এ্যান্ড এস ব্যাটালিয়ানের একটা প্লাটুন এবং কয়েক হাজার 'ইপকাফ',

রাজাকার, রেঞ্জার্স, আর্মড পুলিশ ও সশস্ত্র অবাঙালির দল। ২০২ এবং ৩১২ ব্রিগেডের শক্তি প্রায় একই রকম ছিল।

এর মোকাবেলায় মুক্তিবাহিনীর বেশ কয়েকটা সেক্টর কমান্ডারকে ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য এই এলাকায় লড়াই করতে হয়েছিল। এঁরা হচ্ছেন ২ নম্বর সেক্টরের মেজর খালেদ মোশাররফের বাহিনীকে আখাউড়া-ভৈরব রেললাইনের জন্য, ৩ নম্বর সেক্টরের মেজর শফিউল্লাহর বাহিনীকে হবিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহাকুমা এবং ভৈরবের জন্য, ৪ নং সেক্টরের মেজর দত্তের বাহিনীকে সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চলের জন্য। এইসব সেক্টর কমান্ডারদের পার্শ্ববর্তী অন্যান্য এলাকায়ও লড়াইয়ের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। এখানে শুধুমাত্র পাকিস্তানি ১৪তম ডিভিশনের মোকাবেলায় মুক্তিবাহিনীর কোন্ কোন্ সেক্টরের মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল তার উল্লেখ করা হলো।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এই এলাকায় আখাউড়া এবং কসবাতে সবচেয়ে দীর্ঘদিন স্থায়ী লড়াই অনুষ্ঠিত হয়। কসবা রেল স্টেশন এবং রেলওয়ে লাইন যে কতবার মুক্তিবাহিনী ও হানাদার বাহিনীর মধ্যে হাতবদল হয়েছে, তা সঠিকভাবে কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয়। বিশ্বের বিভিন্ন টেলিভিশনে আখাউড়া ও কস্‌বা লড়াই-এর সচিত্র প্রতিবেদন বহুবার প্রদর্শিত হওয়ায় যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর জওয়ানদের পারদর্শিতা প্রমাণিত হয়েছিল।

এই সেক্টরেই লড়াইয়ের সময় খালেদ মোশাররফ মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতররূপে আহত হয়েছিলেন। ২ নম্বর সেক্টরে খালেদ মোশাররফের অন্যতম সহকারী ছিলেন এটিএম হায়দার। খালেদ মোশাররফের নির্দেশে ঢাকা শহরের বহু যুবককে ক্যাপ্টেন হায়দার গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় এইসব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকরা রাজধানী ঢাকায় অনেকগুলো এ্যাকশন করেছিল। এসব এ্যাকশনের মধ্যে এলিফ্যান্ট রোড, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, স্টেট ব্যাংক, যাত্রাবাড়ী ব্রিজ এবং বনানীতে প্রাক্তন গভর্নর মোনেম খাঁর ওপর হামলা অন্যতম।

খালেদ মোশাররফ আহত অবস্থায় হাসপাতালে থাকায় ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে 'অজ্ঞাত কারণে' 'কে ফোর্স'কে দু'ভাগ করে যথাক্রমে চট্টগ্রাম ও চাঁদপুরে পাঠানো হয়। এ সত্ত্বেও ক্যাপ্টেন হায়দার তার দলবল নিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে ডেমরা অতিক্রম করে কমলাপুর রেল স্টেশন ও মুগদাপাড়া দিয়ে ঢাকায় প্রবেশ করে ১৬ই ডিসেম্বর বেতারকেন্দ্র দখল করে। পরবর্তীকালে ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে সামরিক অভ্যুত্থানের সময় তিনি নিহত হন।

যাক যা বলছিলাম। পূর্ব রণাংগানে ২ নম্বর সেক্টরের মুক্তিবাহিনী ২৭শে নভেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত চারদিনের এক ভয়াবহ রক্তাক্ত যুদ্ধের মাঝ দিয়ে আখাউড়া দখল করে। পাকিস্তানি ২৭ ব্রিগেড পরাজিত হয়ে দ্রুত পশ্চাদপসরণ করে গঙ্গা সাগরে শিবির স্থাপন করে পুনরায় লড়াইয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কিন্তু অগ্রসররত মুক্তিবাহিনী মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পহেলা ডিসেম্বর গঙ্গা সাগরে পাক বাহিনীর অবস্থানকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই দুর্বার আক্রমণের মুখে হানাদার বাহিনী এতোই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে পশ্চাদপসরণের সময় আখাউড়া ব্রিজ ধ্বংস করতে পারেনি।

ফলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে মাইল দশেক দূরে তিতাস নদীর পশ্চিম পাড়ে পাক বাহিনী 'ডিফেন্স' গড়ে তোলার সময়ই পেলো না। পশ্চাদপসরণ হানাদার বাহিনী আখাউড়া ব্রিজ অতিক্রম করার মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যে একই ব্রিজ দিয়ে মুক্তিবাহিনীও তিতাস নদী অতিক্রম করতে সক্ষম হলো। এর মধ্যে মিত্র বাহিনীও রণাংগনে লড়াইয়ে

যোগদান করলো।

এবার খোদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের লড়াইয়ের জন্য উভয় পক্ষ প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। পরাজিত হানাদার বাহিনীর সহযোগীরা এই সময় রাতের অন্ধকারে প্রায় ২৫ জন স্থানীয় বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করলো। এই ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেই মেজর জেনারেল আবদুল মজিদ কাজী ১৪তম ডিভিশনের হেড কোয়ার্টার স্থাপন করে অবস্থান করছিল। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা গোপন পথে চারদিক দিয়ে সাঁড়াসি আক্রমণ শুরু করলে জেনারেল কাজী আরও পশ্চিমে দ্রুত পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত নিলো।

৭ই ডিসেম্বর দিবাগত রাতে জেনারেল কাজী তার বাহিনী নিয়ে ৮ মাইল পশ্চিমে মেঘনা নদীর পারে আশুগঞ্জে এসে হাজির হলো। কিন্তু তার বাহিনীর মনোবল না থাকায় মেঘনা নদীর পূর্ব তীরে 'ডিফেন্স' শক্তিশালী করা জেনারেল কাজীর পক্ষে সম্ভব হলো না। ব্রিগেডিয়ার সাদুল্লার সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি ভৈরব (কিং জর্জ দি ফিফ্‌থ) ব্রিজ অতিক্রম করে ভৈরব শহরের উপকণ্ঠে আস্তানা গাড়লেন। এরপর নিজেদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে জেনারেল কাজী এক ভয়াবহ সিদ্ধান্ত নিলো। ২৭ ব্রিগেডের জোয়ানরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও আশুগঞ্জে থাকা সত্ত্বেও তিনি ডিনামাইট দিয়ে ভৈরব ব্রিজের একাংশ উড়িয়ে দিলেন। এই সংবাদে মেঘনা নদীর পূর্ববতীরে অবস্থানরত ২৭ ব্রিগেডের জোয়ানরা যুদ্ধ করতে অস্বীকার করলো। চারদিকে পাক-বাহিনীতে তখন খালি পালাবার পালা। এরা সব নৌকা করে নদী পার হয়ে বিধ্বস্ত অবস্থায় ভৈরবে এসে হাজির হলো। ওপারে তাদের বিপুল রসদ ও সমরাস্ত্র পড়ে রইলো। এটা হচ্ছে ১১ই ডিসেম্বর দিবাগত রাতের কথা। এর মধ্যে খবর এলো মিত্র বাহিনী রায়পুরা ও নরসিংদীতে হেলিকপ্টারে এসে জমায়েত হচ্ছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে ঢাকা আক্রমণ। জেনারেল কাজীর বক্তব্য হচ্ছে, 'ওটা তো আমার এলাকা নয়।'

৫৬

পূর্ব রণাংগনের যুদ্ধের ঘটনাবলী উপস্থাপনার প্রাক্কালে এর পূর্ব ইতিহাস বর্ণনা করা দরকার। মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা ব্যর্থ, সামরিক হামলা ও বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড, বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার এবং চট্টগ্রামস্থ বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র মারফত স্বাধীনতার বাণী প্রচারিত হওয়ার মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব রণাংগনের এক গোপন স্থানে একাত্তরের ১০ই এপ্রিল নির্বাসিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। নবগঠিত এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ এক বিবৃতিতে সরকারের উদ্দেশ্য এবং জাতির কর্তব্য সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেন। সেসব বিবৃতি ও নির্দেশ বিশ্বের বিভিন্ন বেতার মারফত প্রচারিত এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ মুক্তিযুদ্ধের সুবিধার জন্য বাংলাদেশকে চারটা সেক্টরে ভাগ করেছিলেন। এই সেক্টরগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১ এক নম্বর সেক্টর (চট্টগ্রাম অঞ্চল) : মেজর জিয়াউর রহমান
২ দুই নম্বর সেক্টর (কুমিল্লা অঞ্চল) : মেজর খালেদ মোশাররফ
৩ তিন নম্বর সেক্টর (সিলেট অঞ্চল) : মেজর কে এম শফিউল্লাহ্
৪ চার নম্বর সেক্টর (কুষ্টিয়া অঞ্চল) : মেজর আবু ওসমান চৌধুরী

একাত্তরের জুলাই মাসে মুজিবনগরে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধরত কমাণ্ডারদের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের উদ্বোধন ও সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ এবং বৈঠকে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন কর্নেল (অবঃ)

আতাউল গনি ওসমানী। মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপকতা বৃদ্ধি এবং সুবিধার জন্য এই বৈঠকে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে চিহ্নিত করে কমান্ডারদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হলো। উপরন্তু প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতি বর্ণনা করে সরকারের নীতি বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু পরিষ্কারভাবে কমান্ডারদের নাম এবং এলাকার বর্ণনা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। মুক্তিবাহিনীর তিন নম্বর সেক্টরের সীমানা ছিল আখাউড়া-ভৈরববাজার রেলওয়ে লাইনের উত্তর ধার থেকে শুরু করে কুমিল্লা জেলার বাকি অংশে, কিশোরগঞ্জ মহকুমার অংশ বিশেষ এবং সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা। এজন্যই স্বল্প দূরত্বে অবস্থান সত্ত্বেও কসবা এলাকায় ক্রমাগত সাফল্যজনক পাল্টা আক্রমণের কৃতিত্ব হচ্ছে দুই নম্বর সেক্টরের কমান্ডার খালেদ মোশাররফের অধীনস্থ বাহিনীর। আর আখাউড়া এলাকার উত্তরাঞ্চলের লড়াইগুলোর কৃতিত্ব হচ্ছে কে এম শফিউল্লাহের বাহিনী।

এখানে প্রাসংগিকভাবে বিবেচনা করে কে এম শফিউল্লাহের স্মৃতিচারণ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

"অক্টোবর-নভেম্বর পর্যন্ত আমাদের অবস্থা খুবই ভাল হয়ে গিয়েছিল। ততদিনে আমি অনেক ছেলেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আমার বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমার বাহিনীতে তখন মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা বেড়ে প্রায় বিশ হাজারে দাঁড়িয়েছিল। আমি লক্ষ্য করেছি ঐ সময়ে পাকিস্তানি বাহিনী এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলাচলের নিরাপত্তা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিল। ছোট গ্রুপে তাদের চলাচল এক রকম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেবল বড় গ্রুপেই সীমিত ছিল তাদের যাতায়াত। নভেম্বর মাসের কাছাকাছি সময় থেকেই প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলাম। এ ধরনের কয়েকটি আক্রমণ আমি চালিয়েছিলাম সাহরদি, পাকুন্দিয়াসহ বিভিন্ন এলাকায়।

৩রা ডিসেম্বরের আগেই আমি আমার ব্যাটালিয়ানকে ব্রিগেডে রূপান্তর করতে সক্ষম হয়েছিলাম। শুধু তাই নয়, পাকিস্তান এবং হিন্দুস্তানের সাথে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বেই আমি আমার ব্রিগেডকে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলাম। ছোট ছোট কয়েকটি আক্রমণ চালানোর পর আমি একটি বড় ধরনের আক্রমণ পরিচালনা করেছিলাম। আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশনকে আমাদের আয়ত্তে নিয়ে আসাই ছিল এই আক্রমণ পরিচালনার উদ্দেশ্য। ৩০শে নভেম্বর আখাউড়ার উত্তর-পূর্ব দিক থেকে মুকুন্দপুর হয়ে আমি আক্রমণ শুরু করেছিলাম। ওখান থেকে অগ্রসর হয়ে আমি আখাউড়া পৌঁছেছিলাম ২রা ডিসেম্বর। আখাউড়া স্টেশনে আমি প্রবেশাধিকার নিয়ে ফেলেছিলাম ৩রা ডিসেম্বর। ঠিক এমনি সময় আমি শুনতে পেলাম পাকিস্তান-হিন্দুস্তান যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গিয়েছে।

... ... আমার পর পরই ভারতীয় বাহিনীর একটি ডিভিশনও আখাউড়া ঘিরে ভিতরে ঢুকে পড়েছিল। কাজেই আমাদের সম্মিলিত আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনীর মোট একটি ব্রিগেড ৫ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। এটাই ছিল আমার সেক্টরে পাকিস্তানি বাহিনীর প্রথম আত্মসমর্পণ। তখন ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক আমাকে বললেন, আমার বাহিনী নিয়ে আখাউড়া প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকার জন্য। তাঁর বাহিনী তিনি ভৈরবের দিকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জানালেন।

আমি বললাম : আমি তো পেছনে থাকার জন্য আসিনি, আমি আগে চলে যাবো। তিনি তখন বললেন, তাহলে তো আপনাকে নিজস্ব প্রবেশপথ নিতে হবে। আমি তখন বলেছিলাম : যথার্থই আমিও নিজস্ব প্রবেশ পথই বেছে নেবো। আমি কি আপনার পেছনে

পেছনে যাবো নাকি? তখন তিনি আমাকে বললেন : আমরা আখাউড়া থেকে ভৈরব যাবো, আর আপনি সিলেটের মাধবপুর এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল হয়ে ভৈরব যাবেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি আমার বাহিনী নিয়ে মাধবপুর হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌছেছিলাম ৮ই ডিসেম্বর। তাঁরাও ব্রাহ্মণবাড়িয়া একই তারিখে পৌছেছিলেন। এখানে ছোটখাটো একটা যুদ্ধ হয়েছিল। তারপর ভারতীয় বাহিনী চলে গিয়েছিলো আশুগঞ্জের দিকে। আমি সরাইল থেকে আশুগঞ্জে পৌছেছিলাম ৯ই ডিসেম্বর। আশুগঞ্জে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে আমাদের যুদ্ধ হয় ৯, ১০ এবং ১১ই ডিসেম্বর।

পাকিস্তানী বাহিনী আমাদের সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণে টিকতে না পেরে ভৈরববাজারের দিকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। যাওয়ার সময় তারা ভৈরবের পুল ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়। তখন ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক আমাকে বললেন : আপনি ভৈরবে পাকিস্তানি বাহিনীর 'ফরটিন্থ ডিভিশনকে' ঘিরে রাখুন। আমরা ঢাকার দিকে অগ্রসর হচ্ছি। তখন আমি বলেছিলাম : ফরটিন্থ ডিভিশনকে ঘিরে রাখার জন্য কিছু ফোর্স রেখে আমিও ঢাকা যাবো। তিনি তখন বললেন : আমাদের ফোর্স তো হেলিকপ্টারে নরসিংদী যাচ্ছে, আপনি কিভাবে যাবেন? তখন আমি বলেছিলাম : ঠিক আছে, আমি হেঁটে চলে যাবো।

ভারতীয় বাহিনী তাঁদের ফোর্স হেলিকপ্টারযোগে নরসিংদী পাঠালেন। ভৈরবে পাকিস্তানি বাহিনীকে ঘিরে রাখার জন্য আমি ১১ নং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে রেখেছিলাম। আমার বাকি মুক্তিবাহিনী নিয়ে আমি ওখান থেকে লালপুরে চলে এসেছিলেন।

লালপুর থেকে নৌকাযোগে নদী অতিক্রম করে এসেছিলাম রায়পুরা। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে পৌছি নরসিংদী। নরসিংদী এসে দেখি ভারতীয় দুই ব্রিগেড বাহিনী ইতিমধ্যে এই এলাকা দখল করে রেখেছে। ভারতীয় দুই ব্রিগেডের একটি ছিলো ৩১১ মাউন্টেন ব্রিগেড আর একটি ছিল ৭৩ মাউন্টেন ব্রিগেড। তখন ভারতীয় বাহিনীর কমান্ডার আমাকে বললেন : আপনি নরসিংদী থাকুন, আমরা ঢাকা যাচ্ছি। এবারও আমি বললাম : নরসিংদীতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমিও ঢাকা যাবো। নরসিংদীর সব যানবাহন ভারতীয় বাহিনী নিজেরা নিয়ে এসে ডেমরা পৌছেন। আমি (বাহিনীসহ তখন পায়ে হেঁটে নরসিংদী থেকে ভোলতা পুলের নিকটে এলাম। সেখান থেকে কোনাকুনি পথে আমি রূপগঞ্জ দিয়ে শীতলক্ষ্যা ও বালু অতিক্রম করে ডেমরার পিছনে গিয়ে উঠলাম। ১৩ই ডিসেম্বর আমার বাহিনীর একাংশ ডেমরার পিছনে এবং অপর অংশ বাসাবোতে অবস্থান নেয়। কার্যত তখন থেকেই আমরা ঢাকাকে অবরোধ করে রেখেছিলাম।" (সংগৃহীত)

এখানে একটা ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মেজর জেনারেল আবদুল মজিদ কাজী ডিনামাইট দিয়ে ভৈরব ব্রিজের অংশ উড়িয়ে দিয়ে ১৪তম ডিভিশন নিয়ে ৯/১০ ডিসেম্বর তারিখে ভৈরবে আস্তানা স্থাপনের পর আর কোন যুদ্ধ করেনি বা নড়াচড়া করেনি। ব্রিগেডিয়ার সাদুল্লার ২৭ রেজিমেন্টও আর কোন মুভমেন্ট করেনি। মক্তিবাহিনীর ১১ নং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এদের ঘেরাও করে রেখেছিল। ঢাকায় আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হওয়ার পর দল বেঁধে অস্ত্র জমা দেয়ায় এরা প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু একটা ব্যাপার অনেকেরই বোধগম্য নয় যে, ভৈরব থেকে মাত্র ৮/৯ মাইল দক্ষিণে তিন নম্বর সেক্টরের মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনী জমায়েত হয়ে মেঘনা নদী অতিক্রম করে রাজধানী

ঢাকা আক্রমণের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাদের কোনো আক্রমণ করা হলো না? অথচ ভৈরবে তখন হানাদার বাহিনীর ১৪তম ডিভিশন ও ২৭তম ব্রিগেড একটা সুবিধাজনক 'পজিশনে' ছিল। পরবর্তীকালে এই প্রশ্নের জবাবে মেজর জেনারেল আবদুল মজিদ কাজী নাকি পরিষ্কার বলেছিলেন যে, 'ভৈরবের দক্ষিণাঞ্চল আমার এলাকার মধ্যে ছিল না।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, যে কথাটা তিনি বলেননি তা হচ্ছে, মুক্তিবাহিনীর ক্রমাগত হামলায় পাকিস্তানি বাহিনীর মনোবল বলতে কিছুই ছিল না– পাকিস্তানিরা ছিল ভীত ও সন্ত্রস্ত।

৫৭

একাত্তরের নভেম্বর মাস নাগাদ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পূর্ব রণাংগনে ব্যাপকভাবে সৈন্য মোতায়েন করতে সক্ষম হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসকালই এই এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা বিরতিহীনভাবে লড়াই করেছে এবং এই সীমান্তে মোশাররফ-হায়দারের অধীনে ট্রেনিংপ্রাপ্ত বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধা ঢাকায় অনুপ্রবেশ করে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ অব্যাহত রেখেছিল। পাকিস্তান দখলদার বাহিনী নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য ফেনী, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে তিনটি পূর্ণ ব্রিগেড মোতায়েন করেছিল।

আগেই বলেছি যে, এর পার্শ্ববর্তী এলাকা অর্থাৎ কুমিল্লার নিকটবর্তী সালদা নদী থেকে শুরু করে পুরো সিলেট জেলায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাদের ১৪তম ডিভিশনের দায়িত্বে ছেড়ে দিয়েছিল। ১৪তম ডিভিশনের মেজর জেনারেল আব্দুল মজিদ কাজী আখাউড়া-ভৈরব রেলপথের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থান করে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে জেনারেল মজিদ কাজী এবং ব্রিগেডিয়ার সাদুল্লার অধীনে ২৭তম ব্রিগেডের নাস্তানাবুদ অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। এক্ষণে জেনারেল মজিদ কাজীর ১৪তম ডিভিশনের অধীন সিলেটে অবস্থানরত ২০২ ব্রিগেড এবং মওলবিবাজারে যুদ্ধরত ৩১৩ ব্রিগেডের লড়াইয়ের কাহিনী বলা প্রাসংগিক হবে। এই দুটো ব্রিগেডের দায়িত্বে ছিলেন যথাক্রমে ব্রিগেডিয়ার সলিমুল্লাহ এবং ব্রিগেডিয়ার ইফতেখার রানা। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসকাল এতদঞ্চলে হানাদার বাহিনী যে বীভৎস অত্যাচার করেছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। এসব অত্যাচার হালাকু খাঁ আর চেংগিস খাঁর অত্যাচারের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

মওলবিবাজারে অবস্থানরত ব্রিগেডিয়ার রানা আত্মরক্ষার জন্য ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স এবং ২২ বালুচকে কামালগঞ্জ থেকে লাতু সীমান্ত পর্যন্ত মোতায়েন করলো। এই সীমান্তের সবচেয়ে ভয়াবহ আউট পোস্টের নাম হচ্ছে দুলাই। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের পত্র-পত্রিকা ছাড়াও বেতার ও টেলিভিশনে এই দুলাইয়ের নাম বারবার উচ্চারিত হয়েছে। কেননা, কৌশলগত কারণে দুলাইয়ের গুরুত্ব ছিল খুব বেশি। হানাদার বাহিনী দুলাই রক্ষা করার জন্য অক্টোবরের প্রথম দিকেই এক কোম্পানি সৈন্য এনে হাজির করলো। মুক্তিবাহিনী দুলাই দখলের জন্য অবিরাম আক্রমণ অব্যাহত রাখলো। ফলে একাত্তরের অক্টোবর মাসেই দুলাই আউট পোস্ট মোট চারবার হাতবদল হলো এবং ৩১শে অক্টোবর এক ভয়াবহ রক্তাক্ত যুদ্ধের মাধ্যমে মুক্তিবাহিনী দুলাই দখল করলো। হানাদার বাহিনীর ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সৈন্যদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে রইলো। বাকিরা শ্রীমঙ্গলের দিকে পলায়ন করলো। এই যুদ্ধে ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সহ-অধিনায়ক মেজর জাভেদও নিহত হয়। ৩রা নভেম্বর

নাগাদ মুক্তিফৌজ এই সেক্টরে পাকিস্তানি বাহিনীর দু'জন অফিসার, তিন জন কমিশন অফিসারসহ মোট ১৬০ জনকে হত্যা ও বিপুল পরিমাণে মার্কিনি ও চীনা সমরাস্ত্র দখল করতে সক্ষম হয়।

দুলাইয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি হস্তচ্যুত হওয়ার পর ৩১৩ ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার রানা ২২ বালুচ, ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স এবং দক্ষিণে অবস্থানরত ৩৯ বালুচ থেকে বাছাই করা জোয়ান নিয়ে একটা নতুন ফোর্স গঠন করলো। এদের সমর্থনে কয়েক হাজার রাজাকার ও 'ইপকাফ' সংগ্রহ করা হলো। এরপর ব্রিগেডিয়ার রানা সিলেট ও কুমিল্লা থেকে দুটো ফিল্ড গান ও চারটা হেভি মর্টার এনে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে দুলাই ঘাঁটিতে অবস্থানরত মুক্তিবাহিনীর ওপর সাঁড়াশি আক্রমণ করলো। কিন্তু মুক্তিবাহিনী গোপন স্থান থেকে থেকে বেরিয়ে পেছন থেকে এদের পাল্টা আক্রমণ করায় এরা হতভম্ব হয়ে গেলো। সম্মুখে এবং পিছনে দু'দিক থেকে মুক্তিবাহিনীর পাল্টা আক্রমণে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ব্রিগেডিয়ার রানার এই ফোর্স নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। এদের কেউই আর মূল ঘাঁটিতে ফিরে যেতে পারেনি।

এই বিজয়ের পর মুক্তিবাহিনী শমসেরনগর, কলোরা, জুরি এবং লাতু বরাবর এলাকা মুক্ত করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লো। হানাদার বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার ইফতেখার রানার অধীন ২২ বালুচ ব্রিগেড এই এলাকার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। দুলাইয়ের যুদ্ধে পরিণতি দেখে এরা পশ্চাদপসরণ করে শমসের নগরে মূল ঘাঁটি স্থাপন করলো। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে মুক্তিবাহিনী সীমান্তের সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে শমসেরনগরের ২২ বালুচরে মূল ঘাঁটির ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করলো। ব্রিগেডিয়ার রানা উপায়ন্তরহীন অবস্থায় ঢাকায় পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর সাহায্যের জন্য বার্তা পাঠালো। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দুটো এফ-৮৬ বিমান এসে ব্যাপক বোমাবর্ষণ করে সন্ধ্যার আগে ঢাকায় ফিরে গেলে শুরু হলো মুক্তিবাহিনীর ভয়াবহ আক্রমণ।

৫৮

লড়াইয়ের সুবিধার জন্য মুজিবনগর সরকার কর্তৃক সেক্টরগুলো পুনর্গঠিত করার পূর্ব পর্যন্ত সিলেট জেলার পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চল অর্থাৎ লাতু-আটগ্রাম থেকে শুরু করে জৈন্তাপুর, রাধানগর, সিলেট, ছাতক, টেকেরহাট, সুনামগঞ্জ এবং তাহিরপুরসহ হাওর এলাকায় যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দান করছিলেন তাঁদের মধ্যে তৎকালীন পরিষদ সদস্য ব্যারিস্টার শওকত আলী, মাহফুজ ভূঁইয়া, বিধু দাসগুপ্ত, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত অন্যতম। এছাড়া ছুটিতে আগত দু'জন বাঙালি সামরিক অফিসার মেজর মোতালিব লাতু এলাকার এবং সালাউদ্দীন বালাত এলাকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। একাত্তরের জুন মাস নাগাদ এসব এলাকা পাঁচ নম্বর সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত হলে মেজর (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত লে. জেনারেল) মীর শওকত আলী এর সামরিক দায়িত্ব লাভ করেন এবং এদের সঙ্গে সমন্বয় সাধিত হয়। এরা এক একটা সাব সেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন। অবশ্য এঁরা মোটামুটিভাবে গেরিলা পদ্ধতির যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আওয়ামী লীগের বাইরে নির্বাচিত পরিষদ সদস্যদের মধ্যে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। পাঁচ নম্বর সেক্টরের তৎকালীন অধিনায়ক মীর শওকত আলীর সক্রিয় এবং পূর্ণ সহযোগিতায় সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের সাব-সেক্টর থেকে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে ছাতক শহর আক্রমণ ও দখল সম্ভব হয়েছিল। এর আগেই এরা তাহিরপুর ও জামালগঞ্জ এই

দুইটি থানা দখল করেছিল। এই আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধারা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে হাওর এলাকায় 'ছিপ' নৌকা ব্যবহার করেছিল।

যাক যা বলছিলাম। সিলেট সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে জানতে পারলো যে, মেজর নুরুজ্জামানের (সেপ্টেম্বর মাসে তৎকালীন মেজর কে এম শফিউল্লাহ্ ব্রিগেড আকারে 'এস' ফোর্সের দায়িত্ব গ্রহণ করেন) তিন নম্বর সেক্টরের মুক্তিফৌজের সাথে প্রচণ্ড লড়াইয়ে পরাজিত হানাদার বাহিনীর ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স কুশিয়ারা নদী অতিক্রম করে সিলেটের দিকে পশ্চাদপসরণ করছে। তখন কৌশলগত কারণে এদের সিলেট শহরে ফাঁদে ফেলার জন্য কোন 'ডিস্টার্ব' করা হলো না। ব্রিগেডিয়ার রানা ও ব্রিগেডিয়ার হাসানের নেতৃত্বে ৩০ ফ্রন্টিয়ার ও ২৭ ব্রিগেডের অবশিষ্ট দল পর্যুদস্ত ও রণক্লান্ত অবস্থায় একত্রে নয়ই ডিসেম্বর সিলেট শহরে প্রবেশ করলো। তারা আন্দাজই করতে পারল না যে, তারা এক নতুন ফাঁদে পা দিয়েছে।

সিলেট শহরটা তখন এক ভৌতিক শহরে পরিণত হয়েছে। লোকজনের চলাচল নাই বললেই চলে। রাতের অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে চারদিক নীরব-নিথর। কেবল মাঝে মাঝে কুকুরে ঘেউ ঘেউ আওয়াজ ও গুলির শব্দ। এখানেই অবস্থান করছিল ব্রিগেডিয়ার সলিমুল্লাহ্ ২০২তম ব্রিগেড। এর অধীনে ৩১ পাঞ্জাব ছাড়াও ফ্রন্টিয়ার কোর, গিলগিট রেঞ্জার্স আর কয়েক হাজার রাজাকার এবং এক ব্যাটারি ফিল্ড গান। এছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিমানযোগে সদ্য আগত ১২ আজাদ কাশ্মীরকে সিলেটে পাঠানো হলো।

অন্যদিকে মুক্তিফৌজের ৩ ইস্ট বেঙ্গল তখন ছাতক এলাকা থেকে সিলেট শহরের দিকে তাক করে অবস্থান করছে আর লাতু-আটগ্রাম থেকে শুরু করে সুনামগঞ্জ-তাহিরপুর পর্যন্ত সীমান্তের সমস্ত আউট পোস্ট থেকে হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করে বিস্তীর্ণ এলাকা মুক্ত করেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান ও ভারতের যুদ্ধ শুরু হলে দেখা গেলো যে, পাকিস্তান বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে খুব সামান্য এলাকা রয়েছে। সিলেট শহরের চারপাশে এইসব এলাকা হচ্ছে পূর্বে চরখাই, উত্তরে হেমু এবং উত্তর-পশ্চিমে ছাতক শহরের উপকণ্ঠ পর্যন্ত। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে যখন সিলেটে সংবাদ এসে পৌছালো যে, দক্ষিণে আখাউড়া-ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকায় ২৭ ব্রিগেড এবং মওলভীবাজারে ৩১৩ ব্রিগেড মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, তখন সিলেটে অবস্থানরত ২০২ ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার সলিমুল্লাহ্ প্রমাদ গুনলেন। প্রতিদিনই বিভিন্ন এলাকা থেকে পরাজিত পাকিস্তানি সৈন্যরা সিলেটে এসে জমায়েত হতে লাগলো। এর মধ্যে জৈন্তাপুর থেকে ক্যাপ্টেন বসরতের অধীনে ৩১ পাঞ্জাব, লাতু থেকে ২২ বালুচরে বিচ্ছিন্ন অংশ এবং পরাজিত ৩০ ফ্রন্টিয়ার ও ৩১ পাঞ্জাবের কিছু সৈন্য অন্যতম। সিলেটে তখন তিনজন পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার। এদের মধ্যে দু'জন ব্রিগেডিয়ার রানা ও ব্রিগেডিয়ার হাসান স্ব স্ব এলাকায় যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সিলেটে আশ্রয় নিয়েছেন। আর একজন ব্রিগেডিয়ার সলিমুল্লাহ সিলেটে অবস্থানরত ২০২ ব্রিগেডের দায়িত্বে রয়েছেন।

ঠিক এমনি সময়ে সাতই ডিসেম্বর দিবাগত রাতে সিলেট শহরের পূর্ব দিকে হেলিকপ্টারে মিত্র বাহিনীর সৈন্য অবতরণ শুরু হলো। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে মিরনচক এবং এর অবস্থান হচ্ছে সিলেট শহর থেকে মাত্র দেড় মাইল দূরে। অনেকের মতে পাকিস্তানের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব আজমল চৌধুরী সর্বপ্রথম এই সংবাদ

নিজেই ব্রিগেডিয়ার সলিমুল্লার কাছে পৌছে দিয়েছিলেন। ফলে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা ডিসেম্বর মাসেই জনাব চৌধুরীকে হত্যা করে।

এটা খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে, সিলেট শহরের পূর্ব দিকে হেলিকপ্টারে মিত্র বাহিনীর যেসব সৈন্য অবতরণ করেছিল, কয়েক দিন পর্যন্ত ছাতক ও জকিগঞ্জে অবস্থানকারী মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব না হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানিরা মিরনচকে এদের ওপর কোন হামলা করেনি। ফলে নির্বিঘ্নে হেলিকপ্টারে মিত্র বাহিনীর অবতরণ সম্ভব হয়। অথচ তখন সিলেট শহরে হানাদার বাহিনীর হাতে বিপুল সংখ্যাক সৈন্য ও প্যারামিলিশিয়া ছাড়াও বেশ কিছু সংখ্যক কামান ও নিদেনপক্ষে আট সপ্তাহ পর্যন্ত লড়াই করার সমরাস্ত্র মজুদ ছিল।

পরবর্তীকালে সিলেট হানাদার বাহিনীর এই মনোভাব সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। সিলেটে অবস্থানরত তিনজন পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার হাসান, রানা ও সলিমুল্লাহ প্রকৃতপক্ষে পাল্টা হামলার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।

বিভিন্ন কোম্পানি থেকে জোয়ানদের একত্র করে একটা 'মিক্সড' বাহিনী গঠন করে চারটা ফিল্ডগান ও প্রচুর সমরাস্ত্রসহ ২২ বালুচ-এর কমান্ডিং অফিসারকে মিরনচক আক্রমণের নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু কমান্ডিং অফিসারের বক্তব্য ছিল, 'সৈন্যরা রণক্লান্ত বলে পাল্টা আক্রমণ সম্ভব নয়।' পরদিন নয়ই ডিসেম্বর ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের কমান্ডিং অফিসারকে একই নির্দেশ দিলে তিনিও আক্রমণ পরিচালনা করতে অস্বীকার করেন। সিলেটে পাকিস্তানি সৈন্যদের তখন মনোবল নেই বললেই চলে। সর্বত্রই কেবল পরাজিতের মনোভাব আর সবাই তখন প্রাণে বাঁচতে চায়।

১০ই ডিসেম্বর আরও সৈন্যবল বৃদ্ধি করে পাল্টা আক্রমণের ব্যবস্থা করা হলো। এই ব্যবস্থা মতো ৩০ ফ্রন্টিয়ার উত্তর দিক দিয়ে এবং ৩১ পাঞ্জাব সম্মুখ দিক থেকে মিরনচক আক্রমণ করবে। পরিকল্পনা মোতাবেক এই দুই বাহিনী আক্রমণের জন্য এগিয়ে গেলো। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে দেখা গেল যে, ৩০ ফ্রন্টিয়ারের পাঠান সৈন্যরা উত্তর দিক দিয়ে আক্রমণ করলেও ৩১ পাঞ্জাব আক্রমণের পরিবর্তে শেষ মুহূর্তে আবার সিলেট শহরে প্রত্যাবর্তন করলো। ফলে মিত্র বাহিনীর আক্রমণে ৩০ ফ্রন্টিয়ার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। ১২ ডিসেম্বর নাগাদ সিলেট শহরের পশ্চিম ও উত্তর অঞ্চলে অবস্থানরত মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে মিরনচকের মিত্র বাহিনীর যোগাযোগ হলে সিলেট শহর সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়।

এরপরের ঘটনাবলী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সিলেট অবস্থানরত কয়েক হাজার পাকিস্তানি সৈন্য ও মিলিশিয়া আত্মসমর্পণ করলো। সিলেট শহর রক্ষার জন্য হানাদার বাহিনী কোন যুদ্ধই করলো না। মুক্তিবাহিনীর বদলে মিত্র বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে প্রাণে রক্ষা পেলো।

সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিবেদন

১৯৭১ সালের ৭ই ডিসেম্বর সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা লিওনিদ ব্রেজনেভ ওয়ারশ' নগরীতে পোলিশ কম্যুনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসে বক্তৃতা দানকালে বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দ্ব্যর্থহীনভাবে যে রায় দিয়েছে সেই রায় এবং সেখানকার জনগণের মৌলিক অধিকারকে 'রক্তাক্ত' পদ্ধতিতে দমন করার প্রচেষ্টা ও লাখ লাখ শরণার্থীর মর্মন্তুদ ঘটনার পরিণতি হচ্ছে এই যুদ্ধ।"

চীনা প্রতিবেদন

১৯৭১ সালের ৯ই ডিসেম্বর চীনের অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী কমরেড চি পেং-কি বললেন, "গত কয়েক দিনে দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশের ঘটনাবলীর আরও অবনতি হয়েছে। ভারত সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আগ্রাসন করেছে এবং তাড়াহুড়া করে নৈতিকতা বিরোধীভাবে তথাকথিত বাংলাদেশকে তথাকথিত 'স্বীকৃতি' দিয়েছে।"

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকার পূর্ব-দক্ষিণ রণাংগনকে দুটি ভাগে ভাগ করেছিল। এর একটি ভাগ ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম জেলা নিয়ে ফেনী নদী বরাবর পর্যন্ত। এটাই ছিল এক নম্বর সেক্টর। একাত্তরের জুন মাস পর্যন্ত এই সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান এবং জুন থেকে ষোলই ডিসেম্বর পর্যন্ত তৎকালীন মেজর মোহাম্মদ রফিক।

পূর্ব-দক্ষিণ রণাংগনের আর একটি ভাগ ছিল সম্পূর্ণ নোয়াখালী জেলা, কুমিল্লা জেলার আখাউড়া-ভৈরব রেলওয়ে লাইন পর্যন্ত এবং ঢাকা ফরিদপুর জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে। এটাই ছিল দুই নম্বর সেক্টর। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তাক্ত যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে এই দুই নম্বর সেক্টরে। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন তৎকালীন মেজর খালেদ মোশাররফ। সেপ্টেম্বর মাসে রণাংগনে যুদ্ধ পরিচালনাকালে খালেদ মোশাররফ গোলার আঘাতে মস্তিষ্কে গুরুতরভাবে আহত হলে তৎকালীন ক্যাপ্টেন (পরবর্তীকালে মেজর) এ টি এম হায়দার এই সেক্টরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যুদ্ধের প্রথম থেকেই ক্যাপ্টেন হায়দার ছায়ার মতো খালেদ মোশাররফের সঙ্গী ছিলেন। তাঁরই নির্দেশক্রমে ক্যাপ্টেন হায়দার এই সেক্টরে বিশেষ করে ঢাকা এলাকার কিছু বামপন্থী মনোভাবাপন্ন যুবককে গেরিলা ট্রেনিং প্রদান করেছিল। নিয়তির পরিহাস! পরবর্তীকালে ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর 'সিপাহি বিদ্রোহের' সময় এই দুই বীর সেনানী মোশাররফ-হায়দার একই সঙ্গে নিহত হয়েছিলেন তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, ইতিহাসের সত্য একদিন উদ্‌ঘাটিত হবে।

এগারো জন সেক্টর কমান্ডারের মধ্যে বীর যোদ্ধা খালেদ মোশাররফ মিত্র বাহিনীর অন্যতম বৃহৎ অংশীদার ভারতীয় বাহিনী সম্পর্কে সব সময়ে একটা রিজার্ভ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তি সম্পর্কে যার অমোঘ বিশ্বাস ছিল, সেই খালেদ মোশাররফকে পরবর্তীকালে 'হিন্দুস্তানি জাসুস' (এজেন্ট) এই ভুয়া অভিযোগে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। রাজনীতির অপার মহিমার জন্য সেদিন এটা সম্ভব হয়েছিল। তবুও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে খালেদ মোশাররফ যে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর সেনানী ছিলেন তা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। তাঁর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত প্রতিটি যুদ্ধের বিবরণ ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ থাকার কথা। এসব যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা যে সাহস ও শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করেছে তা তুলনাহীন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় তৎকালীন মেজর খালেদ মোশাররফের নাম হানাদার বাহিনীর শিবিরে ভীতির সঙ্গে উচ্চারিত হতো।

দুই নম্বর সেক্টরে খালেদ মোশাররফের বাহিনীর দীর্ঘস্থায়ী ও ক্রমাগত পাল্টা আক্রমণের সংবাদে নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর জেনারেল হেডকোয়ার্টারে এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। লে. জেনারেল নিয়াজী দেয়ালে বাংলাদেশের বিরাট ম্যাপটার কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন।

দাউদকান্দি থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্যন্ত এলাকাকে আর ১৪ ডিভিশনের আওতায় রাখা সম্ভব নয়। খালেদ মোশাররফের অধীন মুক্তিবাহিনী যেভাবে বেলোনিয়া, ফেনী, কসবা এলাকায় পাল্টা আক্রমণ করছে তাতে মনে হয় যে, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টকে এক পাশে রেখে এইসব মুক্তিযোদ্ধারা চাঁদপুর-দাউদকান্দি এলাকা দিয়ে মেঘনা নদী অতিক্রম করে ঢাকা আক্রমণ করতে সক্ষম। তাই চাঁদপুরকে হেডকোয়ার্টার করে ৩৯ ডিভিশন নামে আর একটা নতুন ডিভিশন মোতায়েন।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আমলের সবচেয়ে দক্ষ জেনারেল এবং পূর্বাঞ্চলের ডেপুটি চিফ মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মেজর জেনারেল মোহাম্মদ রহিম খানকে এই নবগঠিত ৩৯ ডিভিশনের দায়িত্ব দেয়া হলো।

২১শে নভেম্বর রোববার জেনারেল রহিম তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে চাঁদপুরে উপস্থিত হলেন এবং মেঘনা নদীর পূর্ব ধারে মুজাফফরগঞ্জ-চাঁদপুর রাস্তার ধারে ৩৯ ডিভিশনের হেড কোয়ার্টার স্থাপন করলেন। কিন্তু উত্তরে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে এক ব্রিগেড এবং কিছুটা দক্ষিণ-পূর্ব ফেনীতে আর এক ব্রিগেড পাকিস্তানি সৈন্য মোতায়েন থাকায় জেনারেল রহিম কিছুটা নিরাপদ বোধ করলেন। ঢাকার ৫৩ ব্রিগেড, কুমিল্লার ১১৭ ব্রিগেড, ২১ আজাদ কাশ্মীরের দুটো কমান্ডো ব্যাটালিয়ন নিয়ে গঠিত হলো এই নতুন ৩৯ ডিভিশন। এছাড়া এই ডিভিশনের অধীনে মোতায়েন করা হলো অসংখ্য 'ইপকাফ' পুলিশ ও রাজাকার। উপরন্তু ব্রিগেডিয়ার তাসকিনের অধীনে আর একটি অস্থায়ী ৯১ ব্রিগেডকেও জেনারেল রহিমের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে দেয়া হলো। এই ব্রিগেড ১৫ বালুচ ও ৩৯ বালুচ নিয়ে গঠিত। এরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফেনী বেলোনিয়া ব্রিজ রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত হলো। এই প্রেক্ষাপটে নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে পূর্ণোদ্যমে শুরু হলো মুক্তি পাগল বাঙালি তরুণ-তাজা পাগল ছেলেদের সঙ্গে হানাদার বাহিনীর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ।

৬০

একাত্তরের নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে পূর্ব রণাংগনে যুদ্ধের তীব্রতা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেলো। কেননা এর মধ্যেই তৎকালীন লে. কর্নেল খালেদ মোশাররফের অধীনে 'কে' ফোর্স গঠনের অনুমতি দেয়া হয়েছে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে নবম ও দশম ব্যাটালিয়ন এই 'কে' ফোর্সের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একাত্তরের জুলাই মাসে মুজিবনগরে মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত এগারোটা সেক্টর কমান্ডারদের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান সেনাধ্যক্ষ তৎকালীন কর্নেল (অবঃ) আতাউল গণি ওসমানীর উপস্থিতিতে এই বৈঠকে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ এবং তিনি এই এগারোটা সেক্টরের সীমানা চিহ্নিত করে কমান্ডারদের কাছে পৃথক পৃথক ম্যাপ পর্যন্ত হস্তান্তর করেন। লড়াইয়ের ময়দানে বিভ্রান্তিকর অবস্থা এড়াবার জন্য এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। এই সময় দুই নম্বর সেক্টরের কমান্ডার খালেদ মোশাররফ কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি বললেন, 'মুজিবনগরে অবস্থানরত সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে সব সময়ে যোগাযোগ করা সম্ভব নয় বলে বিভিন্ন সেক্টরে কিভাবে এই যুদ্ধ পরিচালিত হবে?'

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ পরিষ্কারভাবে এর তাৎক্ষণিক জবাব দিলেন। 'সার্বিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনার দায়িত্ব মুজিবনগর সরকারের।

কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে কোন কৌশল এবং পদ্ধতিতে যুদ্ধ করা হবে, তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্থানীয় সেক্টর কমান্ডারদের। এ ব্যাপারে প্রতিনিয়ত হেডকোয়ার্টারের অনুমতি সংগ্রহের কোন প্রয়োজন নেই। তবে প্রতিটি সেক্টরের পরিস্থিতি সম্পর্কে হেডকোয়ার্টারকে অবহিত রাখতে হবে।'

এই বৈঠকে তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্তাব উথাপন করেন। এই প্রস্তাবে বলা হয়, যেহেতু ব্রিগেড পর্যায়ে জেড ফোর্স, কে ফোর্স এবং এস ফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে সেই হেতু এই তিনটি ফোর্সের কমান্ডারদের নিয়ে একটা উচ্চ সামরিক কাউন্সিল গঠন করা হোক এবং ইতিমধ্যে জেড ফোর্স গঠন করা হয়েছে বিধায় 'জেড' ফোর্সের অধিনায়ককে এই কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মনোনীত করা হোক।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সেক্টর কমান্ডারদের চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, প্রকাশ্যভাবে এই প্রস্তাব সম্পর্কে কারো মতামত গ্রহণ বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাই জবাবে বললেন, জেড ফোর্সের অধিনায়কের উথাপিত প্রস্তাব উত্তম বলা চলে, কিন্তু এই মুহূর্তে কোন সিদ্ধান্ত দেয়া সমীচীন হবে না। আরও কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করা দরকার।

জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত এই বৈঠক শেষ হবার পর কমান্ডাররা যাঁর যাঁর সেক্টরের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। হেড কোয়ার্টারে রয়ে গেলেন শুধু একজন। দুই নম্বর সেক্টরের খালেদ মোশাররফ। থিয়েটার রোডে অবস্থিত মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর ছোট্ট কামরায় তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে প্রবেশ করে সেলুট দিয়ে দাঁড়ালেন। স্মিতহাস্যে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন তাঁকে বসতে বললেন। খালেদ মোশাররফ দাঁড়িয়ে থেকে শুধু বললেন, 'উচ্চ সামরিক কাউন্সিল গঠনের জন্য জিয়াউর রহমান যে প্রস্তাব দিয়েছে, তাতে আমার সম্মতি নেই। বাকি সব সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। ততক্ষণে সেলুট দিয়ে খালেদ মোশাররফ চলে গেছেন। পরবর্তীকালে এই সিদ্ধান্ত আর চূড়ান্ত করা হয়নি।

যাক্ যা বলছিলাম। একাত্তরের নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে দুই নম্বর সেক্টরে আরও ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা এসে যোগ দিলে যুদ্ধের তীব্রতা ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পেলো। এ সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ১১৭ নং ব্রিগেড কুমিল্লা ক্যানটনমেন্টে অবস্থান করছিল। এর ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হকি খেলোয়াড় ব্রিগেডিয়ার আতিফ। ১১৭ ব্রিগেডের অধীনে ২৫ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের দুটো কোম্পানিকে লালমাই পাহাড়ের পাদদেশে প্রহরায় রাখা হয়। এদের অগ্রবর্তী কোম্পানির সঙ্গে ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারও অবস্থান করেছিল। ৩রা ডিসেম্বর দিবাগত রাত্রে মিত্র বাহিনীর সমর্থনপুষ্ট হয়ে দুই নম্বর সেক্টরের মুক্তিবাহিনী এদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। রাতে যুদ্ধের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পেলে অপরিচিত রাস্তাঘাট এবং মুক্তিযোদ্ধা গেরিলাদের চোরাগোপ্তা হামলার কথা চিন্তা করে ২৫ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের কমান্ডিং অফিসার দ্রুত পশ্চাদপসরণের অনুমতি প্রার্থনা করলো। কিন্তু ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট থেকে এদের পশ্চাদপসরণের অনুমতি নামঞ্জুর হলো। এর মাত্র আধা ঘণ্টার মধ্যে ২৫ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সঙ্গে সমস্ত রকমের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। ১১৭ নং ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার আতিফ প্রমাদ গুনলেন।

তাহলে কি ২৫ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে? এই ফোর্স যদি 'মুক্তিদের' হামলায় নিশ্চিহ্ন হয়েও থাকে তাহলে শত্রু পক্ষ কোন পথে এগুচ্ছে? শেষ পর্যন্ত প্রকৃত

অবস্থা জানার জন্য ব্রিগেডিয়ার সাহেব ৩০ পাঞ্জাবের একটা দুর্ধর্ষ পেট্রোল টিম পাঠালেন। কুমিল্লা শহরের দক্ষিণে বেশ কিছু দূর পর্যন্ত এই পেট্রোল টিম বহু খোঁজাখুঁজি করে ২৫ ফ্রন্টিয়ারের কোন হদিসই করতে পারলো না।

রাতের অন্ধকারে পুরো এলাকাটাই একটা ভৌতিক এলাকা মনে হচ্ছিলো। এই পেট্রোল টিম মুক্তি বাহিনীর অগ্রগতি সম্পর্কেও কোন খবর সংগ্রহ করতে পারলো না। ব্রিগেডিয়ার আতিফ আতংকিত অবস্থায় চৌদ্দগ্রাম অবস্থানরত ২৩ পাঞ্জাবের কাছে বার্তা পাঠালেন। পশ্চাদপসরণত ২৫ ফ্রন্টিয়ার ওদিকে গেছে। ঠিকভাবে যেনো থাকা-খাওয়া-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হয়। চৌদ্দগ্রাম থেকেও কোন খবর পাওয়া গেলো না। পরদিন ৪ঠা ডিসেম্বর দুপুর নাগাদ ২৫ ফন্টিয়ার ফোর্সের জনৈক হাবিলদার বিধ্বস্ত অবস্থায় কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে এসে হাজির হলো। চোখে-মুখে তার শুধু আতংক। মুক্তি বাহিনীর আচমকা ভয়াবহ আক্রমণে ২৫ ফ্রন্টিয়ারের প্রায় অর্ধেকটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বাকিরা অনেক কষ্টে লালমাই পাহাড়ের অন্য ধারে অবস্থিত হিন্দুস্তানীয় ফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ করে প্রাণে রক্ষা পেয়েছে। পরদিন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও আকাশবাণী থেকে সংবাদ প্রচারিত হলো। একজন লে. কর্নেল ও জনা কয়েক অফিসারসহ শতাধিক জওয়ান আত্মসমর্পণ করেছে। বাকিদের আর কোন খবর পাওয়া গেলো না।

ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে কুমিল্লা ক্যান্টিমেন্টে আরও দুঃসংবাদ এসে পৌছালো। ডাকাতিয়া নদী এলাকায় অবস্থানরত ২৩ পাঞ্জাবকে এই মর্মে নির্দেশ পাঠানো হলো যে তারা যেনো বেলোনিয়া এলাকার দিকে লক্ষ্য রাখে। জবাব এলো, বেলোনিয়া পর্যন্ত নজর রাখা তো দূরের কথা এখন এখানে টিকে থাকাই মুশকিল হয়ে পড়েছে। চারদিক থেকে পঙ্গপাতের মতো মুক্তিযোদ্ধারা জমায়েত হচ্ছে। এদের পিছনে রয়েছে মিত্র বাহিনী। যে কোন মুহূর্তে ভয়াবহ হামলা শুরু হতে পারে। ৪ঠা ডিসেম্বর সন্ধ্যা নাগাদ ২৩ পাঞ্জাবের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল আশফাফ আলী সৈয়দ কুমিল্লার নির্দেশ অগ্রাহ্য করে পশ্চাদপসরণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং তার অধীনে কোম্পানিগুলোকে বার্তা পাঠালেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণে বেশ বিলম্ব হয়ে গেছে। ৪ঠা ডিসেম্বর দিনের বেলায় তার দুই নম্বর সহকর্মী মেজর জাফর ইকবাল তখন লাকসাম থেকে দলবল নিয়ে এগুচ্ছিল তখন ডাকাতিয়া নদীর পূর্ব পাড় থেকে দুই নম্বর সেক্টরের দুর্ধর্ষ মুক্তিবাহিনী বিদ্যুৎগতিতে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। শুরু হলো রক্তক্ষীয় যুদ্ধ। মেজর জাফর দ্রুত ৫৩ ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার আসলাম নিয়াজীর কাছে বার্তা পাঠালেন; অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে ২৩ পাঞ্জাবের পশ্চাদপসরণের রাস্তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার আসলাম এ অবস্থার কথা বিশ্বাস করতে পারলো না।

এদিকে ২৩ পাঞ্জাবের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল আশফাক আলী সৈয়দ এই খবর পেয়ে আর পূর্ব নির্ধারিত মাগরেবের আজান পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলেন না। বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত কোম্পানিগুলো ফিরে আসার ঘণ্টা কয়েক আগেই অর্থাৎ বেলা সাড়ে চারটায় তার ব্যাটালিয়ান হেডকোয়ার্টারের পাততাড়ি গুটিয়ে লাকসামের দিকে পশ্চাদপসরণ করলো। তার সৈন্যদের চোখে-মুখে তখন ভীতি আর আতংকের ছাপ। পাকিস্তানি সৈন্যদের মধ্যে আলোচনার মুখ্য বিষয়ই হচ্ছে 'মুক্তিবাহিনীর আচমকা হামলা।' লে. কর্নেল আশফাফ পালাবার সুবিধার জন্য কোন আহতকে সঙ্গে নিলেন না। গুটি কয়েক ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে বিপুল সংখ্যক আহত সৈন নদীর পাড়ে তাঁবুর মধ্যে রেখে লে. কর্নেল আশফাফ গ্রামের মাঝ দিয়ে লাকসাম রওয়ানা হলেন। শুধু

কোম্পানিগুলোকে খবর পাঠালেন আবার লাকসামে তার ব্যাটালিয়ানের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য রাতের অন্ধকারে চৌদ্দগ্রাম থেকে পশ্চাদপসরণরত মেজর জাফর ইকবালের কোম্পানি অজান্তেই এস মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ঢুকে পড়লো। এর পরের ঘটনা অত্যান্ত সংক্ষিপ্ত ও মর্মান্তিক। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে পাকিস্তানি সৈন্যদের এই কোম্পানি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা রাতের অন্ধকারেই ঢাকার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো।

পরদিন সকালে মিত্র বাহিনী ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে এক ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন করলো। পার্বতীপুরের কয়েক মাইল এলাকা জুড়ে রয়েছে হানাদার বাহিনীর শতাধিক সৈন্যের লাশ। তখনও কিছু আহত সৈনিক তীব্র শীতে উন্মুক্ত আকাশের নিচে কাতরাচ্ছে। এদের মধ্যে গুরুতররূপে আঘাতপ্রাপ্ত মেজর আকরাম অন্যতম। মিত্র বাহিনী এদের দ্রুত শুশ্রূষার ব্যবস্থা করলো। এই ঘটনার তারিখটা হচ্ছে ৫ই ডিসেম্বর ১৯৭১।

৬১

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পূর্ব-দক্ষিণ রণাংগনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ছিল চাঁদপুর-হাজীগঞ্জ-মুদাফ্ফরগঞ্জ-কুমিল্লা এবং লাকসাম-কুমিল্লা সড়ক। স্থলপথে সম্ভাব্য হামলার হাত থেকে রাজধানী ঢাকাকে রক্ষা করার জন্য চাঁদপুরের কাছে হানাদার বাহিনীর ৩৯ ডিভিশনের হেড কোয়ার্টার স্থাপন করা হয়েছিল। এর দায়িত্বে ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ডেপুটি চিফ মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং ইয়াহিয়া খানের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ ও সুদক্ষ কমান্ডার মেজর জেনারেল রহিম খান। জেনারেল খান লড়াইয়ের সুবিধার জন্য কুমিল্লায় ১১৭ ব্রিগেড এবং লাকসামে ৫৩ ব্রিগেডকে রেখেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, এই পথ দিয়ে মুক্তিবাহিনী ঢাকার দিকে অগ্রসর হবার প্রচেষ্টা করলে সাঁড়াশি আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করা হবে। এজন্য কুমিল্লা এবং লাকসাম এই দুটি জায়গাতে যথাক্রমে ১১৭ এবং ৫৩ ব্রিগেড দুর্ভেদ্য দুর্গ স্থাপন করে অবস্থান করছিল।

কিন্তু নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হলো। লাকসামের দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা মুক্তিবাহিনীর দখলে আসার পর চেনা-অচেনা সব রাস্তা দিয়ে দুই নম্বর সেক্টরের এবং 'কে' ফোর্সের গেরিলারা প্রচণ্ড গতিতে অগ্রসর হলে এই অবস্থার সৃষ্টি হলো।

আগেই বলেছি যে, লালমাই পাহাড়ের যুদ্ধে হানাদার বাহিনীর ২৫ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স নিশ্চিহ্ন হলে এবং ২৩ পাঞ্জাব বিধ্বস্ত অবস্থায় ডাকাতিয়া নদী এলাকা থেকে পলায়ন করলে চাঁদপুরে অবস্থানরত জেনারেল রহিম খান প্রমাদ গুনলেন। ৩রা ডিসেম্বর ইয়াহিয়া খান মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানী বাহিনীর এতদিনকার লড়াইকে পাক-ভারত যুদ্ধে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে হিন্দুস্তান আক্রমণ করলে পূর্ব রণাংগনে মিত্র বাহিনীর আবির্ভাব হলো। মুক্তিবাহিনীর সহায়তার জন্য মিত্র বাহিনী এগিয়ে এলো।

এই প্রেক্ষাপটে চাঁদপুর-হাজীগঞ্জ-মুদাফ্ফরগঞ্জ-কুমিল্লা সড়কের ওপর মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী একযোগে আঘাত হানলো। এতদঞ্চলের ঝোপ-জংগল-বন্দর, লোকালয় সর্বত্র মুক্তিবাহিনী 'পজিশন' গ্রহণ করলো। এদের হিসাব ছিল যে, চাঁদপুর-কুমিল্লা সড়ক বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হলে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টকে একপাশে রেখে দাউদকান্দির কাছে মেঘনা নদী অতিক্রম করে রাজধানী ঢাকা নগরী আক্রমণ

সুবিধাজনক হবে। কোন অবস্থাতেই পলায়নরত পাকিস্তানি সৈন্যরা কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরুতে সাহসী হবে না। অন্যদিকে চাঁদপুরে অবস্থানরত জেনারেল রহিম খানও তার বাহিনী নিয়ে ঢাকার দিকে পালাবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হবে। তাই যুদ্ধে 'স্ট্রাটেজির' দিক থেকে চাঁদপুর-কুমিল্লা সড়কের গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি।

৪ঠা ডিসেম্বর নাগাদ চাঁদপুর-কুমিল্লা সড়কের নিকটে অবস্থানরত হানাদার বাহিনী ৫৩ ব্রিগেডের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার আসলাম নিয়াজী বুঝতে পারলেন যে, পরিস্থিতি বিশেষ সুবিধাজনক নয়। প্রথমত, স্থানীয় জনসাধারণের সামান্য সহযোগিতা থেকে পাকিস্তানি বাহিনী বঞ্চিত। দ্বিতীয়ত, আশপাশে সর্বত্র মুক্তিবাহিনী সাধারণ মানুষের সক্রিয় সহযোগিতায় অবস্থান সুদৃঢ় করছে এবং মিত্র বাহিনী দ্রুত এগিয়ে আসছে। তৃতীয়ত, 'ইপকাফ' ও রাজাকার সদস্যরা প্রতিদিনই ভেগে চলে যাচ্ছে। চতুর্থত, পাকিস্তানি সৈন্যদের মনোবল বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এই অবস্থায় কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে পশ্চাদপসরণ করা কিংবা চাঁদপুরে জেনারেল রহিমের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আর সম্ভাবনা নেই।

তাই ব্রিগেডিয়ার নিয়াজী তার অধীনস্ত সমস্ত বাহিনীকে লাকসামে জমায়েত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। চাঁদপুর-কুমিল্লা সড়ক থেকে এর দূরত্ব প্রায় আট মাইলের মতো। ব্রিগেডিয়ার নিয়াজীর নির্দেশে ১৫ বালুচ এবং ৩৯ বালুচ মুদাফ্‌ফরগঞ্জ থেকে দ্রুত লাকসামে গিয়ে হাজির হলো। এখানে ডকাতিয়া নদী এলাকা থেকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় ২৩ পাঞ্জাব অবস্থান করছিল। হাজীগঞ্জ এলাকা থেকে লে. কর্নেল জায়েদি ২১ আজাদ কাশ্মীর নিয়ে রাতের অন্ধকারে লাকসামে এসে হাজির হলো। ফলে গুরুত্বপূর্ণ চাঁদপুর-হাজীগঞ্জ-মুদাফ্‌ফরগঞ্জ-কুমিল্লা সড়ক সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত হয়ে পড়লো। এই সময় লাকসামে খবর এলো যে, ৩৯ ডিভিশনের অধিনায়ক জেনারেল রহিম খান স্বয়ং চাঁদপুর থেকে লাকসামে সরেজমিনে হাজির হবেন।

পরদিন জেনারেল রহিম একটা জিপে লাকসামের দিকে রওয়ানা হলেন। কিন্তু হাজীগঞ্জের পরেই একটা মর্টার শেলের আঘাতে তার পাইলট জিপ বিধ্বস্ত হলে তিনি আবার চাঁদপুরে ফিরে এলেন। তখন মুক্তিবাহিনী সর্বত্র ওৎ পেতে রয়েছে। হানাদার বাহিনীর ৩৯ ডিভিশনের তিনটা অংশ কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। ব্রিগেডিয়ার আতিফের নেতৃত্বে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত ১১৭ ব্রিগেড তাদের সুদৃঢ় অবস্থান থেকে বেরুতে রাজি নয় কিংবা কোন যুদ্ধে লিপ্ত হতে সাহসী নয়। লাকসামে ব্রিগেডিয়ার নিয়াজীর অধীনে ৫৩ ব্রিগেড রণক্লান্ত এবং ভীতসন্ত্রস্ত আর চাঁদপুরে জেনারেল রহিম খানের অধীনে ৩৯ ডিভিশনের হেড কোয়ার্টারের সৈন্যরা ঢাকায় পলায়নের চিন্তায় অস্থির। এটা হচ্ছে ৫/৬ ডিসেম্বরের অবস্থা। তখন হানাদার বাহিনী তাঁবুতে শুধু মুক্তিবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের আলোচনা।

অবস্থা বেগতিক দেখে ব্রিগেডিয়ার নিয়াজী এ মর্মে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, লাকসামের এভাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বেশিদিন অবস্থান করা সম্ভব নয়। তাই চাঁদপুরে জেনারেল রহিমের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

এই সিদ্ধান্ত অনুসারে লে. কর্নেল আশফাক সৈয়দ এবং লে. কর্নেল জায়েদীর নেতৃত্বে দুটো গ্রুপ তৈরি করা হলো। ২১ আজাদ কাশ্মীর, ১৫ বালুচ এবং ২৩ পাঞ্জাব থেকে তিনটা কোম্পানিকে পৃথক করে দুইটা গ্রুপ তৈরি করা হলো। এদের কাজ হলো মুদাফ্‌ফরগঞ্জে অবস্থানরত মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনীকে হটিয়ে চাঁদপুরে যাওয়ার রাস্তাকে বিপদমুক্ত করা। পরিকল্পনা মতো এদের প্রথম আক্রমণ বেশ কিছু সংখ্যক

হতাহতের মধ্যে ব্যর্থ হলো। লে. কর্নেল আশফাফ ও লে. কর্নেল জায়েদী এবার সিদ্ধান্ত নিলেন যে, মূল সড়ক দিয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা না করে গ্রামের বিকল্প পথে গিয়ে আকস্মিকভাবে হাজীগঞ্জ আক্রমণ করা। ক্রমাগত ৩৬ ঘণ্টা ধরে তারা হাজীগঞ্জের দিকে বিকল্প পথে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু পথে যে অবর্ণনীয় কষ্টের সম্মুখীন হলেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কোথাও এরা খাদ্য ও পানি পর্যন্ত পেলো না। সব সময়েই এদের মনে হলো যে, প্রেতাত্মার মতো মুক্তিবাহিনী এদের নিঃশব্দে অনুসরণ করছে। দূরে গ্রামের কোন গৃহে লণ্ঠনের আলো দেখলে কিংবা কোন আওয়াজ হলেই এদের মনে হলো– নিশ্চয়ই মুক্তিবাহিনী এদের ওপর নজর রেখে পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে। এদের পেটে তখন প্রচণ্ড ক্ষুধা, বুকে পানির তৃষ্ণা আর বিশ্রামের অভাবে শরীর শক্তিহীন। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর হাতে পড়লে একজনও প্রাণে রক্ষা পাবে না। ৯ই ডিসেম্বর এরা হাজীগঞ্জের উপকণ্ঠে মিত্র বাহিনীর তাঁবুর সন্ধান পেলো। আর কালক্ষেপণ না করে সাদা পতাকা উত্তোলন করে ১৫ বালুচ, ২৩ পাঞ্জাব ও ২১ আজাদ কাশ্মীর আত্মসমর্পণ করলো। পিছনে মুদাফ্‌ফরগঞ্জের কাছে তখনও খোলা মাঠে পড়ে রয়েছে তাদের কিছু আহত সৈন্য। এদের আর কোন খবর পাওয়া যায়নি।

১৫ বালুচ, ২১ আজাদ কাশ্মীর ও ২৩ পাঞ্জাবের আত্মসমর্পণের খবর যখন লাকসাম পৌঁছালো তখন সমস্ত ব্রিগেডে ব্যাপক অসন্তোষ ও অস্থিরতা দেখা দিলো। ব্রিগেডিয়ার নিয়াজী এ মর্মে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আর লাকসামে অবস্থান করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। যেভাবেই হোক কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে পশ্চাদপসরণ করতেই হবে। কিন্তু সমস্যা হলো ১২৮ জনের মতো আহত সৈন্যকে নিয়ে। এদের লাকসাম সিভিল হাসপাতালে রাখা হয়েছিল। আগে মনে হয়েছিল যে, এদের ট্রেনযোগে চাঁদপুর পাঠানো সম্ভব হবে। তাই এইসব আহতদের ৮ই ডিসেম্বর কয়েকটা তৃতীয় শ্রেণীর রেলওয়ে কম্পার্টমেন্টের মেঝেতে রাখা হয়েছিল। কিন্তু ১০ই ডিসেম্বর যখন খবর এলো যে, লে. কর্নেল আশফাফ ও লে. কর্নেল জায়েদী তাদের সৈন্য নিয়ে হাজীগঞ্জে আত্মসমর্পণ করেছে, তখন ব্রিগেডিয়ার নিয়াজী চাঁদপুরের পরিবর্তে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু এই ১২৮ জন আহত সৈন্য নিয়ে কিভাবে পলায়ন সম্ভব হবে?

৫৩ ব্রিগেডের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার আসলাম নিয়াজী এ সময় এক ভয়াবহ ও বিশ্বাসঘাতকমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ডাক্তারদের বলা হলো যে, রেলওয়ে বগিতে অবস্থানরত আহত সৈন্যদের ব্যথা কমাবার মিক্সচার ও ঘুমাবার ওষুধ দেয়া হোক। এরপর গভীর রাতে ব্রিগেডিয়ার নিয়াজী তার বাকি সিদ্ধান্ত কার্যকরী করলেন।

২৩ পাঞ্জাবের মেজর রাইসীমের নেতৃত্বে 'ইপকাফ', মুজাহিদ ও রাজাকারের প্রথম দলটি ১০ই ডিসেম্বর মধ্যরাতে নিঃশব্দে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের দিকে রওয়ানা হলো। আধঘণ্টার মধ্যে লে. কর্নেল নঈমের নেতৃত্বে ৩৯ বালুচ লাকসাম ত্যাগ করলো। এরপর ব্রিগেডিয়ার নিয়াজী ভারি সমরাস্ত্র, সমস্ত রেশন সামগ্রী ও গোলাগুলি নদীতে নিক্ষেপের নির্দেশ দিয়ে রাতের অন্ধকারে ময়নামতির দিকে রওয়ানা হলেন। পিছনে কয়েকটা রেলওয়ে বগির মেঝেতে পড়ে রইলো ১২৮ জন আহত সৈন্য আর জনা কয়েক ডাক্তার। রাতের নিশ্চুপ অন্ধকারে খালি একটানা ভেসে আসছে তখন কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ।

চাঁদপুর অবস্থানরত ৩৯ ডিভিশনের কমান্ডার ও ডেপুটি চিফ মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মেজর জেনারেল মোহাম্মদ রহিম খান বুঝতে পারলেন যে, লে. কর্নেল

সাইদের অধীনে ২৭ পাঞ্জাব এবং লে. কর্নেল জাহেদীর অধীনে ২১ আজাদ কাশ্মীর শত চেষ্টা করলেও চাঁদপুরে এসে পৌঁছতে পারবে না। কেননা দাউদকান্দি ও কুমিল্লা থেকে শুরু করে মুদাফ্‌ফরগঞ্জ, চাঁদপুর, লাকসাম, ফেনী ও মাইজদি-এসব এলাকায় হাজার হাজার ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিবাহিনী 'পজিশন' নিয়েছে আর 'শত্রুপক্ষ' কোন বড় ধরনের প্রতিরোধ ছাড়াই ঢাকার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই অগ্রাভিযানের সময় চাঁদপুর ৩৯ ডিভিশনের হেডকোয়ার্টার আক্রান্ত হবে কিনা?

আটই ডিসেম্বর রাতে জেনারেল রহিম খান ঢাকায় ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টারে বিপদ সংকেত পাঠালেন। ...আমরা তিন দিক থেকে শত্রুবেষ্টিত। আমাদের অবস্থানের পিছনে হচ্ছে বিশাল মেঘনা নদী। সাফল্যজনক পশ্চাদপসরণের জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় সাহায্য পাঠান

লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী তাঁর সবচেয়ে প্রিয় জেনারেল রহিম খানের এই অবস্থা দেখে বেশ বিচলিত হয়ে উঠলেন। লাল শাটিন প্রিন্টের ড্রেসিং গাউন পরে হন্তদন্ত হয়ে সে রাতেই জেনারেল নিয়াজী অপারেশন রুমে এসে চাঁদপুর সেক্টরের বিরাট দেয়াল ম্যাপটার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। এরপর হঠাৎ করে চিৎকার করে উঠলেন, 'জেনারেল রহিমকে এক্ষুণি ঢাকায় চলে আসতে হবে। এতো বড় মেঘনা নদীর পাড়ে রহিমের পক্ষে আর কতক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব? ওকে পশ্চাদপসরণের নির্দেশ পাঠিয়ে দাও?'

জেনারেল রহিম এই নির্দেশ পেয়ে চাঁদপুর থেকে ঢাকায় পশ্চাদপসরণের আয়োজন শুরু করলেন। নদীপথে তাঁকে ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের দুইটা প্লাটুন, ২৩ পাঞ্জাবের অবশিষ্ট প্লাটুন, একটা কমান্ডো ব্যাটালিয়ন এবং সিগন্যাল, অর্ডিন্যান্স ও সাপ্লাইয়ের লোকজন ছাড়াও প্রয়োজনীয় রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যেতে হবে। ভারি অস্ত্র আর বাকি গোলাগুলি ধ্বংস করতে হবে, না হয় নদীতে ফেলতে হবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার দুর্ধর্ষ সেনাপতি মেজর জেনারেল মোহাম্মদ রহিম খান একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের রণাংগনে ৯ই ডিসেম্বরের সকালে চাঁদপুরের বিশাল মেঘনা নদীর দিকে কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলেন। সর্বত্র তিনি শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের আনাগোনা দেখতে পাচ্ছেন।

ঢাকা থেকে কোন সাহায্যের আশা না করে তিনি নয়ই ডিসেম্বর সমস্ত দিন ধরে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত কয়েকটা লঞ্চে সমস্ত জিনিসপত্র ও জোয়ানদের উঠাবার ব্যবস্থা করলেন। তার সিদ্ধান্ত হচ্ছে নয়ই ডিসেম্বর দিবাগত মধ্যরাতে নদীপথে ঢাকার দিকে রওয়ানা হবেন। এর মধ্যে অনেক কষ্টে রাত এগারোটা নাগাদ নারায়ণগঞ্জ থেকে সাহায্যের জন্য একটা গানবোট এসে হাজির হলো। কিন্তু সব কিছু কাজ সমাধা করে নদীপথে যখন ৩৯ ডিভিশনের 'কনভয়' রওয়ানা হলো তখন সময় হচ্ছে দশই ডিসেম্বর ভোর সাড়ে চারটা। জেনারেল রহিম হিসাব করলেন যে, গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে তাঁর নিদেনপক্ষে পাঁচ ঘণ্টার প্রয়োজন হবে। দিনের বেলায় নদীতে যে কোনো সময় মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের আশংকা রয়েছে। তাই তিনি রওয়ানা হওয়ার আগে ঢাকায় ইস্টার্ন কমান্ডের হেডকোয়ার্টারে 'এয়ার কভারের' অনুরোধ জানিয়ে জরুরি বার্তা পাঠালেন। বেচারা জেনারেল রহিম জানেন না যে, ৬ই ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশে পাকিস্তান এয়ারফোর্সের আর কোন অস্তিত্ব নেই। মাত্র ৬০ ঘণ্টার লড়াইয়ে পিএএফ যুদ্ধবিমানের অধিকাংশই বিনষ্ট হয়ে গেছে।

দশই ডিসেম্বর সকালে যখন জেনারেল রহিম খানের গানবোট ও নৌযানগুলো

শীতলক্ষ্যা নদী বরাবর অগ্রসর হচ্ছিল তখন মিত্র বাহিনীর দুটো মিগ-২১ যুদ্ধবিমান হামলা চালালো। গানবোট থেকে বিমান বিধ্বংসী কামান ব্যবহার করেও কোন কাজ হলো না। মাত্র বিশ মিনিটকাল হামলায় শীতলক্ষ্যা নদী বক্ষে ১৯৭১ সালের ১০ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের ৩৯ ডিভিশনের পলায়মান হেডকোয়ার্টারের (সৈন্য বাহিনী, রসদ ও সমরাস্ত্র) সলিল সমাধি হলো। বহু কষ্টে গানবোটের ক্যাপ্টেন বিধ্বস্ত অবস্থায় গানবোটটা নদীর ধারে লাগাতে সক্ষম হয়েছিল। এতে জেনারেল রহিমসহ জনাকয়েক রক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু মেজর জেনারেল মোহাম্মদ রহিম খান তখন মারাত্মকভাবে আহত। গোটা কয়েক বুলেট তার পায়ে বিদ্ধ হয়েছিল। নারায়ণগঞ্জ থেকে উদ্ধারকারী দল আহত রহিম খানসহ জীবিত সৈন্যদের উদ্ধার করলো। পিছনে শীতলক্ষ্যা নদী বক্ষে রইলো বহু সংখ্যক ভাসমান সৈন্য ও অফিসারদের লাশ। এখানে নিশ্চিহ্ন হলো পাকিস্তান সৈন্য বাহিনীর সবচেয়ে দুর্ধর্ষ দুই নং 'ক্র্যাক কমান্ডো' ব্যাটালিয়ান। এর চারজন অফিসারই নিহত হলো। এই নিহত অফিসারদের অন্যতম ছিলেন মেজর বেলাল। ছাব্বিশে মার্চ যে কমান্ডো বাহিনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বত্রিশ নম্বরের বাসভবনে হামলা চালিয়েছিল এই মেজর বেলাল ছিলেন সেদিন সেই কমান্ডো বাহিনীর কোম্পানি কমান্ডার। তার কোম্পানির কমান্ডিং অফিসার ছিলেন লে. কর্নেল জেড এ খান। দশই ডিসেম্বর শীতলক্ষ্যার পাড় দিয়ে যেসব জীবিত সৈন্য প্রাণভয়ে গ্রামের দিকে দৌড়েছিল তাদের খবর আর কোন দিন পাওয়া যায়নি। এসব গ্রামে তখন মুক্তিবাহিনী ওৎ পেতে বসে ছিল।

চাঁদপুর-কুমিল্লা সেক্টরের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত পাকিস্তানের প্রখ্যাত হকি খেলোয়াড় ব্রিগেডিয়ার আতিকের অধীনে ১১৭ নং ব্রিগেডে অবস্থান। একে যদিও মেজর জেনারেল রহিম খানের ৩৯ ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তবুও এই ১১৭ নং ব্রিগেড কোন সময়েই একই ডিভিশনের অন্য কোন কোম্পানিকে সাহায্য করেনি কিংবা লড়াইয়ের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলা করেনি। ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট এলাকাটা সব সময়েই দুর্গের মতো। তাই ব্রিগেডিয়ার আতিক যুদ্ধ চলাকালীন কোন সময়েই তার ব্রিগেডকে এই ক্যান্টনমেন্ট এলাকা থেকে বাইরে যাবার নির্দেশ দেননি। এমনকি রাজধানী ঢাকার 'ডিফেন্স' শক্তিশালী করার জন্য ব্রিগেডিয়ার আতিককে ১১৭ ব্রিগেড নিয়ে পশ্চাদপসরণ করার নির্দেশ দিলে তিনি 'নিরাপত্তার' অজুহাত দেখিয়ে তা অগ্রাহ্য করলেন। আরও আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের সুরক্ষিত অবস্থা দেখে মিত্র বাহিনীও অযথা সময় নষ্ট এবং ক্ষয়-ক্ষতির কথা চিন্তা করে এই ক্যান্টনমেন্টে আক্রমণ না করে পাশ কাটিয়ে দাউদকান্দি হয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে মুক্তি বাহিনীর সদস্যরা কুমিল্লা শহর দখল করে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উড্ডীন করলেও শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ না করে সুযোগের প্রতীক্ষায় রইলো। ষোলই ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পণ করার পর কুমিল্লা গ্যারিসন মিত্র বাহিনীর কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেছিল।

এদিকে ঢাকায় ৩৯ ডিভিশনের প্রধান আহত মেজর জেনারেল রহিম খান গভর্নর ড. মালেকের পরামর্শদাতা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর বাসভবনে চিকিৎসার জন্য অবস্থান করছিলেন। ১২ই ডিসেম্বর তিনি কিছুটা সুস্থ হয়ে লে. জেনারেল নিয়াজী, মেজর জেনারেল জমসেদ ও মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে আলোচনার জন্য

ডেকে পাঠালেন। সবাই আহত জেনারেলকে দেখতে এসে আলোচনায় বসলেন। জেনারেল রহিম খান সবাইকে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে বললেন। তিনি উল্লেখ করলেন যে, এভাবে সৈন্য ক্ষয় করে কোন লাভ আছে কি?

রণক্ষেত্রে থেকে সদ্য আগত আহত জেনারেল রহিম খান সব সময়ই একজন ধীরস্থির জেনারেল হিসেবে পরিচিত। সবাই তার বক্তব্যের গুরুত্ব দিলেন এবং প্রায় আধঘণ্টা আলোচনার পর জেনারেল নিয়াজী যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাবের জন্য রাজি হলেন। তখন প্রশ্ন উঠলো এই প্রস্তাব ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টার আর গভর্নর হাউসের কোন্ জায়গা থেকে রাওয়ালপিন্ডিতে পাঠানো বাঞ্ছনীয় হবে। জেনারেল নিয়াজীর বক্তব্য হচ্ছে প্রস্তাবটি গভর্নর হাউস থেকে পাঠানো হোক। জেনারেল ফরমানের কথা হচ্ছে এই প্রস্তাব ইস্টার্ন কমান্ড থেকে পাঠালে ভালো হয়। এমন সময় চিফ সেক্রটারি মোজাফ্ফর হোসেন এসে হাজির হলেন এবং জেনারেল নিয়াজীকে সমর্থন করলেন। এরপর গভর্নরের অনুমোদনের জন্য একটা 'খসড়া সিগন্যাল' লেখা হলো।

পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হলে ১৫ই ডিসেম্বর আহত মেজর জেনারেল রহিম খানকে একটা হেলিকপ্টারে বর্মার আকিয়াবে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ৪ নং অ্যাভিয়েশন স্কোয়াড্রনের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল লিয়াকত বোখারী এই হেলিকপ্টারে আরও কয়েকজন গোয়েন্দা বিভাগীয় কর্মচারীকে নিয়ে গেলেন। অথচ জেনারেল নিয়াজী মিলিটারি হাসপাতালে কর্মরত আটজন মহিলা নার্সকে কথা দিয়েছিলেন যে, শেষ মুহূর্তে তাদের হেলিকপ্টারে বর্মায় পাঠিয়ে দেয়া হবে। মুক্তিবাহিনীর "পৈশাচিক কার্যকলাপের" হাত থেকে এই নার্সদের রক্ষা করার জন্য এই হেলিকপ্টারকে 'স্ট্যান্ড বাই' রাখা হয়েছিল।

পনেরোই ডিসেম্বর বিকেলের দিকে যখন নার্সরা জানতে পারলো যে, তাদের উদ্ধারের জন্য কোন হেলিকপ্টার নেই, তখন সবাই ডুকরে কেঁদে উঠলো আর বললো, 'ইয়ে তো গাদ্দারি হ্যায়।'

৬২

ময়মনসিংহ সদর, নেত্রকোনা এবং জামালপুর এলাকা নিয়ে গঠিত হয়েছিল মুজিবনগর সরকারের ১১ নং সেক্টর। প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কাজের সুবিধার জন্য এই সেক্টরের হেড কোয়ার্টার ছিল সীমান্তের ওপারে মেঘালয়ে। মুক্তিযুদ্ধের প্রথমদিকে কিছুদিন পর্যন্ত তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান (পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি) এই সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন। এ সময় মুজিবনগর সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব কামরুজ্জামান এই সেক্টর পরিদর্শনে এসেছিলেন। পরে একাত্তরের জুলাই মাসে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম, তৃতীয় ও অষ্টম ব্যাটালিয়ান নিয়ে জিয়াউর রহমানের পরিচালনায় 'জেড ফোর্স' গঠনের দায়িত্ব দেয়া হলে আগস্ট মাসে মেজর আবু তাহের এই সেক্টরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে আর যেসব অফিসার যুদ্ধ করেছিলেন তারা হলেন লে. কর্নেল আব্দুল আজিজ পিএসসি, উইং কমান্ডার (অবঃ) হামিদুল্লাহ বীর প্রতীক, মেজর নূরুন নবী, মেজর তাহের আহমেদ বীর প্রতীক, মেজর মিজানুর রহমান, মেজর গিয়াস আহমেদ (১৯৮১ সালে সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত) এবং মেজর মুইনুল ইসলাম (চাকরিচ্যুত) প্রমুখ। রাজনীতিবিদদের মধ্যে ব্যারিস্টার শওকত আলী সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে এই সেক্টরে যুদ্ধ করেছিলেন।

১১ নং সেক্টরের কমান্ডার আবু তাহের ছিলেন একজন নির্ভীক সেনানী। দেশ মাতৃকার শৃংখল মুক্তির জন্য তিনি ছিলেন এক উৎসর্গকৃত প্রাণ। একাত্তরের আগস্ট মাসে জামালপুরের বকশীগঞ্জ-কামালপুর সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর ৯৩ ব্রিগেডের সঙ্গে এক সম্মুখযুদ্ধে ১২০ মিলিটার মর্টারের গোলায় আবু তাহেরের একটি পা উড়ে যায়। এই দিনকার যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে ছিলেন ব্যারিস্টার শওকত আলী। এই যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ব্যারিস্টার আলী বলেছেন, "মেজর তাহেরের আহত হওয়ার ঘটনাটিই বলি। তিনি সেদিন যুদ্ধের সম্মুখ ভাগে গিয়েছিলেন। আমিও তাঁর সাথে গেলাম। সম্মুখভাগে যাওয়ার পর তিনি আমাকে তাঁর সাথে আর এগুতে দিলেন না। তিনি আমাকে একটা নির্দিষ্ট স্থানে থাকতে পরামর্শ দিয়ে তাঁর অন্য কয়েকজন সাথী নিয়ে আক্রমণ চালানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এটা ঘটেছিল মাইনকারচর সীমান্ত এলাকায়। কিন্তু তিনি বেশিদূর এগুতে পারেননি। শত্রু বাহিনীর একটা শেল এসে তাঁর পায়ে লাগল। তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে গেলেন। তার সাথীরা তখন তাকে তাড়াতাড়ি পেছনের দিকে নিয়ে এলেন।

আমাদের ক্যাম্পে ফিল্ড হাসপাতাল ছিল। সেখানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তার মুখার্জী নামে একজন এমবিবিএস ডাক্তার ছিলেন। তিনি ঐ ফিল্ড হাসপাতালে গিয়েই মেজর তাহেরকে অস্ত্রোপচার করলেন।

"তারপরই ওখান থেকে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল গৌহাটি হাসপাতালে। সেখানে তিন দিন থাকার পর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো পুনা। সেখানেই তাঁকে একটি নকল পা দেয়া হয়েছিল।" স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ব্যারিস্টার শওকত আলী আরও বললেন, 'মেজর তাহের যুদ্ধের অগ্রভাগ থেকে যখন আক্রমণ পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে পাকিস্তানি সৈন্যরাও এগিয়ে আসছিল। কিন্তু এটা হয়তো তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বুঝে উঠতে পারেননি। তাছাড়া পাকিস্তানি সৈন্যরা 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে আমাদের দিকে এমনভাবে এগিয়ে আসছিল যে, তিনি হয়তো এতে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। তবে বিভ্রান্তি কাটিয়ে ওঠা মাত্র তিনিই পাক বাহিনীকে পাল্টা আক্রমণ করেছিলেন। ঐ সময় আচমকা একটি সেল এসে তাঁর পায়ে লেগেছিল।"

যুদ্ধের 'স্ট্রাটেজি' হিসাবে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর 'স্ট্রাটেজি' ছিল প্রথমত সীমান্তে হালুয়াঘাট থেকে বকশীগঞ্জ, কামালপুর, নকশী ও বারমারী প্রভৃতি জায়গায় দীর্ঘস্থায়ীভাবে মরণপণ যুদ্ধ করতে হবে। এরপর পশ্চাদপসরণে বাধ্য হলে ময়মনসিংহ আর জামালপুরে সুরক্ষিত ঘাঁটি স্থাপন করে প্রতিপক্ষের ওপর আঘাত হেনে প্রতিরোধ করতে হবে। এটাই হবে 'লাইন অব নো পেনিট্রেশন' অর্থাৎ শত্রুর জন্য মরণ ফাঁদ। এরপরেও পাশ্চাদপসরণ করতে হলে একেবারে রাজধানী ঢাকার উপকণ্ঠে জমায়েত হয়ে শেষ লড়াই ও আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে। এই 'স্ট্রাটেজি'র কারণেই সীমান্তের হালুয়াঘাট, বকশীগঞ্জ, কামালপুর, নকশী ও বারমারী এলাকায় দীর্ঘস্থায়ী রক্তাক্ত যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর এর পুরো ধাক্কাটাই সামলাতে হয়েছে মুক্তিবাহিনীর ১১ নম্বর সেক্টরের দুর্ধর্ষ সৈন্যদের। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে আমাদের বাঙালি সৈন্যদের এসব বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের বিস্তারিত কাহিনী লিপিবদ্ধ থাকার কথা। ১১ নং সেক্টরের যুদ্ধের পর্যাচালোনা করলে দেখা যায় যে, সীমান্তের হালুয়াঘাট, বকশীগঞ্জ, নকশী ও বারমারী এলাকায় দীর্ঘস্থায়ী রক্তাক্ত যুদ্ধে পাকিস্তানিরা পরাজিত হলে পশ্চাদপসরণকালে রাজধানী ঢাকা নগরী পর্যন্ত আর কোন প্রতিরোধ গড়তে সক্ষম হয়নি। অবশ্য এর অন্যতম কারণ হচ্ছে টাঙ্গাইল

এলাকার দুর্ধর্ষ কাদেরিয়া বাহিনীর ভয়াবহ ও পৈশাচিক পাল্টা আক্রমণ।

যা হোক, একাত্তরের নভেম্বর মাসে ১১ নং সেক্টরের কমান্ডার আবু তাহের আহত হলে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এম হামিদুল্লাহ সেক্টর পরিচালনার দায়িত্ব ভার লাভ করেন। যুদ্ধে শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দেয়ায় এম আবু তাহেরকে বীর উত্তর এবং হামিদুল্লাহকে বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়। আবু তাহের কর্নেল পদে এবং হামিদুল্লা উইং কমান্ডারে পদোন্নতি লাভ করেছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এক দুঃখজনক পরিস্থিতিতে সামরিক আদালতে কর্নেল তাহেরের ফাঁসি হয় এবং পরবর্তীতে উইং কমান্ডার হামিদুল্লাহ অবসর লাভ করেন।

ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনী কিভাবে লড়াই করেছিল তার তথ্য উপস্থাপনা করা প্রাসংগিক হবে। একাত্তরের যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি জেনারেলদের মধ্যে মেজর জেনারেল জমসেদ ধীরস্থির ও ঠাণ্ডা মেজাজের জেনারেল হিসাবে পরিচিত ছিলেন। প্রথমে ইনি ছিলেন 'ইফকাফ', রেঞ্জার্স, রাজাকার ও পুলিশ বাহিনীর দায়িত্বে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বেশ কিছু সংখ্যক খুনি, ডাকাত ও দুশ্চরিত্রের প্রাক্তন ফৌজি আর স্থানীয়ভাবে কিছু দাগি আসামিদের রিক্রুট করে ইনি গঠন করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্স। এক কথায় যার নাম ছিল 'ইফকাফ'। এছাড়া রাজাকার বাহিনী গঠনের সার্বিক দায়িত্ব ছিল এই জেনারেল জমসেদের ওপর। ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা, পাশবিক অত্যাচার এবং লুণ্ঠন ও অগ্নি সংযোগে ইনি ছিলেন পারদর্শী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই মেজর জেনারেল জমসেদ 'মিলিটারি ক্রস' লাভ করেছিলেন।

একাত্তরের শেষার্ধে ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল এলাকায় যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে জেনারেল নিয়াজী স্বয়ং 'ইফকাফ', পুলিশ ও রাজাকার বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করে মেজর জেনারেল জমসেদকে ৩৬ ডিভিশনের কমান্ড প্রদান করেন। এই ডিভিশনের অধীনে ন্যস্ত করা হয় পাকিস্তানে সবচেয়ে দুর্ধর্ষ ৯৩ ব্রিগেডকে। এর ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন প্রবীণ ব্রিগেডিয়ার কাদির। দায়িত্ব লাভের পর জেনারেল জমসেদ ময়মনসিংহে তাঁর আস্তানা স্থাপন করলেন। সীমান্তের কামালপুর থেকে হালুয়াঘাট পর্যন্ত এলাকায় মোতায়েন করা হলো ৩১ বালুচ আর ৩৩ পাঞ্জাবকে। পাঠানো হলো এক ব্যাটারি ১২০ মিলিমিটার মর্টার ও প্রচুর সমরাস্ত্র। এছাড়া ক্যাপ্টেন আহসানের নেতৃত্বে ৭০ জন নিয়মিত সৈন্য ছাড়াও এক প্লাটুন রেঞ্জার্সকেও সুরক্ষিত করা হলো। সুবিধাজনক স্থানে তারা স্থাপন করলো তিনটা ৮১ মিলিটারের মর্টার। দূরে সাহায্যের জন্য রইলো ৩১ বালুচ। শুরু হলো ১১ নম্বর সেক্টরের মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে ভয়াবহ লড়াই। উভয় পক্ষই একটা বিষয় জানতো যে, ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল এলাকার জন্য এই সীমান্ত ফাঁড়ি কামালপুরের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। কামালপুরের আউট পোস্ট মুক্তিবাহিনী দখল করতে সক্ষম হলে পাকিস্তানি সৈন্যদের পক্ষে নকশী, বারমারী, বকশীগঞ্জ ও হালুয়াঘাটে নিরাপত্তার অভাবে টিকে থাকা সম্ভব হবে না।

১৯৭১ সালের ১২ই জুন মুক্তিবাহিনী প্রথম দফায় কামালপুরের ওপর আঘাত হানলো। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফায় আক্রমণ হলো যথাক্রমে ৩১শে জুলাই ও ২১শে অক্টোবর। এই তিন দফা রক্তাক্ত যুদ্ধে উভয় পক্ষেই প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হলো। ময়মনসিংহ থেকে জেনারেল জমসেদ দ্রুত আরও সৈন্য, রসদ ও সমরাস্ত্র পাঠালেন।

কিন্তু বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহেরের নেতৃত্বে ১১ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হচ্ছে যেভাবেই হোক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই সীমান্ত ফাঁড়ি কামালপুর

দখল করে শত্রু সেনাদের নিশ্চিহ্ন করতেই হবে। তারিখটা হচ্ছে একাত্তরের ১৪ই নভেম্বর।

কমান্ডার আবু তাহের আজ স্বয়ং যুদ্ধের ফ্রন্টে দাঁড়িয়ে। উত্তাল তরঙ্গের মতো কয়েক হাজার মুক্তিযোদ্ধা একযোগে আক্রমণ করলো সুরক্ষিত কামালপুর ঘাঁটি আর বকশীগঞ্জ-কামালপুর রাস্তা। এই রাস্তায় অবস্থান করছিল পাকিস্তানি ৯৩ ব্রিগেডের ৩১ বালুচ। দুপুর বারোটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ১১ নভেম্বরের সেক্টর কমান্ডার আবু তাহের আক্রমণের মুখে ৩১ বালুচ সন্ধ্যার অন্ধকারে দ্রুত শেরপুর হয়ে জামালপুরের দিকে পশ্চাদপসরণ করলো। কামালপুরের একমাত্র যোগাযোগের রাস্তা মুক্তিবাহিনীর দখলে এলে কামালপুরে অবস্থানরত হানাদার সৈন্যরা প্রমাদ গুনলো। মুক্তিবাহিনী ও ৩১ বালুচের মধ্যে এই যুদ্ধে পাকিস্তানিদের একজন অফিসারসহ দশ জন নিহত এবং বেশ কিছু সৈন্য আহত হয়। এছাড়া দুটো ১২০ মিলিমিটার কামান ও চারটা ভারি যান বিনষ্ট হয় এবং বিপুল পরিমাণে সমরাস্ত্র মুক্তিবাহিনীর হস্তগত হয়।

৩১ বালুচ দ্রুত বকশীগঞ্জ ও শেরপুরে পশ্চাদপসরণ করলো। কিন্তু মুশকিল হলো একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় কামালপুর, নকশী, বারমারী আউট পোস্টের পাকিস্তানি সৈন্যদের কিভাবে রক্ষা করা যায়। এছাড়া হালুয়াঘাট এলাকায় অবস্থানরত ৩৩ পাঞ্জাব যখন জানতে পারলো যে, ৩১ বালুচ পশ্চাদপসরণ করছে তখন তাদের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। একদিকে ক্যাপ্টেন আহসান ৩১ বালুচের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ২২শে ও ২৪শে নভেম্বর দুটো পেট্রোল পাঠালো। মুক্তিবাহিনী এই দুটো পেট্রোল বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করলো। ৩৯ ডিভিশনের প্রধান জেনারেল জমসেদ ও ৯৩ ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার কাদির কিছুতেই এ অবস্থা মেনে নিতে রাজি হলেন না। ময়মনসিংহ থেকে আরও সৈন্য পাঠানো হলো। যেভাবেই হোক মুক্তিবাহিনীকে কামালপুর-বকশীগঞ্জ রাস্তা থেকে হটিয়ে দিতে হবে আর সীমান্ত এলাকার ঘাঁটিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে রসদ ও সমরাস্ত্র সরবরাহ করতে হবে।

এরপর শুরু হলো দু'সপ্তাহব্যপী এক মরণপণ যুদ্ধ। একদিকে মুক্তিবাহিনীর ১১নং সেক্টরের বাঙালি বীর মুক্তিযোদ্ধা আর একদিকে পাকিস্তানের দুর্ধর্ষ ৯৩ ব্রিগেড।

৬৩

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ময়মনসিংহ সেক্টরের কামালপুরের যুদ্ধ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। 'স্ট্রাটেজির' কথা চিন্তা করে পাকিস্তানি রণবিশারদরা কামালপুরের সীমান্ত ফাঁড়িতে মোটা কংক্রিটের বাংকার তৈরি করে দুর্ভেদ্য করে রেখেছিল।

এই ফাঁড়ির প্রতিরক্ষাকে আরও সুরক্ষিত করার জন্য সামান্য দূরত্বে কামালপুর-বকশীগঞ্জ রাস্তায় মোতায়েন করেছিল দুর্ধর্ষ ৩১ বালুচকে। ফলে ১২ই জুন থেকে শুরু করে মুক্তিবাহিনী তিন দফা আক্রমণ করে ব্যর্থ হওয়ায় চতুর্থ দফায় কামালপুর ফাঁড়ির ওপর আক্রমণ না করে কিছুটা দক্ষিণে এসে কামালপুর-বকশীগঞ্জ রাস্তায় অবস্থানকারী ৩১ বালুচের ওপর আক্রমণ করলো। ১১ নং সেক্টরের মুক্তিবাহিনী এমন এক চোরা রাস্তায় এসেছিল যা ৩১ বালুচ চিন্তাও করতে পারেনি . তাই এই আকস্মিক আক্রমণ সফল হয়েছিল। ফলে মুক্তিবাহিনী কামালপুর-বকশীগঞ্জ রাস্তায় আস্তানা স্থাপন করতে

সক্ষম হলো। আর ৩১ বালুচ পশ্চাদপসরণ করে পূর্ব পরিকল্পনা মতো শেরপুর-জামালপুর অঞ্চলে প্রতিরক্ষা ঘাঁটি সুরক্ষিত করলো।

এরপরে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে এই সেক্টরে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হলো। সীমান্তের ওধারে ভারতীয় বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার হরদেব সিংয়ের অধীনে ৯৫ মাউন্টের ব্রিগেডকে মোতায়েন করা হয়েছিল। এদের সাহায্যের জন্য এক নং মারাঠা লাইট ইনফ্যানট্রি, এক ব্যাটালিয়ান বিএসএফ, ১৩ রাজপুতনা রাইফেল্‌স, ৬ বিহার, ৬ শিখ লাইট ইনফ্যানট্রি এবং ২ প্যারা ব্যাটালিয়ান কমান্ডে প্রস্তুত হলো। এদের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন শিলংয়ে অবস্থানকারী জিওসি কমান্ডিং মেজর জেনারেল গুর বক্‌শ সিং জৈল।

সীমান্ত বরাবর কামালপুর, নক্‌শী, বারোমারী এবং ঢালু-হালুয়াঘাট ঘাঁটিগুলো পাকিস্তানিদের দখলে। আবার কিছুটা দক্ষিণে কামালপুর-বকশীগঞ্জ যোগাযোগকারী রাস্তার বকশীগঞ্জ মুক্তিবাহিনীর দখলে। এর দক্ষিণে শেরপুর-জামালপুর থেকে ময়মনসিংহ পর্যন্ত শহরগুলোতে পাকিস্তানি বাহিনীর আস্তানা। আবার এর দক্ষিণাঞ্চলে যমুনা নদী থেকে শুরু করে মধুপুর জংগল হয়ে টাঙ্গাইল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা কাদেরিয়া বাহিনীর কর্তৃত্বে। এরপর টঙ্গী-ঢাকা এলাকায় পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা ব্যূহ।

এ সময় ময়মনসিংহ-জামালপুর এলাকার নাগরিকদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। মার্কিন পত্রিকা 'দি আটলান্টিক ম্যাগাজিনের' দু'জন সংবাদদাতা পিটার কান ও লি লেস্‌কেজ রিপোর্ট সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে পূর্ব বাংলায় এসেছিলেন। সময়টা ছিল নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ। পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে তাঁরা লিখলেন :

"ঢাকা থেকে বেরিয়ে কালিয়াকৈরের দিকে গাড়িতে যাচ্ছিলাম। আমাদের সাদা চামড়া দেখে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে একজন গ্রামবাসী ইশারা করে গাড়ি থামালো। ভাঙ্গা ইংরেজিতে বললো, 'জামালপুর যাও তাহলে সব বুঝতে পারবে।'

"ঘণ্টা কয়েক গাড়ি চালিয়ে অনেক কষ্টে জামালপুরে হাজির হলাম। ছোট্ট শহর জামালপুর। দিনের বেলায় রাস্তাঘাট প্রায় নির্জন। কোথাও রাস্তায় বাচ্চা ছেলে পর্যন্ত দেখতে পেলাম না। দোকান-পাট সব বন্ধ। কোনো বেচাকেনা নাই। রাস্তায় দু'-চারজন লোককে পেয়ে শহরের অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করলাম। বেচারা বললো, 'আমার মনের আসল কথা বলবো না। শেষে কি জানটা খোয়াবো?' কথা ক'টা বলে লোকটা ভেগে গেলো।

"মার্চের আগে জামালপুরের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ হাজারের মতো এবং এখানে নানা দ্রব্যের প্রচুর বেচা-কেনা হতো। কিন্তু এখন সব কিছুই বন্ধ। শহরের প্রায় সব লোকই পালিয়ে গেছে। বাজার এলাকার পুরোটাই পাকিস্তানি সৈন্যরা পুড়িয়ে দিয়েছে। কাছেই আর্মির একটা গ্যারিসন। রাতদিন সেখানে সৈন্যদের যাতায়াত হচ্ছে। মনে হলো উত্তরের দিকে কোথাও ব্যাপক লড়াই শুরু হয়েছে।

"কামালপুর শহরের পাশ দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদীর পাড়ে হিন্দুদের শ্মশান ঘাট। এটাকেই পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঙালি হত্যার স্থান নির্ধারণ করেছে। হত্যার পর লাশগুলোকে নদীতে ফেলে দেয়া হয়। এতো লাশ নদীতে ফেলা হয়েছে যে, আশপাশের অবশিষ্ট লোকেরা নদীর মাছ পর্যন্ত খাওয়া বন্ধ করেছে।"

–দি আটলান্টিক ম্যাগাজিন (ইউএসএ), ডিসেম্বর ১৯৭১।

প্রখ্যাত মার্কিনি সাপ্তাহিক নিউজউইক পত্রিকার রিপোর্টারের রিপোর্ট আরো ভয়াবহ। তিনি লিখলেন, "লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফের সংবাদদাতা ক্লেয়ার হলিংওয়ার্থকে সঙ্গে করে আমি ঢাকা থেকে ৪৫ মাইল উত্তরে একটা 'মুক্ত এলাকা' যেয়ে হাজির হলাম। এলাকাটা মুক্তিবাহিনী গেরিলাদের নিয়ন্ত্রণে। সর্বত্র যুদ্ধের ধ্বংস্তূপের চিহ্ন বিদ্যমান। আমাদের গাইড মুক্তিযোদ্ধা বললো, এমন কোন বাঙাল পরিবার নেই, যাঁদের এক বা একাধিক আত্মীয় এর মধ্যে নিহত হয়নি। যার সঙ্গেই কথা বলেছি তাঁরাই উল্লেখ করেছে কিভাবে পাকিস্তানি সৈন্যরা প্রতি রাতেই নিরপরাধ লোকদের হত্যা করেছে।

"কাছেই একটা ছোট্ট গ্রাম। এখানে এক লোমহর্ষক কাহিনী শুনলাম। ঘটনাটি প্রায় সবারই জানা। চৌদ্দ বছরের এক গ্রাম্য বধূ। কোলে তার কয়েক দিনের একটা শিশু। বারোজন পাকিস্তানি সৈন্য পাশবিক অত্যাচার করায় মেয়েটির মৃত্যু হলো। লাশের পাশেই পড়ে রইলো কয়েক দিনের শিশুর মৃতদেহ। কাছেই আর একটা গ্রামে নারীর সন্ধানে এসে পাকিস্তানি সৈন্যরা গ্রামটা ধ্বংস করলো আর হত্যা করলো ৩৮ জনকে। ...প্রতিটি বাঙালির কাছে এই পৈশাচিক বর্বরতার জবাব হচ্ছে একটা স্বাধীন বাংলাদেশের। যেখানেই আমরা গিয়েছি, সেখানে মুক্তিবাহিনী, গেরিলা আর সমর্থকদের বক্তব্য হচ্ছে, শীঘ্র অত্যাচারীদের জন্য ভয়ংকর দিন সমাগত।...ফেরার পথে জনৈক পথচারীকে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে বললো, 'শীঘ্র প্রতিশোধ গ্রহণের দিন আসছে। তা হবে ভয়াবহ।'

—নিউজউইক (ইউএসএ), নভেম্বর ১৯৭১

এ রকম এক পরিস্থিতিতে ২৩শে নভেম্বরে পাকিস্তান জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলো। ২৫শে নভেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া মার্কিনি সংবাদ সংস্থা এসোসিয়েটে প্রেসের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বললেন, 'আর মাত্র দশ দিনের মধ্যে আমি রাওয়ালপিন্ডিতে নাও থাকতে পারি। তখন আমি একটা যুদ্ধ পরিচালনা করবো।'

এ সময় সর্বত্র শুধু চরম যুদ্ধের প্রস্তুতি। ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলের সীমান্তে মিত্র বাহিনীর অন্যতম স্ট্রাটেজি হচ্ছে, একই সেক্টরে এমনভাবে বিদ্যুৎগতিতে যুদ্ধ করতে হবে, যাতে পাকিস্তানি ৩৬ ডিভিশনের সৈন্যরা পশ্চাদপসরণের পর ঢাকায় প্রতিরক্ষা ব্যূহকে সুদৃঢ় করতে না পারে। পূর্ণ যুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করা যাবে না। সে ক্ষেত্রে জাতিসংঘের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের আগেই ঢাকার পতন ঘটাতে হবে।

আগেই এই সেক্টরের অদ্ভুত অবস্থার কথা উল্লেখ করেছি। সীমান্ত বরাবর ভারতীয় বাহিনী প্রস্তুত। অথচ সীমান্ত ফাঁড়িগুলোতে পাকিস্তানি সৈন্যরা অবস্থান করছে। কিছুটা দক্ষিণে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে মুক্তিবাহিনীর অবস্থান। আবার শেরপুর-জামালপুর-ময়মনসিংহে পাকিস্তানি ঘাঁটি থাকলেও এর দক্ষিণে ওৎ পেতে বসে রয়েছে প্রায় ১৫ হাজার কাদেরিয়া বাহিনী। এরপর টঙ্গী অঞ্চলে ঢাকার প্রতিরক্ষা ব্যূহ।

এই অবস্থায় ৪ঠা ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় দু'সপ্তাহকাল জামালপুরের বিভিন্ন সীমান্ত ঘাঁটিতে ৩১ বালুচের একটা কোম্পানির পক্ষে আগলে রাখা প্রশংসার দাবি রাখে। অবশ্য এই পাকিস্তানি সীমান্ত ঘাঁটি পুরু কংক্রিটের ব্যাংকার দিয়ে সুরক্ষিত ছিল। অন্যদিকে আঘাতের পর আঘাত হেনেও কামালপুর-বকশীগঞ্জ রাস্তা থেকে ১১নং সেক্টরের মুক্তিবাহিনীকেও সরানো সম্ভব হলো না।

২৩শে নভেম্বর কামালপুর ফাঁড়ি থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদের দুটো পেট্রোল

মুক্তিবাহিনীর হাতে নিশ্চিহ্ন হলে ফাঁড়ির কমান্ডার মেজর আইয়ুব ও ক্যাপ্টেন আহসান অবরুদ্ধতার ভয়াবহতার কথা চিন্তা করে ভীত হয়েছিলেন। এদিকে জামালপুরে অবস্থানকারী পাকিস্তানি ব্যাটলিয়ান হেডকোয়ার্টার থেকে কামালপুরের সীমান্ত ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য একদল সৈন্য পাঠালে মুক্তিবাহিনীর হাতে তারাও নিশ্চিহ্ন হলো।

শেরপুর-বকশীগঞ্জ-কামালপুর রাস্তা তখন পাকিস্তানি সৈন্যদের জন্য একটা মরণফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তানি ব্যাটলিয়ন হেডকোয়ার্টার থেকে ২৩শে, ২৪শে ও ২৫শে নভেম্বরে আরও তিনবার পেট্রোল পাঠানো হলো। কিন্তু এদের আর কোন খবরই পাওয়া গেলো না।

এরপর শেরপুরে পশ্চাদপসরণকারী ৩১ বালুচের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল সুলতান ২৭শে নভেম্বর একই সঙ্গে তিন দিক দিয়ে তিন গ্রুপ সৈন্য পাঠালেন কামালপুর-বকশীগঞ্জ রাস্তা থেকে মুক্তিবাহিনীকে হটাবার জন্য। এই প্রথমবারের মতো সীমান্তে অবস্থানকারী মিত্র বাহিনী ভারি কামান থেকে গোলা নিক্ষেপ করলো আর আকাশে উড্ডীন হলো কয়েকটা হান্টার বিমান। নিচে মাটিতে ১১ নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা প্রচণ্ড লড়াই করে বিনষ্ট করতে সক্ষম হলো ৩১ বালুচের শেষ প্রচেষ্টা। কামালপুর সীমান্ত ঘাঁটিতে তখন দেখা দিয়েছে রেশন ও গোলাবারুদের সংকট।

৬৪

প্রায় ২১ দিন অবরোধ থাকার পর ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখের বিকেলে পূর্ব রণাংগনের সবচেয়ে সুরক্ষিত পাকিস্তানি ঘাঁটি কামালপুরের পতন হলো। এই লড়াইয়ে মুজিবনগর সরকারের ১১ নং সেক্টরের অধিনায়ক মেজর আবু তাহের নভেম্বর মাসে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। এছাড়া ৪ঠা ডিসেম্বর কামালপুরে সীমান্ত ফাঁড়ির পতনের পর ৫ই ডিসেম্বর যখন ভারতীয় অধিনায়ক মেজর জেনারেল গুর বক্স সিং শেরপুর-জামালপুর রণাংগন পরিদর্শন করছিলেন, তখন একটা মাইন বিস্ফোরণে তাঁর জিপ বিধ্বস্ত হলে তিনিও গুরুতররূপে আহত হন। ৬ই ডিসেম্বর এই সেক্টরে মেজর জেনারেল ম্যানেক শ বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের জন্য শত্রুপক্ষীয় হওয়া সত্ত্বেও বালুচি ক্যাপ্টেন আহসান মালিককে ব্যক্তিগতভাবে একটা অভিনন্দন বাণী পাঠিয়েছিলেন। আর কামালপুরে ফাঁড়ির যুদ্ধবন্দিদের প্রতি বিশেষ খাতির-যত্নের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, কামালপুর ঘাঁটির পতন হওয়ার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নকশী, বারোমারা, হালুয়াঘাট প্রভৃতি সীমান্ত ফাঁড়িতে ৩৩ পাঞ্জাব বড় রকমের যুদ্ধের আগেই দ্রুত পশ্চাদপসরণ করে জামালপুর-ময়মনসিংহ রোড বরাবর প্রতিরক্ষার জন্য জমায়েত হয়। এদিকে ১১ নম্বর সেক্টরের মুক্তিবাহিনী কামালপুর-বকশীগঞ্জ-শেরপুর রোডের অবস্থান থেকে জামালপুর শহরের দিকে অগ্রসর হলো। একই সঙ্গে মেজর জেনারেল নাগরার অধীনের বাহিনীও এতদঞ্চলের দিকে দ্রুত এগুতে থাকে। উদ্দেশ্য হচ্ছে অবিলম্বে পাকিস্তানিদের জামালপুর-ময়মনসিংহ প্রতিরক্ষা ব্যূহ নিশ্চিহ্ন করতে হবে।

ময়মনসিংহে অবস্থানরত ৯৩ ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার কাদির এবং ৩৬ ডিভিশনের প্রধান মেজর নেজারেল জমসেদ, বিশেষ করে ৩৩ পাঞ্জাবের পশ্চাদপসরণের নীতি অনুমোদন করতে পারলেন না। কেননা তখন হানাদার বাহিনীর নীতি হচ্ছে, যত বেশি দিন ধরে মিত্র বাহিনীকে এসব এলাকায় আটকে রাখা সম্ভব ততই পাকিস্তানের জন্য

মঙ্গল। এতে করে আন্তর্জাতিক সীমারেখায় সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহারের শর্তে জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব পাসের সময় পাওয়া যাবে। এ ধরনের একটা প্রস্তাবে পাকিস্তান একতরফাভাবে লাভবান হবে। তাই জেনারেল জমসেদ ও ব্রিগেডিয়ার কাদির ৩১ বালুচ আর ৩৩ পাঞ্জাবের পশ্চাদপসরণের সংবাদে বেশ বিব্রত বোধ করলেন। জেনারেল জমসেদের কাছে এ সময় জেনারেল নিয়াজীর পক্ষে ব্রিগেডিয়ার বশীরের কাছ থেকে খবর এলো যে, অপারগ অবস্থায় পশ্চাদপসরণ করতে হলে এমনভাবে করবেন, যাতে বাহিনী যতদূর সম্ভব অক্ষত অবস্থায় ঢাকা প্রত্যাবর্তন করতে পারে। এতে করে ৩৬ ডিভিশনের অতিরিক্ত শক্তি ঢাকার প্রতিরক্ষার জন্য খুবই সহায়ক হবে।

কিন্তু টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনী ৩৬ ডিভিশনের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। জামালপুর-ময়মনসিংহ রোড বরাবর ৩১ বালুচ আর ৩৩ পাঞ্জাবের প্রতিরক্ষা ব্যূহ খুবই সুদৃঢ় মনে হচ্ছিল। সামনেই বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ, পাকিস্তানি প্রতিরক্ষাকে আরও দুর্ভেদ্য করার পক্ষে সহায়ক হলো। নদীর অপর পারে ১১ নম্বর সেক্টরের মুক্তিবাহিনী আর ভারতীয় বাহিনী।

জেনারেল জমসেদ আর ব্রিগেডিয়ার কাদেরের বদ্ধমূল ধারণা যে, এখানে একটা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে হবে। কিন্তু দক্ষিণে টাঙ্গাইল-মধুপুর এলাকায় কাদেরিয়া বাহিনীর আচমকা আক্রমণে যখন সরবরাহ অনিয়মিত হলো, তখন এরা প্রমাদ গুনলেন। তবুও জামালপুরে পাকিস্তানি ৩১ বালুচ আর মিত্র বাহিনীর মধ্যে ভয়াবহ লড়াই হলো।

এ সময় মিত্র বাহিনীর নীতি হচ্ছে কত শীঘ্র পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে রাজধানী ঢাকার দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। উপরন্তু এই সেক্টরে যুদ্ধরত পাকিস্তানি সৈন্যরা অক্ষত অবস্থায় পশ্চাদপসরণের অর্থই হচ্ছে ঢাকায় হানাদার বাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যূহ সুদৃঢ় হওয়া।

তাই ৯৫ মাউন্টেড ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার হরদেব সিং ক্লার মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় ৮ এবং ৯ই ডিসেম্বর রাতের অন্ধকারে গোপনে দুটো ব্যাটালিয়ানকে ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করিয়ে জামালপুরের অদূরে একটা গোপন স্থানে রাখলেন। আর জামালপুরের ওপর বিমান আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। তবুও ৭ই ডিসেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাঁচদিন ধরে ৩১ বালুচ অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে জামালপুরকে রক্ষা করেছিল। প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে লে. কর্নেল মাহমুদের নেতৃত্বে ৩১ বালুচ ১১ই ডিসেম্বর রাতে পশ্চাদপসরণ শুরু করলো। রাস্তায় শত্রু পক্ষ রয়েছে কিনা বোঝার জন্য রাতের অন্ধকারে পেট্রোল জিপ থেকে গুলিবর্ষণ করা হলো। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার ক্লার গোপন স্থানে অবস্থানকারী দুটো ব্যাটালিয়ানকে আগেই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, কোন অবস্থাতেই যেনো এ ধরনের গুলিবর্ষণের জবাব না দেয়া হয়। গুলির জবাব দিলেই ৩১ বালুচ তাদের পলায়নের পথ পরিবর্তন করবে। এই দুটো ব্যাটালিয়ান অবস্থান কিছুতেই শত্রু পক্ষকে জানতে দেয়া হবে না। এটাই হবে দুর্ধর্ষ ৩১ বালুচের জন্য মৃত্যুফাঁদ।

ব্রিগেডিয়ার ক্লারের কৌশল ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়। ১১ই ডিসেম্বর গভীর রাতে ঘন অন্ধকারে ৩১ চালুচ পশ্চাদপসরণকালে একেবারে মিত্র বাহিনীর মাত্র ২০ গজের মধ্যে এসে হাজির হলে ভয়াবহ আক্রমণ পরিচালিত হলো। সকাল সাড়ে চারটায় পাকিস্তানি বাহিনী নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী জামালপুরের লড়াই।

সকালের সূর্যে কুয়াশা সরে যাওয়ার পর দেখা গেলো সর্বত্র মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে

আর আহতদের শুরু হয়েছে করুণ ক্রন্দন। পাকিস্তানিদের ক্ষতির পরিমাণ হচ্ছে ২৩৫ জন নিহত, ২৩ জন আহত আর ৬১ জন যুদ্ধবন্দি। জামালপুরের মূল ঘাঁটিতে অবস্থানকারী ৩১ বালুচের সেকেন্ড ইন কমান্ড ৩৭৬ জন সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করলো। বিপুল সংখ্যক ছোট ধরনের অস্ত্রপাতি ছাড়াও তিনটা ১২০ মিলিটার কামান এদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হলো। এছাড়া পাওয়া গেলো আড়াই হাজার টন গোলাবারুদ আর দেড় টন রেশন দ্রব্য। মিত্রপক্ষের ১ মারাঠা লাইট ইনফ্যানট্রির ১০ জন্য এবং ১৩ গার্ড রেজিমেন্টের একজন নিহত ৮ জন আহত।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, ভয়াবহ লড়াইয়ের মধ্যে ৩১ বালুচের অধিনায়ক লে. কর্নেল মাহমুদ ২০০ জন্য সৈন্য নিয়ে রাতের অন্ধকারে ঢাকার দিকে চলে গেছে।

এদিকে ব্রিগেডিয়ার সন্ত সিংহের অধীনে ৬ বিহার দ্রুত হালুয়াঘাট এলাকায় এসে দেখলেন যে, মুক্তিবাহিনী আগেই এলাকা দখল করে রেখেছে এবং ৩৩ পাঞ্জাব ময়মনসিংহের দিকে পশ্চাদপসরণ করেছে। মুক্তিবাহিনীকে সঙ্গে করে ব্রিগেডিয়ার সন্ত তাঁর বাহিনী নিয়ে দ্রুত ময়মনসিংহের দিকে এগিয়ে গেলো। ১০ই ডিসেম্বর দিবাগত রাতে মুক্তিবাহিনী আর ৬ বিহার ময়মনসিংহে প্রবেশ করে দেখলো কোন রকম লড়াই না করেই জেনারেল জমসেদ আগেই সরাসরি ঢাকার দিকে রওয়ানা হয়েছে আর ৯৩ ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার কাদের ৩৩ পাঞ্জাবকে নিয়ে ঢাকার পথে টাঙ্গাইলের দিকে পশ্চাদপসরণ করেছে।

কিন্তু মধুপুর জঙ্গল থেকে টাঙ্গাইল-মীর্জাপুর-কালিয়াকৈর এলাকায় কাদেরিয়া বাহিনী এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করলো। এই সব এলাকায় পশ্চাদপসরণরত রণক্লান্ত পাকিস্তানি সৈন্যদের কাদেরিয়া বাহিনী যেভাবে নিশ্চিহ্ন করছে তা প্রশংসার দাবি রাখে। এই রাস্তায় কাদেরিয়া বাহিনী একই রাতে ১৯টি ব্রিজ ধ্বংস করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে এবং বিকল্প রাস্তাগুলোতে অসংখ্য মাইন স্থাপন করেছিল। মিত্র বাহিনী যেখানে 'স্ট্রাটেজি' গ্রহণ করেছিল যে, পশ্চাদপসরণরত পাকিস্তানি সৈন্যরা যাতে করে অক্ষত অবস্থায় ঢাকায় ফেরত গিয়ে রাজধানীর প্রতিরক্ষাকে আরও শক্তিশালী না করতে পারে, সেখানে প্রকৃত পক্ষে ৩৬ ডিভিশনের পাকিস্তানি সৈন্যরা কামালপুর আর জামালপুরের লড়াই ছাড়া সর্বত্রই সাফল্যজনকভাবে পশ্চাদপসরণ করতে সক্ষম হয়েছিল। অথচ মিত্র বাহিনী তার 'স্ট্রাটেজি'কে সফল করার জন্য জামালপুর এলাকায় নাপাম বোমা ব্যবহার করা ছাড়াও টাঙ্গাইল এলাকায় ১১ই ডিসেম্বর বেলা ৪টায় বিমানে বহন করে ২ প্যারা ব্যাটালিয়ান অর্থাৎ কমান্ডো বাহিনী অবতরণ করিয়েছিল। এরা পুংগলিতে জোহাজং-এর ব্রিজ দখলের পর পলায়নরত পাকিস্তানি সৈন্যদের পথ রুদ্ধ করে। মাঝরাতে কমান্ডো বাহিনী একটা পাকিস্তানি মর্টার ব্যাটারি কনভয়কে আটক করে। পরে কমান্ডো বাহিনী জানতে পারলো যে, ময়মনসিংহের পাকিস্তানি ৩৬ ডিভিশনের মূল বাহিনী প্রায় ১৪ ঘণ্টা আগে এই ব্রিজ অতিক্রম করে ঢাকার দিকে চলে গেছে। মিত্র বাহিনী এভাবে প্রতিটি এলাকায় পলায়নরত পাকিস্তানি সৈন্যদের ধাওয়া করতে লাগলো। কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হলো না। ৩৬ ডিভিশনের বিশেষ করে ৩৩ পাঞ্জাব প্রায় অক্ষত অবস্থায় ঢাকার দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হলো। টাঙ্গাইলে পৌছার পর জেনারেল নাগরা এজন্য বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

কিন্তু বাদ সাধলো প্রায় ১৫ হাজার সদস্যবিশিষ্ট কাদেরিয়া বাহিনী। আগেই

উল্লেখ করেছি যে, মধুপুর-টাঙ্গাইল-কালিয়াকৈর এলাকার সর্বত্র তারা ওৎ পেতে ছিল। মিত্র বাহিনী যা করতে সক্ষম হয়নি, শেষ পর্যন্ত কাদেরিয়া বাহিনী সেই দায়িত্ব পালন করলো। গেরিলা পদ্ধতিতে এঁরা রণক্লান্ত পলায়নপর পাকিস্তানি সৈন্যদের হামলা করে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিল। ঢাকার মাত্র ৪০/৫০ মাইলের মধ্যে এসেও পাকিস্তানি সৈন্যরা শেষ রক্ষা করতে পারলো না। কাদেরিয়া বাহিনী এঁদের নাভিশ্বাসের সৃষ্টি করলো। প্রতিটি রাস্তায় তখন মাইন পাতা রয়েছে।

ফলে ব্রিগেডিয়ার কাদের তাঁর পশ্চাদপসরণরত বাহিনীকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করে ঢাকার দিকে পায়ে হেঁটে গ্রামের পথে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিল। ব্রিগেডিয়ার কাদের নিজের সঙ্গে আটজন অফিসার ও ১৮ জন সৈন্য রাখলেন। লে. কর্নেল সুলতান জনা কয়েক অফিসার আর কিছু সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হলেন। বাকিরা ঢাকায় যাওয়ার জন্য যার যার পথ করে নিল।

এদিকে বহু কষ্টে মাঠ ও জংগলের মাঝ দিয়ে ব্রিগেডিয়ার কাদেরের দল ১৪ই ডিসেম্বর কালিয়াকৈর এসে পৌছলো। কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণায় তারা তখন প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে। স্থানীয় কেউই তাদের কাছে কোন খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করলো না– এমনকি পানি পর্যন্ত দিল না। এদিকে কাদেরিয়া বাহিনী তখন তাঁদের জন্য সাক্ষাৎ যমদূতের মতো। এই অবস্থাতে ব্রিগেডিয়ার কাদের তাঁর দলবলসহ ধরা পড়লো। আর কেউ কেউ ১৩/১৪ তারিখ নাগাদ ঢাকায় এসে পৌছলো। কিন্তু তখন তাদের চেনাই মুশকিল। চুল উষ্কখুষ্ক, মুখে খোঁচা দাড়ি, গায়ে পাঁচড়া আর চোখে-মুখে মুক্তিবাহিনীর জন্য ভয়ের বহিঃপ্রকাশ।

৬৫

আগেই উল্লেখ করেছি যে, ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল-ঢাকা সেক্টরে মিত্র বাহিনীর অধিনায়ক মেজর জেনারেল গান্ধর্ব নাগরা দুটো কারণে ১৬৭ মাউনটেন ব্রিগেডের যুদ্ধে পারদর্শিতার ক্ষেত্রে আশানুরূপ সফল না হওয়ায় বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। প্রথমত, উইং কমান্ডার হামিদুল্লাহর (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) নেতৃত্বে ১১ নং সেক্টরের মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে সক্রিয় ও পূর্ণ সহযোগিতা দেয়া সত্ত্বেও ১৬৭ মাউনটেন ব্রিগেডের অগ্রগতি ছিল কিছুটা ধীর প্রকৃতির।

দ্বিতীয়ত, এতো প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ৩৬ ডিভিশনের সৈন্যরা দ্রুত ও সাফল্যজনকভাবে ঢাকার দিকে পশ্চাদপসরণ করতে সক্ষম হচ্ছিল। জেনারেল নাগরার ভয় ছিল যে, হানাদার বাহিনীর এসব সৈন্যরা পালিয়ে ঢাকায় পৌছাতে সক্ষম হলে ঢাকার প্রতিরক্ষা ব্যূহ আরও সুদৃঢ় হবে। সেক্ষেত্রে রাজধানী ঢাকার পতন বিলম্বিত হবে এবং তার ফলাফল ভয়াবহ হতে পারে। এখন সময়ের সদ্ব্যবহারটা সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। অবশ্য মধুপুর-টাঙ্গাইল-মীর্জাপুর-কালিয়াকৈর এলাকায় কাদেরিয়া বাহিনী এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে পশ্চাদপসরণরত রণক্লান্ত পাকিস্তানি ৯৩ ব্রিগেডকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে জেনারেল নাগরা টাঙ্গাইলে পৌছার পর ১৬৭ মাউনটেন ব্রিগেডের পরিবর্তে ৯৫ ব্রিগেডকে পলায়নরত হানাদার বাহিনীকে পশ্চাদ্ধাবন করে দ্রুত ঢাকার উপকণ্ঠে গিয়ে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু মুশকিল বাধলো এদের রসদ সরবরাহ কিভাবে হবে। আবার কাদেরিয়া বাহিনী সমস্যার সমাধান

করলো। এদের কমান্ডাররা জেনারেল নাগরাকে জানালেন যে, আকাশ পথে রসদ আনা সম্ভব হলে ছোটখাটো একটা রানওয়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় টাঙ্গাইল শহরের উপকণ্ঠে ব্রিটিশদের তৈরি যে ছোট্ট রানওয়েটা গত ২৬ বছর ধরে অকেজো অবস্থায় পড়ে ছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কাদেরিয়া বাহিনীর সদস্যরা কয়েক ইঞ্চি পরিমাণ মাটি ও ঘাস পরিষ্কার করে তা ব্যবহারের উপযোগী করে দিল। ১৩ই ডিসেম্বর বিকেল থেকে রসদ ও সমরাস্ত্র বহন করে ভারতীয় বিমান বাহিনীর ট্রান্সপোর্ট বিমান এই রানওয়েতে অবতরণ শুরু করলো।

ব্রিগেডিয়ার হরদেব সিং ক্লার ১৩ই ডিসেম্বর ৯৫ মাউনটেন ব্রিগেডের ৬ শিখ লাইট ইনফ্যানট্রি নিয়ে মীর্জাপুরের পথে ঢাকার দিকে অগ্রসর হলেন। মীর্জাপুর হানাদার বাহিনীর সঙ্গে একটা ছোটখাটো লড়াইয়ের পর ব্রিগেডিয়ার ক্লার তার বাহিনী নিয়ে ১৪ই ডিসেম্বর সকালে টঙ্গীর উপকণ্ঠে তুরাগ নদীর ধারে এসে উপস্থিত হলেন। নদীর অপর পাড়ে পাকিস্তানি বাহিনী সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যূহ সৃষ্টি করে অবস্থান করছে। সঙ্গে তাদের গোটা কয়েক কামান। ভারতীয় বিমান বাহিনী থেকে কয়েক দফায় বোমাবর্ষণ করেও কোন ফল হলো না। জেনারেল নাগরা প্রমাদ গুণলন। সম্মুখযুদ্ধে পাকিস্তানিদের এই প্রতিরক্ষা ব্যূহের পতন ঘটাতে দিন কয়েকের সময় প্রয়োজন। এ সময় কাদেরিয়া বাহিনী জেনারেল নাগরাকে বিকল্প পথে অর্থাৎ কালিয়াকৈর-নয়ারহাট পথে সাভার হয়ে ঢাকার দিকে এগোবার পরামর্শ দিল।

১৪ই ডিসেম্বর জেনারেল নাগরা এই বিকল্প কালিয়াকৈর-নয়ারহাট রাস্তার অবস্থা দেখার জন্য একটা হেলিকপ্টারে এলাকাটা নিজেই পরিদর্শন করলেন। এ সময়ে মুক্তিবাহিনী থেকে খবর এসে পৌছালো যে, সাভারের মিলিটারি ডেইরি ফার্ম ও রেডিওর ট্রান্সমিটারে দুই প্লাটুন ছাড়া নয়ারহাট, সাভার থেকে আমিনবাজার পর্যন্ত পাকিস্তানি সৈন্যদের কোন প্রতিরক্ষা ব্যূহ নেই।

জেনারেল নাগরা দ্রুত সর্বাত্মক আক্রমণের পরিকল্পনা করলেন। প্রথমত, ব্রিগেডিয়ার ক্লারকে নির্দেশ দিলেন যে, টঙ্গী এলাকায় তুরাগ নদীর অপর পারে অবস্থানরত পাকিস্তানি সৈন্যদের তাদের ঘাঁটিতে লড়াইয়ে ব্যস্ত রাখতে হবে। সম্ভব হলে আরও দক্ষিণে এসে নদী অতিক্রম করে নয়া ব্যূহ রচনা করতে হবে। এজন্য ১৩ গার্ডস ও ১৩ রাজপুতনা রাইফেলসকে ব্রিগেডিয়ার ক্লারের অধীনে ৬ শিখ লাইট ইনফ্যানট্রিকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। এছাড়া জামালপুর এলাকা থেকে বিলম্বে এসে পৌছানো ইরানীর নেতৃত্বে ১৬৭ মাউনটেন ব্রিগেডকে জয়দেবপুরের দিকে অগ্রসর হতে বললেন। সন্ত সিংকে তার বাহিনী নিয়ে নয়ারহাট রাস্তা বন্ধ করে অবস্থান করার নির্দেশ দিলেন। কেননা যশোর-ফরিদপুর এলাকা থেকে পশ্চাদপসরণরত পাকিস্তানি বাহিনীকে এখানে বাধা দান করতে হবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এসব ভারতীয় বাহিনীর কাছে ট্যাংক বা কামান নেই। যে কোন সময়ে পাকিস্তানিরা কামান ছাড়াও ট্যাংক ব্যবহার করতে পারে। এতে ক্ষতির পরিমাণ হবে খুব বেশি।

শেষ পর্যন্ত মেজর জেনারেল গান্ধর্ব নাগ্‌রা টাঙ্গাইলে হেলিকপ্টারে আগত প্যারা ব্যাটালিয়নকে রাজধানী ঢাকা অবরোধ ও আক্রমণের দায়িত্ব দিলেন। এই ব্যাটালিয়নের সঙ্গে অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র ছাড়াও রয়েছে চারটা ১০৬ মিলিমিটারের কামান। কাদেরিয়া বাহিনীর সহযোগিতায় ১৫ই ডিসেম্বর রাত দশটায় টাঙ্গাইল থেকে ২ প্যারা ব্যাটালিয়ন ঢাকা অভিমুখে রওয়ানা হলো। কালিয়াকৈর এসে এরা বিকল্প কালিয়াকৈর-

নয়ারহাট রাস্তা বরাবর অগ্রসর হলো। নয়ারহাট থেকে মীরপুরের দিকে এগুবার পথে কাদেরিয়া বাহিনী সাভার ডেইরি ফার্ম ও রেডিও ট্রান্সমিটার ভবনে অবস্থানরত পাকিস্তানি দুটো প্ল্যাটুনকে নিশ্চিহ্ন করলো।

বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা আর মিত্র বাহিনীর ২ প্যারা ব্যাটালিয়ান যখন আমিনবাজারে মীরপুর ব্রিজের ধারে এসে উপস্থিত হলো তখন ইংরেজি ক্যালেন্ডারের তারিখ পরিবর্তন হয়ে গেছে। সময় হলো ১৬ই ডিসেম্বর ভোররাত ০২-০০টা। একটা পেট্রোল জিপ মীরপুর ব্রিজের (পুরনো) উপর পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানিদের আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হলো। ২ প্যারা ব্যাটালিয়ান তখন ব্রিজের অপর পারের অবস্থানের ওপর অবিরাম কামানের গোলা নিক্ষেপ করতে লাগলো। ফলে পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক হানাদার বাহিনীর পক্ষে মীরপুর ব্রিজ আর ধ্বংস করা সম্ভব হলো না। এদিকে ক্লার ও সন্ত সিং তাঁদের বাহিনীর সুদৃঢ় করে নাগরার নির্দেশে আমিনবাজারে এসে উপস্থিত হলেন।

প্রায় একই সময়ে মিত্র বাহিনীর ৩১১ মাউনটেন ব্রিগেড নরসিংদী-ডেমরা রোড দিয়ে অগ্রসর হয়ে ১১ই ডিসেম্বর নরসিংদী মুক্ত করার পর ১৪ই ডিসেম্বর ডেমরায় এসে হাজির হলো। কিন্তু পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা ব্যূহের ট্যাংকের পাল্টা আক্রমণে এদের অগ্রগতি রোধ হলো। কিন্তু ২ নম্বর সেক্টরের তৎকালীন ক্যাপ্টেন এটিএম হায়দারের ('৭৫-এর সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত) নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক মুক্তিবাহিনীর সদস্য ঢাকার কমলাপুর, মুগদাপাড়া এলাকায় অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হয়। ১৬ই ডিসেম্বর এরাই ঢাকার বেতারকেন্দ্র দখল করেছিল।

এদিকে ৩০১ মাউনটেন ব্রিগেড চাঁদপুর মুক্ত করার পর দাউদকান্দি পৌঁছলে এদের একাংশকে হেলিকপ্টারযোগে ১৪/১৫ ডিসেম্বর রাতে নারায়ণগঞ্জ ও বৈদ্যেরবাজার নিয়ে যাওয়া হয়। বাকীদের নদী পথে ঢাকার দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু এরা শীতলক্ষ্মা পর্যন্ত পৌঁছাবার পর ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের খবর লাভ করে।

৫৭ মাউনটেন ডিভিশনের মেজর জেনারেল গণসাল্‌ভেস তাঁর বাহিনী নিয়ে ডেমরা পর্যন্ত পৌঁছাবার পর পাকিস্তানিদের পাল্টা ট্যাংক হামলার মুখে নিরাপদ স্থানে অবস্থান করে। এ সময় চাঁদপুর, কুমিল্লা, দাউদকান্দি, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মীরকাদিম, কালীগঞ্জ, বৈদ্যেরবাজার, কেরানীগঞ্জ, দোহার, কাপাসিয়া, শ্রীপুর প্রভৃতি এলাকা থেকে হাজার হাজার মুক্তিবাহিনী ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

মুজিবনগরে তখন তুমুল উত্তেজনা। ঢাকা ছাড়া বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা এখন মুক্ত। প্রতি মুহূর্তে খবর আসছে ঢাকায় আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি চলছে।

বালীগঞ্জে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের স্টুডিওতে বসে বার্তা বিভাগীয় প্রধান কামাল লোহানী ও সুব্রত বড়ুয়া আর আলী জাকের ও আলমগীর কবির ঘন ঘন সংবাদ বুলেটিন পরিবর্তন করছে। ১৩ই ডিসেম্বর থেকে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। বাংলাদেশ মুক্ত হতে চলেছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের স্টুডিওতে শিল্পী ও কর্মচারীদের চোখে আনন্দের অশ্রু। কেউবা হারানো প্রিয়জনদের কথা মনে করে ক্রন্দন করছে। বালু হাক্কাক লেনে, 'জয় বাংলা' অফিস, এক নম্বর বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে তথ্য দফতর, পার্ক সার্কাসে বাংলাদেশ মিশন আর থিয়েটার রোডে মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী সচিবালয়ের সর্বত্র একই অবস্থা। চরম উত্তেজনা। সুদীর্ঘ ন'মাসকাল রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হতে চলেছে। ছুটে গেলাম মুক্তিবাহিনীর

প্রধান সেনাপতি আতাউল গণি ওসমানীর অফিসে। পুরো সামরিক পোশাক পরে তিনি বাংলাদেশের বিরাট ওয়াল ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। দৌড়ে গেলাম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের অফিসে। চেয়ারে বসে ছোট টেবিলটাতে দু'হাতের উপর মাথাটা নিচু করে রয়েছেন। পায়ের আওয়াজে মাথা তুলে তাকালেন। চোখ দুটো অশ্রুতে টলমল করছে। শুধু বললেন, 'আমার নেতা মুজিব ভাই– বঙ্গবন্ধুকে আমরা আবার ফিরে পাবো তো? কোন জবাব দিতে পারলাম না। প্রধানমন্ত্রী নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বেতারে ঘোষণার জন্য একটা নির্দেশ হাতে তুলে দিলেন। "দেশবাসীর কাছে আবেদন অপরাধীদের বিচারের পর শাস্তি হবে। তাই আইন ও শৃংখলার ভার নিজেদের হাতে তুলে নিবেন না।' আবার দৌড়ালাম জয় বাংলা বেতার অফিসের দিকে।

৬৬

এদিকে ঢাকায় ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টারে তখন বিষাদের ছায়া। সাতই, আটই এবং নয়ই ডিসেম্বর দিবারাত কেবল বিভিন্ন রণাংগনের পরাজয়ের খবর এসে পৌঁছুলো। বিশ্বের বিভিন্ন বেতার কেন্দ্র থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদের যুদ্ধে ব্যর্থতার সংবাদ ইথারে ভেসে এলো। ব্রিগেডিয়ার বশীর ঢাকার প্রতিরক্ষা ব্যূহ শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা শুরু করলেন।

লে. জেনারেল নিয়াজী গভর্নর হাউসে ডা. মালেকের সঙ্গে গোপনে বৈঠকে প্রতিটি রণক্ষেত্রে তার বাহিনীর পরাজয়ের কথা স্বীকার করলেন এবং যুদ্ধবিরতির জন্য প্রেসিডেন্টের কাছে তারবার্তা পাঠাবার অনুরোধ করলেন। পরদিন গভর্নর মালেকের কাছ থেকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে 'সাইফারে' তারবার্তা, 'অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং রাজনৈতিকভাবে সমস্যার সমাধানের জন্য পুনরায় অনুরোধ করা হচ্ছে।'

ইয়াহিয়া এই তারবার্তার বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। কেননা যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে জেনারেল নিয়াজীর কাছ থেকে রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত কোন জবাব দেয়া সম্ভব নয়। ৯ই ডিসেম্বর ইস্টার্ন হেড কোয়ার্টার থেকে পিন্ডিতে লে. জেনারেল নিয়াজীর সিগন্যাল গেলো :

"এক. আকাশে শত্রুপক্ষের পূর্ণ কর্তৃত্বের দরুন পশ্চাদপসরণরত সৈন্যদের পুনরায় সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ করা সম্ভব নয়। আপামর জনসাধারণ মারাত্মক রকমের শত্রুতা মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে এবং শত্রুপক্ষকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করছে। 'বিদ্রোহীদের' আচমকা হামলা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় রাতের বেলায় চলাচল সম্ভব নয়। 'বিদ্রোহীরা' শত্রুপক্ষকে সুবিধাজনক জায়গা দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে। বিমানবন্দর দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। গত তিনদিন ধরে আমাদের বিমান বাহিনী কোন মিশনে যায়নি এবং ভবিষ্যতেও যাওয়া সম্ভব নয়। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া খুবই দুষ্কর।"

"দুই. শত্রুপক্ষের বিমান হামলায় ভারি সামরিক অস্ত্রপাতির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সৈন্যরা দক্ষতার সঙ্গে লড়াই করেছে। কিন্তু শত্রু পক্ষের প্রচণ্ড চাপ অব্যাহত রয়েছে। গত ২০ দিন ধরে আমাদের সৈন্যরা ঘুমাতে পারেনি। শত্রুপক্ষ অবিরাম কামান ও ট্যাংক থেকে গোলা নিক্ষেপ করছে।"

"তিন. পরিস্থিতি খুবই সংকটাপূর্ণ। আমরা লড়াই চালিয়ে যাবো এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।"

"চার. পূর্ব রণাংগনে শত্রুপক্ষের বিমান ঘাঁটিগুলোর ওপরে অবিলম্বে হামলা চালাবার অনুরোধ করা হচ্ছে। সম্ভব হলে ঢাকার প্রতিরক্ষা ব্যূহের জন্য বিমানযোগে সৈন্য পাঠান।"

জেনারেল নিয়াজীর এই সিগন্যালের পর পাকিস্তান সামরিক জান্তার টনক নড়লো। পূর্ব রণাংগনের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর ইয়াহিয়া খানের নিকট থেকে সে রাতেই গভর্নর মালেক ও জেনারেল নিয়াজীর কাছে সিগন্যাল এলো :

"প্রেসিডেন্টের নিকট থেকে গভর্নর এবং ইস্টার্ন কমান্ডের কাছে কপি। আপনার জরুরি বার্তা পেয়েছি। আমার কাছে প্রেরিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে আপনাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুমতি দেয়া হলো। আন্তর্জাতিক মহলে আমি সম্ভাব্য সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু যেহেতু আপনাদের কাছ থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছি, সেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেয়াটা আপনাদের বিচার বুদ্ধি আর সুবিবেচনার ওপর ছেড়ে দিলাম। আপনি যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করবেন, আমি তা অনুমোদন করবো। আমি জেনারেল নিয়াজীকেও আপনার গৃহীত সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া এবং এতদসম্পর্কিত ব্যবস্থাদি গ্রহণের নির্দেশ দিচ্ছি।"

প্রেসিডেন্টের প্রেরিত সিগন্যালের কিছুক্ষণ পরেই পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল আব্দুল হামিদ খানের প্রেরিত অনুরূপ বার্তা এসে পৌঁছুলো।

"আর্মির সিওএস-এর (চিফ অব স্টাফ) নিকট থেকে কমান্ডারের কাছে প্রেরিত। গভর্নরের নিকট প্রেসিডেন্টের প্রেরিত বার্তার সূত্র। আপনার সঙ্গে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গভর্নরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যেহেতু আপনাদের প্রেরিত সিগন্যালের মাধ্যমে পরিস্থিতির সঠিক অবস্থা অনুধাবন ও মূল্যায়ন সম্ভব নয়, সেহেতু আমি সরেজমিনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব আপনার ওপর ছেড়ে দিলাম। 'বিদ্রোহী'দের সক্রিয় সহযোগিতায় বহু সৈন্য ও সমরাস্ত্র নিয়ে শত্রুদের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ত করার প্রস্তুতি এখন যে শুধু সময়ের ব্যাপার তা আমরা অনুধাবন করতে পেরেছি। ইতিমধ্যে বেসামরিক জনসাধারণের ব্যাপক জানমালের ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে এবং সামরিক বাহিনীর হতাহতের সংখ্যাও খুব বেশি। সম্ভবমতো আপনার পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মূল্যায়ন করা বাঞ্ছনীয় হবে। এরই ভিত্তিতে আপনি গভর্নরকে খোলাখুলিভাবে পরামর্শ দিবেন এবং প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্বের ভিত্তিতে গভর্নর এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবেন। আপনি যখনই প্রয়োজন অনুভব করবেন, তখনই সর্বাধিক পরিমাণ সমরাস্ত্র ধ্বংসের ব্যবস্থা করবেন। এসব সমরাস্ত্র যেনো কিছুতেই শত্রুর হাতে না পড়ে। আমাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখবেন। আল্লাহ্ আপনার সহায় হোন।"

পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে 'টাইগার নিয়াজী' বলে পরিচিত লে. জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ্ খান নিয়াজী অনাগত ভবিষ্যৎ পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলেন। তাঁর চোখে দেয়ালের লিখনগুলো আরও সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়লো। নিয়াজীর মুখে চিরাচরিত হাসি-ঠাট্টাগুলো বন্ধ হয়ে গেলো। ইস্টার্ন কমান্ডের হেডকোয়ার্টারের নিজের কামরায় বসে তিনি জরুরি কাজ ছাড়া দেখা সাক্ষাৎ পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন।

তারিখটা ছিল ১৯৭১ সালের দশই ডিসেম্বর। তিনি বিবিসি'র প্রচারিত এক সংবাদে দারুণভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। খবরটা ছিল, 'জেনারেল নিয়াজী তাঁর সৈন্যবাহিনীকে ফেলে রেখে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেছেন, উত্তেজিত অবস্থায়

আকস্মিকভাবে তিনি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের (বর্তমানে শেরাটন) লাউঞ্জ-এ এসে হাজির হলেন। চিৎকার করে বললেন, 'কোথায় গেলো বিবিসির সংবাদদাতা? আমি তাঁকে বলতে চাই যে, আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে আমি এখনও পূর্ব পাকিস্তানে রয়েছি। আমি কখনই আমার সৈন্যদের ফেলে যাবো না।' (পৃষ্ঠা ১৯৫ : উইটনের টু সারেন্ডার)।

এর পরের কাহিনী খুবই ভয়াবহ আর লোমহর্ষক। সম্ভবত ১১ই ডিসেম্বর বিবিসির ঢাকাস্থ সংবাদদাতা এবং পিপিআই-এর ব্যুরো চিফ নিজামউদ্দীনকে আল-বদর বাহিনীর একটা গ্রুপ তাঁর বাসভবন থেকে কারফিউ-এর মধ্যে উঠিয়ে নিয়ে গেলো। সাংবাদিক নিজামউদ্দীনের লাশ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

দিন কয়েক পর দেশ স্বাধীন হলে গভর্নর হাউসে (বঙ্গভবন) যেসব দলিল ও কাগজপত্র 'সিজ' করা হয়েছিল, তার একটা টেবিল ডাইরির পাতায় জেনারেল নিয়াজীর হাতের লেখায় কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর নামের তালিকা পাওয়া যায়। এই তালিকায় নিজামউদ্দীনের নাম ছিল। অধুনালুপ্ত দৈনিক পূর্বদেশসহ বিভিন্ন পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এসব ব্যাপার তো রহস্যের অন্তরালেই রয়ে গেলো।

এদিকে ১০ই ডিসেম্বর গভর্নর ডা. এম এ মালেক সর্বশেষ পরিস্থিতির মোকাবেলায় মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ও চিফ সেক্রেটারি মুজাফফর হোসেনের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হলেন। তাঁরা ধূর্ততার সঙ্গে এ মর্মে সিদ্ধান্ত দিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের (প্রহসনমূলক নির্বাচনে) হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ও যুদ্ধবিরতিসহ পাকিস্তান ও ভারতের সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তাব জাতিসংঘের কাছে উত্থাপন করা সমীচীন হবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব প্রণয়ন করে ঢাকায় অবস্থানকারী জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব পল মার্ক হেনরির নিকট হস্তান্তরের ব্যবস্থা হলো এবং প্রায় ৪০০ শব্দের একটা সিগন্যালের মাধ্যমে প্রেসিডেন্টকে অবহিত করা হলো। সিগন্যালে বলা হলো :

"পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের জন্য। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আপনার অনুমোদনসাপেক্ষে নিম্নোক্ত নোট জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব পল মার্ক হেনরির নিকট হস্তান্তর করলাম। ...এই প্রেক্ষাপটে আমি জাতিসংঘকে অবিলম্বে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের আয়োজন ছাড়াও নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি। এক. অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি। দুই. সম্মানের সঙ্গে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর পশ্চিম পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন। তিন. পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা। চার. ১৯৪৭ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বসবাসকারীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা এবং পাঁচ. পূর্ব পাকিস্তানে ব্যক্তি বিশেষদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার গ্যারান্টি। এই প্রস্তাব নিশ্চিতভাবে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব। সশস্ত্র বাহিনীর আত্মসমর্পণের প্রশ্ন উঠতে পারে না। উপরন্তু আমার এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য না হলে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করবে। দ্রষ্টব্য : জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

পাকিস্তানের পক্ষ থেকে পল হেনরির মাধ্যমে জাতিসংঘের কাছে এ ধরনের একটা যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক বিভ্রাটের সৃষ্টি হলো। জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগদানকারী পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলের নেতা (মনোনীত উপ-প্রধানমন্ত্রী) জুলফিকার আলী ভুট্টো এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভুট্টো ইসলামাবাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে বিস্তারিত জানতে চাইলেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উথান্টের কাছে জরুরি তার বার্তা পাঠিয়ে মালেক-নিয়াজীর যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব উপেক্ষা করার অনুরোধ জানালেন। আর ঢাকায় গভর্নর মালেক ও জেনারেল নিয়াজীর কাছে সিগন্যাল এলো 'যে সিদ্ধান্তই নেবেন তা যেন অখণ্ড পাকিস্তানের কাঠামো রক্ষা করে নেয়া হয়।'

রাওয়ালপিন্ডিতে একজন সরকারি মুখপাত্র তাড়াহুড়া করে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করলেন যে, 'এমনকি আত্মসমর্পণের আভাস রয়েছে, আমাদের এ ধরনের কোন প্রস্তাব বা বিবৃতির প্রশ্নে আমি চ্যালেঞ্জ প্রদান করছি।'

কিন্তু পাকিস্তানের জন্য তখন বিধি বাম। লাখ লাখ বাঙালি শহীদদের লাশের তলায় অখণ্ড পাকিস্তানের সমাধি রচিত হয়ে গেছে।

১৯৭১ সালের ১২ই ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর জন্য ছিল এক মর্মান্তিক দিন। এ সময় আহত অবস্থায় মেজর জেনারেল রহিম খান তৎকালীন গভর্নর ডক্টর মালেকের উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর বাসায় চিকিৎসাধীন ছিলেন। জেনারেল রহিম দিন কয়েক আগে চাঁদপুর থেকে সদলবলে পলায়নের সময় নারায়ণগঞ্জের কাছে শীতলক্ষ্যা নদীবক্ষে ভারতীয় বিমান বাহিনীর হামলা ও মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের মুখে অনেক কষ্টে একটা গানবোটে জনাকয়েক সহকর্মী নিয়ে ঢাকায় এসে পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্যদের আর কোন খবর পাওয়া যায়নি।

ঢাকায় অবস্থানরত পাকিস্তানি সৈন্যরা যাতে জানতে না পারে যে, ৩৯ ডিভিশনের ৫৩ ব্রিগেড এর মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং এই ডিভিশনের প্রধান এখন আহত অবস্থায় ঢাকায় রয়েছে, এজন্যেই মেজর জেনারেল রহিম খানকে সবার অজান্তে রাও ফরমান আলীর বাসায় রাখা হয়েছে।

১২ই ডিসেম্বর সকালে বিছানায় শুয়ে অর্ধ-শায়িত জেনারেল রহিম ব্রেকফাস্ট করছিলেন। কাছেই একটা চেয়ারে বসে রাও ফরমান আলী। দু'জনে যুদ্ধের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে আলাপের সময় রহিম খান বললেন :

'আমার মনে হয় যুদ্ধবিরতি ছাড়া আমাদের জন্য আর কোন পথ খোলা নেই।'

জেনারেল ফরমান অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। এতদিন পর্যন্ত জেনারেল রহিম বারবারই দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের ওকালতি করেছেন। অথচ আজ ইনিই বলছেন, যুদ্ধবিরতির কথা? ফরমান আলী জবাব দিলেন।

এতো শীঘ্রি আপনার তেজ শেষ হয়ে গেলো?

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে রহিম খান বললেন :

"যুদ্ধ বিরতির জন্য আর দেরি করা মোটেই লাভজনক হবে না।' এমন সময় আহত জেনারেলকে দেখার জন্য লে. জেনারেল নিয়াজী আর মেজর জেনারেল জমসেদ সেখানে এসে হাজির হলেন। জেনারেল জমসেদ ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল এলাকায় অবস্থানরত ৩৬ ডিভিশনের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনীর হাতে প্রচণ্ড মার খাওয়ার পর টাঙ্গাইল এলাকা দিয়ে পলায়নপর এই ডিভিশন কাদেরিয়া বাহিনীর আক্রমণে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এর অধীনে ব্রিগেডিয়ার কাদিরের নেতৃত্বে দুর্ধর্ষ ৯৩ ব্রিগেড দলপতিসহ কালিয়াকৈর-এ ১৪ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করেছে। জেনারেল জমসেদ দিন কয়েক আগে কোনোক্রমে প্রাণটুকু নিয়ে ঢাকায় আশ্রয় নিয়েছেন। জেনারেল নিয়াজী আর জেনারেল জমসেদকে একসঙ্গে দেখে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিলিটারি ক্রস পাওয়া এবং 'ঠাণ্ডা মাথা' বলে পরিচিত মেজর জেনারেল রহিম

খান যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে তাঁর মতামত আবার ব্যক্ত করলেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত ইস্টার্ন কমান্ড 'সাদা' (মার্কিন) আর 'হলুদ' (চীন) দেশের সাহায্যের আশা একেবারে ছেড়ে দেয়নি। তাই নিয়াজী কোন রকম জবাব না দিয়ে নিশ্চুপ রইলেন। এরকম নাজুক দেখে রাও ফরমান নিঃশব্দে পাশের ঘরে চলে গেলেন। এরপর তিন জেনারেল মিলে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ করলেন।

আলাপ শেষে লে. জেনারেল নিয়াজীই প্রথমে বেরিয়ে এলেন। ধীর পদক্ষেপে পাশের ঘরে ঢুকে রাও ফরমান আলীকে বললেন :

"ফরমান, তাহলে রাওয়ালপিন্ডিতে সিগন্যাল পাঠাবার ব্যবস্থা করো।"

নিয়াজীর ইচ্ছা এ ধরনের প্রস্তাব গভর্নরের কাছ থেকে প্রেসিডেন্টকে পাঠানো বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ফরমান আলী জানেন যে, ইস্টার্ন কমান্ড থেকে সিগন্যাল না পাওয়া পর্যন্ত রাওয়ালপিন্ডির কর্তৃপক্ষ তাতে গুরুত্ব দিবে না।

হন্তদন্ত হয়ে জেনারেল নিয়াজী বেরিয়ে যাওয়ার আগেই চিফ সেক্রেটারি মোজাফফর হোসেন এসে হাজির হলেন। সব কিছু শুনে তিনি নিয়াজীর বক্তব্য সমর্থন করে নিজেই কাগজ নিয়ে এই ঐতিহাসিক সিগন্যাল লিখতে বসলেন। সিগন্যালের শেষ পরিচ্ছেদে প্রেসিডেন্টকে অবিলম্বে সম্ভাব্য পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা জানানো হলো। গভর্নর ডক্টর মালেকের অনুমোদনের পর সেদিন সন্ধ্যা বেলায় প্রেসিডেন্টের কাছে এই বার্তা পাঠানো হলো। এটাই ডক্টর মালেকের নিকট থেকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে প্রেরিত শেষ বার্তা।

১৩ ডিসেম্বর সমস্ত দিন ধরে গভর্নর মালেক তাঁর পরামর্শদাতাদের নিয়ে অধীর আগ্রহে একটা জবাবের প্রতীক্ষা করলেন। কিন্তু রাওয়ালপিন্ডি থেকে কোন মেসেজই এলো না। পরদিন ১৪ই ডিসেম্বর গভর্নর হাউসে ডক্টর মালেক সবেমাত্র এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক শুরু করছেন। এমন সময় শুরু হলো ঢাকায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর হামলা। বেলা সোয়া ১১টায় তিনটি বিমান একযোগে গভর্নর হাউসে রকেট নিক্ষেপ করলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে বিরাট দরবার হলটার ছাদ ধূলিসাৎ হলো। ৭৪ বৎসর বয়সের মালেক দৌড়ে সামনের সবুজ লনটার ট্রেঞ্চে গিয়ে আশ্রয় নিলেন এবং পাশেই উপস্থিত জনৈক বিদেশী সাংবাদিকদের কাছ থেকে একটা বল পয়েন্ট কলম ধার করে ট্রেঞ্চে বসেই তাঁর পদত্যাগ লিখলেন। তখনও মিগগুলো বারবার এসে শুধু গভর্নর হাউসেই হামলা করছিল।

বিমান হামলা বন্ধ হবার পর গভর্নর আব্দুল মোতালেব মালেক তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ এবং পশ্চিম পাকিস্তানি বেসামরিক অফিসারদের নিয়ে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের সৃষ্ট নিরপেক্ষ এলাকা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে প্রবেশ করলেন। অবশ্য 'নিরপেক্ষ এলাকা'য় প্রবেশের সময় প্রত্যেকেই রেডক্রসের কাছে লিখিতভাবে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সমপর্কচ্ছেদ করতে হয়েছিল। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সবার চোখে তখন অশ্রু টলমল করছিল। এদের মধ্যে চিফ সেক্রেটারি, পুলিশের আইজি ঢাকা বিভাগের কমিশনার, প্রাদেশিক সরকারের সেক্রেটারিরা ছাড়াও আরও কয়েকজন ভিআইপি ছিলেন।

তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের সেবামরিক সরকারের শেষ দিন। এরপর থেকে মুজিবনগর সরকারের কর্ণধাররা এসে দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত ঢাকায় কোনো বেসামরিক সরকারের অস্তিত্ব পর্যন্ত ছিল না।

পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক শেষ গভর্নর ডা. মালেক ১৯৭১ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর স্থায়িত্বকাল মাত্র তিন মাস ১১ দিন। তিনি যেদিন গভর্নরের শপথ গ্রহণ করেছিলেন, সেদিনকার অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে মোমেন খান, ফজলুল কাদের চৌধুরী ও সবুর খান উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে মোমেন খান মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হন এবং ফজলুল কাদের চৌধুরী কারাগারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ডা. মালেকের গভর্নরশিপের আমলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে তিনটি। প্রথমত, তথাকথিত ক্ষমা প্রদর্শনের প্রেক্ষিতে সীমান্ত এলাকায় অভ্যর্থনা ক্যাম্পের আয়োজন। এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়ত, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের বাহানা করে দক্ষিণপন্থী ও ধর্মীয় দলগুলোর মধ্যে হয় আসন বন্টন। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী এসব পার্টির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করার পর এরা নিম্নোক্তভাবে উপ-নির্বাচনে পার্লামেন্টের আসন দাবি করেছিল :

১ ডেমোক্রেটিক পার্টি : ৪৬টি

২ জামাত-ই-ইসলাম : ৪৪টি

৩ কাউন্সিল মুঃ লীগ : ২৬টি

৪ কনভেনশন মুঃ লীগ : ২১টি

৫ নেজামে ইসলাম : ১৭টি

এ সময় ফরমান আলী রাওয়ালপিন্ডি থেকে জেনারেল পীরজাদার এ মর্মে বার্তা পেলেন যে, কাইয়ুম মুসলিম লীগকে ২১টি এবং পিপলস পার্টিকে ১৮টি আসন দিতে হবে। অবশ্য বাংলাদেশের সর্বত্র মুক্তিযুদ্ধ তখন আরও জোরদার হওয়ায় ডা. মালেকের গভর্নরশিপে এই উপনির্বাচনও আর সম্ভব হয়নি।

তৃতীয়ত, ডা. মালেকের আমলে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়।

যাক যা বলছিলাম। ১৪ই ডিসেম্বর দিবাগত রাতে লে. জেনারেল নিয়াজী ফোনে রাওয়ালপিন্ডিতে সামরিক বাহিনীর প্রধান সেনাধ্যক্ষ জেনারেল আবদুল হামিদকে সর্বশেষ পরিস্থিতির কথা জানালেন। তিনি আরও বললেন, 'স্যার, আমি এর মধ্যেই প্রেসিডেন্টের কাছে কিছু প্রস্তাব পাঠিয়েছি। আপনি কি একটু চেষ্টা করবেন, যাতে শীঘ্রি এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পাঠানো হয়?'

এই দিন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তান চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উপ-মহাদেশে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে ভারত ও পাকিস্তানকে অবিলম্বে সৈন্য প্রত্যাহার করে আন্তর্জাতিক সীমানায় ফিরে যাওয়ার জন্য যে প্রস্তাব উথাপিত হয়েছিল তা বাতিল হয়ে গেলো। চীন এই প্রস্তাব সমর্থন করলেও ব্রিটেন ও ফ্রান্স ভোটদানে বিরত রইলো। আর সোভিয়েত রাশিয়া এইবার নিয়ে তৃতীয় ও শেষবারের মতো ভেটো প্রয়োগ করলো।

শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট থেকে ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজীর কাছে তারবার্তা এলো :

'যুদ্ধ বন্ধ এবং জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করো।'

৬৭

১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর বেলা সাড়ে তিনটায় ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে সেই বহুল প্রত্যাশিত তারবার্তা পাওয়ার পর নিজের কর্তব্য সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করলেন। কিভাবে অগ্রসর হওয়া সমীচীন?

গভর্নর ডা. থেকে শুরু করে সমস্ত মন্ত্রী ও সেক্রেটারি সবাই এদিকে সম্পর্কচ্ছেদ করে 'নিরপেক্ষ জোন' হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের কাছে আশ্রয় নিয়েছে। তাই জেনারেল নিয়াজী আলোচনার জন্য মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে ডেকে পাঠালেন। দু'জনে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত দিলেন যে, অবিলম্বে আত্মসমর্পণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন্ দূতবাসের মধ্যস্থতা মেনে নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে? শেষ পর্যন্ত জেনারেলদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে ঢাকাস্থ মার্কিনি দূতাবাসের মধ্যস্থতার আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঢাকায় তখন মার্কিনি কনসাল জেনারেল হচ্ছেন মি. এস পিভ্যাক। সন্ধ্যার সময় গোপনে দু'জনে দেখা করতে গেলেন মার্কিনি কনসাল জেনারেলের সঙ্গে। সবকিছু শুনে মার্কিনি কূটনীতিবিদ বললেন, 'জেনারেল, আমি তো আপনাদের পক্ষ থেকে মধ্যস্থতা করতে পারি না। তবে আপনারা চাইলে আপনাদের বার্তাটুকু জায়গা মতো পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।' এরপর মি. এস পিভ্যাক-এর অফিসে বসেই ভারতীয় আর্মি চিফ অব স্টাফ জেনারেল স্যাম মানেক শ'-এর জন্য বিশেষ বার্তা লেখা হলো। এতে বলা হলো যে, 'পাকিস্তানি সৈন্য বাহিনী এবং সহযোগী বাহিনীর সদস্যদের নিরাপত্তা। ২. মুক্তি বাহিনীর হামলার মোকাবেলায় স্থানীয় অনুগত জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা এবং ৩. আহত ও রুগ্ন সৈন্যদের নিরাপত্তা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির জন্য আমরা রাজি আছি।"

পরবর্তীকালে এ মর্মে তথ্য পাওয়া গেছে যে, মার্কিনি কনসাল এস পিভ্যাক এই বার্তা সরাসরি জেনারেল মানেক শ-এর কাছে কিংবা দিল্লিতে পাঠাননি। তিনি বার্তা পাঠিয়েছিলেন ওয়াশিংটনে মার্কিনি পররাষ্ট্র দফতরে। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন সরকার এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে রাওয়ালপিন্ডিতে সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। অনেকের মতে জঙ্গি প্রেসিডেন্ট এ সময় অতিমাত্রায় সুরা পান এবং অন্যান্য ধরনের কু-অভ্যাসে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তাঁকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আর যোগাযোগ সম্ভব হয়নি।

যা হোক, পরদিন অর্থাৎ ১৫ই ডিসেম্বর নাগাদ ভারতীয় আর্মি চিফ অব স্টাফ এবং মিত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল মাকেন শ'-এর কাছ থেকে ছোট্ট একটা বার্তা এসে পৌঁছালো। 'অবিলম্বে আমার অগ্রগামী বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলে, আপনার সৈন্যবাহিনী এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তা বিধান করা হবে।'

পরবর্তীতে বিস্তারিত ব্যবস্থাদির উদ্দেশ্যে ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের জন্য এই বার্তায় একটা বিশেষ 'রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি' জানানো হলো। এই ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান দফতর হচ্ছে কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে। এখানে উল্লেখ্য যে, এ সময় ঢাকা বেতারকেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠানসূচি প্রচার বন্ধ হয়ে গেছে এবং ঢাকাস্থ

পাকিস্তান ইস্টার্ন কমান্ড আর কোলকাতাস্থ ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের সঙ্গে বিশেষ 'রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি' মারফত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র ও ভারতীয় বেতারের কোলকাতা কেন্দ্র থেকে নৈশকালীন অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ রাখা হয়েছিল।

এদিকে জেনারেল নিয়াজী ভারতীয় ও মিত্রবাহিনীর প্রধানের নিকট থেকে বার্তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানি বাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল আব্দুল হামিদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় রাওয়ালপিন্ডি থেকে জবাব এলো, 'প্রদত্ত শর্ত মোতাবেক যুদ্ধবিরতি করার পরামর্শ দিচ্ছি...।'

মুজিবনগরে তখন তুমুল উত্তেজনা। ১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সর্বশেষ সংবাদ জানার জন্য সবাই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন। অবশেষে 'ব্ল্যাক আউট'-এর মধ্যে সেই প্রতীক্ষিত খবর এলো। বিকেল পাঁচটা থেকে অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি শুরু হয়ে গেছে। পরদিন ১৬ই ডিসেম্বর সকাল ৯টা পর্যন্ত এই যুদ্ধবিরতি অব্যাহত থাকালীন আত্মসমর্পণের ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করতে হবে। পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনী এতে অপারগ হলে আবার হামলা শুরু হবে। ১৬ই ডিসেম্বর ভোর রাতে ঢাকা থেকে জেনারেল নিয়াজীর অনুরোধের বার্তা এলো, অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির সময়সীমা বাড়িয়ে দেয়ার জন্য। সকাল ৯টায় মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ আমাদের জানালেন যে, অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির সময়সীমা বিকেল তিনটা পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

কোলকাতার বালিগঞ্জে অবস্থিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের রেকর্ডিং স্টুডিও, ১ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে তথ্য ও প্রচার দফতর, পার্ক সার্কাসে বাংলাদেশ মিশন, বালু হাক্কাক লেনে 'জয়বাংলা' পত্রিকা অফিস আর থিয়েটার রোডে মুজিবনগর সরকারের ক্যাম্প অফিসের সে সময়কার বর্ণনা দেয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে হারানো প্রিয়জনদের কথা স্মরণ করে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করছেন, কেউবা বসতবাটি ও সহায়সম্পত্তি নিশ্চিহ্ন হওয়ায় বিলাপ করছেন, কেউ কেউ জিজ্ঞেস করছেন, 'পাকিস্তানের বন্দি শিবিরে আটকে পড়া বাঙালিরা কি দেশে ফিরতে পারবে? আমাদের বঙ্গবন্ধু কি জীবিত আছেন।' তবে বাংলাদেশ স্বাধীন হতে চলেছে এ জন্য সবারই চোখে তখন আনন্দাশ্রু আর সবার মুখে একই প্রশ্ন, 'আমাদের প্রিয় ঢাকা নগরী কি ধ্বংস হয়ে গেছে?'

এমন সময় বাংলাদেশ থেকে সেই ভয়াবহ খবর এসে পৌঁছলো। পশ্চাদপসরণরত পাকিস্তানি সৈন্যরা ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে বেশ কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী হত্যা করেছে। শহরের উপকণ্ঠে এসব আইনজীবী, চিকিৎসক আর শিক্ষকদের লাশ পাওয়া গেছে। রাজশাহী থেকেও একই ধরনের খবর এলো। সবশেষে পাওয়া গেলো ঢাকার খবর। কারফিউয়ের মধ্যে আল্ বদরের সদস্যরা ঢাকায় বুদ্ধিজীবীদের বাড়ি বাড়ি হামলা করে চোখ বেঁধে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাচ্ছে। এরপর এদের খবর আর কেউই বলতে পারে না। এসব বুদ্ধিজীবীর মধ্যে অধ্যাপক, চিকিৎসক, আইনজীবী, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি সব ধরনের পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন। মুজিবনগরে সবার মধ্যে তখন চাপা আক্রোশ। এর মধ্যে আবার খবর এলো, এঁদের সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। তখন সবারই চিন্তা এই শহীদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকায় কারা রয়েছেন।

এদিকে ঢাকায় তখন এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা বিরাজ করছে। বিরতিহীন কারফিউয়ের জন্য আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে যোগাযোগ নাই বললেই

চলে। চারদিক থেকে কেবল নৃশংস হত্যার খবর পাওয়া যাচ্ছে। সন্তানহারা পিতা, স্বামীহারা বধূ, পিতৃহারা এতিম বাচ্চার ফরিয়াদে খোদার আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে। প্রায় সবাই তখন ঢাকা নগরীতেই পলাতকের জীবনযাপন করছে।

রাজধানী ঢাকা নগরীর ওপর লে. জেনারেল নিয়াজী ১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় তার চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বারেককে ডেকে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বিভিন্ন কমান্ডে পাঠাবার জন্য একটা জরুরি বার্তার খসড়া তৈরির নির্দেশ দিলেন। এক পৃষ্ঠাব্যাপী এই নির্দেশে 'সাহসিকতাপূর্ণ' লড়াই-এর জন্য প্রশংসা জ্ঞাপনের পর অবিলম্বে সবাইকে নিকটবর্তী ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হলো। এই নির্দেশে 'আত্মসমর্পণ' শব্দ উল্লেখ করা না হলেও শেষ দিকে একটা বাক্যে বলা হলো যে, 'দুঃখজনকভাবে এর অর্থ হচ্ছে সমরাস্ত্র জমা দিতে হবে।'

জেনারেল নিয়াজী ও তার বাহিনীর নৈতিক মনোবল বিনষ্ট করবার জন্য জেনারেল মানেক শ' বেতার মারফত আত্মসমর্পণের আহ্বান জানালেন। এই আহ্বানের শেষে বলা হলো '...এরপরও যদি আমার আবেদন মোতাবেক আপনি পুরো বাহিনীসহ আত্মসমর্পণ না করেন তাহলে পূর্ণোদ্যমে আঘাত হানার জন্য আমি ১৬ই ডিসেম্বর সকাল ৯টার পর নির্দেশ দিতে বাধ্য হবো।' উপরন্তু জেনারেল শার এই আহ্বান উর্দু ও ইংরেজিতে প্রচারপত্র আকারে বিমানযোগে বাংলাদেশের সর্বত্র বিতরণ করা হলো।

ঠিক একই সময়ে নিরাপত্তা পরিষদে জুলফিকার আলী ভুট্টো বক্তৃতা দিচ্ছেন। 'সম্ভবত নিরাপত্তা পরিষদে এটাই হচ্ছে আমার শেষ বক্তৃতা। যদি নিরাপত্তা পরিষদ মনে করে থাকে যে, আমি আত্মসমর্পণ সংক্রান্ত ব্যাপারটি বৈধ করার জন্য অংশগ্রহণ করবো, তাহলে এতটুকু বলতে পারি যে, কোনো অবস্থাতেই আমি তা করবো না। আমি নিরাপত্তা পরিষদ থেকে আত্মসমর্পণের দলিল গ্রহণ করবো না। আমি একটা আগ্রাসনকে বৈধ করার 'পার্টি' হবো না। কেনো গত তিন চারদিন ধরে নিরাপত্তা পরিষদ বিধি মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব করবো? এটার অর্থ কি এই নয় যে, ঢাকার পতনের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছিলো? কেনো আমি নিরাপত্তা পরিষদে সময় নষ্ট করবো? ...আমি এই মুহূর্তে ওয়াক আউট করলাম।'

এদিকে ১৫ই ডিসেম্বর দিবাগত রাতে ঢাকার প্রতিরক্ষা ব্যূহ সুদৃঢ় করার দায়িত্বে লিপ্ত ব্রিগেডিয়ার বশীর অস্থির হয়ে উঠেছেন। তিনি খবর পেলেন যে, মুক্তিবাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতায় ভারতীয় ১০১ বাহিনীর মেজর জেনারেল নাগ্‌রা জয়দেবপুর-টঙ্গি এলাকায় ২১ বালুচের মারাত্মক প্রতিরোধের দরুন পথ পরিবর্তন করে কালিয়াকৈর হয়ে নয়ারহাট-ঢাকা রোডের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে। সম্মুখে দুর্ধর্ষ কমান্ডো বাহিনী আর সহযোগী হিসাবে রয়েছে কাদেরিয়া বাহিনী। ব্রিগেডিয়ার বশীরের হিসাব মতো ৬ই ডিসেম্বর কোনরকম লড়াই না করেই খুলনা থেকে পশ্চাদপসরণরত কর্নেল ফজলে হামিদের সৈন্যদের ঢাকার উপকণ্ঠে এই রাস্তায় ব্যূহ রচনা করে থাকার কথা। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার সাহেব সংবাদ নিয়ে দেখলেন না, কর্নেল ফজলে হামিদ তাঁর সৈন্যদের নিয়ে একেবারে ঢাকার ক্যান্টনমেন্টে হাজির হয়েছে, আর এসব সৈন্যের লড়াই করার মতো অবস্থা নেই।

উপায়ন্তরবিহীন অবস্থায় ব্রিগেডিয়ার বশীর অত্যন্ত দ্রুত কিছু সৈন্য সংগ্রহ করে মেজর সালামতকে মীরপুর ব্রিজ পাহারা দিতে পাঠালেন। এ মর্মে তিনি নির্দেশ দিলেন যে, প্রয়োজনমতো এই ব্রিজ উড়িয়ে দিতে হবে। মেজর সালামত তাঁর সৈন্য এবং

'ইপাকাফ' সদস্যদের নিয়ে 'পজিশন' নেয়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই মেজর জেনারেল নাগ্রা তাঁর অগ্রবর্তী কমান্ডো বাহিনী নিয়ে মীরপুর ব্রিজের অপর পারে আমিনবাজারে এসে পৌঁছুলেন। সঙ্গে স্বয়ং কাদের সিদ্দিকী ও তাঁর বাহিনীর কিছু সদস্য। মেজর জেনারেল নাগ্রা এখানে দাঁড়িয়ে লে. জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজীকে একটা চিরকুট লিখলেন, 'প্রিয় আব্দুল্লাহ, আমি এখন মীরপুর ব্রিজে। আপনার দূত পাঠান।'

৬৮

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অন্ধকার ভোরের ঘন কুয়াশার মধ্যে মেজর জেনারেল নাগ্রা মীরপুর ব্রিজের ওধারে আমিনবাজারে রাস্তার উপরে পায়চারি করছেন। নাগরার সঙ্গে কাদেরিয়া বাহিনীর প্রধান টাইগার সিদ্দিকী, ভারতীয় ১৩ গার্ডস্-এর সন্ত সিং এবং শিখ লাইট ইনফ্যানট্রির ব্রিগেডিয়ার হরদেব সিং ক্লার। মীরপুর ব্রিজের কন্ট্রোল তখন মোটামুটিভাবে ২ কমান্ডো প্যারা ব্যাটেলিয়নের দায়িত্বে। এই কমান্ডো ব্যাটালিয়ানকে ১১ই ডিসেম্বর বিকেলে টাঙ্গাইলের উপকণ্ঠে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার একটা পরিত্যক্ত 'এয়ার স্ট্রিপে' ট্রান্সপোর্ট প্লেন থেকে প্যারাস্যুটযোগে অবতরণ করানো হয়েছিল। এ সময় তাদের অন্যান্য সমরাস্ত্রের সঙ্গে প্যারাস্যুট করে ৩.৭ ইঞ্চির কামান পর্যন্ত অবতরণ করানো হয়েছিল। টাঙ্গাইল সার্কিট হাউসে অবস্থানরত পলায়নপর পাকিস্তানি ৯৩ ব্রিগেডের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার কাদির প্রথমে ভুল খবর পেয়েছিলেন যে, তাদের সাহায্যার্থে টাঙ্গাইল শহরের উপকণ্ঠে চীনা সৈন্যরা অবতরণ করছে। ভুল ভাঙার পর পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার তার বাহিনী নিয়ে ঢাকার দিকে দ্রুত পশ্চাদপসরণের প্রচেষ্টা করলে কাদেরিয়া বাহিনী টাঙ্গাইল-ঢাকা এলাকায় এদের নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং কালিয়াকৈর-এ পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার কাদিরকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। এরপর এরা নবনির্মিত কালিয়াকৈর-নয়ারহাট রাস্তা দিয়ে সাভার হয়ে মীরপুরে এসে হাজির হয়।

১৬ই ডিসেম্বর ভোরে মীরপুর ব্রিজের কাছে জেনারেল নাগরা রাস্তায় পায়চারি করার সময় মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে কুয়াশার মাঝ দিয়ে ঢাকা নগরীর ঝাপসা চেহারাটা দেখার চেষ্টা করছেন। তাকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছিল। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর হাত থেকে ঢাকা নগরীকে মুক্ত করার কৃতিত্ব তিনি কি লাভ করতে পারবেন?

এ সময় দুটো ঘটনা তাকে খুবই উদ্বিগ্ন করেছেন। কিছুক্ষণ আগে ভোর রাতে তাঁর কমান্ডের বাহিনীর কয়েকজন সৈন্য জিপে মীরপুর ব্রিজের ওধারে যাওয়ার চেষ্টা করলে সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর মেজর সালামতের নির্দেশে ব্রিজের প্রহরারত পাকিস্তানি সৈন্যরা গোলাবর্ষণ করে দুটো জিপই উড়িয়ে দিয়েছে। এতে ভারতীয় বাহিনীর একজন অফিসার ও ৪ জন জোয়ান নিহত হয়েছে। অবশ্য পাকিস্তানিরা ব্রিজ উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করলে ২ কমান্ডো বাহিনীর প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণে পাকিস্তানি সৈন্যরা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। এই মীরপুর ব্রিজ রক্ষা করা এখন কমান্ডো বাহিনীর জন্য জীবন-মরণ প্রশ্ন। কেননা পাকিস্তানি সৈন্যরা ব্রিজ উড়িয়ে দিতে সক্ষম হলে আপাতত বিকল্প 'পন্টুন ব্রিজ' বানাবার কোন ব্যবস্থাই তাদের সঙ্গে নেই। ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের সদস্যরা এখনও এসে পৌঁছায়নি। তাই ব্রিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করলেও অতর্কিত হামলার ভয়ে ব্রিজ অতিক্রম করা সম্ভব নয়।

আর একটা ব্যাপারে জেনারেল নাগরা একটু বেশি চিন্তিত। মাত্র কিছুক্ষণ সময়ের মধ্যে অর্থাৎ সকাল ন'টায় পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের জন্য জেনারেল মানেক শ'-এর দেয়া সময়ের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। ঢাকা নগরীর ওপর তখন স্থল ও বিমান হামলায় শুরু হবে এক ভয়াবহ রক্তাক্ত যুদ্ধ। ১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বিবিসির খবরে বলা হয়েছে যে, জেনারেল নিয়াজীর অনুরোধে জেনারেল মানেক শ' ১৫ই ডিসেম্বর বিকেল পাঁচটা থেকে পরদিন ১৬ই ডিসেম্বর সকাল ন'টা পর্যন্ত হামলা বন্ধ রাখার জন্য মিত্র বাহিনীর প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গ্যারিসনের সঙ্গে যোগাযোগ এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য জেনারেল নিয়াজীকে এই সময় দেয়া হয়েছে।

জেনারেল নাগরা বারবার তাঁর হাতের ঘড়ির দিকে দেখছিলেন। তখন সকাল ছ'টা বাজে। এর মধ্যে ভারতীয় ১০ জম্বু ও কাশ্মীর রাইফেলস এবং ৭ বিহার-এর দুটো ব্যাটালিয়ান আমিনবাজারের কাছাকাছি এগিয়ে আসার খবর পাওয়া গেছে। এমন সময় ব্রিগেডিয়ার ক্লাব সবচেয়ে প্রয়োজনীয় খবর দিলেন। পাকিস্তান ইস্টার্ন কমান্ডের হেডকোয়ার্টার থেকে জেনারেল নিয়াজী বিভিন্ন কমান্ডে সকাল পাঁচটা থেকে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য ওয়ারলেসে যে মেসেজ পাঠাচ্ছেন তা ইন্টারসেপট করা হয়েছে। এখন সময় হচ্ছে ১৫ই ডিসেম্বর সকাল ছ'টা। মীরপুর ব্রিজের পূর্ব ধারে আমিনবাজারে দাঁড়িয়ে জেনারেল নাগরাকে তার সৈনিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এ অবস্থায় পরবর্তী নির্দেশের জন্য তাঁর পক্ষে অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। আবার এখান থেকেও হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। জেনারেল নাগরা খবর নিয়ে দেখলেন যে মীরপুর ব্রিজের পশ্চিম ধার গাবতলিতে অবস্থানরত পাকিস্তানি সৈন্যরা সকাল পাঁচটা থেকে আর গোলাবর্ষণ করেনি।

মীরপুর ব্রিজের পাদদেশে দাঁড়িয়ে হরদেব সিং ক্লার, সন্ত সিং আর কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে আলাপ করে জেনারেল নাগরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এই মুহূর্তে জেনারেল নিয়াজীর কাছে দূত পাঠাতে হবে। একটা জিপের সামনে বিরাট আকারের সাদা ফ্ল্যাগ লাগিয়ে তৈরি করা হলো। ২ কমান্ডো ব্যাটালিয়নের দু'জন অফিসার ও ড্রাইভার জিপে উঠলো। এরপর জেনারেল নাগরা একটা বার্তা লিখলেন জেনারেল নিয়াজীকে।

'প্রিয় আব্দুল্লাহ, আমি এখন মীরপুর ব্রিজে। ঘটনার পরিসমাপ্তি হয়েছে। পরামর্শ হচ্ছে, আপনি আমার কাছে আত্মসমর্পণ করুন। সেক্ষেত্রে আমরা আপনাদের দেখাশোনার দায়িত্ব নেবো, শীঘ্র আপনার প্রতিনিধি পাঠান। নাগরা।'

বছর কয়েক আগে জেনারেল নাগরা যখন ইসলামাবাদে ভারতীয় দূতাবাসে মিলিটারি এট্যাচি হিসাবে চাকরি করতেন, তখন থেকে জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে তার পরিচয়।

১৬ই ডিসেম্বর সকাল পৌনে ন'টা নাগাদ জেনারেল নাগরা এই বার্তা তার এডিসি'র হাতে দিয়ে তাকেই নির্দেশ দিলেন জিপে লে. জেনারেল নিয়াজীর কাছে যাওয়ার জন্য।

সাদা ফ্ল্যাগ উড়িয়ে জিপটা ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টারে এসে পৌছুলো। অবাক বিস্ময়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা এই ভারতীয় জিপটাকে দেখছিল। তখন ঘড়িতে সকাল ন'টা। হেডকোয়ার্টারে বসে রয়েছেন পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীতে 'টাইগার' বলে পরিচিত লে. জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বীরত্বসূচক মিলিটারি

ক্রস বিজয়ী মেজর জেনারেল জমসেদ, ধূর্ত মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী এবং নৌ-বাহিনীর আঞ্চলিক প্রধান রিয়ার এ্যাডমিরাল শরিফ। জেনারেল নাগরার বার্তা হাতে নিয়ে পড়ার পর নিয়াজীর চেহারাটা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। তিনি কোনও কথা না বলে চিঠিটা অন্যদের পড়ার জন্য দিলেন। উপস্থিত সবাই বার্তাটা দেখলেন। মিনিট কয়েকের জন্য সেখানে কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এলো।

রাও ফরমান প্রথমে কথা বললেন, 'তাহলে জেনারেল নাগরাই আলোচনার জন্য এসেছে?' এ প্রশ্নের কেউই জবাব দিলেন না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে : জেনারেল নাগরাকে অভ্যর্থনা জানানো হবে, নাকি সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করা হবে?

জেনারেল নিয়াজীকে উদ্দেশ্য করে আবার রাও ফরমান জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার হাতে কি ঢাকার জন্য কিছু রিজার্ভ সৈন্য আছে?' নিয়াজী এবারও কোন জবাব দিলেন না। শুধু জেনারেল জমসেদের দিকে তাকালেন। রাজধানী ঢাকা নগরীর দায়িত্বে নিয়োজিত মেজর জেনারেল জমসেদ মুখে কিছু না বলে মাথাটা নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন, যুদ্ধ করার মতো ঢাকায় আর কোন রিজার্ভ সৈন্য নেই। রিয়ার অ্যাডমিরাল শরিফ এবং রাও ফরমান প্রায় একই সঙ্গে বললেন, 'এই যখন পরিস্থিতি, তাহলে নাগরা যা বলছে তাই করুন।' (উইটনেস টু সারেন্ডার : পৃঃ ২১০ সিদ্দিক সালিক)

শেষ পর্যন্ত এ মর্মে পাকিস্তানের ৩৬ ইনফ্যানট্রি ডিভিশনের সিদ্ধান্ত হলো যে, জিওসি মেজর জেনারেল মোহাম্মদ জমসেদ যাবেন জেনারেল নাগরাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে মীরপুর ব্রিজ এলাকায় প্রহরারত পাকিস্তানি সৈন্যদের কাছে জরুরি নির্দেশ পাঠানো হলো। যুদ্ধবিরতির কথাবার্তা হচ্ছে, তাই জেনারেল নাগরার ঢাকা নগরীতে প্রবেশের সময় যেনো কোনো বাধা দেয়া না হয়।

পর্যবেক্ষকদের মতে একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকা নগরীতে মনোবলহীন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যূহ একটা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়লো। হাজার হাজার সৈন্য আর বিপুল সমরাস্ত্র মজুদ থাকা সত্ত্বেও আর লড়াই হলো না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ের বার্লিন, প্যারিস কিংবা লেনিনগ্রাডের মতো কিছুই এখানে হলো না। মনে হলো পাকিস্তানের কর্তৃত্বাধীন এতোদিনকার ঢাকা নগরী একটা হার্টের রোগীর মতো শয্যাশায়ী হলো। অনেকের মতে জেনারেল নিয়াজী পুরা মাত্রায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই পরাজয় মেনে নিয়েছিলেন।

মীরপুর ব্রিজের পাদদেশে দাঁড়িয়ে জেনারেল নাগরার প্রতীক্ষার পরিসমাপ্তি হলো। প্রায় ঘন্টা দেড়েক পরে ব্রিজের ওপারে সাদা ফ্ল্যাগওয়ালা জিপটা দৃষ্টিগোচর হলো। পিছনে একটা 'স্টাফ কারে' গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট জেনারেল জমসেদ। ভারতীয় জিপটা পুরানো সরু ব্রিজটা পেরিয়ে এলো। আর জমসেদের গাড়িটা ব্রিজের পশ্চিম ধারেই রয়ে গেলো। এর মধ্যেই ব্রিগেডিয়ার হরদেব সিং ক্লার ওয়ারলেসে কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের হেডকোয়ার্টার এবং চার নং কোর হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে 'মেসেজ' আদান-প্রদান করতে শুরু করেছে।

একটু পরেই সাদা ফ্ল্যাগ উড়িয়ে পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর জিপ মীরপুর ব্রিজের ওপর দিয়ে এগিয়ে এলো। মুহূর্তের মধ্যে ২ কমান্ডো বাহিনী গুলি শুরু করলে অনেক কষ্টে তাদের বিরত করা হলো। জিপ থেকে একজন পাকিস্তানি মেজর নেমে জেনারেল

নাগরাকে স্যালুট দিয়ে নিয়াজীর আত্মসমর্পণের বার্তা প্রদান করে জানালো যে, ব্রিজের পশ্চিম ধারে লে. নিয়াজীর পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য মেজর জেনারেল মোহাম্মদ জমসেদ অপেক্ষা করছেন।

একটু পরেই জেনারেল নাগরা, কাদের সিদ্দিকী, ব্রিগেডিয়ার ক্লার সাদা ফ্ল্যাগওয়ালা জিপে মীরপুর ব্রিজের পশ্চিম ধারে এসে উপস্থিত হলেন। পাকিস্তান ৩৬ ইনফ্যানট্রি ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল মোহম্মদ জমসেদ তাদের ঢাকা নগরীতে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিজের স্টাফ গাড়িতে বসার অনুরোধ করলেন। তখন সময় হচ্ছে সকাল সাড়ে দশটা। কুয়াশা সরে যাওয়ায় সামনে বিরাট ঢাকা শহরটা নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়িটা সরাসরি ৩৬ ইনফ্যানট্রি ডিভিশনের হেড কোয়ার্টারে এসে হাজির হলে মেজর জেনারেল জমসেদ দ্রুত ফোনে জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ১৬ই ডিসেম্বর বেলা ১১টায় জনশূন্য রাস্তা দিয়ে একটা মিলিটারি জিপে জেনারেল জমসেদ আর পিছনের স্টাফ কারে জেনারেল নাগরা, কাদের সিদ্দিকী, সন্ত সিং আর ক্লার এগিয়ে চললেন কুর্মিটোলায় পাকিস্তান ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টারের দিকে। অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে নিয়াজীর পক্ষ থেকে পাকিস্তান ইস্টার্ন আর্মির চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বারেক সবাইকে অভ্যর্থনা জানিয়ে একটা সাজানো কক্ষে বসতে অনুরোধ করলেন।

এর আগেই জেনারেল নিয়াজীর নির্দেশে ব্রিগেডিয়ার বারেক ইস্টার্ন কমান্ডের 'আন্ডার গ্রাউন্ড' টেকনিক্যাল হেডকোয়ার্টারের দেয়াল থেকে সমস্ত অপারেশনাল ম্যাপ সরানো ছাড়াও হেডকোয়ার্টারের প্রধান অফিসটাও নতুনভাবে সাজিয়েছেন আর অফিসার্স মেসে নতুন মেহমানদের জন্য অতিরিক্ত খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই লে. জেনারেল নিয়াজী 'আন্ডার গ্রাউন্ড' টেকনিক্যাল হেডকোয়ার্টার থেকে নিজস্ব অফিসে এসে হাজির হলেন। জেনারেল নাগরা ও তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে করে মেজর জেনারেল জমসেদ এসে ঘরে ঢুকতেই আবদুল্লাহ খান নিয়াজী ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে নাগরার সঙ্গে করমর্দন করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। জেনারেল নাগরার কাঁধে মুখটা এলিয়ে দিয়ে নিয়াজীর বিরাট দেহটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। এই অবস্থায় চিৎকার করে নিয়াজী পাঞ্জাবিতে বললেন, 'পিন্ডিতে হেডকোয়ার্টারের বেজন্মারা আমার এই অবস্থার জন্য দায়ী।'

নিয়াজীর কান্না থামিয়ে একটু ঠাণ্ডা হতেই জেনারেল নাগরা তার সহকর্মীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে শুরু করলেন। প্রথমেই কাদেরীয়া বাহিনীর প্রধান কাদের সিদ্দিকী। নাগরা যখন কাদের সিদ্দিকীর পরিচয় দিচ্ছিলেন তখন জেনারেল নিয়াজী, জেনারেল জমসেদ আর ব্রিগেডিয়ার বারেক এই বাঙালি যুবকের আপদমস্তক নিরীক্ষা করছিলেন। জেনারেল নাগরা তাঁর বক্তব্যের শেষে বললেন, 'এই হচ্ছে সেই টাইগার সিদ্দিকী।' জেনারেল নিয়াজী করমর্দনের জন্য কাদের সিদ্দিকীর দিকে হাত এগিয়ে দিলেন। সবাইকে হতবাক করে এই মুক্তিযোদ্ধা তাঁর হাত সরিয়ে নিয়ে ইংরেজিতে বললেন, 'যারা নারী ও শিশু হত্যা করেছে, তাদের সঙ্গে করমর্দন করতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিত। আমি আল্লার কাছে জবাবদিহিকারী হতে চাই না।'

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের দুপুর প্রায় বারোটা নাগাদ কোলকাতাস্থ থিয়েটার রোডে মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের কাছে এ মর্মে খবর এসে পৌঁছালো যে, ঢাকার হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণে সম্মত হয়েছে। এই মুহূর্তে মিত্র বাহিনীর অন্যতম অধিনায়ক মেজর জেনারেল নাগরা এবং কাদেরিয়া বাহিনীর প্রধান কাদের সিদ্দিকী তাদের জনাকয়েক সহকর্মী নিয়ে ঢাকায় পাকিস্তান ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টারে রয়েছেন। হানাদার বাহিনীর প্রধান লে. জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী এবং মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। মুজিবনগরে তুমুল উত্তেজনা। তাজউদ্দিন আহমেদ প্রতিমুহূর্তের খবরের জন্য উদ্গ্রীব। এমন সময় খবর এলো যে, আজ বিকেলেই আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকায় আত্মসমর্পণ হবে। মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য উচ্চপদস্থ কাউকে উপস্থিত থাকতে হবে। তাজউদ্দিন আহমেদ ধীর পদক্ষেপে তাঁর ছোট্ট অফিস কক্ষ থেকে বেরিয়ে সচিবালয়ের অন্য পার্শ্বে অবস্থিত প্রধান সেনাপতি তৎকালীন কর্নেল (অবঃ) আতাউল গণি ওসমানীর সুরক্ষিত অফিসের দিকে এগিয়ে গেলেন। পিছনে আমরা কয়েকজন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনকে তখন কিছুটা চিন্তিত দেখাচ্ছিল। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তাঁর কক্ষের দিকে এগিয়ে আসছেন জানতে পেরে সামরিক পোশাক পরিহিত সৌম্য চেহারার ওসমানী সাহেব নিজের অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে দেখেই আনন্দে এক রকম চিৎকার করে উঠলেন, "সি-ইন-সি সাহেব ঢাকার সর্বশেষ খবর শুনেছেন বোধ হয়? এখন তো আত্মসমর্পণের তোড়জোড় চলছে ..." প্রধানমন্ত্রী বাকি কথাগুলো শেষ করতে পারলেন না। ওসমানী সাহেব তাঁকে করিডোরের আর এক কোণায় একান্তে নিয়ে গেলেন। দু'জনের মধ্যে মিনিট কয়েক কি কথাবার্তা হলো আমরা তা শুনতে পেলাম না। এরপর দু'জনেই আবার আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। পিছনে প্রধান সেনাপতির এডিসি শেখ কামাল। ওসমানী সাহেবের শেষ কথাটুকু আমরা শুনতে পেলাম। 'নো, নো প্রাইম মিনিস্টার, মাই লাইফ ইজ ভেরি প্রেসাস, আই কান্ট গো'। (না, না, প্রধানমন্ত্রী, আমার জীবনের মূল্য খুব বেশি। আমি যেতে পারবো না)।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদকেও তখন বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। অভ্যাসবশত তখন তিনি অবিরাম তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি খুঁটছিলেন। আমাদের ইশারা দিয়ে তিনি নিজের অফস কক্ষের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমরাও গিয়ে তার অফিসে ঢুকলাম। আমাদের সঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন তৎকালীন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার এবং দিনাজপুরের অবসরপ্রাপ্ত উইং কমান্ডার মির্জা আবুল। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ তাঁর চেয়ারে বসে খন্দকার সাহেবের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনাকে একটা দুরূহ কাজে পাঠাবো বলে মনস্থির করেছি। আমাদের সেক্টর কমান্ডাররা তো সবাই এখন লড়াইয়ের ময়দানে। আজ বিকেল চারটায় ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান। সেখানে আপনাকেই মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। এটা আমাদের মান ইজ্জতের প্রশ্ন। আপনার জন্য দমদম বিমানবন্দরে একটা হেলিকপ্টার তৈরি রয়েছে। আর একটা কথা, আমার জিপটা নিয়েই দমদমে চলে যান প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এই ফাইলটার মধ্যে রয়েছে। জিপে বসেই পড়ে নিতে পারবেন।"

ফাইল হাতে নিয়ে খন্দকার সাহেব একটা স্যালুট দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন। আমরাও বিদায় দিয়ে একে একে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু সেদিন মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী আর প্রধান সেনাপতির মধ্যে একান্তে কি আলাপ হয়েছিল, তা আজও পর্যন্ত রহস্যের অন্তরালেই রয়ে গেল। ১৯৭৫ সালের নভেম্বর ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে নিহত হবার পর থেকে তাজউদ্দিন আহমদের ব্যক্তিগত ডায়রির আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। আর জেনারেল ওসমানী তাঁর স্মৃতিচারণ লেখা শুরু করবার পর পরই ১৯৮৪ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ইহজগত থেকে বিদায় নিলেন। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট সাংবাদিক কাজী জাওয়াদ জেনারেল ওসমানী সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে ১৯৮৪ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি সাপ্তাহিক বিচিত্রায় লিখেছেন, '১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর নিয়াজীর আত্মসমর্পণ তার কাছে হলো না কেন–এ প্রশ্ন করলে তিনি তার জবাব এড়িয়ে যেতেন। বলতেন, মুক্তিযুদ্ধের এমন অনেক ঘটনা আমি জানি যাতে অনেকেরই অসুবিধা হবে। আমি একটা বই লিখছি। তাতে সব ঘটনাই পাবেন।'

ভারতীয় সেনাধ্যক্ষ মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ প্রধান সেনাপতি ওসমানী সম্পর্কে যে মন্তব্য করছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জেনারেল সিং তার 'দি লিবারেশন অব বাংলাদেশ' পুস্তকে লিখেছেন, ওসমানী সাহেব নিশ্চিতভাবে নির্বাসিত সরকারের জন্য শক্তির স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন এবং সব সময়ই তিনি সবার সঙ্গে ন্যায় ও পরিচ্ছন্ন ব্যবহারের পরিচয় দিয়েছেন। ওসমানী সাহেব মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপন করতেন এবং সরকারি ও সামরিক আদব-কায়দা সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি যেখানেই গিয়েছেন, একটা স্বাধীন দেশের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান হিসাবে মর্যাদা ও সম্মান প্রাপ্তির দিকে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। আমার এখনও মনে আছে, একবার বিমানে চড়ে এক বিশেষ স্থানে যাওয়ার পর ওসমানী সাহেব তার বিমানের পাইলটকে এ মর্মে নির্দেশ দিলেন যে, ভারতীয় আর্মী কমান্ডার তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য তৈরি হয়ে রানওয়েতে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তার প্লেন যেন ল্যান্ড না করে। ফলে ওসমানীকে বহনকারী বিমানের পাইলট বিমান বন্দরে ওপর চক্কর দিতে থাকলো। ভারতীয় আর্মি কমান্ডারের বিমানটি প্রথমে অবতরণ করলো এবং ভারতীয় কমান্ডার বিমান থেকে নেমে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য তৈরি হলে ওসমানীর বিমান ল্যান্ড করলেন।'

'ওসমানীর দৃঢ় মনোভাব ছিল যে, তিনি স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হলেও দেশের ওপর তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। তাঁর দেশের জন্য সাহায্য প্রয়োজন– ভিক্ষা নয়। প্রাথমিক পর্যায়ে তার সৈন্যরা ব্যর্থ হয়েছে– কিন্তু পরাজিত হয়নি। যদিও তার র‍্যাংক জুনিয়র পর্যায়ে ছিল, তবুও মর্যাদা ও অন্যান্য যে কোন দিক দিয়েই তিনি ভারতীয় প্রতিপক্ষ থেকে কোন অংশেই কম ছিলেন বলে মনে করতেন না।'

বাংলাদেশের কোনো কোনো সামরিক অফিসারের মতে, ওসমানী ছিলেন বয়স্ক, গোঁড়া এবং সময়ের সঙ্গে তাল মিলাতে অক্ষম। কিন্তু কেউই তার দেশপ্রেম অথবা কর্তব্যনিষ্ঠার ব্যাপারে কোন সময়েই প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেনি। এটা খুবই কৃতিত্বের কথা যে, তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজস্ব র‍্যাঙ্কের পদোন্নতির প্রচেষ্টা করেননি। অথচ তার জায়গায় অন্য এ কেউই যে ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকতেন না।'

তবুও এটাই হচ্ছে ঐতিহাসিক সত্য যে, ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে একটা কোট ও শার্ট পরিহিত অবস্থায় গ্রুপ

ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার নির্বাসিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। আর সেখানে উপস্থিত ছিলেন কাদের সিদ্দিকী। এদিকে ১৬ই ডিসেম্বর দুপুর বারোটায় ঢাকায় পাকিস্তানি ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টারে আর এক নাটকীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। জেনারেল নিয়াজী তখন প্রাথমিক ধাক্কার পর নিজেকে সামলিয়ে উঠেছেন এবং পরিবেশকে হালকা করার জন্য সামরিক ছাউনিতে চালু কিছুটা অশ্লীল ধরনের ইয়ার্কি শুরু করেছেন। এমন সময় খবর এলো অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা বিশেষ আর্মি হেলিকপ্টারে মেজর জেনারেল জ্যাকব এসে পৌঁছাচ্ছেন। বেলা একটায় ব্রিগেডিয়ার বাকের তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে জেনারেল জ্যাকব এবং ভারতীয় সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের কর্নেল খেরাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। জ্যাকবের হাতে সেই ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণের দলিল। জেনারেল নিয়াজী এই দলিলকে 'যুদ্ধবিরতির খসড়া চুক্তি' হিসাবে উল্লেখ করলেন। জেনারেল জ্যাকব ঐতিহাসিক দলিলটি সবার সামনে ব্রিগেডিয়ার বাকেরের হাতে দিলেন। বাকের কয়েক পা এগিয়ে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর টেবিলে দলিলটা খুলে ধরলেন। একটু নজর বুলিয়েই রাও ফরমান আপত্তি উত্থাপন করে বললেন, 'ভারত ও বাংলাদেশের জয়েন্ট কমান্ডারের কাছে' কথাটা তো থাকতে পারে না? আমরা তো ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করবো।" জেনারেল জ্যাকব তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, 'দিল্লি থেকে এভাবেই এই দলিল তৈরি হয়ে এসেছে। এর কোন পরিবর্তন বা সংশোধন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।'

কাছেই দাঁড়িয়ে ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের কর্নেল খেরা বলে উঠলেন, 'এটা তো আমাদের আর বাংলাদেশের মধ্যে একটা অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা মাত্র।' এরপর জেনারেল নিয়াজী এক নজর দলিলটা দেখে কোন রকম মন্তব্য না করেই রাও ফরমানের হাতে ফিরিয়ে দিলেন। জেনারেল ফরমান তাঁর বস-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের কমান্ডারই বলতে পারবেন যে, তিনি এই দলিল মেনে নেবেন, না প্রত্যাখ্যান করবেন?' লে. জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী কোন জবাবই দিলেন না। প্রায় ১০/১৫ সেকেন্ড ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে মাথা ঝুঁকিয়ে ইশারা দিলেন। উপস্থিত সবাই বুঝতে পারলেন যে, পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে টাইগার নিয়াজী নামে যিনি পরিচিত এবং গত ৯ মাস যাবৎ যার দম্ভোক্তি বিশ্বের পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে প্রচারিত হয়েছে, সেই জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষরে সম্মত হয়েছেন।

পরবর্তীকালে ভারতীয় মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং তার 'দি লিবারেশন অব বাংলাদেশ' পুস্তকে একাত্তরের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের পরিস্থিতি বর্ণনাকালে জেনারেল নিয়াজী সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করেছেন– 'তার নিজস্ব কমান্ডের ওপর নিয়াজীর কোন কন্ট্রোল ছিল না। আত্মসমর্পণের পর তাঁর হেডকোয়ার্টার বলতে পারে নাই যে, বাংলাদেশে সে মুহূর্তে পাকিস্তানের কত সৈন্য রয়েছে এবং এদের সঠিক অবস্থান কোথায়। আত্মসমর্পণের পর অভাবনীয় পরিমাণ সমরাস্ত্র বিজয়ীদের হস্তগত হলো। তবে একটা কথা বলা যায় যে, নিয়াজীর কাছে যত সৈন্য এবং সমরাস্ত্র ছিল এবং ঢাকার এলাকা যেভাবে প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল ও বিশাল নদ-নদী দিয়ে প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত, তাতে করে নিয়াজী সাহসী হলে এই যুদ্ধকে আরও দীর্ঘস্থায়ী করতে অনায়াসে সক্ষম হতেন। এর ফলে পাকিস্তানের বিদেশী বন্ধু রাষ্ট্রগুলো নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষাকল্পে একটা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাস

করাবার সময় পেতো। সেক্ষেত্রে ভারতকেও বাধ্য হয়ে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব মানতে হতো।'

যাক যা বলছিলাম। একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর বেলা তিনটা নাগাদ ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম থেকে সস্ত্রীক হেলিকপ্টারে তেজগাঁও বিমানবন্দরে এসে হাজির হলেন। লে. জেনারেল নিয়াজী তাঁকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানিয়ে স্যালুট করার পর করমর্দন করলেন। সে এক হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য। কিছুক্ষণ পর এই জেনারেল অরোরার কাছেই নিজেকে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

এদিকে দুপুর থেকে ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকার হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা এসে ঢাকা নগরীতে প্রবেশ করতে শুরু করলো। এদের মধ্যে ২ নং সেক্টরের এ টি এম হায়দারের নেতৃত্বাধীন ক্র্যাক-প্লাটুন অন্যতম। ডেমরা থেকে মুগদাপাড়া আর কমলাপুর হয়ে এরা এসে দখল করলো ঢাকা বেতারকেন্দ্র। কিন্তু সর্বাধিক সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা এলো মীরপুর ব্রিজ দিয়ে, এরা সবাই কাদেরিয়া বাহিনীর সদস্য। ঢাকায় এক আশ্চর্য দৃশ্যের সৃষ্টি হলো। মাত্র ন'মাস আগে যে বাঙালি যুবকরা সঠিকভাবে লাঠির ব্যবহার পর্যন্ত জানতো না, তারাই এখন মুখে ফিদেল ক্যাস্ট্রোর মতো দাড়ি, পরনে সামরিক পোশাক আর হাতে স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঢাকার রাজপথ জয় বাংলা শ্লোগানে মুখরিত করছে। আনন্দের বহিঃপ্রকাশে তাঁরা নীলাকাশের দিকে অবিরাম গুলিবর্ষণ করছে।

৭০

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল। বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিনে বিশ্বের মানচিত্রে সৃষ্টি হলো, শুধুমাত্র ধর্মের বন্ধনের ভিত্তিতে প্রায় দেড় হাজার মাইলের দূরবর্তী দুটি ভৌগোলিক এলাকা নিয়ে একটা রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না। এই সত্যি প্রতিষ্ঠিত হলো যে, আধ্যাত্মিক জগতের ধর্মকে কখনই রাষ্ট্রীয় চৌহদ্দির মধ্যে আটকে রাখা কিংবা ক্ষমতাসীনদের সুবিধার জন্য রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় নয় এবং পরিণাম শুভ নয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয় এর জ্বলন্ত প্রমাণ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী বর্তমান যুগে একটা রাষ্ট্র গঠনের জন্য সবচেয়ে জরুরি উপাদানগুলো হচ্ছে– একই ভৌগোলিক এলাকা, সম-চিন্তাধারার জনগোষ্ঠী, ভাষা ও সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ইত্যাদি।

বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, ইরাক-ইরান, মিসর-লিবিয়া, পাকিস্তান-আফগানিস্তান, সিরিয়া-জর্দান সুদান কোথাও ধর্মীয় বন্ধনের নামে পারস্পরিক সংঘাত ঠেকানো যাচ্ছে না। একইভাবে একাত্তর সালেও ধর্মের জিগির তুলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াই বন্ধ করা যায়নি। ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টির মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি হলো।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর সকালের দিকে যেখানে ঢাকার পথঘাট ছিল প্রায় জনশূন্য, বেলা তিনটা নাগাদ সেখানে ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে প্রায় দশ লাখ লোকের জমায়েত হলো। সবাই পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান দেখতে উন্মুখ হয়ে রয়েছে। মাত্র ৯ মাস ৯ দিন আগে এই রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চ তার ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ১৬ই ডিসেম্বর ঠিক সেই জায়গায় পাকিস্তানি সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে। আজ সেখানে আবার জনতার ঢল নেমেছে। চারদিকে শুধু গগনবিদারী 'জয় বাংলা' শ্লোগান।

১৬ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণের পূর্ব মুহূর্তে ঢাকা নগরীর অবস্থা বর্ণনা করা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। ৯ মাসকাল যে বাঙালিরা হানাদার বাহিনীকে মদদ যুগিয়েছিল, তারা এখন প্রাণভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত। এদের মধ্যে যারা ভাগ্যবান, তারা এক বস্ত্রে শুধুমাত্র আশ্রয়ের জন্য ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে হাজির হতে লাগলো। বাকিদের অনেকেই এই ডামাডোলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। এদিকে স্বজনহারা বাঙালি পরিবারগুলোতে তখন বুকফাটা করুণ ক্রন্দন ও আর্তনাদ। রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তখন ভারতীয় সৈন্যদের প্রাণান্তকর অবস্থা। বিকেল চারটার একটু পরেই ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এসে পৌঁছালেন পাকিস্তান ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান এবং ইস্ট পাকিস্তানের আঞ্চলিক সামরিক অধিকর্তা লে. জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজীকে সঙ্গে নিয়ে। পিছনে গাড়িগুলো থেকে মিত্রবাহিনীর পক্ষে একে একে এসে নামলেন মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার, কাদেরিয়া বাহিনীর প্রধান কাদের সিদ্দিকী, ১০১ মাউনটেন ডিভিশনের প্রধান মেজর জেনারেল নাগরা, এয়ার মার্শাল দেওয়ান, ভাইস অ্যাডমিরাল কৃষ্ণা, ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জ্যাকব, ব্রিগেডিয়ার সন্ত সিং, ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার এইচএম ক্লার, ভারতীয় সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের কর্নেল খেরা প্রমুখ। অন্য গাড়িগুলোতে শান্ত্রী পরিবেষ্টিত অবস্থায় নামলেন, মেজর জোনারেল রাও ফরমান আলী, মেজর জেনারেল জমসেদ, রিয়ার অ্যাডমিরাল শরীফ, ব্রিগেডিয়ার বাকের, এয়ার কমোডোর ইমামউল হক প্রমুখ।

সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। মেজর জেনারেল গান্ধর্ব নাগরার নেতৃত্বে ভারতীয় সৈন্যদের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার মধ্যে পাকিস্তানি সৈন্যদের একটা ছোট কনটিনজেন্ট নিয়মমাফিক লে. জোনারেল জগজিং সিং অরোরাকে গার্ড অব অনার প্রদান করলো। কাছেই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে জেনারেল নিয়াজী। আর প্রায় দশ লাখ লোকের জনতা চিৎকার করছে টাইগার নিয়াজীকে তাদের হাতে ছেড়ে দেয়ার জন্য। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যরা তাঁকে কঠোর প্রহরায় রেখেছে।

বেলা সোয়া চারটা নাগাদ শিখ জেনারেল জগজিং সিং অরোরা নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাঝ দিয়ে জেনারেল নিয়াজী ও অন্যদের সঙ্গে করে জোর কদমে এগিয়ে চললেন আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের মঞ্চে। চারদিকে তুমুল হর্ষধ্বনি আর মুক্তিযোদ্ধাদের আগ্নেয়াস্ত্র থেকে নীলাকাশের দিকে অবিরাম নিক্ষিপ্ত গুলির আওয়াজ।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিকাল ঠিক ৪টা ৩১ মিনিটের সময় পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনীর পক্ষে লে. জেনারেল এ এ কে নিয়াজী মিত্র শক্তির কাছে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করলেন। প্রায় দশ লাখ লোকের এক জনতা আর শতাধিক বিদেশী সাংবাদিক এই অনুষ্ঠান অবলোকন করলেন। এরপর দু'পক্ষের সেনাপতিরা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আনুষ্ঠানিকতা পালনের জন্য জেনারেল নিয়াজী তাঁর কোমরের বেল্ট থেকে সুদৃশ্য রিভলভারটা আর ইউনিফরমের কাঁধ থেকে লে. জেনারেল ব্যাজ দুটো জগজিৎ সিং অরোরার হাতে দিয়ে কপালের সঙ্গে কপাল ঘষলেন। পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনীর বাকি সমস্ত সদস্য অস্ত্র সমর্পণ ও ব্যাজে

খোলার আনুষ্ঠানিকতা পালন করলো। ঢাকা নগরীর প্রতিটি বাড়িতে তখন গাঢ় সবুজের ওপর বাংলাদেশের ম্যাপ অংকিত রক্ত বলয়ের পতাকা উড়ছে। ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান নামে দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে পূর্বাঞ্চল এলাকার নাকমরণ হলো বাংলাদেশ। অল্পক্ষণের মধ্যে রেডিও মাইক্রোওয়েভে এই সংবাদ মুজিবনগর গিয়ে পৌঁছলে সেখানে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেলো। বিশ্বের পশ্চিমা দেশগুলোতে বিশিষ্ট সংবাদপত্রগুলো বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করলো। আর বিভিন্ন দেশের বেতার ও টেলিভিশনে অবিরামভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের কথা উচ্চারিত হলো। লন্ডনে প্রবাসী বাঙালিরা বিজয় মিছিল বের করলো। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে জেনারেল নিয়াজী ইস্টার্ন কমান্ডের দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এ সময় ডা. এ এম মালেককে গভর্নর নিয়োগ করেন। তৎ ীন পূর্ব পাকিস্তানে এরাই ছিলেন শেষ গভর্নর ও সামরিক অধিকর্তা।

এদিকে ঢাকায় যথেষ্ট সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য এসে না পৌঁছানো পর্যন্ত মিত্র বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ লে. জেনারেল অরোরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ঢাকা গ্যারিসনে সদস্যদের আত্মরক্ষার জন্য ব্যক্তিগত আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অনুমতি প্রদান করলেন। কেননা, তখন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে যে কোন সময়ে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক পরাজিত পাকিস্তানি সৈন্যদের আবাসস্থল ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট আক্রান্ত হওয়া বিচিত্র ছিল না।

১৯৭১ সালের ২২শে ডিসেম্বর তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দে ঢাকায় আগমনের পর সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেই আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সংখ্যা নিরূপণের নির্দেশ প্রদান করলো। যুদ্ধবন্দিদের এই সংখ্যা যাচাইয়ের পর সমগ্র সভ্য জগত স্তম্ভিত হয়ে পড়লো।

এদিকে বাংলাদেশে নিরাপত্তার অভাব হেতু ৯১,৫৪৯ জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিকে ভারতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এই সিদ্ধান্তে আরও বলা হয়েছিল যে, যুদ্ধাপরাধীদের ঢাকায় বিচারের সময় আবার ফেরৎ আনা হবে। নিয়তির পরিহাস এই যে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অনুষ্ঠিত হয়নি। বিশ্বের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা বিরল। প্রকাশ, পরবর্তীকালে ভারত সরকার চাপ সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়াশীল মহল এ ব্যাপারে বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত এসব যুদ্ধবন্দি ভারতের মাটি থেকেই পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এরপর থেকে পাকিস্তান সরকার আর কাশ্মীরী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কে তেমনভাবে সোচ্চার হয়নি এবং ভারতও তাদের অংশের কাশ্মীর ভূখণ্ডকে ভারতীয় সংবিধানের আওতায় অন্যান্য অঙ্গ রাজ্যগুলো সমমর্যাদায় পরিণত করেছে। তাহলে এটা কি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সিমলা চুক্তির অলিখিত সমঝোতা ছিল? সুদীর্ঘ বারো বছর পরে ঐতিহাসিকরা এ ব্যাপারে গবেষণা করে আলোকপাত করবেন বলে এ প্রসঙ্গটা উত্থাপন করলাম।

যা হোক, ১৬ই ডিসেম্বরে পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণের পর ভারতীয় বাহিনীর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে এখানকার অবাঙালি সম্প্রদায়কে রক্ষা করা।

একাত্তরের ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে এসব যুদ্ধবন্দিদের ভারতে পাঠানো শুরু হয় এবং বাহাত্তরের জানুয়ারি মাসের শেষ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।

১৯৭১ সালের ২০শে ডিসেম্বর পরাজিত পাকিস্তানি সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী, মেজর জেনারেল জমসেদ, রিয়ার অ্যাডমিরাল শরীফ, এয়ার কমোডোর ইমাম-উল হক প্রমুখকে হেলিকপ্টারযোগে কোলকাতায় নিয়ে ঐতিহাসিক ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে রাখা হয়।

পরবর্তীকালে কোলকাতায় এই ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে কথোপকথনকালে জেনারেল নিয়াজী চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছেন।

প্রশ্ন : ৩রা ডিসেম্বর আপনি যখন বুঝতে পারলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অতিরিক্ত আর কোন সৈন্য আসবে না তখন নিজস্ব সম্পদ থেকে আপনি কেনো ঢাকার প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করলেন না?

নিয়াজী : সবগুলো সেক্টরে একই সঙ্গে যুদ্ধের চাপ এসে পড়েছিল। তাই কোন সেক্টর থেকে সৈন্য প্রত্যাহার সম্ভব ছিল না।

প্রশ্ন : ঢাকায় আপনার কাছে যেটুকু শক্তি ছিল, তা দিয়েও কি আপনি যুদ্ধকে আরও দিন কয়েকের জন্য দীর্ঘায়িত করতে পারতেন না?

নিয়াজী : কেনো তা করতে যাবো? সেক্ষেত্রে ঢাকার নর্দমাগুলো মৃতদেহে ভরে উঠতো আর রাস্তায় লাশের পাহাড় হতো। ঢাকার নাগরিক জীবনের মারাত্মক অবনতি হতো এবং মহামারী আকারে রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়তো। অথচ যুদ্ধের ফলাফল একই হতো। আমি পশ্চিম পাকিস্তানে এই ৯০,০০০ যুদ্ধবন্দি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া শ্রেয় মনে করেছি। না হলে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে গিয়ে আমাদের ৯০,০০০ বিধবা মহিলা আর লাখ পাঁচেক এতিম বাচ্চাকে মোকাবেলা করতে হবে। আমার কাছে যুদ্ধে এভাবে আত্মাহুতি মূল্যহীন মনে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের ফলাফল তো একই হতো।

প্রশ্ন : শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে গেলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইতিহাস তো গৌরবোজ্জ্বল হতো। যুদ্ধের ইতিহাসে এই বীরত্বগাথা উৎসাহব্যঞ্জক নতুন অধ্যায় হিসাবে সংযোজিত হতো।

লে. জনারেল নিয়াজী এ প্রশ্নের আর কোন জবাব দেননি।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবের জবানবন্দি

স্কুল জীবন থেকেই আমি পাকিস্তান অর্জনের জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছি। উপমহাদেশে প্রাক স্বাধীনতা যুগ (১৯৪৭ সালের পূর্বে) আমি মুসলিম লীগের সদস্য ছিলাম এবং আমার পড়াশোনার ক্ষতি করেও আমি পাকিস্তান কায়েমের লক্ষ্যে সক্রিয় ছিলাম।

স্বাধীনতা (১৯৪৭ সাল) লাভের পর পাকিস্তানে মুসলিম লীঘ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করায় আমরা জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ সংগঠিত করি।

১৯৫৪ সালে আমি প্রাদেশিক পরিষদে সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হই। পরে আমি জাতীয় পরিষদেও নির্বাচিত হই। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের আমি দু'বার মন্ত্রী ছিলাম। আমি গণপ্রজাতন্ত্রী চীনেও একটি পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলাম। গণমানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে সংবিধানসম্মত একটি বিরোধী দল গঠনের জন্য আমি ইতিমধ্যেই কয়েক বছর কারাজীবন যাপন করেছি।

সামরিক শাসন জারি হবার পর বর্তমান সরকার আমার প্রতি নিপীড়ন শুরু করে। এরা আমাকে পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে ১৯৫৮ সালের ১২ই অক্টোবর আটক করে বিনা বিচারে প্রায় দেড় বছর কারান্তরালে রেখেছিল। আমি যখন এভাবে আটক ছিলাম তখন এরা আমার বিরুদ্ধে অর্ধ ডজনের মতো ফৌজদারি মামলা দায়ের করে। কিন্তু আমি সম্মানের সঙ্গে প্রতিটি মামলা থেকে বেকসুর খালাস লাভ করি। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে আমি কারাগার থেকে মুক্ত হই।

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার সময় আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে নোটিশ জারি করা হয়। অর্থাৎ আমাকে ঢাকার বাইরে যেতে হলে প্রস্তাবিত গন্তব্যস্থল সম্পর্কে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে (পুলিশ বিভাগের) লিখিতভাবে জানাতে হতো এবং ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের পরও লিখিতভাবে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে অবহিত করতে হতো। গোয়েন্দা বিভাগের লোক আমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতো।

আবার ১৯৬২ সালে বর্তমান সংবিধান চালু করার সময় যখন আমার নেতা মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয় তখন আমাকেও জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে প্রায় ছ'মাসের মতো বিনা বিচারে আটক রাখা হয়।

সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে পাকিস্তানের উভয় অংশে আওয়ামী লীগ পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং আমরা সম্মিলিত বিরোধী পার্টির অংগদল হিসাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। জনাব আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে বিরোধীদলীয় প্রার্থী হিসাবে মিস ফাতেমা জিন্নাহকে মনোনীত করা হলে আমরা তাঁর সমর্থনে নির্বাচনী অভিযান শুরু করি। ক্ষমতাসীন সরকার আমার বিরুদ্ধে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং আমাকে হয়রানির জন্য বেশ ক'টা মামলা দায়ের করে।

১৯৬৫ সালে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে অন্যতম রাজনৈতিক নেতা হিসাবে আমি ভারতীয় আগ্রাসনের নিন্দা জ্ঞাপন পরি এবং পার্টি ও সমর্থকদের সরকারের যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যবস্থাদির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপনের আহ্বান জানাই। আমার প্রতিষ্ঠান পূর্ব

পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পার্টি ও প্রতিটি ইউনিটের নিকট প্রেরিত সার্কুলারে সরকারের যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রস্তুতির প্রতি সম্ভাব্য উপায়ে আবেদন করে।

যুদ্ধ চলাকালীন পূর্ব পাকিস্তান গভর্নর ভবনে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় বৈঠকে আমি অন্যান্য রাজনৈতি ক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একটি যুক্ত বিবৃতি মারফত ভারতীয় আগ্রাসনের নিন্দা জ্ঞাপন করি এবং জনগণকে দেশের যুদ্ধ প্রস্তুতির ব্যবস্থাদির ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানাই। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যখন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন তখন আমন্ত্রিত হয়ে আমি ও অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ত র সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হই এবং পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন দেয়ার আবেদন জানাই। যুদ্ধের সময় পশ্চিম পাকিস্তান এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকার অভিজ্ঞতার আলোকে পূর্ব পাকিস্তানকে দেশ রক্ষার দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার বক্তব্য আমরা উপস্থাপিত করি।

আমি তাসখন্দ ঘোষণার প্রতি সমর্থন করি। কেননা, আমি এবং আমার জনগণ এ মর্মে বিশ্বাস করি যে, আন্তর্জাতিক সমস্ত বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান করা সম্ভব। প্রগতির লক্ষ্যে বিশ্বশান্তির নীতিতে আমরা আস্থাশীল।

১৯৬৬ সালের প্রথমার্ধে লাহোরে সর্বদলীয় কনভেনশন আয়োজিত হলে আমি বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে ৬-দফা দাবি পেশ করি। আমাদের বক্তব্য ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের (তথা পশ্চিম পাকিস্তানের) সমস্যাবলীর সাংবিধানিক সমাধানের ভিত্তিমূলক হচ্ছে এই ৬-দফা প্রোগ্রাম। এই ৬-দফা প্রস্তাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের শর্তাদি বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর আমার পার্টি পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ এই ৬-দফা দাবি গ্রহণ করে এবং দেশের উভয় অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিরাজমান অসমতা দূর করার লক্ষ্যে ৬-দফার প্রতি জনমত গড়ে তোলার জন্য আমরা জনসভার আয়োজন করি।

ঠিক এই সময় সরকারি প্রশাসন এবং প্রেসিডেন্টসহ সরকারদলীয় নেতৃবৃন্দ আমাকে অস্ত্রের ভাষা ও 'গৃহযুদ্ধ' ইত্যাদির কথা বলে ভীতি প্রদর্শন করে এবং এক ডজনের বেশি মামলা দায়ের করে আমাকে হয়রানি শুরু করে। খুলনায় একটা জনসভা করে যখন আমি যশোর হয়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করছিলাম, তখন যশোরে ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে আমাকে প্রথম গ্রেফতার করে। যশোরে আমাকে যাত্রাপথে বাধা দিয়ে একটি কথিত 'ক্ষতিকর' বক্তৃতার অজুহাতে ঢাকা থেকে জারিকৃত ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে এই গ্রেফতার করা হয়।

আমাকে যশোরে মহকুমা হাকিমের কোর্টে হাজির করা হলে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর হয়। ঢাকায় ফিরে এসে আমি ঢাকা সদর মহকুমা হাকিমের কাছে উপস্থিত হলে তিনি জামিন না-মঞ্জুর করেন। কিন্তু ঢাকার সেশন জজ আমাকে জামিন দিলে সেদিনই আমি মুক্তিলাভ করি। সন্ধ্যা ৭টার দিকে আমি বাসায় পৌঁছি। সিলেটে কথিত 'ক্ষতিকর' বক্তৃতার অভিযোগে সিলেট থেকে জারিকৃত গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে পুলিশ সে রাতেই ৮টা নাগাদ আমার বাসায় হাজির হয়।

আমাকে গ্রেফতার করে পুলিশ প্রহরাধীনে সে রাতেই সিলেট নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন সকালে সিলেটের মহকুমা হাকিম আমার জামিন না-মঞ্জুর করে আমাকে জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়। পরদিন সিলেটের দায়রা জজ আমাকে জামিনে খালাস প্রদান করেন। আমি মুক্তিলাভ করলে ময়মনসিংহের এক জনসভায় কথিত 'ক্ষতিকর'

বক্তৃতার অজুহাতে ময়মনসিংহ থেকে জারিকৃত গ্রেফতারি পরোয়ানার ভিত্তিতে পুলিশ জেলগেটে আবার আমাকে আটক করে। সে রাতেই আমাকে পুলিশ প্রহরাধীনে সিলেট থেকে ময়মনসিংহে নিয়ে যাওয়া হয়। আমাকে ময়মনসিংহের মহকুমা হাকিমের এজলাসে হাজির করা হলে একইভাবে জামিন না-মঞ্জুর করে জেলে পাঠানো হয়। পরদিন ময়মনসিংহের সেশন জজ আমাকে জামিন প্রদান করেন এবং আমি ঢাকায় ফিরে আসি। এসব এপ্রিল মাসের কথা।

১৯৬৬ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে সম্ভবত ৮ই মে তারিখে আমি নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় ভাষণদান করে রাতে ঢাকায় নিজের বাসায় ফিরে আসি। পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের ৩২ নং রুল মোতাবেক পুলিশ আমাকে রাত একটা নাগাদ আমার বাসা থেকে গ্রেফতার করে। এর পরেই আমার পার্টির বহু নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অন্যতম সহ-সভাপতি খন্দকার মোশতাক আহমেদ, প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মুজিবুর রহমান, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আজিজ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী অন্যতম।

দিন কয়েক পরেই পাকিস্তান দেশরক্ষা রুলসের ২৩ নং ধরা মোতাবেক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এমএনএ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক জনাব এ মোমেন, সমাজসেবা সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শামসুল হক, ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব হাফেজ মোহাম্মদ মুসা, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট মোল্লা জালালউদ্দীন আহমেদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এবং প্রাক্তন এমএনএএম মনসুর আলী, প্রাক্তন এমএনএ জনাব আমজাদ হোসেন, অ্যাডভোকেট আমিন উদ্দীন আহমদ, পাবনার অ্যাডভোকেট আমজাদ হোসেন, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মোস্তফা সারোয়ার, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক অ্যাডভোকেট মোহাম্মদউল্লাহ, অ্যাডভোকেট শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শাহাবুদ্দীন চৌধুরী, ঢাকা সদর-উত্তর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল হাকিম, ধানমণ্ডি আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব রাশেদ মোশাররফ, ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক জনাব সুলতান আহমদ, আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব নূরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব আব্দুল মান্নান, পাবনার অ্যাডভোকেট হাসনাইন এবং ময়মনসিংহ আওয়ামী লীগের বহু কর্মীসহ ছাত্র ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। আমার দু'জন ভাগিনা, একজন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মনি এবং আরেকজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শহীদুল ইসলামকেও আটক করা হয়।

এছাড়া বর্তমান শাসকচক্র পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক ইত্তেফাককে বেআইনি ঘোষণা করে। এর পিছনে একটা মাত্র কারণ হচ্ছে, সময় সময় ইত্তেফাক আমার পার্টির নীতি সমর্থন করেছে। সরকার এই পত্রিকার প্রেস বাজেয়াপ্ত করেছে ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে দীর্ঘদিন কারাগারে আটক রাখা ছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে বেশ কিছুসংখ্যক ফৌজদারি মামলা

দায়ের করেছে। এদিকে চট্টগ্রাম মুসলিম চেম্বার অব কমার্সের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্ট-এর প্রাক্তন সহ-সভাপতি এবং আওয়ামী লীগ নেতা জনাব ইদ্রিসকে পাকিস্তান দেশরক্ষা রুলস্-এ আটক করে কারাগারে অন্ধকার সেলে রাখা হয়েছে।

এসব গ্রেফতারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য আমার পার্টি ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন সাধারণ হরতাল আহ্বান করে। সমগ্র প্রদেশে এই প্রতিবাদ ধর্মঘটের জন্য ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলিতে ১১ ব্যক্তি নিহত হয় ও প্রায় ৮০০ জন কর্মীকে গ্রেফতার করা হয় এবং অসংখ্য কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জনাব মোনেম খান অফিসার এবং অন্যান্যদের সামনে প্রায় প্রকাশ্যেই বলেছেন যে, যতদিন পর্যন্ত তিনি (জনাব মোনেম খান) গভর্নর রয়েছেন ততদিন পর্যন্ত 'শেখ মুজিবুর রহমানকে জেলে থাকতে হবে।' এটা অনেকেরই জানা রয়েছে।

আমাকে আটক রাখার পর থেকেই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে অস্থায়ী কোর্ট বাসিয়ে আমার বিরুদ্ধে অনেক ক'টা দায়েরকৃত মামলার বিচার হয়েছে। প্রায় ২১ মাস কারাগারে আটক থাকার পর ১৯৬৮ সালের ১৮ই জানুয়ারি রাত ১টার সময় আমাকে মুক্তি দেয়া হয় এবং সামরিক বাহিনীর কয়েকজন লোক আমাকে জোর করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে এসে নির্জন কক্ষে আটক রাখে এবং আমাকে কারো সঙ্গে যোগাযোগ পর্যন্ত করতে দেয়নি। আমাকে কোন খবরের কাগজ পড়তে দেয়া হয়নি। বাস্তবক্ষেত্রে সুদীর্ঘ ৯ মাসকাল বাইরের গজৎ থেকে আমি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলাম। এই সময় আমাকে অমানুষিক মানষিক যন্ত্রণা দেয়া হয়েছে এবং সামান্যতম সুযোগ-সুবিধা থেকে আমাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আমার মানসিক যন্ত্রণা সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভাল।

আমার বর্তমান বিচার শুরু হওয়ার মাত্র একদিন আগে ১৯৬৮ সালের ১৮ই জুন তারিখে সর্বপ্রথম আমার পচিরিত অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম খানের সাক্ষাৎ লাভ করি এবং তাঁকে আমার অন্যতম আইনজীবী হিসাবে নিয়োগ করি। শুধুমাত্র আমাকে ও আমার পার্টিকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন এবং নিপীড়ন ও অপমানিত করার উদ্দেশ্যেই মিথ্যাভাবে আমাকে এই তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত করা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দমন এবং অধিকার আদায়ে বাধা সৃষ্টি করা।

এই কোর্টে হাজির হওয়ার আগে আমি কোন দিনই লে. কর্নেল মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রাক্তন কর্পোরাল আমিন হোসেন, এল এস সুলতাউদ্দীন আহমদ, কামালউদ্দীন আহমদ, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহবুবুল্লাহ এবং এই মামলায় জড়িত নৌ, বিমান ও সামরিক বাহিনীর কোন কর্মচারীকে দেখিনি। আমি তিনজন সিএসপি অফিসার– জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস এবং খান মোহাম্মদ শামসুর রহমানকে চিনি। মন্ত্রী হিসাবে সরকারি দায়িত্ব পালনের সময় এঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তখন এঁরা পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন পদে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু আমি কখনই এঁদের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করিনি কিংবা কোন ষড়যন্ত্রে জড়িত হয়নি। আমি করাচিতে কোন সময়েই লে. কর্নেল মোয়াজ্জেম হোসেন কিংবা জনাব কামালউদ্দীনের বাসায় যাইনি। অথবা লে. কর্নেল মোয়াজ্জেম হোসেন কিংবা জনাব কামালউদ্দীনের করাচির বাসায় আমার সঙ্গে এঁদের কোন বৈঠক হয়নি। আমার কিংবা জনাব তাজউদ্দিনের বাসায় কোন সময়েই এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কোন আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি। ওইসব লোক কোন সময়েই আমার বাসায় আসেনি এবং তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত কাউকে আমি কোন টাকা-পয়সা দেইনি। আমি কখনই ডা. সাইদুর রহমান অথবা মানিক

চৌধুরীকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রে সহযোগিতা প্রদানের কথা বলিনি। এঁরা চট্টগ্রামে আমার হাজার হাজার কর্মীর অন্যতম। আমার দলের তিনজন সহ-সভাপতি, ৪৪ জন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, একজন সাধারণ সম্পাদক এবং আটজন সম্পাদক রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এসব কর্মকর্তার অনেকেই প্রাক্তন মন্ত্রী এবং এমএনএ ও এমপিএ। বর্তমানে জাতীয় সংসদের পাঁচজন এবং প্রাদেশিক পরিষদে দশজন আমার দলীয় সদস্য রয়েছেন। চট্টগ্রামে আমার পার্টির জেলা ও নগর কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকদের অনেকেই প্রাক্তন এমএনএ ও এমপি এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও সংগতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। আমি কোন সময়েই এঁদের কাছ থেকে কোন সাহায্য চাইনি। তাই এটা আশ্চর্যজনক যে, আমি মানিক চৌধুরীর মতো একজন সাধারণ ব্যবসায়ী এবং সাইদুর রহমানের মতো একজন সাধারণ এলএমএফ ডাক্তারের কাছ থেকে সাহায্য চাইবো। বাস্তব ঘটনা হচ্ছে যে, ১৯৬৫ সালে জাতীয় সংসদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নমিনি জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীর বিরোধিতা করার জন্য ডা. সাইদুর রহমানকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়। আমি কোন সময়েই ডা. সাইদুর রহমানের বাসায় যায়নি।

আমি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। এই পার্টি সংবিধানসম্মত একটা রাজনৈতিক দল এবং দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ' লক্ষ্যে এই পার্টির সুনির্দিষ্ট ও গঠনমূলক ম্যানিফেস্টো ও প্রোগ্রাম রয়েছে। আমি ৬-দফা প্রোগ্রামের মাধ্যমে দেশের উভয় অংশের ন্যায়বিচার দাবি করেছি। আমি দেশের জন্য যা কিছু শুভ মনে করেছি তাই-ই সংবিধানের আওতায় দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকাশ করেছি। তবুও ক্ষমতাসীন চক্র এবং স্বার্থান্বেষী মহল পাকিস্তানের বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণের ওপর শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য আমাকে এবং আমার পার্টিকে দাবিয়ে রেখেছে আর আমাকে নিপীড়নের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

আমার বক্তব্যের সমর্থনে আমি মাননীয় ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে বলতে চাই যে, আমার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমাকে এই মিথ্যা মামলায় জড়িত করা হয়েছে। পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংবাদপত্রে ১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারি জারিকৃত বিবৃতিতে দেখা যায়, অভিযুক্ত হিসাবে ১৮ ব্যক্তির তালিকা রয়েছে এবং আমার নাম সেই তালিকায় নাই। উক্ত বিবৃতিতে এ মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অভিযুক্ত সবাই অপরাধ স্বীকার করেছে আর তদন্তকার্য প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে এবং শীঘ্রি এই মামলা বিচারের জন্য কোর্টে দাখিল করা হবে।

একজন প্রাক্তন মন্ত্রী হিসাবে অভিজ্ঞতার আলোকে আমি মন্তব্য করতে চাই যে, সরকারের কোন মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত সম্পন্ন এবং সমস্ত নথিপত্রের অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত কোন বিবৃতি প্রকাশিত হতে পারে না। উপরন্তু এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কিত বিবৃতি নিশ্চিতভাবে প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রেসিডেন্টের পূর্বাহ্নে অনুমোদন গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

এর আগে যেসব নিপীড়ন ও অত্যাচারের উল্লেখ করেছি এই মামলা হচ্ছে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর একটা চক্রান্ত। স্বার্থান্বেষী মহলের শোষণ অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে বর্তমান শাসকচক্র এই ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে। বিমান, নৌ অথবা সেনাবাহিনীর কোন অফিসারের যোগসাজশে যে কোন ধরনের ষড়যন্ত্রে আমি নিজেকে যুক্ত করিনি কিংবা আমি এ ধরনের কোন কাজ করিনি।

আমি নিজেকে নির্দোষ ঘোষণা করছি এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই যে. এই কথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

'লেখক, কবি, সাহিত্যিক এবং নাট্যকারদের লেখনীতে প্রতিধ্বনিত হোক কৃষক ও শ্রমিকের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি'

যদিও আমার পার্টি জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে এবং জনগণের রায় আমাদের পক্ষে রয়েছে, তবুও আমার পার্টি ক্ষমতা পাবে কিনা এ ব্যাপারে আমাদের এখনও সন্দেহ রয়েছে।

আমরা যখন সর্বপ্রথম বাংলাকে দেশের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার দাবি উত্থাপন করেছিলাম, তখনকার ক্ষমতাসীন সরকার পূর্ব বাংলার জনসাধারণের বিরুদ্ধে এ মর্মে কুৎসা রটনা করেছিল যে, এঁরা হচ্ছে হিন্দুদের দালাল এবং পশ্চিম বাংলার এজেন্ট। পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠী বাংলার সঙ্গে উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণের দাবির মাধ্যমে নিজেদের হৃদয়ের বিশালতা প্রকাশ করেছিল।

গত ২৩ বছর যাবৎ শাসকগোষ্ঠী ক্রমাগতভাবে বাংলাদেশের জনগণের ভাষা ও কৃষ্টির ওপর হামলা অব্যাহত রেখেছে। কেবলমাত্র আমাদের যুব সমাজ এইসব হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। আমি জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিবর্গকে জিজ্ঞাসা করতে পারি যে, আপনারা এতদিন পর্যন্ত কি করছিলেন? যারা শাসকচক্রের সঙ্গে আঁতাত ও সহযোগিতা করেছিলেন, তাঁরা এখন এসে [illegible] কাতারে দাঁড়িয়েও ক্ষমা পাবেন না।

আইয়ুব-মোমেন শাসনের আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর শিক্ষকদের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করছি। এসব শিক্ষক নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে মোনেম খাঁর সৃষ্ট ভয়াবহ ত্রাসের বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রতিবাদ করেননি। সামান্য কয়েকজন সাহস দেখিয়ে মোনেম রাজত্বের সমালোচনা করেছিল, হয় তারা অপমাণিত হয়েছেন, না-হয় বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করার জন্য বাধ্য হয়েছেন। যদি সেদিন শিক্ষকরা তাদের ভূমিকার প্রতি যত্নবান হতেন, তাহলে দেশে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারতো না।

কোন রকম ভয়-ভীতি ছাড়াই লেখক, কবি, সাহিত্যিক এবং নাট্যকারদের আমি লেখার আহ্বান জানাচ্ছি। আপনাদের লেখনীতে প্রতিধ্বনিত হোক কৃষক ও শ্রমিকের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি।

আমরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাস করি। পরিশেষে বলতে চাই, আমরা যদি দাবির বাস্তবায়ন করতে না পারি তাহলে আমরা ক্ষমতায় থাকবো না।

[১৯৭১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে বাংলা একাডেমী সপ্তাহকালের জন্য শহীদ স্মৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। একাডেমী ডিরেক্টর অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার অংশবিশেষের উদ্ধৃতি।]

‘১৯৫২-র আন্দোলন ছিল অধিকার প্রতিষ্ঠার’

... ... ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ যখন করাচীতে গণপরিষদে এ মর্মে প্রস্তাব পাস করা হলো যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, তখন থেকেই বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে সূত্রপাত। তখন কুমিল্লার একমাত্র মি. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। আমি অবাক হয়ে যাই, এ সময় আমাদের বাঙালি মুসলিম নেতৃবৃন্দ কি করছিলেন?

১৯৫২ সালের আন্দোলন কেবলমাত্র ভাষা আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, এ আন্দোলন ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন...।

... ...আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথেষ্ট রক্ত দিয়েছি। আর আমরা কেবলমাত্র শহীদ হবার জন্য জীবন উৎসর্গ করবো না– এবার আমরা ‘গাজী’ (বিজয়ী) হবো। সাত কোটি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য আমি ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য আন্দোলনের শহীদানদের নামে শপথ করছি যে, আমি নিজের শরীরের শেষ রক্তবিন্দু উৎসর্গ করবো।

বাংলাদেশের জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্তের মোকাবেলায় আপনারা যাতে কাপুরুষ না হয়ে পড়েন, এজন্য শহীদদের আত্মা ভিক্ষা চাইছে, আপনারা সাহসী হোন। ভাষা আন্দোলনের সময় যেসব ষড়যন্ত্রকারী হত্যার জন্য দায়ী ছিলেন, তারা আজও পর্যন্ত সক্রিয় রয়েছেন। অতীতে ষড়যন্ত্র রয়েছে এবং এখনও তা অব্যাহত রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও ষড়যন্ত্র হবে। ষড়যন্ত্রকারীদের একথা উপলব্ধি করা দরকার যে, ১৯৫২ সালের বাংলাদেশ ও ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ হয়ে গেছে...।

বাঙালিরা এখনও শহীদ হচ্ছে, তবে সব সময়ে বন্দুকের গুলিতে নয়। বাঙালিরা অনাহারে মারা যাচ্ছে। আমরা কারো প্রতি অন্যায় করতে চাই না। কিন্তু একই সঙ্গে আমরা আর আমাদের ওপর শোষণ বরদাশত করবো না। যদি আমাদের অধিকার আদায়ের সময় শাসকগোষ্ঠীর বাধার সৃষ্টি করে তাহলে আমরা তা প্রতিহত করবো...।

আমি সামনে ভয়ঙ্কর দিন দেখতে পাচ্ছি। আমি সব সময় আপনাদের সঙ্গে নাও থাকতে পারি। মরণের জন্যই মানুষ বেঁচে থাকে। জীবনে বেঁচে থাকাটাই একটা দুর্ঘটনা মাত্র। আমি জানি না আবার কখন আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে। কিন্তু আপনাদের কাছে আমার দাবি রইলো, বাংলাদেশের জনসাধারণ যেন তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তা আপনারা নিশ্চিত করবেন। শহীদদের রক্ত যেন বৃথা না যায়।

শহীদ স্মৃতি অমর হোক। জয় বাংলা।

[১৯৭১ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিটে শহীদ মিনারের পাদদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার অংশবিশেষের উদ্ধৃতি]

সত্তরের নির্বাচনী ফলাফল

রাজনৈতিক দলের নাম	বিজয় আসন সংখ্যা	উপজাতীয় এলাকা	মহিলা সদস্য	মোট সংখ্যা
আওয়ামী লীগ	১৬০	–	৭	১৬৭
পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি	৮৩	–	৫	৮৮
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	৯	–	–	৯
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	৭	–	–	৭
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	২	–	–	২
ন্যাপ (ওয়ালী)	৬	–	১	৭
জামাত-ই-ইসলাম	৪	–	–	৪
জমিয়তে ওলেমা	৭	–	–	৭
জমিয়তে ওলেমা (থানভী)	৭	–	–	৭
পিডিপি	১	–	-	১
স্বতন্ত্র	৭	৭	–	১৪

পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে সত্তরের নির্বাচনী ফলাফল

রাজনৈতিক দলের নাম	সাধারণ আসন	পরোক্ষ ভোটে মহিলা সদস্য	মোট সংখ্যা
আওয়ামী লীগ	২৮৮	১০	২৯৮
পিডিপি	২	–	২
ন্যাপ (ওয়ালী)	১	–	১
জামায়াত-ই-ইসলামী	১	–	১
নেজামে ইসলাম	১	–	১
পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি	–	–	–
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	–	–	–
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	–	–	–
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	–	–	–
কৃষক শ্রমিক পার্টি	–	–	–
স্বতন্ত্র	৭	–	৭

মোট = ৩১০

২৫শে মার্চ বাঙালি হত্যার নীল নক্‌শা

অপারেশন সার্চলাইট

(২৫শে মার্চ দিবাগত রাতে কার্যকরী)

ভিত্তি ও পরিকল্পনা

১. আওয়ামী লীগের সমস্ত কার্যকলাপ বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ হিসাবে বিবেচিত হবে। যারা আওয়ামী লীগের কার্যকলাপ সমর্থন করে এবং সামরিক আইন মোতাবেক গৃহীত ব্যবস্থার বিরোধী, তাদের বিদ্রোহী হিসাবে গণ্য করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. যেহেতু সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে পূর্ব পাকিস্তানিদের মধ্যে ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন স্তরে আওয়ামী লীগের ব্যাপক সমর্থন রয়েছে, সেইহেতু ও অপারেশনের সময় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এই অপারেশন আকস্মিক ও ঝটিকাময় এবং দ্রুততার সঙ্গে ত্বরিত হামলার মাধ্যমে করতে হবে।

সাফল্যের জন্য প্রয়োজন

৩. এই অপারেশন একযোগে সমগ্র প্রদেশব্যাপী করতে হবে।

৪. সর্বাধিক সংখ্যক রাজনীতিবিদ ও ছাত্রনেতা এবং শিক্ষক সম্প্রদায় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের চরমপন্থী মনোভাবাপন্নকে গ্রেফতার করতে হবে।

৫. ঢাকায় এই অপারেশনের শতকরা 'একশ' ভাগ সাফল্য অর্জন করতে হবে। এই লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দখল এবং ব্যাপক তল্লাশি চালাতে হবে।

৬. ক্যান্টমেন্ট এলাকায় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণকারীদের ওপর সঙ্গে সঙ্গে বেপরোয়াভাবে গুলি করতে হবে।

৭. অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, বেতার, টিভি, টেলিপ্রিন্টার সার্ভিস এবং বৈদেশিক দূতাবাসের সমস্ত ট্রান্সমিটার বন্ধ করতে হবে।

৮. পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা সমস্ত প্রহরা ও সমরাস্ত্র ডিপোর দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং সামরিক বাহিনীর সকল পূর্ব পাকিস্তানি সৈন্যদের নিরস্ত্র করতে হবে। পাকিস্তান বিমানবাহিনী এবং পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসে একই নির্দেশ পালিত হবে।

হতবাক করা ও প্রতারণার পদ্ধতি

৯. সর্বোচ্চ পর্যায়ে, সংলাপ (রাজনৈতিক কথাবার্তা) অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করা হচ্ছে। পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মুজিবকে ধোঁকা দিতে হবে। তাঁকে আশ্বাস দিতে হবে যে, জনাব ভুট্টো একমত না হলেও আওয়ামী লীগের দাবি-দাওয়া মেনে নিয়ে প্রেসিডেন্ট ২৫শে মার্চ একটা ঘোষণা দিবেন।

১০. কৌশলগত পর্যায়

ক যেহেতু গোপনীয়তা রক্ষা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেজন্য নিচে বর্ণিত দায়িত্বগুলো রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত সৈন্যদের দিয়ে করতে হবে :

১. দরজা ভেঙ্গে মুজিবের বাড়িতে প্রবেশ করে উপস্থিত সবাইকে গ্রেফতার করা। এই বাড়িটা সুরক্ষিত এবং প্রহরী বেষ্টিত রয়েছে।

২. বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলো ঘেরাও করা– ইকবাল হল [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়] লিয়াকত হল [কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়]

৩. টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বন্ধ করা।

৪. যেসব বাড়িতে অস্ত্রপাতি সংগৃহীত হয়েছে, সেসব বাড়িগুলোকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা।

খ. টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বন্ধ না করা পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় সৈন্য যাতায়াত এবং কর্মকাণ্ড শুরু হবে না।

গ. অপারেশনের রাতে ২২০০ ঘন্টার (রাত ১০টা) পর কাউকে ক্যান্টেনমেন্ট এলাকা থেকে বেরুতে দেয়া হবে না।

ঘ. যে কোন অজুহাত তৈরি করে প্রেসিডেন্ট ভবন, গভর্নর হাউস, এমএনএ হোস্টেল, বেতার, টেলিভিশন এবং টেলিফোন এলাকায় সৈন্য মোতায়েন বাড়াতে হবে।

ঙ. মুজিবের বাড়িতে 'অ্যাকশন' করার সময় বেসরকারি গাড়ি ব্যবহার করা যেতে পারে।

অ্যাকশনের পদ্ধতি

১১. ক 'এইচ আওয়ার' – রাত একটা

খ অ্যাকশনের জন্য নির্ধারিত সময় :

১. কমান্ডো (এক প্লাটুন) -মুজিবের বাড়িতে – রাত ১টা

২. টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সুইচ বন্ধ – রাত ১২টা ৫৫ মিনিট

৩. সৈন্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ঘেরাও – রাত ১টা ৫ মিনিট

৪. রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টার এবং নিকটবর্তী অন্যান্য থানায় সৈন্য প্রেরণ – রাত ১টা ৫ মিনিট

৫. নিচের বাড়িগুলো ঘেরাও ধানমণ্ডির ২৯ নম্বর রোডের মিসেস আনোয়ারা বেগমের বাড়ি – রাত ১টা ৫ মিনিট

৬. কারফিউ জারি– রাত ১১টায় সাইরেনের আওয়াজ এবং লাউড স্পিকারের ঘোষণার মাধ্যমে করতে হবে। প্রাথমিকভাবে ৩০ মিনিটের জন্য। এ সময় কোন কারফিউ পাস ইস্যু করা হবে না। ডেলিভারি কেস এবং গুরুতর ধরনের হার্টের রুগীদের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হবে। প্রয়োজনীয় অনুরোধের ভিত্তিতে সামরিক তত্ত্বাবধানে এসব রুগীকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা যাবে। ঘোষণায় বলা হবে যে, পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হবে না।

৭. নির্দিষ্ট মিশনে সৈন্যদের পাঠানো হবে (ছাত্রাবাস দখল তল্লাশি করতে হবে) – রাত ১১টায়

৮. বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সৈন্য প্রেরণ – সকাল ৫টায়

৯. রাস্তা ও নদীপথে তল্লাশি ঘাঁটি স্থাপন – রাত ২ টায়

গ. দিনের বেলায় অপারেশনের সময়সূচি

১. ধানমণ্ডিতে অবস্থিত সন্দেহজনক বাড়িতে বাড়িতে তল্লাশি করতে হবে। পুরনো শহরের হিন্দুদের বাড়িতেও তল্লাশি চালাতে হবে। (গোয়েন্দা বিভাগ বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করবে)

২. সমস্ত ছাপাখানা বন্ধ করে দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সমস্ত 'সাইক্লোস্টাইল মেশিন বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

৩. কড়া ধরনের কারফিউ জারি করতে হবে।

৪. রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করতে হবে।

১২. সৈন্য বাহিনীর দায়িত্ব : স্ব স্ব ব্রিগেড কমান্ডাররা বিস্তারিত প্ল্যানিং করবেন। কিন্তু নিচের বিষয়গুলো অবশ্য করণীয় :

ক. সিগন্যালস এবং অন্যান্য প্রশাসনিক বিভাগসহ সমস্ত ইউনিটে চাকরিরত পূর্ব পাকিস্তানি সৈন্যদের নিরস্ত্র করতে হবে। কেবলমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে অস্ত্র দিতে হতে।

বিশ্লেষণ : আমরা পূর্ব পাকিস্তানি সৈন্যদের বিব্রত করতে চাই না; আবার এদিকে তাঁদেরকে দায়িত্বেও রাখতে চাই না। এটা তাঁদের মনঃপূত নাও হতে পারে।

খ. থানাগুলোতে পুলিশদের নিরস্ত্র করতে হবে।

গ. পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্‌-এর ডিজিকে বাহিনী সম্পর্কে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঘ. আনসারদের সমস্ত রাইফেল হস্তগত করতে হবে।

১৩. এসব তথ্যের প্রয়োজন

ক. নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের কে কোথায় রয়েছেন

১. মুজিব
২. নজরুল ইসলাম
৩. তাজউদ্দিন
৪. ওসমানী
৫. সিরাজুল আলম
৬. মান্নান
৭. আতাউর রহমান
৮. অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর
৯. অলি আহাদ
১০. মতিয়া চৌধুরী
১১. ব্যারিস্টার মওদুদ
১২. ফয়জুল হক
১৩. তোফায়েল
১৪. এন. এ. সিদ্দিকী
১৫. রউফ
১৬. মাখন এবং অন্যান্য ছাত্রনেতা

খ. সমস্ত থানাগুলোর অবস্থা এবং রাইফেলের সংখ্যা।
গ. শক্ত ঘাঁটি এবং অস্ত্রাগারের বাড়ির ঠিকানা।
ঘ. ট্রেনিং ক্যাম্পের এলাকা।
ঙ. সামরিক ট্রেনিং-এ উৎসাহদানকারী সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলোর ঠিকানা।
চ. বিদ্রোহীদের সক্রিয়ভাবে সাহায্যকারী এমন সব সাধারণ বাহিনীর প্রাক্তন অফিসারদের নাম ও ঠিকানা।

১৪ কমান্ড ও কন্ট্রোল : দুটো কমান্ড স্থাপন করতে হবে।

ক. ঢাকা এলাকা

কমান্ড : মেজর জেনারেল ফরমান
স্টাফ : ইস্টার্ন কমান্ড স্টাফ/অথবা এমএলএইচ কিউ
সৈন্য : ঢাকায় অবস্থানকারী

খ প্রদেশের অন্যত্র

কমান্ড : মেজর জেনারেল কে এইচ রাজা
স্টাফ : ১৪ ডিভিশন এইচ কিউ
সৈন্য : ঢাকা ছাড়া অন্যত্র অবস্থানকারী সমস্ত সৈন্য

১৫ ক্যান্টনমেন্টের নিরাপত্তা

প্রথম পর্যায়ে : পিএএফসহ সবার অস্ত্র জমা নেয়া।

১৬. তথ্য সরবরাহ

ক. নিরাপত্তা বিষয়
খ. নীল নকশা

ঢাকা এলাকা

কমান্ড ও কন্ট্রোল : মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী
হেডকোয়ার্টার : এম এল এ জোন 'বি'

সৈন্য বাহিনী

ঢাকায় অবস্থানরত ৫৭ ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের সৈন্য। অর্থাৎ ১৮ পাঞ্জাব, ৩২ পাঞ্জাব (সি ও হিসাবে লে. কর্নেল তাজ দায়িত্ব নিবে) ২২ বালুচ, ১৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট, ১৩ লাইট এএ রেজিমেন্ট এবং কুমিল্লা থেকে ৩ কমান্ডো কোম্পানি।

দায়িত্ব

১. ২ ইস্ট বেঙ্গল, ১০ ইস্ট বেঙ্গল, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্-এর হেডকোয়ার্টার (২৫০০) এবং রাজারবাগের রিজার্ভ পুলিশকে নিরস্ত্র করা।
২. বেতার, টেলিভিশন, স্টেট ব্যাংক এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জের দায়িত্ব গ্রহণ করা।
৩. আওয়ামী লীগের সমস্ত নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা। (তালিকা সরবরাহ করা হবে)।
৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল, জগন্নাথ হল এবং কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের লিয়াকত হলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা।
৫. গাজীপুর এবং রাজেন্দ্রপুরে অবস্থিত ফ্যাক্টরি ও সমরাস্ত্রের ডিপোর নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করা।

বাকি সৈন্য এবং ১৪ ডিভিশন হেডকোয়ার্টার

মেজর জেনারেল খাদেম হোসেন রাজার অধীনে থাকবে

যশোর

সৈন্য বাহিনী

১০৭ ব্রিগেডের হেডকোয়ার্টার, ২৫ বালুচ, ২৪ ফিল্ড রেজিমেন্ট এবং ৫৫ ফিল্ড রেজিমেন্ট।

দায়িত্ব

১. ১ ইস্ট বেঙ্গল, ইপিআর-সেক্টর হেডকোয়ার্টার এবং রিজার্ভ পুলিশ নিরস্ত্র করা এবং আনসারদের কাছে থেকে অস্ত্র নেয়া।
২. যশোর শহরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা এবং আওয়ামী লীগ ও ছাত্রনেতাদের গ্রেফতার করা।
৩. টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও টেলিগ্রাফ দখল করা।
৪. নিরাপত্তা এলাকা নির্দিষ্ট ও প্রহরার ব্যবস্থা করা– যশোর ক্যান্টনমেন্ট, যশোর শহর, খুলনা-যশোর রোড এবং বিমানবন্দর।
৫. কুষ্টিয়ার টেলিফোন এক্সচেঞ্জকে অকেজো করা।
৬. প্রয়োজনমতো খুলনায় আরো ফোর্স পাঠানো।

সৈন্য বাহিনী

২২ এফ এফ

দায়িত্ব

১. শহরের নিরাপত্তা।
২. টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও বেতার ভবন দখল।
৩. ইপিআর-এর উইং হেডকোয়ার্টার, রিজার্ভ কোম্পানি এবং রিজার্ভ পুলিশকে নিরস্ত্র করা।
৪. আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট ও ছাত্র নেতাদের গ্রেফতার করা।

রংপুর-সৈয়দপুর

সৈন্য বাহিনী

২৩ ব্রিগেডের হেডকোয়ার্টার, ২৯ ক্যাভালরি, ২৬ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ও ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট।

দায়িত্ব

রংপুর-সৈয়দপুর নিরাপত্তা।
২. সৈয়দপুরে ৩ ইস্ট বেঙ্গলকে নিরস্ত্র করা।
৩. সম্ভব হলে দিনাজপুরে ইপিআর-এর সেক্টর হেডকোয়ার্টার এবং রিজার্ভ কোম্পানিগুলোকে নিরস্ত্র করা এবং সীমান্ত ফাঁড়িসহ এসব জায়গায় নতুন বাহিনী প্রেরণ করা।
৪. রংপুরে বেতার ভবন ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করা।
৫. রংপুরে আওয়ামী লীগ ও ছাত্র নেতাদের গ্রেফতার করা।
৬. বগুড়ায় সমরাস্ত্রের ডিপোর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা।

রাজশাহী

সৈন্য বাহিনী

২৫ পাঞ্জাব

১. কমান্ডিং অফিসার হিসাবে সফকত্ বালুচকে পাঠানো।
২. রাজশাহী বেতার ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করা।
৩. ইপিআর-এর সেক্টর হেডকোয়ার্টার ও রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী নিরস্ত্র করা।
৪. রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা।
৫. আওয়ামী লীগ ও ছাত্র নেতাদের গ্রেফতার করা।

সিলেট

সৈন্য বাহিনী

একটা কোম্পানি ছাড়া ৩১ পাঞ্জাব

দায়িত্ব

বেতার ভবন ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করা।

৩. বিমানবন্দর দখল করা।

৪. আওয়ামী লীগ ও ছাত্র নেতাদের গ্রেফতার করা।

৫. ইপিআর-এর সেকশন হেডকোয়ার্টার এবং রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীকে নিরস্ত্র করা।

কুমিল্লা

সৈন্য বাহিনী

৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট, দেড় মর্টার ব্যাটারিজ, স্টেশন ট্রুপস্, ৩ কমান্ডো ব্যাটালিয়ন (একটা কোম্পানি ছাড়া)।

দায়িত্ব

১. ৪ ইস্ট বেঙ্গল, ইপিআর-এর উইং হেডকোয়ার্টার এবং রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীকে নিরস্ত্র করা।

২. কুমিল্লা শহরের নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ এবং আওয়ামী লীগ ও ছাত্র নেতাদের গ্রেফতার করা।

৩. টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করা।

চট্টগ্রাম

সৈন্য বাহিনী

২০ বালুচ, ৩১ পাঞ্জাবের একটা কোম্পানি, ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, ভারি কামান ও ফিল্ড কোম্পানি ইঞ্জিনিয়ার্স। এছাড়া 'এইচ আওয়ার' অর্থাৎ অপারেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে ব্রিগেডিয়ার ইকবাল তার কম্যুনিকেশন ও ট্যাক্টিক্যাল হেড কোয়ার্টার এবং মোবাইল বাহিনী নিয়ে কুমিল্লা থেকে সড়ক পথে চট্টগ্রাম উপস্থিত হওয়া।

দায়িত্ব

১. ইস্ট বেঙ্গল, ইপিআরের সেকশন হেডকোয়ার্টার, ইবিআরসি এবং রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীকে নিরস্ত্র করা।

২. পুলিশের কেন্দ্রীয় অস্ত্রাগার (২০ হাজার অস্ত্র) দখল করা।

৩. বেতার ভবন ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করা।

৪. পাকিস্তান নৌবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা (কমডোর মোমতাজ)।

৫. ৮ ইস্ট বেঙ্গলের সি. ও. ঝানঝুয়া এবং সাইগ্রির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি চট্টগ্রাম না পৌছানো পর্যন্ত আপনার নির্দেশ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

৬. যদি সি. ও. ঝানঝুয়া এবং সাইগ্রি নিজেদের কর্তৃত্ব সম্পর্ক আস্থাবান থাকে তা নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকবে। তবে সেক্ষেত্রে শহরের দিকে

যোগাযোগকারী রাস্তায় একটা কোম্পানিকে 'ডিফেনসিভ পজিশনে' রেখে রোড ব্লক করবে। এতে করে ইবিআরসি এবং ৮ ইস্ট বেঙ্গল তাদের আনুগত্য পরিবর্তন করলেও আটকে পড়বে।

৭. আমি সঙ্গে করে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে নিয়ে যাচ্ছি। অপারেশনের রাতেই ইবিআরসির সি, আই, চৌধুরীকে গ্রেফতার করবে।

৮. উপরে উল্লিখিত দায়িত্ব পালনের পর আওয়ামী লীগ ও ছাত্র নেতাদের গ্রেফতার করবে।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের আম্রকাননে (মুজিবনগর) দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে এক অনাড়ম্বর অথচ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে নির্বাসিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনার সামগ্রিক দায়িত্বে ছিলেন টাঙ্গাইল থেকে নির্বাচিত পরিষদ সদস্য অ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান। এই অনুষ্ঠানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম আনুষ্ঠানিকভাবে মন্ত্রিসভার সহকর্মীদের পরিচয় করিয়ে দেন এবং সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ও সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ হিসাবে যথাক্রমে কর্নেল (অবঃ) আতাউল গণি ওসমানী ও কর্নেল (অবঃ) আব্দুর রবের নাম ঘোষণা করেন। দেশ স্বাধীন হবার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই দু'জনকেই মেজর জেনারেল পদে প্রমোশন দিয়েছিলেন।

মেহেরপুরের আম্রকাননের এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে দিনাপকুর থেকে নির্বাচিত পরিষদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির চিফ হুইফ অধ্যাপক ইউসুফ আলী স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। –লেখক

"যেহেতু ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হইয়াছিল এবং যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়াছিলেন।

এবং যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ তারিখে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন এবং যেহেতু আহূত এই পরিষদ স্বেচ্ছাচার এবং বে-আইনিভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা।

এবং যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

এবং যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছেন এবং এখনো বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন গণহত্যা

নির্যাতন চালাইতেছে। এবং যেহেতু পাকিস্তান সরকার অন্যায় যুদ্ধ ও গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার পরিচালনা দ্বারা বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের একত্রিত হইয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়া জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।

এবং যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর তাহাদের কার্যকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

যেহেতু সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যে ম্যান্ডেট দিয়েছেন সেই ম্যান্ডেট মোতাবেক আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আমাদের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠন করিয়া পারস্পরিক আলাপ- আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য মনে করি।

সেইহেতু আমরা বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি। এবং উহার দ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করিতেছি।

এতদ্বারা আমরা আরো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্র প্রধান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্র প্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

রাষ্ট্র প্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদেও অধিষ্ঠিত থাকিবেন। রাষ্ট্র প্রধানই সর্বপ্রকার প্রশাসন ও আইন প্রণয়নের অধিকারী।

রাষ্ট্র প্রধানের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়োগের ক্ষমতা থাকিবে। তাঁহার কর ধার্য ও অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা থাকিবে, তাঁহার গণপরিষদের অধিবেশনের আহ্বান ও উহার অধিবেশন মুলতবি ঘোষণার ক্ষমতা থাকিবে। উহা ছাড়া বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হইবেন।

বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি, যে কোন কারণে রাষ্ট্র প্রধান যদি না থাকেন, অথবা রাষ্ট্র প্রধান যদি কাজে যোগদান করিতে না পারেন অথবা তাঁহার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে যদি অক্ষম হন তাহা হইলে রাষ্ট্র প্রধানকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্র প্রধান পালন করিবেন।

আমরা আরো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের এই স্বাধীনতা ঘোষণা ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে যথাযথভাবে রাষ্ট্র প্রধান ও উপ-রাষ্ট্র প্রধানের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য দায়িত্ব অর্পণ ও নিযুক্ত করিলাম।

স্বাধীনতার রক্তাক্ত সংগ্রামে
বাঙালী অগ্নিকন্যাদের বিজয় অভিযান

বামপন্থী আন্দোলন এবং উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষের প্রেক্ষাপটে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা

সংক্ষিপ্ত পূর্বকথা : একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করার পূর্বে এতদঞ্চলে এঁদের কর্মকাণ্ডের পূর্ব ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষেপে উপস্থাপন করা বাঞ্ছনীয় মনে করি। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পূর্ব অংশ ও আসামকে একত্র করে নতুন প্রদেশ গঠন করলে এর জের হিসাবে বাঙালি বর্ণ হিন্দুদের এক শ্রেণীর দুঃসাহসিক যুবক সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করার ব্রত গ্রহণ করে। এঁদের বক্তব্য ছিল যে, ইংরেজ রাজপুরুষদের একের পর এক হত্যা করলেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশ থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলবে। পূর্ববংগীয় এলাকায় এসব সন্ত্রাসবাদীরা 'অনুশীলন' এবং পশ্চিমবংগীয় এলাকায় 'যুগান্তর' নামে সংগঠিত হয়েছিল। আশ্চর্যজনকভাবে এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পশ্চাতে বিশেষ জনসমর্থন ছিল না এবং কোন মুসলমান অথবা তফসিলি হিন্দু সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে যোগদান করেনি। তবুও যেভাবে এসব সন্ত্রাসবাদীরা হাসিমুখে ফাঁসির রজ্জুকে বরণ করেছে এবং বছরের পর বছর ধরে আন্দোলনের 'কালাকোলা' কারাগারে বন্দি জীবনযাপন করেছে, তা ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এইসব সন্ত্রাসবাদীদের ওপর ভয়াবহ অত্যাচার অব্যাহত রাখলেও মুসলমান নবাব ও সামন্তদের চরম বিরোধিতার মুখে ১৯১১ সালে নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের বিলুপ্তি ঘোষণা করে। এর বছর কয়েকের মধ্যে ১৯১৪ সালে বিশ্বব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা হয়। এই যুদ্ধ চলাকালীন ১৯১৮ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় অত্যাচারী জার সম্রাটের বিরুদ্ধে কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে সর্বহারাদের সাফল্যজনক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হলে বিশ্বের সর্বত্র এর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কোলকাতা মহানগরীর রাজপথে সর্বপ্রথম এক বাঙালি মুসলিম যুবককে একটা লাল ঝাণ্ডা হাতে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। তাঁর মুখে শ্লোগান হচ্ছে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'। এটা হচ্ছে ১৯১৯-২০ সালের কথা। বাংলাদেশের সন্তান এই কমরেড যুবকের নাম হচ্ছে কমরেড মুজাফফর আহমদ। তখনকার দিনে কমিউনিস্ট পার্টির বদলে বলশেভিক পার্টি নামটা বিশেষ পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে কমরেড মুজাফফরকেই উপমহাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির গুরু হিসাবে স্বীকৃতি দান করলেও ১৯২০ সালে ১৭ই অক্টোবর সোভিয়েত রাশিয়ার তাসখন্দ নগরীতে আর এক বাঙালি বিপ্লবী কমরেড মানবেন্দ্র নাথ রায়ের নেতৃত্বে প্রবাসে আনুষ্ঠানিকভাবে সাত সদস্য বিশিষ্ট ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়। এর সম্পাদক নির্বাচিত হন কমরেড শফিক সিদ্দিকী। চলতি শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশ দশকে এই উপমহাদেশে বিশেষ করে বঙ্গীয় এলাকায় সন্ত্রাসবাদী ও কমিউনিস্ট আন্দোলন পাশাপাশি অব্যাহত থাকে। অবশ্য কমিউনিস্ট পার্টি তখন কংগ্রেসের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। এই সময় কারাগারে আটক সন্ত্রাসবাদীদের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয় এবং এঁদের অধিকাংশই কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থনে রূপান্তরিত হয়। এর মধ্যে ১৯৪৯ সালে বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু

হলে কমিউনিস্ট রাশিয়া এবং নাজি জার্মানিদের মধ্যে আশ্চর্যজনকভাবে আঁতাত দেখা দেয়। ফলে উপমহাদেশের রাজনীতিবিদদের চিন্তাধারায় এক ত্রিশংকু অবস্থার সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন অব্যাহত রাখতে তা প্রকারান্তরে নাজি জার্মানির সমর্থনের নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। আবার আন্দোলন বন্ধ করলে ব্রিটিশ সামাজ্রবাদের দালাল হিসাবে চিহ্নিত হবার আশংকা সবচেয়ে বেশি। ১৯৪১ সালে জাপান বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পক্ষে যোগদান করলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিরুদ্দেশ হন এবং জাপানের পক্ষে বার্মা ও আসাম ফ্রন্টে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধ চলাকালীন রহস্যজনকভাবে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মৃত্যু হয়।

১৯৪১ সালে ব্রিটিশ কূটনীতির সফলতা প্রমাণিত হয়। সোভিয়েত রাশিয়া আকস্মিকভাবে মিত্র পক্ষে যোগদানের কথা ঘোষণা করলে হিটলারের নাজি জার্মানি সর্বশক্তি নিয়ে রাশিয়া আক্রমণ করে বসে। যুদ্ধে এর পরবর্তী ইতিহাস সবারই জানা। মিত্রপক্ষে সোভিয়েত রাশিয়ার যোগদানের ফলে উপমহাদেশীয় রাজনীতিতে এর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তখন এই মহাযুদ্ধ 'জনযুদ্ধ' হিসাবে আখ্যায়িত করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারিত করলে অন্য রাজনৈতিক দলগুলো এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করে। সত্যিকারভাবে বলতে গেলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভ থেকে উপমহাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির 'লেজুড়বৃত্তি' নীতি অনুকরণ করার সূচনা।

১৯৪৫ সালে মিত্রপক্ষ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জয়লাভ করলে উপমহাদেশীয় রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এ সময় ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত পার্টিগুলো ব্যাপক শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের ওয়াদা মতো 'স্বাধীনতা' প্রদান ও উপমহাদেশ পরিত্যাগের 'ফর্মুলা' প্রণয়নে সচেষ্ট হয় এবং ঘোষণা করে যে, আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে উপমহাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তান নামে পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হবে। ভারতীয় কংগ্রেস নিজেদের পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক প্রমাণিত করায় ব্যর্থ হওয়ায় এই অবস্থার সৃষ্টি হলো। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে সোহ্‌রাওয়ার্দী-হাশেমের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদে ১১৯টি আসনের মধ্যে ১১৬টি আসন দখল করে চমকের সৃষ্টি করে। পরাজিত তিনটি আসনের দুটিতে শেরেবাংলা ফজলুল হক এবং জনৈক মওলানা শামসুল হক ময়মনসিংহে মোনেম খানকে পরাজিত করে বিজয়ী হন। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে কারাগার থেকে সমস্ত সন্ত্রাসবাদী কমিউনিস্ট রাজবন্দিদের মুক্তির নির্দেশ দান করেন। এর অল্প দিনের মধ্যেই ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট সমগ্র উপমহাদেশব্যাপী শুরু করে সুদূর পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিমে বোম্বাই পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কত লাখ লোক যে আত্মাহুতি দিয়েছেন, তা কেউই বলতে পারে না আর কত সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে তারও কোন হিসাব নেই।

এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ রূপ দেখে কমরেড পি. সি. যোশীর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি নতুন থিসিস গ্রহণ করে স্লোগান দিলো, 'হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই' আর 'কংগ্রেস-লীগ এক হও'। কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের কেউই একথা বললো না যে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দুটো পার্টিরই শ্রেণী চরিত্র এক ও অভিন্ন। এরা দেশীয় পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া শ্রেণী স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য উদ্‌গ্রীব। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আশীর্বাদপুষ্ট সাদা

বেনিয়ার পরিবর্তে এরা দেশীয় বেনিয়াদের জন্য শিল্প ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল এবং কৌশলগত কারণে ধূম্রজাল ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি লক্ষ্যে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্যে মদদ যোগাচ্ছে।

কমরেড পি. সি. যোশীর লেজুড়বৃত্তি থিসিসের পর ১৯৪৮ সালে ২২শে ফেব্রুয়ারি কোলকাতায় পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে কমরেড রণদিভের থিসিসের ভিত্তিতে কমিউনিস্ট পার্টি (পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির তখন পৃথক অস্তিত্ব নেই) নতুন হঠকারী স্লোগান উচ্চারিত হলো, 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়', 'লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়'। এই থিসিসে আরও বলা হলো যে, 'বিপ্লব সংগঠিত করার সময় এসে গেছে' আর 'রবীন্দ্রনাথ হচ্ছে বুর্জোয়া কবি'। পি. সি. যোশীর স্থলে পার্টির নতুন সেক্রেটারি হলেন কমরেড বি. টি. রণদিভে। এবার নতুন নীতি হচ্ছে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বুর্জোয়া নেতৃত্ব উৎখাত করতে হবে।

১৯৪৮ সালে কোলকাতার মোহাম্মদ আলী পার্কে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান থেকে আগত কমিউনিস্ট প্রতিনিধিরা পৃথক পার্টি গঠন করলেন। পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকারী কমিটির সদস্য হলেন যথাক্রমে সাজ্জাদ জহির, আতা মোহাম্মদ, জামালউদ্দিন বোখারী, মোহাম্মদ ইব্রাহিম, খোকা রায়, নেপাল নাগ, কৃষ্ণ বিনোদ রায়, মনসুর হাবিব এবং মণি সিং। এঁদের মধ্যে কমরেড মনসুর হাবিব হচ্ছেন পশ্চিম বাংলার বর্ধমানের অধিবাসী। তিনি পূর্ব বাংলায় পার্টি গঠন করতে এসে কিছুদিন কারাগারে আটক ছিলেন। মুক্তি লাভের পর তিনি কোলকাতায় চলে যান। কমরেড কৃষ্ণ বিনোদ রায়ও কিছুদিনের মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য সীমান্তের ওপারে চলে যান। এ সময় পার্টির শতকরা প্রায় ৭০/৮০ জন পদত্যাগ করেন।

পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম পলিটব্যুরোয় সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন সাজ্জাদ জহির, খোকা রায় এবং কৃষ্ণ বিনোদ রায়। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জুন ঢাকার সদরঘাট এলাকায় করোনেশন পার্কে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম প্রকাশে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী মুনির চৌধুরী। বক্তা ছিলেন সরদার ফজলুল করিম ও রণেশ দাস গুপ্ত। কিন্তু এই জনসভার সমাপ্তির আগেই শাহ্ মোহাম্মদ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বাধীনে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সমর্থকদের হামলায় সভা পণ্ড হয়ে যায়। এর আগে ১১ই মার্চ তারিখে এক উন্মত্ত জনতা ঢাকায় কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ফেডারেশনের অফিস আক্রমণ করে লণ্ডভণ্ড করে দেয়।

এরকম অবস্থাতেও তৎকালীন পূর্ব বাংলায় কমরেড বি. টি. রণদিভের থিসিস বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। 'বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে আছে। তাই শ্রেণী শত্রুদের খতম করে সর্বহারাদের বিপ্লব এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।'

দক্ষিণ ভারতে তেলেংগানা, পশ্চিম বাংলায় কাকদ্বীপ আর পূর্ব পাকিস্তানে নাচোলে মধ্যবিত্ত নেতৃত্বে অসময়ে শুরু হলো রক্তাক্ত কৃষক বিদ্রোহ। ভয়াবহ আর শোচনীয় পরিণতি হলো এসব বিদ্রোহের। শত সহস্র নারীর সিঁথির সিঁদুর মুছে গেলো, হাজার হাজার কৃষাণের সংসার হলো নিশ্চিহ্ন। শহুরে মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব কোন খোঁজই করলো না যে, কত কৃষক কর্মী ডাকাতি ও খুনের আসামি হিসাবে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে আর কত শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়ে অনাহারে দিন যাপন করছে।

এরপর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি তথা বামপন্থীদের নীতিতে

কৌশলগত পরিবর্তন দেখা দিল। ১৯৫১ সালে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় সম্মেলনে কমরেড মণি সিং-এর নতুন থিসিস গৃহীত হলো। 'বুর্জোয় ভূস্বামী শাসকচক্রের জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে হবে।" এবার শুরু হলো প্রভাবীকরণ প্রক্রিয়ার কাজ। এসব কৌশলের অন্যতম হচ্ছে মধ্যপন্থী জাতীয়তাবাদী পার্টি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগে অনুপ্রবেশ। বামপন্থী চিন্তাধারার নেতৃত্ব মধ্যবিত্তদের কুক্ষিগত থাকায় এ সময় নেতৃবৃন্দের জন্য আর কোন বিকল্প পন্থা ছিল না বললেই চলে। এসব শহুরে বামপন্থী মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের অনেকেই নানা সাংস্কৃতিক ও যুব প্রতিষ্ঠানের আশ্রয়পুষ্ট হলো, কিংবা নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললো। ডেমোক্রেটিক লীগ, পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগ, প্রগতি লেখক শিল্পী সংসদ, পাকিস্তান প্রগতি লেখক সংঘ ইত্যাদি এসব প্রতিষ্ঠানের অন্যতম রণদিভে থিসিসের হঠকারী নীতির পর বামপন্থী শহুরে নেতৃবৃন্দ দাঙ্গাবিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, শাসনতন্ত্রের মূলনীতি বিরোধীর মতো প্রগতিশীল আন্দোলনে আওয়ামী লীগের 'লেজুড়বৃত্তি' হিসাবে কাজ করতে শুরু করলো। কিন্তু এঁরা কেউই একবার খোঁজও করে দেখলো না যে, সর্বহারাদের 'বিপ্লব' আর 'বিদ্রোহের' লালিত বাণী প্রচার করে দিনাজপুর, রংপুরে তেভাগা আন্দোলন, আটচল্লিশের রেল ধর্মঘট, উনপঞ্চাশের পুলিশ ধর্মঘাট, ময়মনিসংহে হাজং বিদ্রোহ, আর রাজশাহীর নাচোলে কৃষক বিদ্রোহের মাধমে যে শত শত কৃষক ও শ্রমিকদের পুলিশি নির্যাতন এবং জেল ও জুলুমের মুখে ঠেলে দিয়েছি, তারা কি অবস্থায় রয়েছেন? এদের কতজন খুন আর ডাকাতির অভিযোগে অপরাধী প্রমাণিত হয়ে শাস্তি ভোগ করছেন আর এদের সংসার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে?

আবার পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়ে বাহান্নোর ভাষা আন্দোলনের চরম মুহূর্তে আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধাবান থাকা সত্ত্বে অর্থাৎ ২০শে ফেব্রুয়ারি রাতে আন্ডারগ্রাউন্ড কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত হচ্ছে, '১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ২১শে ফেব্রুয়ারি হরতাল করা বাঞ্ছনীয় নয়। এতে মুসলিম সরকার আসন্ন সাধারণ নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার অজুহাত লাভ করবে।' তাই তো ২০শে ফেব্রুয়ারির রাতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে কমরেড তোয়াহাকে ভোটদানে বিরত থাকতে হয়। ইতিহাস এর সাক্ষী অথচ ভাষা আন্দোলন সফল হওয়ার প্রেক্ষাপটে এই গত ৩১ বছর ধরে ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বের দাবিদার হিসাবে নিজেদের বামপন্থী মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার কত প্রচেষ্টাই না করলো।

চুয়ান্নোর সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে বামপন্থীদের অনুপ্রবেশ চূড়ান্ত হয়ে গেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, এ সময় দিনাজপুর জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ কমিউনিস্ট পার্টি থেকে দখল করা হয়েছে। কমরেড নূরুল হুদা, কাদের বকশ (ছোটা) এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্টের অংগ দল হিসাবে এক দিকে যেমন কৃষক শ্রমিক পার্টি দক্ষিণপন্থী প্রার্থীদের (১৪ জন নেজামে ইসলাম দলীয় ছিলেন) মনোনয়নের জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, অন্যদিকে আওয়ামী লীগ তেমনি গণতন্ত্রী দলের ১৮ জন (?) প্রার্থীকে নিজস্ব প্রার্থী হিসাবে যুক্তফ্রন্টের নমিনেশন দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে পাবনার সেলিনা বানু, নোয়াখালীর মোহাম্মদ তোয়াহা, দিনাজপুরের হাজী মুহাম্মদ দানেশ, সিলেটের মাহমুদ আলী (বর্তমানে পাকিস্তানের নাগরিক), বরিশালের মহিউদ্দিন আহমদ, কুমিল্লার অধ্যাপক মোজাফফর

আহমদ এবং রাজশাহীর আতাউর রহমান অন্যতম। (১৯৫৩ সালে হাজী দানেশ ও মাহমুদ আলীর নেতৃত্বে গণতন্ত্রী দল গঠন হয়)

১৯৫৪-'৫৫ সাল থেকে ১৯৫৭ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়কালে যখন আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক পরিষদে দক্ষিণপন্থী কৃষক শ্রমিক পার্টির সঙ্গে ক্ষমতাদ্বন্দ্বে লিপ্ত তখন এইসব বামপন্থী সদস্য আওয়ামী লীগকে শর্তাধীনে সমর্থন জোগায়। এমনকি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ যখন অসাম্প্রদায়িক আওয়ামী লীগ পরিণত হয় তখনও বামপন্থী শক্তি এই পার্টির অভ্যন্তরে অবস্থান করে ভূমিকা পালন করে। এ সময় দক্ষিণপন্থী সালাম খান গ্রুপ আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে। অবশ্য এঁদের তখন গার্জিয়ান ছিলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা ভাসানী ও আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অলি আহাদ।

আওয়ামী লীগে অনুপ্রবেশকারী বামপন্থী শক্তি (১৯৮৩ সালে রাজ্জাক গ্রুপের মতো) ১৯৫৭ সালে পার্টির অভ্যন্তরে জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। এরই বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে ১৯৫৭ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে কাগমারীতে আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনের সিদ্ধান্ত। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি মওলানা ভাসানী বামপন্থী চিন্তাধারার কর্মী ও নেতৃবৃন্দসহ আওয়ামী লীগ ত্যাগ করেন। ১৯৫৭ সালে জুলাই মাসে গফফার খান-ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত হলো ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। এদিকে আওয়ামী লীগের নতুন সভাপতি হলেন মওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিশ আর সাধারণ সম্পাদক হিসাবে পুনঃনির্বাচিত হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা এ মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, রাজনৈতিক মঞ্চে আওয়ামী লীগের প্রাধান্যের পরিসমাপ্তি ঘটতে বাধ্য এবং ভাঙন অনিবার্য। কিন্তু পরবর্তীকালে এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ থেকে যখনই দল ত্যাগ হয়েছে তার পরবর্তীতে এই পার্টি আরও বেশি শক্তি সঞ্চয় করেছে। কেননা গত চার দশকের ইতিহাসে বার বার একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, শূন্যতা থাকা সত্ত্বেও বামপন্থী শক্তির মধ্যবিত্ত নেতৃবৃন্দ সব সময়ই পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করতে এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু পেটি-বুর্জোয়া সম্প্রদায় বার বার শ্রেণী স্বার্থে আওয়ামী লীগের পতাকাতলে শক্তি সঞ্চয় করেছে।

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে আইয়ুব খানের নেতৃত্বে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করলে সংবিধান বাতিল, রাজনৈতিক পার্টি বেআইনি এবং সমস্ত রকমের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়। পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী শক্তি ভয়াবহ দমননীতির সম্মুখীন হয়। কয়েক হাজার রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী হয় কারাগারে নিক্ষিপ্ত না হয় পলাতকের জীবনযাপন করে। প্রাক্তন মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ছ'টা ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিটি মামলা থেকে বেকসুর মুক্তি লাভ করেন।

১৯৬২ সালে 'মৌলিক গণতন্ত্রের' (পরোক্ষ পদ্ধতির ভোটে) ভিত্তিতে 'আইয়ুব সংবিধান' চালু করার প্রাক্কালে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সম্মিলিত বিরোধীদলীয় মোর্চা গঠন করেন। নসরুল্লাহ, আতাউর রহমান খান, সালাম খান প্রমুখ দক্ষিণপন্থী নেতা থেকে শুরু করে বামপন্থী মওলানা ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফফর ও সীমান্তের ওয়ালী খান পর্যন্ত নেতৃবৃন্দকে এ সময় জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী এক প্লাটফর্মে জমায়েত

করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে সামরিক কর্তৃপক্ষ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবকে জননিরাপত্তা আইনে আটক করে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে চিকিৎসার জন্য জেনেভায় গমন করেন এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় বৈরুতে এক হোটেলে প্রাণ ত্যাগ করেন। সোহ্‌রাওয়ার্দীর জীবদ্দশায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্ব ঘোষিত ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানকে ক্ষমতাচ্যুতে করা সম্ভব হয়নি।

সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে ১৯৬৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমান সম্মিলিত বিরোধী দল থেকে বেরিয়ে এসে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করলে বামপন্থী দলগুলোও একই পন্থা অবলম্বন করে। অবশ্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বামপন্থী দলগুলো আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধীদলীয় ('কপ') কট্টর দক্ষিণপন্থী প্রার্থী মিস ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন দান করে। নির্বাচনে আইয়ুব খান বিজয়ী হয়।

এদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ষাট দশকের গোড়ার দিকে অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে সোভিয়েত-চীন মতবিরোধ দেখা দেয়। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত সংর্ঘষের সময় সোভিয়েত রাশিয়া জাতীয়তাবাদী ভারতের প্রতি নৈতিক সমর্থন প্রদান করলে দুইটি কমিউনিস্ট দেশের মধ্যে সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে। তৎকালীন পূর্ব বাংলায় এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি রুশ-চীন মতবিরোধের প্রেক্ষিতে ভাগ হয়ে যায়। কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়াও পার্টি বিভক্ত হওয়া ছাড়াও সৃষ্টি হয় চীনাপন্থী ভাসানী ন্যাপ ও রুশপন্থী মোজাফফর ন্যাপের। (অবশ্য পরবর্তী বছরগুলোতে মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের এসব মার্ক্সিস্ট পার্টিগুলো আরও বহু দল উপ-দলে বিভক্ত হয়েছে।) ১৯৬৭ সালে রংপুরে অনুষ্ঠিত ন্যাপের কাউন্সিল অধিবেশনে রুশ-সমর্থকরা যোগদানে বিরত থাকে। ১৯৬৮ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি ন্যাপের পৃথক কমিটি গঠিত হয়। রুশপন্থী ও পিকিংপন্থীরা পুরোপুরিভাবে বিভক্ত হলো।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ এবং সোভিয়েত দূতিয়ালীতে তাসখন্দ চুক্তির ফলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক নতুন খাতে প্রবাহিত হলে আইয়ুব খানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো পদত্যাগ করে পশ্চিম পাকিস্তানে জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হন এবং পিপলস্ পার্টি গঠন করেন। অন্যদিকে মুজিব-তাজউদ্দিনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ দ্রুত জনসমর্থন লাভ করে এবং ১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত বিরোধী দলীয় বৈঠকে ঐতিহাসিক ছয় দফা প্রস্তাব পেশ করেন। এই ছয় দফা প্রস্তাবে পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি উচ্চারিত হয়। একথা চিন্তা করলে আশ্চর্য মনে হয় যে, আওয়ামী লীগের নেতা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ১৯৫৫-৫৬ সালে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী হিসাবে একদিন বলেছিলেন যে, পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের 'শতকরা ৯৫ ভাগ আদায় হয়ে গেছে' মাত্র দশ বছরের ব্যবধানে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সেই আওয়ামী লীগ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ছয় দফা দাবি উত্থাপন করে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হলো। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান হুশিয়ারি উচ্চারণ করলেন যে, 'অস্ত্রের ভাষায় ছয় দফা দাবির জবাব দেয়া হবে।' জুলফিকার আলী ভুট্টো ছয় দফা সম্পর্কে প্রকাশ্যে বিতর্কের আহ্বান জানালে শেখ মুজিব পল্টন ময়দানে জনসমক্ষে ছয় দফা সম্পর্কে 'বাসাসের' চ্যালেঞ্জ প্রদান করলেন। ভুট্টো এ ব্যাপারে নিশ্চুপ রইলেন।

মুজিব-তাজউদ্দিনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ এ সময় বাঙালি উগ্র জাতীয়তাবাদী নীতির প্রবক্তা। ১৯৬৬ সালের প্রথমার্ধে শেখ মুজিব যেভাবে ছয় দফা নীতি সমর্থনে পূর্ব বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনসভা করেছেন এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দান করেছেন তা অবিস্মরণীয় ঘটনা। মাত্র ৯০ দিন সময়ের মধ্যে তিনি সমগ্র পূর্ব বাংলায় ছয় দফার ভিত্তিতে এক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। ১৯৬৬ সালের ৮ই মে রাতে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর গভর্নর মোনেম খানের নির্দেশে প্রতিটি জেলার অসংখ্য আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। এসব গ্রেফতারের প্রতিবাদে ১৯৬৫ সালের ৭ই জুন সমস্ত পূর্ব বাংলায় সাধারণ হরতাল আহ্বান করলে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলিতে প্রায় ১১ ব্যক্তি নিহত ও ৮০০ জনকে আটক করা হয়।

এরকম এক অবস্থাতেও বামপন্থী দলগুলো পরিস্থিতির মূল্যায়নে ব্যর্থ হয়। সোভিয়েত সমর্থক পার্টিগুলো ইতস্তত ভাব প্রদর্শন করলো এবং চীন-পাকিস্তান বন্ধুত্বের কথা চিন্তা করে মহাচীবের সমর্থক দলগুলো প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রতি পরোক্ষ সমর্থন প্রত্যাহার প্রশ্নে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলো। একথা স্বীকার্য যে, উন্নয়শীল দেশগুলোতে মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী পার্টিগুলোতে সাচ্চা কর্মীর অভাব থাকলে এবং পুরোপুরিভাবে মধ্যবিত্তসুলভ মনোভাবের নেতৃত্বের 'কুক্ষিগত' থাকলে উগ্র জাতীয়তাবাদী স্লোগান ও আঞ্চলিকতাবাদের মোকাবেলায় জনসমর্থন অব্যাহত রাখা কিংবা সংগ্রহ করা খুবই দুষ্কর হয়ে পড়ে। ষাট দশকের মাঝামাঝি পূর্ব বাংলায় ঠিক এরকম এক পরিস্থিতি দেখা দেয়। এমনকি প্রগতিশীল মহলের দাবিদার একাংশ থেকে 'ছ' দফাকে মার্কিনি সমর্থনপুষ্ট বলে আখ্যায়িত করে কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, মোটামুটিভাবে প্রথম দশ বছর পর্যন্ত ধর্মীয় জিগিরের ভিত্তিতে গঠিত দক্ষিণপন্থী মহলের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থীদের সম্মিলিত মোর্চার সংঘাত হয়েছে। ১৯৭৫ সালের কাগমারীতে আওয়ামী লীগের ভাঙ্গনের পর থেকে সত্তরের সাধারণ নির্বাচনের পর্যন্ত সময়কালে পূর্ব বাংলার রাজধানীতে বামপন্থীরা মোটামুটিভাবে পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হয়ে। ফলে এ সময়ে সামগ্রিকভাবে তিনটি রাজনৈতিক স্রোত পরিলক্ষিত হয়। এগুলো হচ্ছে দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী, জাতীয়তাবাদী মহল আর বামপন্থী (রুশ ও পিকিং গ্রুপে বিভক্ত) মোর্চা। এই ফলশ্রুতি হিসাবে সত্তরের সাধারণ নির্বাচনের সময় সৃষ্ট হয় 'ইসলাম পছন্দ' গোষ্ঠী। এর মোকাবেলায় জাতীয়তাবাদী মহলের প্রতিনিধিত্ব করে আওয়ামী লীগ। বামপন্থীদের রুশ সমর্থকরা পৃথকভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আর চীনা পন্থীরা 'কৌশলগত' কারণে নির্বাচন বয়কট করে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। এই নির্বাচনে দক্ষিণপন্থী 'ইসলাম পছন্দ' গোষ্ঠী এবং রুশ সমর্থক বামপন্থী মোর্চা জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগের কাছে শোচনীয় পরাজিত হয়।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে আমরা দেখতে পাই যে, বামপন্থী মহল বহুধা-বিভক্ত এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়নে অপারগ। পাকিস্তানের সামরিক শক্তিই বলুন আর উপনিবেশবাদ শোষণ বলুন, সব কিছুর বিরুদ্ধে প্রথম কাতারে প্রতিবাদের সোচ্চার কণ্ঠস্বর হচ্ছে আওয়ামী লীগের। আঞ্চলিক ও জাতীয়তাবাদের

স্লোগানের মোকাবেলায় বামপন্থী মহল দ্বিধাগ্রস্ত এবং বেশ কিছুটা বিভ্রান্ত। সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক বিজয়ের পর স্বাধীকার ও অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার নেতৃত্ব সব কিছুই আওয়ামী লীগের কব্জায়। শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে সৃষ্টি হলো স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। এটাই হচ্ছে বাস্তব সত্য।

এই পেক্ষাপটে বামপন্থী আন্দোলন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকার প্রতি আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন সম্ভব নয়। তথাপি আমাদের উত্তরসূরিদের জন্য একটা প্রতিবেদন উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা করা হলো।

১৯৬৮ সালের ১৮ই জুন তারিখে শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হলে সোভিয়েত ও চীন সমর্থক দলগুলো ছাত্রদের চাপে আউয়ুব বিরোধী আন্দোলনে শরিক হতে এগিয়ে আসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন এবং ৬ দফার সম্পূরক হিসাবে, ১১ দফার ভিত্তিতে ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি হলে প্রগতিশীল দলগুলোর পক্ষে আর নিশ্চুপ থাকা সম্ভব ছিলো না। বাহান্নোর ভাষা আন্দোলনের মতো ছাত্র সমাজই আবার আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলো।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের পরামর্শদাতাদের বিশ্বাস ছিলো যে, 'ষড়যন্ত্র মামলার' বিস্তারিত তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে শেখ মুজিব প্রমুখের সম্পর্কে জনমনে ঘৃণার সৃষ্টি হবে। কিন্তু অবস্থা হিতে-বিপরীত হলো। শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠলো আর মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে সৃষ্টি হলো গণ-আন্দোলন। পূর্ব বাংলার পথে-প্রান্তরে স্লোগান উচ্চারিত হলো, 'তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার কর।' ঢাকায় প্রগতিশীল ছাত্রনেতা আসাদ পুলিশের গুলিতে নিহত হলে গণ-আন্দোলন রূপান্তরিত হলো গণ-অভ্যুত্থানে।

পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন শুরু হলো। এদিনে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে সামরিক বাহিনী প্রকাশ্য দিবালোকে অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহাকে যথাক্রমে ১২ই ও ১৮ই ফেব্রুয়ারিতে হত্যা করলে আইয়ুব-বিরোধী গণ-অভ্যুত্থান ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

ঢাকায় ব্যাপক সরকারি সম্পত্তি বিনষ্ট এবং দৈনিক পাকিস্তান (দৈনিক বাংলা) ও মর্নিং নিউজ পত্রিকা অফিস প্রজ্বলিত হলো। সংগ্রামী জনতা কর্তৃক কারফিউ অগ্রাহ্য এবং পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর গুলিবর্ষণ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি বিচারপতি রহমান এক বস্ত্রে কোনরকমে ঢাকা থেকে লাহোরে পালিয়ে গেলেন।

এরকম এক অবস্থায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনার জন্য গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব দিলেন এবং গণ-অভ্যুত্থানের মুখে শেষ পর্যন্ত তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করলেন।

১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি বিকেল নাগাদ শেখ মুজিবুর রহমান এবং তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলার অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তি (সার্জেন্ট জহুরুল হককে আগেই হত্যা করা হয়েছিলো) সামরিক হেফাজত থেকে বেরিয়ে এলেন। সেদিন বিকালেই শেখ মুজিব রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দিলেন।

যে আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন এতদিন পর্যন্ত মোটামুটিভাবে বামপন্থীদের ও সংগ্রামী ছাত্রদের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছিল, তা নিমিষে জাতীয়তাবাদী শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের হাতে চলে গেলো। বামপন্থী দলগুলোর মধ্যবিত্তসুলভ মনোভাবের নেতৃবৃন্দ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জাতীয়তাবাদীদের হাতে নেতৃত্ব অর্পণ করে আবার 'লেজুড়বৃত্তির' ভূমিকা গ্রহণ করলেন। সেদিন বামপন্থী নেতৃবৃন্দের সঠিক ভূমিকা পালনের ব্যর্থতা স্বীকার করার সাহস থাকা বাঞ্ছনীয় হনে হয়।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গত ৫০ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসে ছ'দফা আন্দোলনের মতো দ্রুত আর কোন আন্দোলন জনপ্রিয় হতে পারেনি। ছ'দফা-ষড়যন্ত্র মামলা-গণঅভ্যুত্থান-নির্বাচন-স্বাধীকার-অসহযোগ স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ ও পরিপক্ক নেতৃত্ব আর সবচেয়ে 'ডিসিপ্লিনড্ পার্টি' আওয়ামী লীগের গ্রামভিত্তিক ব্যাপক সংগঠন ও লাখ লাখ কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সক্রিয় জনসমর্থনে মাত্র সোয়া পাঁচ বছরের মধ্যে পূর্ব বাংলা ছ'দফা থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে সক্ষম হলো।

'ইসলাম পছন্দ' আর 'মেহনতী জনতার' পার্টিগুলো রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুষ্ঠান করার আগেই একটার পর একটা ঘটনা দ্রুত অনুষ্ঠিত হলো। ১৯৬৬-'৭১ হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে সাফল্যজনক অধ্যায়। এ সময় তাঁর পরিপক্ক নেতৃত্ব ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকার কথা। পরাক্রমশালী পাকিস্তানি সামরিক নেতা আইয়ুব খান ও সামরিক ডিক্টেটর ইয়াহিয়া খানকে তিনি যেভাবে 'ধরাশায়ী' ও পরাস্ত করেছেন তা ঐতিহাসিকদের পর্যন্ত হতবাক করেছে।

যা হোক, ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের ছ'দফাকে জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম হিসাবে চিহ্নিত করে মস্কোপন্থীরা ছ'দফাকে 'সিআই-এর চক্রান্ত' বলে আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করলো। কিন্তু পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারণ ছ'দফাকে নিজেদের প্রাণের দাবি হিসাবে গ্রহণ করলো। এরই ফলশ্রুতি সিহাবে জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থীদের মিলিত প্রচেষ্টায় ঊনসত্তরের আইয়ুব-বিরোধী গণ-অভ্যুত্থান।

এর পরের ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। ভাসানী-ভুট্টো কর্তৃক রাওয়ালপিন্ডিতে প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক বর্জনের সিদ্ধান্ত হওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিব দলবলসহ এই বৈঠকে যোগদান করলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে ছয় দফা দাবির ব্যাপক প্রচারের সুযোগ লাভ ছাড়াও শেখ মুজিব এই বৈঠকে ছয় দফা দাবিতে অটল থাকায় আইয়ুব-মুজিব আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। এর ফল হিসাবে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের পদত্যাগ এবং জেনারেল ইয়াহিয় খান কর্তৃক ক্ষমতা দখল ও সামরিক আইন জারি হলো। জাতির প্রতি প্রদত্ত ভাষণে জেনারেল ইয়হিয়া এ মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেন যে, ১৯৭০ সালের পহেলা জানুয়ারি থেকে রাজনৈতিক কার্যকলাপের অনুমতি দেয়া হবে এবং 'এক মাথা এক ভোটের' ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর সমগ্র দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশের জন্য একটা শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন। এছাড়া একই সঙ্গে পাকিস্তানের প্রতিটি প্রাদেশিক পরিষদেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জেনারেল ইয়াহিয়া তাঁর ভাষণে এই মুহূর্ত থেকে এক ইউনিট ভেঙে দেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। ফলে ১৮৬৯ সালের পরবর্তী প্রায় দশ মাস সময়কাল শান্তিপূর্ণভাবেই অতিবাহিত হলো।

১৯৭০ সালের প্রায় পুরো বছরটাই সমগ্র পাকিস্তানব্যাপী নির্বাচনী ডামাডোলে

ভরপুর হয়ে উঠলো। পূর্ব বাংলায় চীনা সমর্থক পার্টিগুলো 'অজ্ঞাত কারণে' নির্বাচন বয়কট করলেও রাজনীতিতে তার বিশেষ প্রতিক্রিয়া হলো না। সোভিয়েত-সমর্থক মার্ক্সীয় দলগুলো থেকে শুরু করে জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগ এবং দক্ষিণপন্থী ইসলাম পছন্দ দলগুলো পর্যন্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলো।

পূর্ব বাংলায় একদিকে ধর্মীয় শ্লোগানের আড়ালে দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দের নির্বাচনী প্রচার এবং আর একদিকে ৬-দফার ভিত্তিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদাত্ত আহ্বানে পথ-প্রান্তর মুখরিত হয়ে উঠলো। এতো সব হৈচৈয়ের মধ্যে সবার অজান্তে ছাত্রলীগের নেতৃত্ব উগ্র জাতীয়তাবাদীদের হস্তগত হলো। আওয়ামী লীগের প্রকাশিত 'পূর্ব বাংলা শ্মশান কেনো?' পোস্টারের ভিত্তিতে কয়েক লাখ ছাত্রলীগ কর্মী দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও আঞ্চলিকতার সমর্থনে অসংখ্য জনসভার আয়োজন করলো। এঁরা পূর্ব বাংলার বঞ্চনার জন্য সামগ্রিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানকে দায়ী করে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করলো। এঁদের বক্তব্যে শ্রেণী সংগ্রামের কথা অনুপস্থিত (পুরোপুরি নয়) দেখে বাঙালি শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, জোতদার, সরকারি কর্মচারী এবং বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশ উৎসাহিত বোধ করলো এবং সক্রিয় সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারিত করলো। কৃষক ও শ্রমিক সমাজকে সন্তুষ্ট করার জন্য আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ এবং ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাপের কথা থাকায় আওয়ামী লীগ সর্বহারাদের সমর্থন সংগ্রহে সক্ষম হলো। এক কথায় পেটি বুর্জোয়া পার্টি আওয়ামী লীগ অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবেই ইয়াহিয়া খানের নির্বাচনের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলো। পূর্ব বাংলার সর্বত্র উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তির আবির্ভাব হলো।

এ রকম এক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বরের কালোরাতে পূর্ব বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোতে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানলো। এতে দশ লাখ লোকের প্রাণহানি এবং প্রায় তিরিশ লাখ গৃহহীন হলো। মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী কিছু সংখ্যক কর্মী নিয়ে দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করলেও প্রগতিশীল মহল রিলিফ সংগঠন এবং সরকারের নিকট সোচ্চার হওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হলো না। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ এবং ইসলাম পছন্দ দলগুলোর কেউই দুর্গত এলাকা সফর করলো না। অথচ বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা শেখ মুজিবুর রহমান দুর্গত এলাকায় একটা ভাঙ্গা লঞ্চ নিয়ে এক নাগাড়ে ৯ দিনব্যাপী ঝটিকা সফর করলেন। এ সময় তিনি খুলনার পাইকগাছা, ভোলার দৌলত খান, তমিজউদ্দিন, বোরহানউদ্দিন, চর লালমোহন, চরফ্যাশন ও মনপুরা, পটুয়াখালীর বাউফল, কল্লোয়া, গলাচিপা, রাঙ্গাবালি, বড় বাইশদিয়া, চরকাজল ও পানপট্টি এবং নোয়াখালী জেলার হাতিয়া, চরগাজী, চল আব্দুল্লাহ, চর আলেকজান্ডার, রামগতি এবং সুধারাম সফর করে স্বহস্তে রিলিফ বন্টন ও জনগণকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। অন্যদিকে তিনি আওয়ামী লীগের বিরাট কর্মী বাহিনীকে রিলিফের জন্য কাজের নির্দেশ দিলেন। ঘূর্ণিঝড় এবং সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ভয়াবহ সংবাদে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে রিলিফ প্রদান করলেও কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে বেশ অবহেলা প্রদর্শন করে। নির্বাচনের প্রাক্কালে শেখ মুজিব এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন।

দুর্গত এলাকা থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে ১৯৭০ সালের ২৬শে নভেম্বর শেখ মুজিব শাহবাগ হোটেলে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করলেন। দেশ-বিদেশের প্রায় দু'শ জন সাংবাদিক এতে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় আওয়ামী লীগ পার্টি

উপমহাদেশের সবচেয়ে 'ডিসিপ্লিনড' পার্টি হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। আওয়ামী লীগের প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিত। এই পার্টি দেশের একটা বিকল্প সরকার হিসাবে ভূমিকা পালনে মহড়া করছিল। ২৬শে নভেম্বরের সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান আড়াই হাজার শব্দের ইংরেজিতে লিখিত একটা তৈরি বিবৃতি পাঠ করলেন এবং পরে সাংবাদিকদের কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিলেন। বিবৃতিতে তিনি ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ভয়াবহ বর্ণনা প্রদান করে বললেন যে, পটুয়াখালী, ভোলা ও নোয়াখালীর কোন কোন এলাকায় ২০ থেকে ২৫ ভাগ জনসংখ্যা মাত্র জীবিত রয়েছে এবং এঁরা বর্তমানে রিলিফ, বাসস্থান ও চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুপথযাত্রী। সময়মতো রিলিফ প্রদান করলে হয়তো কিছু লোককে অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা হতো।

তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, কেনো কেন্দ্র থেকে যৎকিঞ্চিৎ রিলিফ আসতে এতো বিলম্ব হলো? কেনো পশ্চিম পাকিস্তানে কয়েক স্কোয়াড্রন হেলিকপ্টার মজুত থাকতেও রিলিফের কাজে হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হলো না? কোথায় পশ্চিম পাকিস্তানের মওলানা মওদুদী, খান আব্দুল কাইয়ুম খান, মিয়া মোমতাজ দৌলতানা আর নবাবজাদা নসরুল্লাহ খানের মতো ইসলাম-পছন্দ নেতৃবৃন্দ? সামান্য সমবেদনা জানানোর জন্যও এঁরা পূর্ব বাংলায় 'তসরিফ' আনলেন না কেনো?

লিখিত বিবৃতিতে শেখ মুজিব আরও বললেন যে, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে আমরা একটা স্বাধীন দেশের নাগরিকের জন্মগত অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়ে রয়েছি। সব কিছু সিদ্ধান্তও রাওয়ালপিন্ডি আর ইসলামাবাদে হচ্ছে। সমস্ত ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় সরকার এবং এর ব্যুরোক্র্যাটদের কাছে কুক্ষিগত। তাই আমি বাংলাদেশের প্রতি বৈমাত্রেয়সুলভ আচরণ এবং অবহেলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অভিযুক্ত করতে চাই। এরা হচ্ছে ঘৃণ্য অপরাধী ও উপনিবেশবাদের ধ্বজাধারী।

এরপর তিনি ৬ দফার যৌক্তিকতা বর্ণনা করে উপসংহারে বললেন, 'জনগণকে ক্ষমতা দখল করতে হবে। নির্বাচনের মাধ্যমেই ক্ষমতা নিতে হবে। নির্বাচন যদি বানচাল করা হয়, তাহলে জাগ্রত জনতার শক্তিতে ক্ষমতা দখল করতে হবে। জনগণ এর মধ্যেই তাঁদের হৃদয় এবং মন দিয়ে ভোট দিয়েছে। জনতা 'শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার' যথেষ্ট দেখেছে। 'জাতীয় সংহতি'র নামে কেন্দ্রীয় সরকার যথেষ্ট অপরাধ করছে। তাই বাংলাদেশের জনসাধারণের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি আর কারো পক্ষে বাতিল করা সম্ভব নয়। ক্ষমতাসীনদের যারা মনে করেন যে, জনতার এই দাবিকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব, তাদের আমি হুশিয়ার করে দিতে চাই। বাংলাদেশ এখন জাগ্রত। যদি নির্বাচনকে বানচাল করা না হয়, তাহলে নির্বাচনের মাধ্যমে জনতা তার রায় দিবে। আর যদি নির্বাচনকে বানচাল করা হয় তাহলে সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ে নিহত দশ লাখ মানবাত্মার কাছে ঋণী বাংলাদেশের জনসাধারণ আরও দশ লাখ জীবনের চরম মূল্য দিতে প্রস্তুত। এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে মুক্ত মানুষের মতো বেঁচে থাকা এবং এর অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশ নিজেরাই তার ভবিষ্যৎ নির্ণয় করবে।"

এরপর শেখ মুজিব নির্বাচনী প্রচারের জন্য মাত্র দশ দিনের সময় পেয়েছিলেন। তিনি উল্কার মতো পূর্ব বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনী অভিযান চালালেন। এ সময় তিনি ৬ দফার পক্ষে সোচ্চার হলেন এবং পূর্ব বাংলার প্রতি কেন্দ্রের ক্ষমাহীন বঞ্চনা আর সাম্প্রতিক ঘূর্নিঝড়ের পরে কেন্দ্রের

উদাসীনতার প্রশ্নে বিষোদগার করলেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে এসময় আওয়ামী লীগের প্রচারণা তুঙ্গে উঠেছিল।

এই প্রেক্ষাপটে জেনারেল ইয়াহিয়া সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে দেশব্যাপী সত্তরের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। সংরক্ষিত ১৩টি মহিলা আসনসহ মোট ৩১৩টি আসন বিশিষ্ট প্রস্তাবিত পার্লামেন্টে আওয়ামী লীগ কতগুলো আসনে বিজয়ী হবে– এ ব্যাপারেও বামপন্থী নেতৃবৃন্দ সঠিক কোন আন্দাজই করতে পারলেন না। ইয়াহিয়া খানের পরামর্শদাতাদের থেকে শুরু করে পূর্ব বাংলার বামপন্থী নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত সবাই তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণীতে আওয়ামী লীগ ১৩০/১৩৫টির বেশি আসন পাবে একথা বলতে পারলেন না। কিন্তু ৭ই ডিসেম্বর নির্বাচন শুরু হবার পর শেখ মুজিব সাংবাদিকদের কাছে বললেন যে, পূর্ব বাংলার ১৬২টি আসনের মধ্যে ৫টি ছাড়া বাকি সবগুলো আসনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হবে। যে পাঁচটা আসনের ব্যাপারে তিনি সন্দিহান ছিলেন সেগুলো হলো : ১. চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী, ২. কক্সবাজারে ফরিদ আহমদ, ৩. ময়মনসিংহের নূরুল আমীন, ৪. রাজশাহীতে আতোয়ার রহমান এবং ৫. খুলনায় খান এ সবুর খান। শেখ মুজিবের ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় কাছাকাছি ছিল। আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার ১৬২টি আসনে ১৬০টি দখল করে বসলো। এর সঙ্গে পরোক্ষ ভোটে আরও সাতটি মহিলা আসন যুক্ত হলে ৩১৩টি সদস্যবিশিষ্ট প্রস্তাবিত পার্লামেন্টে আওয়ামী লীগের শক্তি দাঁড়ালো ১৬৭ জন সদস্য। অর্থাৎ আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ। রাওয়ালপিন্ডি-ইসলামাবাদের সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রমাদ গুনলেন আর বামপন্থী নেতৃবৃন্দ হলেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের পর দেখা গেল যে, জামায়াত ও মুসলিম লীগসহ চরম দক্ষিণপন্থী ইসলাম-পছন্দ দলগুলো সম্মিলিতভাবে লাভ করেছে শতকরা প্রায় ন'ভাগ ভোট। বামপন্থী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পেয়েছে শতকরা মাত্র ২.২৪ ভাগ ভোট। আওয়ামী প্রার্থীদের পক্ষে প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৮৭ ভাগ।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পূর্ব বাংলায় পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে বামপন্থীদের যে প্রভাব ছিল সত্তর দশকের শুরুতে তা বেশ হ্রাস পেয়েছে। দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও রাজশাহীর নাচোল ও আত্রাই অঞ্চল, ময়মনসিংহের নেত্রকোনা, ঢাকার নরসিংদী ও টঙ্গী এলাকা, খুলনার শিল্পাঞ্চল এবং যশোর ঝিনাইদহ ও মাগুরা অঞ্চলের 'বেস'গুলো এসময় বিনষ্ট হওয়ার পথে। মফস্বলের প্রগতিশীল কর্মীরা সঠিক নেতৃত্বের অভাবে এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী শ্লোগানের মুখে এক বিভ্রান্তিকর অবস্থার সম্মুখীন। শহরে অবস্থানকারী মার্ক্সীয় দলীয় মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব পরিস্থিতির মূল্যায়ন ও সঠিক পথনির্দেশ দানে অপরাগ হয়ে প্রায় নিশ্চুপ।

সত্তরের নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর দেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ দ্রুত প্রবাহিত হলো। বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রবক্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিভাবে এই পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছিলেন তা পাঠকবৃন্দের অনুধাবনের জন্য নিম্নোক্ত ঘটনাপঞ্জি উপস্থাপিত করা হলো।

১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭০। করাচি

বাংলাদেশের জনগণের দাবি ছ'দফা এখন বাস্তবায়ন সম্ভব। বিশ্বের কোন শক্তিই এ দাবি রোধ করতে পারবে না। –শেখ মুজিব।

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭০। লাহোর
পিপলস্ পার্টির সহযোগিতা ছাড়া সংবিধান প্রণয়ন চলবে না এবং কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করতে দেয়া হবে না। –ভুট্টো।

২১শে ডিসেম্বর, ১৯৭০। লাহোর
পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। বিরোধী দলীয় আসনে বসার জন্য পিপলস্ পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। সব ব্যাপারে আমাদের মতামত নিতে হবে এবং ক্ষমতার ভাগ দিতে হবে। –ভুট্টো

২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৭০। হায়দ্রাবাদ
পিপলস্ পার্টির সহযোগিতা ছাড়া কোন কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা যাবে না এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে কাজ করতে দেয়া হবে না। –ভুট্টো

২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৭০। করাচি
পিপলস্ পার্টিকে বিরোধীদলীয় আসনে বসবার যে কোন প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা হবে। –ভুট্টো

৩রা জানুয়ারি, ১৯৭১। ঢাকা
ছ'দফা এখন আর পার্টির সম্পত্তি নয়, জনগণের সম্পত্তি। ছ'দফা ও এগারো দফার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত সংবিধান প্রণীত হবে। এ ব্যাপারে কেউই আর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। –শেখ মুজিব

৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৭১। ঢাকা
ছ'দফার পক্ষে জনগণের রায় ও গণভোটের ফলাফল নির্বাচিত এমএনএদের পরিবর্তনের ক্ষমতা নেই। –শেখ মুজিব

১১ই জানুয়ারি, ১৯৭১। পটুয়াখালী
আওয়ামী লীগ একাই কেবলমাত্র কেন্দ্র ও পূর্ব বাংলায় মন্ত্রিসভা গঠনে সক্ষম। ছ'দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে জনতার দাবি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। –শেখ মুজিব

১৩ই জানুয়ারি, ১৯৭১। রাওয়ালপিন্ডি
দেশের সংহতি রক্ষাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। একটা সর্বসম্মত সংবিধান প্রণয়ন এখন হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। –ভুট্টো

১৪ই জানুয়ারি, ১৯৭১। ঢাকা
সংবিধান প্রণয়ন সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। –প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া

১৪ই জানুয়ারি, ১৯৭১। ঢাকা
শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী। যখন তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, আমি আর থাকবো না। এটা শীঘ্র শেখ মুজিবের সরকার হবে। –প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া।

৩০শে জানুয়ারি, ১৯৭১। ঢাকা
শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় অচলাবস্থা হয়নি। আমি পরবর্তীতে আরও আলোচনায় রাজি আছি। –ভুট্টো

৩রা জানুয়ারি, ১৯৭১। ঢাকা
লাহোরে হাইজ্যাক করা ভারতীয় বিমান ধ্বংসের ব্যাপারে পূর্ণ তদন্ত হওয়া দরকার। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। –শেখ মুজিব

৩রা জানুয়ারি ১৯৭১। লাহোর
লাহোরে হাইজ্যাক করা ভারতীয় ধ্বংসের জন্য পাকিস্তান সরকার দায়ী হতে পারে না। দু'জন কাশ্মীরী কমান্ডো এই বিমান ধ্বংস করেছে। এদের পাকিস্তানে আশ্রয় দেয়া উচিত। –ভুট্টো।

৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১। ঢাকা
পাকিস্তানের রাজনীতি হচ্ছে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার রাজনীতি। পার্লামেন্ট অধিবেশন আহ্বানে অহেতুক বিলম্ব দুঃখজনক। –শেখ মুজিব

১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১। ঢাকা
পাকিস্তানের জন্য একটা সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ সকাল ন' ঘটিকায় ঢাকার পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে পাকিস্তান জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করা হলো। –প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১। ঢাকা
ছ'দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণীত হবে। গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিদের সংখ্যাধিক্যের রায় মেনে নেয়া বাঞ্ছনীয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা আহ্বান জানাচ্ছি। –শেখ মুজিব

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১। পেশোয়ার
নির্বাচিত সংখ্যাগুরু দল (আওয়ামী লীগ) প্রকাশ্যে অথবা গোপনে আমাদের কিছুটা 'কনসেশনের' প্রতিশ্রুতি না দেয়া পর্যন্ত পিপলস্ পার্টি ঢাকায় ৩রা মার্চে আহূত জাতীয় সংসদের অধিবেশনে যোগদান করবে না। সংখ্যাগুরু দল কর্তৃক ইতিমধ্যে প্রণীত

একটা সংবিধান কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মতি দেয়ার জন্য আমার পার্টির সদস্যদের পক্ষে ঢাকা যাওয়া এবং 'অপমানিত' হয়ে ফিরে আসা সম্ভব নয়। –ভুট্টো

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১। কক্সবাজার

জুলফিকার আলী ভুট্টো কর্তৃক প্রদত্ত পূর্ব শর্ত পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি 'হুমকি স্বরূপ'। –মওলানা ভাসানী

১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১। ঢাকা

আওয়ামী লীগ এখন রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখছে। স্বার্থান্বেষী মহল থেকে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর নস্যাৎ করার প্রচেষ্টা চলছে।
–শেখ মুজিব

১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১। করাচি

বর্তমান পরিস্থিতিতে ঢাকায় আসন্ন জাতীয় সংসদের অধিবেশনে যোগদান অর্থহীন। জাতীয় সংসদ এখন একটা 'কসাইখানায়' পরিণত হয়েছে। –ভুট্টো

১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১। ঢাকা

বিশ্বের কোন শক্তিই আর বাঙালিদের দাসত্ব শৃংখলে আটকে রাখতে পারবে না। শহীদদের রক্ত আমরা বৃথা যেতে দিবো না। –শেখ মুজিব

২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১। ঢাকা

কায়েমী স্বার্থের দল ১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গের নির্বাচিত সরকারকে পদচ্যুত করেছিল, ১৯৫৫ সালে সামরিক শাসন জারি করেছিল। জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহূত হওয়ার পর এসব ষড়যন্ত্রকারীরা আঘাত হানার জন্য অশুভ পাঁয়তারা করছে। ভুট্টো ও তাঁর পিপলস্ পার্টি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আসন্ন সংসদ অধিবেশনের স্বাভাবিক কাজকর্মে বাধার সৃষ্টি করে শাসনতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর বানচান করার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্র করছে। –শেখ মুজিব

১লা মার্চ, ১৯৭১। করাচি

হয় আসন্ন জাতীয় সংসদের অধিবেশন পিছিয়ে দেয়া হোক, না হয় এলএফও প্রদত্ত দিনের মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে সংবিধান প্রণয়ন করার নির্দিষ্ট বিধি সংশোধন করা হোক। আর পিপলস্ পার্টির উপস্থিতি ছাড়া যথারীতি সংসদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে ভয়াবহ গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে এবং পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত জীবনযাত্রা নীরব ও নিথর করে দেয়া হবে। –ভুট্টো

১লা মার্চ, ১৯৭১। রাওয়ালপিন্ডি

পাকিস্তানে এখন ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমি জাতীয় সংসদের আসন্ন অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করলাম। –প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া

১লা মার্চ, ১৯৭১। ঢাকা

জাতীয় সংসদের আসন্ন অধিবেশন স্থগিত করা খুবই দুঃখজনক। আমরা যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে সক্ষম এবং সাত কোটি বাঙালির মুক্তির জন্য আমি চরম মূল্যদানে প্রস্তুত। ষড়যন্ত্রকারীদের শুভবুদ্ধির উদয় না হলে আমরা নতুন ইতিহাস রচনা করবো। আওয়ামী লীগের আপাতত প্রোগ্রাম হচ্ছে আজ ১লা মার্চ ঢাকায় এবং ৩রা মার্চ দেশব্যাপী হরতাল। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত জনসভায় চূড়ান্ত প্রোগ্রাম ঘোষণা করা হবে। –শেখ মুজিব

২রা মার্চ, ১৯৭১। ঢাকা

১লা মার্চ ঢাকার ফার্মগেটে নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলিবর্ষণের আমি তীব্র নিন্দা করছি এবং সরকারকে এ ধরনের হীন কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য হুঁশিয়ারি প্রদান করছি। বাঙালিদের আর দাবিয়ে রাখা যাবে না। বাংলাদেশে এভাবে আগুনের সূত্রপাত করলে, সরকার এর প্রজ্বলিত শিখার হাত থেকে রক্ষা পাবে না। আমি অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি এবং ৭ই মার্চ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের প্রোগ্রাম ঘোষণা করছি :

১. ৩রা মার্চ থেকে ৬ই মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ছ'টা থেকে বেলা দুটা পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে পূর্ণ হরতাল।
২. ৩রা মার্চ জাতীয় শোক দিবস এবং পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের ছাত্র-জনসভা
৩. বেতার ও টেলিভিশনে আন্দোলন সংক্রান্ত সঠিক সংবাদ ও বিবৃতি প্রচারিত না হলে বাঙালি কর্মচারীদের কর্মবিরতি
৪. ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বেলা দুটোয় জনসভা এবং পরবর্তী প্রোগ্রামের ঘোষণা –শেখ মুজিব

৩রা মার্চ, ১৯৭১। ঢাকা

পল্টন ময়দানে নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে ছাত্রলীগের আয়োজিত বিশাল জনসভায় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রস্তাবিত জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হলো এবং জাতীয় পতাকা প্রদর্শিত হলো।

জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত সরকারকে খাজনা ও ট্যাক্স দিবেন না। আন্দোলনের সাফল্যের জন্য আমি দলমত নির্বিশেষে সবার সহযোগিতা কামনা করছি। আমরা এখন আরও বেশি রক্ত দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। সাত কোটি বাঙালিকে হত্যা করেও বাঙালিদের প্রাণের দাবিকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। –শেখ মুজিব

৪ঠা মার্চ, ১৯৭১। করাচি

রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এই মুহূর্তে সংখ্যাগুরু দলের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেশের সংহতি রক্ষা করা অপরিহার্য। –এয়ার মার্শাল (অব.) আসগর খান

৪ঠা মার্চ, ১৯৭১। করাচি

পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্ত নির্বাচিত সদস্যদের পক্ষ থেকে জনাব ভুট্টোর কথা বলার অধিকার নেই এবং তাঁর পক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যদের হুমকি দেয়া শোভনীয় নয়। –মওলানা গোলাম গাউস হাজারভী

৪ঠা মার্চ, ১৯৭১। কোয়েটা

জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিতের ঘোষণা অবাঞ্ছিত অগণতান্ত্রিক। –বেলুচিস্তান ন্যাপ (ওয়ালী)

৪ঠা মার্চ, ১৯৭১। লাহোর

এখন আমরা এমন একটা অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি যখন পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হলে অবিলম্বে সংখ্যাগুরু দলের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর ছাড়া আর কোন পথ নেই –মালিক গোলাম জিলানী

৪ঠা মার্চ, ১৯৭১। ঢাকা

সাফল্যজনকভাবে পূর্ণ হরতাল পালনের জন্য আমি বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। যে কোন মূল্যে অধিকার আদায়ের জন্য জনতাকে সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমি এ মর্মে নির্দেশ দান করছি যে, হরতালজনিত পরিস্থিতির জন্য যেসব সরকারি ও বেসরকারি অফিসগুলোতে এখন পর্যন্ত মাসিক বেতন হয়নি, সেসব অফিসগুলো শুধুমাত্র বেতন দেয়ার জন্য প্রতিদিন বেলা ৩-৩০ থেকে বিকেল ৪৩০ পর্যন্ত খোলা থাকবে। সর্বোচ্চ ১৫০০০ টাকা পর্যন্ত বেতনের চেক ভাঙ্গাবার উদ্দেশ্যে ব্যাংকগুলোর জন্য একই নির্দেশ প্রযোজ্য হবে। –শেখ মুজিব

৫ই মার্চ, ১৯৭১। ঢাকা

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সমস্ত বাংলাদেশে পাঁচদিনব্যাপী হরতাল পালন– টঙ্গী, খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রামে গুলি– রংপুরে কারফিউ এবং ঢাকায় অসংখ্য সভা ও শোভাযাত্রা। কে জি মোস্তফার নেতৃত্বে ঢাকায় সাংবাদিকদের সভা ও শোভাযাত্রা। হাসান ইমাম ও গোলাম মোস্তফার নেতৃত্বে বাংলা একাডেমীতে শিল্পীদের সভা ও আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা। শহীদ মিনারে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সভা। সরকারি ও বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের শহীদ মিনারে র‍্যালি। এয়ারওয়েজ কর্মচারী ইউনিয়ন, ট্যানারি শ্রমিক ইউনিয়ন এবং ডাকসুর টর্চ শোভাযাত্রা। পল্টনে বাংলা ন্যাশনাল লীগের জনসভা। নিউ মার্কেটে অধ্যাপক মুজাফফর আহমদের সভাপতিত্বে ন্যাপ ওয়ালীর জনসভায় আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে মহিউদ্দীন আহমদ ও মতিয়া চৌধুরীর বক্তৃতা।

[সত্তরের নির্বাচনে পরাজিত হবার পর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতি প্রগতিশীল মহলের সমর্থনদানের সূচনা]

৬ই মার্চ, ১৯৭১। রাওয়ালপিন্ডি

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস-অ্যাডমিরাল এস এম আহ্সান অপসারিত এবং লে. জেনারেল টিক্কা খানকে নতুন গভর্নর হিসাবে নিয়ো। –ক্যাবিনেট ডিভিশনের বিজ্ঞপ্তি

৬ই মার্চ, ১৯৭১। রাওয়ালপিন্ডি

রাজনৈতিক দলগুলো অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে নিজেদের মধ্যে সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। আমি ১০ই মার্চ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বৈঠক আহ্বান করেছিলাম। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ এই বৈঠক প্রত্যাখ্যান করছেন। তাই এই প্রেক্ষাপটে আমি ২৫শে মার্চ ঢাকা জাতীয় সংসদের প্রস্তাবিত অধিবেশন আহ্বান করলাম। –প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান

৬ই মার্চ, ১৯৭১। ঢাকা

পরদিন বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবিত ভাষণ সম্পর্কে সর্বত্র জল্পনা-কল্পনা। অনেকের মতে তিনি এই জনসভায় বাংলাদেশের জন্য স্বঘোষিত স্বাধীনতার কথা বলবেন। কেননা, ছাত্রলীগ সম্পূর্ণভাবে এবং আওয়ামী লীগের প্রায় সবটাই উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। এঁরা স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত এবং জাতীয় পতাকার পর্যন্ত ব্যবস্থা করে ফেলেছে। অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুকে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকার প্রচেষ্টায় লিপ্ত।

দিবাগত রাতে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বত্রিশ নম্বরে বৈঠকে মিলিত হলো। গভীর রাতে কোন রকম সিদ্ধান্ত ছাড়াই বৈঠক মুলতবি হলো উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রবক্তা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পৃথকভাবে বৈঠকে মিলিত হলেন এবং প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা করলেন।

এর আগেই ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠকে কথাবার্তা চলাকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এরপর ইয়াহিয়া একটা বার্তা পাঠালেন–

"আমার অনুরোধ, তাড়াতাড়ি করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। শীঘ্র আমি ঢাকা এসে আপনার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করবো। আমি আশ্বাস দিতে পারি যে, জনগণের কাছে আপার প্রদত্ত ওয়াদা পালিত হতে পারে।"

৬ই মার্চ রাত ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনের এক মারাত্মক সমস্যাপূর্ণ রাত। তাঁর তখন এক ত্রিশংকু অবস্থা। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামান্য ভুল হলে তা হবে ভয়াবহ। এরকম এক অবস্থাতেও পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ বলতে গেলে 'দর্শকের ভূমিকায়' বসে রইলেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কোন অর্থসহ যোগাযোগের প্রচেষ্টা মাত্র করলেন না। শোনা যায় উপায়ান্তরহীন বঙ্গবন্ধু স্থানীয় সামরিক কর্তৃপক্ষকে এ মর্মে অনুরোধ করেছিলেন যে, তাকে কোনো গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু পরিস্থিতির ভয়াবহতার কথা চিন্তা করে সামরিক কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সাহসী হয়নি।

৭ই মার্চ, ১৯৭১। ঢাকা

পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিনি রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড সকালে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বত্রিশ নম্বরে সাক্ষাৎ করলেন। এই স্বল্পকালীন বৈঠক গোপনে অনুষ্ঠিত হলো। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে এই বৈঠকে মার্কিনি রাষ্ট্রদূত পরিষ্কার ভাষায় ওয়াশিংটনের সিদ্ধান্তের কথা বঙ্গবন্ধুকে জানিয়ে দেন। এই সিদ্ধান্ত হচ্ছে, 'পূর্ব বাংলায় স্বঘোষিত স্বাধীনতা হলে

যুক্তরাষ্ট্র তা সমর্থন করবে না।'

এরপর আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ পুনরায় বৈঠকে মিলিত হলেন এবং বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবিত বক্তৃতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। বৈঠক সমাপ্ত হওয়ার পর ইকবাল হল (সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) থেকে আগত উগ্র জাতীয়তাবাদী ছাত্র নেতৃবৃন্দ আবার বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বললেন এবং সভা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ছায়ার মতো বঙ্গবন্ধুকে অনুসরণ করলেন। এদের নেতৃত্বে ছিলেন সিরাজুল আলম খান, আ স ম আবদুর রব প্রমুখ। এঁদের বক্তব্য হচ্ছে, চরম ব্যবস্থা গ্রহণের পথ আর খোলা নেই– এখন হচ্ছে চরম ব্যবস্থা গ্রহণের সময়। আর এই ব্যবস্থা হচ্ছে 'পূর্ব বাংলার স্বঘোষিত স্বাধীনতা।' উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তির চাপে রাজনৈতিক পরিস্থিতির এতো দ্রুত পট পরিবর্তন হলো যে, পূর্ব বাংলার বামপন্থী মহল কিছুটা বিমূঢ় হলো বলা চলে এবং কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলো না।

৭ই মার্চ, ১৯৭১। ঢাকা

রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মরণীয় বক্তৃতা।... ... ...এরপর যদি একটা গুলি চলে– এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়– তোমাদের কাছে অনুরোধ রইলো, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই-ই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দিবে।

... ...গুলি করবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউই আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না।

... ...এবং আমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দিবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো– ইনশাআল্লাহ্।

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম– এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।–জয় বাংলা

মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগিশের নেতৃত্বে শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাতের পর এই জনসভায় শেখ সাহেব বক্তৃতাদানকালে চার দফা দাবীর উত্থাপন করলেন। ১. সামরিক আইন প্রত্যাহার, ২. সৈন্যবাহিনীকে ব্যারাকে প্রত্যাবর্তন, ৩. নিহতদের জন্য ক্ষতিপূরণ এবং ৪. জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর। রাজনৈতিক পণ্ডিতদের মতে এ সময় আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তি স্বঘোষিত স্বাধীনতার (ইউডিআই) জন্য শেখের ওপর মারাত্মক চাপের সৃষ্টি করেছিল। অন্যদিকে পার্টির প্রবীণ ও দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের ভৌগোলিক কাঠামোর মধ্যে আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। এরই বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ। বেলা ৩টা ২ মিনিট কাল এই ভাষণে একদিকে যেমন বঙ্গবন্ধুর শর্তাধীনে সংসদে যোগাদানের কথা বলেছেন; অন্যদিকে তেমনি 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম– এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'-এর কথাও বলেছেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের অবিস্মরণীয় ভাষণ সব মহলকেই সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষ

পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন ব্যর্থ হলেন। সম্ভবত রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাবই এর জন্য দায়ী। এর পাশাপাশি বাংলাদেশের বামপন্থী দলগুলো সাধারণ নির্বাচনে পেটি বুর্জোয়া পন্থী আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক বিজয়, উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্লোগান এবং পরবর্তীতে রক্তাক্ত পথে একটা সর্বাত্মক আন্দোলনের দ্রুত অগ্রগতিতে স্তম্ভিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলো। প্রগতিশলী মহলের একাংশ আওয়ামী লীগের লেজুড়বৃত্তি শুরু করলেও অন্যান্য অংশগুলো কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশের অভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো। এটাই হচ্ছে বাস্তব সত্য।

৭ই মার্চ বিকেল পৌনে চারটায় পূর্ব বাংলার নতুন গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খান ঢাকায় এসে পৌছলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রোগাম

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক জনসভার পর পেটি বুর্জোয়া পার্টি আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিল। ৭ই মার্চ রাতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অহিংসভাবে অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানালেন। প্রকাশিত হলো ১০ দফা প্রোগাম।

১. সরকারি খাজনা বন্ধ।
২. সরকারি ও বেসরকারি অফিস এবং কোর্ট-কাচারি বন্ধ।
৩. রেলওয়ে ও বন্দরের কাজ চালু থাকবে। তবে সামরিক বাহিনী ও যুদ্ধাস্ত্র বহন করা চলবে না।
৪. বেতার ও টিভিতে সমস্ত সংবাদ ও বিবৃতি প্রচারিত হবে। অন্যথায় বাঙালি কর্মচারীরা কর্মে বিরতি দেবে।
৫. বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কেবলমাত্র আন্তঃজেলা ট্রাঙ্ক-কল চালু থাকবে।
৬. সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ।
৭. স্টেট ব্যাংকের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনভাবে কোন ব্যাংক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা পাঠানো যাবে না।
৮. প্রতিদিন সমস্ত অট্টালিকায় কালো পতাকা উত্তোলন হবে।
৯. হরতাল প্রত্যাহার করা হলেও পরিস্থিতির মোকাবেলা আংশিক অথবা পূর্ণ হরতাল আহ্বান করা হবে।
১০. স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রতিটি মহল্লা, ইউনিয়ন, থানা, মহকুমা ও জেলা পর্যায়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হবে।

৯ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমেদ অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কিত সংশোধিত নির্দেশ জারি করলেন।

১. ব্যাংক :

ক. পূর্ব সপ্তাহের মতো মজুরি ও বেতনের টাকা প্রদান

খ. ১০০০ টাকা পর্যন্ত ব্যক্তিগত খরচের জন্য টাকা উত্তোলন

গ. কলকারখানা চালু রাখার লক্ষ্যে কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য টাকা প্রদান

২. স্টেট ব্যাংকের মাধ্যমে অথবা কোনওভাবে টাকা পাঠানো বন্ধ
৩. উপরোক্ত বিষয়গুলোর জন্য স্টেট ব্যাংক খোলা থাকবে
৪. ইপি ওয়াপদা : বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় শাখাগুলো খোলা থাকবে।
৫. ইপি এডিসি : সার ও পাওয়ার পাম্পের ডিজেল সরবরাহের কাজ করবে
৬. ধান ও পাট বীজ সরবরাহ হবে এবং ইট পোড়াবার কয়লা দিতে হবে
৭. খাদ্য যাতায়াত অব্যাহত থাকবে
৮. উপরে উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কিত চালান পাসের জন্য ট্রেজারি ও এজি অফিস কাজ করবে
৯. ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় রিলিফ বণ্টন অব্যাহত থাকবে
১০. বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চিঠিপত্র, তার এবং মানি অর্ডার পাঠানো অব্যাহত থাকবে। পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক চালু থাকবে। বিদেশে প্রেস টেলিগ্রাম ছাড়া আর কিছু পাঠানো যাবে না।
১১. বাংলাদেশের সর্বত্র 'ইপিআরটিও' চালু থাকবে
১২. গ্যাস ও পানি সরবরাহ অব্যাহত থাকবে
১৩. স্বাস্থ্য ও স্যানিটারি সার্ভিসগুলো চালু থাকবে
১৪. শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পুলিশ তার স্বেচ্ছাসেবকের সহযোগিতা গ্রহণ করবে
১৫. উপরে বর্ণিত আধা-সরকারি অফিসগুলো ছাড়া বাকি সব অফিসে হরতাল অব্যাহত থাকবে
১৬. গত সপ্তাহের জারিকৃত অন্যান্য নির্দেশ বহাল থাকবে

৭ই মার্চ, ১৯৭১। সরকারি প্রেস নোট

এক সপ্তাহে নিহত ১৭১ ও আহত ৩৫৮। চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, যশোর ও রাজশাহীতে সংঘর্ষ। ৬ই মার্চ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ভেঙ্গে কয়েদিদের পলায়ন এবং গুলিতে সাতজন নিহত। খুলনা-যশোরে সৈন্যবাহিনীর ট্রেন আক্রমণ। রাজশাহী, খুলনা ও যশোর টেলিফোন ভবন আক্রান্ত, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সৈয়দপুরে বাঙালি-অবাঙালি সংঘর্ষ এবং সামরিক বাহিনীর গুলিবর্ষণ।

৯ই মার্চ, মওলানা ভাসানীর বক্তৃতা

এরকম এক উত্তপ্ত পরিবেশে যখন স্বাধিকার আন্দোলন এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির পুরো নেতৃত্ব জাতীয়তাবাদী শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন তখন মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুস হামিদ খান ভাসানী একাত্তরের ৯ই মার্চ ঢাকায় পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ভাষণ দিলেন। আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে তিনি বললেন :

> "একদিন ভারতের বুকে নির্বিচারে গণহত্যা করিয়া জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মান্তিক ইতিহাস রচনা করিয়া অত্যাচার অবিচারের বন্যা বহাইয়া দিয়াও প্রবল পরাক্রমশালী ব্রিটিশ সরকার শেষ রক্ষায় সক্ষম হয় নাই। শেষ পর্যন্ত তাহাদের শুভবুদ্ধির উদয় হইয়াছে। পাক-ভারত উপমহাদেশকে শত্রুতে পরিণত না করিয়া সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের মধ্যে একদিন সূর্য অস্ত যাইত না, রূঢ় বাস্তবের কষাঘাতে সে সাম্রাজ্যের সূর্য আজ অস্তমিত।...প্রেসিডেন্ট

ইয়াহিয়াকেও তাই বলি, অনেক হইয়াছে, আর নয়। তিক্ততা বাড়াইয়া আর লাভ নাই। 'লা-কুম দ্বীনুকুম অলইয়াদ্বীন-এর (তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার) নিয়মে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লও।...মুজিবের নির্দেশ মতো আগামী ২৫ তারিখের মধ্যে কোন কিছু করা না হইলে আমি শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত মিলিত হইয়া ১৯৫২ সালের ন্যায় তুমুল আন্দোলন শুরু করিব। খামোকা কেহ মুজিবকে অবিশ্বাস করিবেন না, মুজিবকে আমি ভালো করিয়া চিনি।"

মওলানা ভাসানীর এই বক্তব্য থেকে একটা কথা অনুধাবন করা যায় যে, ইতিপূর্বে ছ'দফা আন্দোলন মার্কিনি মদপপুষ্ট বলে প্রগতিশীল মহলে যে রটনা করা হয়েছিল, তাতে কর্মীদের মনে দারুণ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। 'স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা' আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে প্রগতিশীল কর্মীদের প্রায় বিচ্ছিন্ন হবার মতো অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছিল। ঢাকায় অবস্থানকারী মার্ক্সীয় নেতৃবৃন্দ এর জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিলেন বলা যায়। সেদিন এদের পক্ষে রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হয়নি। তবুও প্রবীণ জননেতা মওলানা ভাসানীর ৯ই মার্চের বক্তব্য বিলম্বে হলেও প্রগতিশীল কর্মীদের চিন্তাধারায় বিভ্রান্তির কিছুটা অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল।

১১ই মার্চ, ১৯৭১। ঢাকা

১১ই মার্চ আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ অসযোগ আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করে সাফল্যজনকভাবে অব্যাহত রাখার জন্য জনতাকে অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করলেন। তিনি উল্লেখ করলেন যে, এ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশগুলোকে বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে জারি করা হয়েছে বলে গণ্য করতে হবে। জনাব আহমেদ এই দিন আরও ১৪টি অতিরিক্ত নির্দেশের কথা ঘোষণা করলেন।

অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত সংখ্যালঘু দলগুলোর প্রতিনিধিরা মওলানা মুফতি মাহমুদের সভাপতিত্বে জমায়েত হয়ে শেখ মুজিবের চার দফার দাবির প্রতি সমর্থন জানালো। বৈঠকে একমাত্র কাইয়ুম মুসলিম লীগ ছাড়া সব দলগুলো যথাক্রমে জমিয়াতুল উলেমা-ই-পাকিস্তান, জামাত-ইসলামী, কনভেনশন মুসলিম লীগ ও ন্যাপের (ওয়ালী) প্রতিনিধিরা এবং স্বতন্ত্র সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এসব নেতৃবৃন্দ সরকার গঠন এবং সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুরকে দেয়ার আহ্বান জানালো এবং মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকের প্রস্তাব করলো।

১৪ই মার্চ ভুট্টো কর্তৃক দুই পাকিস্তানের প্রস্তাব

করাচির নিশতার পার্কে আয়োজিত এক জনসভায় বক্তৃতা দানকালে পিপলস্ পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো স্পষ্ট ভাষায় বললেন, শেখ মুজিবুর রহমানের দাবি মোতাবেক পার্লামেন্টের বাইরে সংবিধান সংক্রান্ত 'সমঝোতা' ছাড়া ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের পৃথকভাবে দুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক।

১৫ই মার্চ ভুট্টোর সাংবাদিক সম্মেলন

১৫ই মার্চ করাচিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পিপলস্ পার্টির চেয়ারম্যান ভুট্টো বললেন, 'শুধুমাত্র সংখ্যাধিক্যের জন্য পাকিস্তানে শাসন পরিচালনা করা যাবে না। পিপলস্ পার্টিকে বাদ দিয়ে কোন সরকার গঠন সম্ভব নয়। পিপলস্ পার্টির পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাধিক্য রয়েছে। তাই কেন্দ্রের ক্ষমতা হস্তান্তর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু পার্টি দুটোর কাছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতা আওয়ামী লীগের কাছে হস্তান্তর করা সমীচীন হবে।

জনাব ভুট্টোর এই বক্তব্যের পর সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। মেসার্স নবাবজাদা নসরুল্লাহ (পিডিপি), মাহমুদুল হক উসমানী (ন্যাপ ওয়ালী), খাজা মাহমুদ মান্টু (কাউন্সিল মুসলিম লীগ), মিয়া নিজামুদ্দীন হায়দার (ভাওয়ালপুর যুক্তফ্রন্ট), সৈয়দ আলী আসগর শাহ (কনভেশন মুসলিম লীগ), মিয়া তেফাইল (জামায়ত), হামিদ সরফরাজ (পাঞ্জাব আওয়ামী লীগ), নবাবজাদা শের আলী খান, খাজা মোহাম্মদ সফদার (কাউন্সিল মুসলিম লীগ), এ আর এস শামসুল দোহা (রাওয়ালপিন্ডি আওয়ামী লীগ) প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে ভুট্টোর বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করলো।

আসগর খান পেশোয়ার আইনজীবী সমিতির সভায় বললেন, বর্তমান মুহূর্তে শেখ মুজিবুর রহমান দেশের দু'অংশকে একত্রে ধরে রেখেছেন। তাই সংখ্যাগুরু দলের কাছে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক এবং এটাই হচ্ছে গণতন্ত্র সম্মত।'

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রধান খান ওয়ালী খান সাংবাদিকদের কাছে বললেন, 'নির্বাচিত পার্লামেন্টের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। বাস্তবক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের আর অস্তিত্ব নেই। ১লা জুলাই থেকে এখানে চারটা পৃথক প্রদেশ হয়েছে।'

১৫ই মার্চ, ১৯৭১। ঢাকা

লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। –শেখ মুজিব

আওয়ামী লীগ থেকে অতিরিক্ত নির্দেশাবলী ঘোষণা করা হলো। ফলে নির্দেশ সংখ্যা দাঁড়ালো ৩৫টিতে।

১৫ই মার্চ, ১৯৭১। লাহোর

একটা দেশের দুইটা সংখ্যাগুরু পার্টির প্রশ্নই উঠতে পারে না। কেননা, পাকিস্তান হচ্ছে একটা ঐক্যবদ্ধ দেশ। সবার দৃষ্টি এখন আসন্ন ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠকের প্রতি রয়েছে। –মিয়া মমতাজ দৌলতানা

১৫ই মার্চ, ১৯৭১। ঢাকা

কড়া নিরাপত্তার মধ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ঢাকা আগমন এবং ১৮ পাঞ্জাব ইনফ্যানট্রি ব্যাটালিয়নের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট হাউসে (পুরনো গণভবন) গমন।

১৬ই মার্চ, ১৯৭১। ঢাকা

কোন পরামর্শদাতা ছাড়া ইয়াহিয়া-মুজিব প্রথম দফা বৈঠক। একদিকে ঐতিহাসিক নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যাগুরু দলের নেতা এবং বাস্তব ক্ষেত্রে যার নির্দেশে গত প্রায় আট সপ্তাহ ধরে পূর্ব বাংলার প্রশাসন পরিচালিত আর অন্যদিকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে দু'জনে দুই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কথাবার্তা বলেছেন। আলোচনা মুলতবি হলো।

১৭ই মার্চ, ১৯৭১। ঢাকা

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়াও এইদিন দ্বিতীয় দফা বৈঠকে উভয় পক্ষের পরামর্শদাতারাও যোগদান করলেন। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ জনসাধারণের গণতান্ত্রিক রায়ের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বললেন এবং ছ'দফার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত সংবিধান প্রণয়নের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করলেন। ফলে পৃথকভাবে প্রতিটি দফা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হলো। বৈদেশিক বাণিজ্যে, বৈদেশিক সাহায্য এবং ব্যাংকি প্রশ্নে কিছুটা অচলাবস্থার সৃষ্টি হলো। কিন্তু আওয়ামী লীগের যুক্তিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট বক্তব্যে সামরিক জান্তার পরামর্শদাতারা হতভম্ব হলেন। বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসে বঙ্গবন্ধু উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন।

১৭ই মার্চ, ১৯৭১। ঢাকা

প্রেসিডেন্ট ভবনে রাতে ইয়াহিয়া-টিক্কা খান স্বল্পকালীন বৈঠক হলো। ইয়াহিয়া খান বললেন, 'শয়তানটা ঠিকমতো কথাবার্তা বলছে না। রাত দশটায় গভর্নর টিক্কা খান জিওসি মেজর জেনারেল খাদেম হোসেন রাজাকে ফোন করে নির্দেশ দিলেন, খাদেম, তুমি চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি নাও।'

ঢাকায় সামরিক জান্তার জেনারেলদের বৈঠকে প্রণীত হলো নিরপরাধ বাঙালি হত্যার নীল নকশা 'অপারেশন সার্চলাইট'। ষোল অনুচ্ছেদে পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী এই নীল নকশায় গণহত্যার বিস্তারিত নির্দেশ সন্নিবেশ করা হলো।

এদিকে ইয়াহিয়া-মুজিব তৃতীয় দফা বৈঠকে উভয় পক্ষের মধ্যে কিছুটা সমঝোতার মনোভাব দেখা দিলো। পর্যবেক্ষকদের মতে এদিন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হলো যে, প্রথমত প্রেসিডেন্সিয়াল ঘোষণায় সামরিক আইনের শাসন প্রত্যাহার করে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রে আপাততঃ ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে সরকার থাকতে পারে, কিন্তু প্রদেশগুলোতে অবিলম্বে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সরকার গঠন করবে। তৃতীয়ত, পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রস্তাবিত পার্লামেন্টের নির্বাচিত প্রতিনধিরা পৃথক পৃথকভাবে মিলিত হয়ে ছ'দফার ভিত্তিতে খসড়া সংবিধানের সুপারিশ করবে এবং সংসদের আনুষ্ঠানিক অধিবেশনে তা চূড়ান্তকরণ করা যেতে পারে।

কিন্তু এ প্রস্তাবের ফলাফল খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হলো। কারণ একবার সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হলে ইয়াহিয়া খানের সামরিক জান্তার বৈধতার আইনগত প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। তবুও কেন্দ্রে ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে সরকার থাকার প্রস্তাবের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কিছুটা নমনীয় মনোভাব প্রকাশ করে

বললেন, 'ভুট্টো আপত্তি না করলে এ ধরনের একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে।'

করাচিতে অবস্থানরত ভুট্টোকে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ প্রস্তাবে রাজি হতে অস্বীকার করে তারবার্তা পাঠালেন, এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, তাঁর পার্টি সীমান্ত ও বেলুচিস্তানের পরিষদে সংখ্যালঘু। উপরন্তু সামরিক আইন প্রত্যাহার হলে পিপলস্ পার্টি অসুবিধার সম্মুখীন হতে বাধ্য।

অন্যদিকে ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা দীর্ঘায়িত হওয়ার প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ চূড়ান্ত সংগ্রামের প্রস্তুতি নিল। পূর্ব বাংলার সর্বত্র শুরু হলো যুবকদের সামরিক ট্রেনিং। এ সময় রুশ-সমর্থক প্রগতিশীল মহল এ ব্যাপারে সমর্থন জোগালো এবং আওয়ামী লীগের 'লেজুড়' হিসাবে কাজ করার জন্য এগিয়ে এলো। চীনা-সমর্থক মহলে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অব্যাহত রইলো।

১৯শে মার্চ, ১৯৭১। ঢাকা

জয়দেবপুরে সামরিক বাহিনীর গুলিবর্ষণ ও কারফিউ জারি। বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে বললেন, 'তারা (সামরিক জান্তা) যদি মনে করে থাকে যে, বুলেট দিয়ে জনগণের সংগ্রাম বন্ধ করতে সক্ষম হবে, তাহলে তারা আহম্মকের স্বর্গে বাস করছে।' এইদিন রাজধানী ঢাকা নগরীতে অসংখ্য প্রতিবাদ সভা ও শোভাযাত্রা হলো।

১৯শে মার্চ ইয়াহিয়া-মুজিব নব্বই মিনিটকাল আলোচনা হলো। পরে সন্ধ্যায় শেখের তিনজন পরামর্শদাতাদের সঙ্গে ইয়াহিয়ার পরামর্শদাতাদের পৃথক বৈঠক হলো। আওয়ামী লীগের এই তিনজন হচ্ছেন মেসার্স সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ এবং ড. কামাল হোসেন। 'জয় বাংলা' শ্লোগানের ব্যাখার কথা জানতে চাইলে বঙ্গবন্ধু বললেন, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময়েও তিনি কালেমা পাঠের সঙ্গে 'জয় বাংলা' উচ্চারণ করবেন।

২০শে মার্চ, ১৯৭১। ঢাকা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে চতুর্থ দফা বৈঠকে মিলিত হলেন। এ সময় মেসার্স সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, কামরুজ্জামান, মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমদ এবং ডা. কামাল হোসেনও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের পর বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের কাছে কোন মন্তব্য করতে অস্বীকার করলেন।

উভয় পক্ষের পরামর্শদাতারা পৃথকভাবে বিস্তারিত আলোচনা জন্য মিলিত হলেন।

অন্যদিকে লে. জেনারেল আব্দুল হামিদ ফ্লাগ স্টাফ হাউসে টিক্কা খানের সঙ্গে বৈঠক করলেন এবং গণহত্যার নীল নকশা 'অপারেশন সার্চলাইটের' প্রয়োজনীয় অনুমোদন দিলেন। অনেকের মতে এ ব্যাপারে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনাকালে টিক্কা খান এ মর্মে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক চলাকালেই সমস্ত আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতার করা হোক। কিন্তু এ প্রশ্নে জেনারেলদের মধ্যে দ্বিমতের সৃষ্টি হয়।

কাউন্সিল মুসলিম লীগের প্রধান মিয়া মোমতাজ দৌলতানা, ওয়ালী ন্যাপের প্রধান খান ওয়ালী খান, জমাতুল উলেমা-ই-ইসলামের মুফতি মাহমুদ প্রমুখ শেখ মুজিবের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হলেন।

২১শে মার্চ, ১৯৭১। ঢাকা

পিপল্স পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর পরামর্শদাতাদের সঙ্গে করে ঢাকায় আগমন করে প্রেসিডেন্ট-মুজিব আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত হলেন। ভুট্টোর বক্তব্য হচ্ছে, সমস্যা সমাধানের জন্য ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা হতে হবে। ভুট্টো এমর্মে ইয়াহিয়াকে জানিয়ে দিলেন যে, সম্মুখে অপেক্ষমাণ আলোচনার 'সমঝোতা' গ্রহণযোগ্য নয়।

এদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বাসভবনের সম্মুখে অপেক্ষমাণ এক বিরাট জনতার প্রতি ভাষণদানকালে বললেন যে, 'সাড়ে সাত কোটি মানুষের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনের গতি কোন ভাবেই মন্থর করা যাবে না।'

২২শে মার্চ, ১৯৭১। ঢাকা

আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ঢাকার প্রতিটি জাতীয় দৈনিক (একদিন পরে 'আজকের বাংলাদেশ' নামে অবজারভার ও পূর্বদেশ পত্রিকায়) 'বাংলাদেশের মুক্তি' নামে ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হলো। এতে অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমদ, অধ্যাপক রেহমান সোবহান ও কামরুজ্জামানের লেখা নিবন্ধ ছাপা হলো। এছাড়া বঙ্গবন্ধু এক লিখিত বাণীতে বললেন, ...'লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে হবে– প্রতিরোধের দুর্গ। আমাদের দাবি ন্যায়সংগত। তাই সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত। জয় বাংলা।"

এদিকে ঢাকার প্রেসিডেন্ট হাউস থেকে প্রচারিত এক ঘোষণায় ২৫শে মার্চ পার্লামেন্ট অধিবেশন পুনরায় স্থগিত ঘোষণা করা হলো।

জুলফিকার আলী ভুট্টো তাড়াহুড়া করে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন যে প্রেসিডেন্ট ভবনে এক 'ত্রিপক্ষীয়' আলোচনাকালে শেখ মুজিবের সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি স্বীকার করলেন যে, 'এ সময় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাকে ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করেন এবং বলেন যে, এসবই 'আমাদের মধ্যেকার চুক্তি' মোতাবেক অনুমোদনসাপেক্ষে হয়েছে। শেখ মুজিবের সঙ্গে জনাব ভুট্টোর আরও 'ফলপ্রসূ' এবং 'সন্তোষজনক' আলোচনা করতে আগ্রহী বলে জানালেন। কেননা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রথমে আমাকে ও শেখ মুজিবকে একমত হতে হবে।

এইদিন পাকিস্তান দিবস ২৩শে মার্চ উপলক্ষে প্রচারিত বাণীতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বললেন যে, 'পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মতামতের সমন্বয় সাধন করে একটা সন্তোষজনক সুরাহার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।'

এর পাশাপাশি ঢাকায় বিরাট জনসমাবেশে বক্তৃতাদানকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, 'কোন জাতির পক্ষে আত্মদান ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা ছাড়া সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব নয়। একটা ঐক্যবদ্ধ জাতিকে বেয়োনেট ও বুলেট দিয়ে দাবিয়ে রাখা যায় না।' একটা বিদেশী টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে তিনি বললেন, 'বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের তিনিই হচ্ছেন প্রতিনিধি। তাই একমাত্র তাঁরই শাসন করার অধিকার রয়েছে।'

২৩শে মার্চ, ১৯৭১। ঢাকা

ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনার প্রেক্ষাপটে আজ সকালে ও সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ ও সামরিক জান্তার পরামর্শদাতাদের মধ্যে দুই দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। তাজউদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও ড. কামাল হোসেন আওয়ামী লীগের পক্ষে এবং এম. এম. আহম্মদ, বিচারপতি এ. আ. কর্নেলিয়াস, লে. জেনারেল পীরজাদা ও কর্নেল হাসান সামরিক জান্তার পক্ষে বৈঠকগুলোতে উপস্থিত ছিলেন। খান আব্দুল কাইয়ুম খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো পৃথকভাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দ যথাক্রমে মিয়া মোমতাজ দৌলতানা, খান আব্দুল ওয়ালী খান, মওলানা মুফ্তি মাহমুদ, মওলানা শাহ্ আহম্মদ নুরানী এবং সরদার শওকাত হায়াত খান পৃথকভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হলেন।

খান আব্দুল কাইয়ুম খান পৃথকভাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর সঙ্গে বৈঠক করলেন। কাইয়ুম খান সাংবাদিকদের বললেন, 'যে ফর্মুলার ভিত্তিতে এখন আলোচনা চলছে, তা আমি জানি। কিন্তু এর বিস্তারিত কিছু বলবো না। এসব আলোচনার চূড়ান্ত ফলাফল আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঘোষিত হতে পারে।'

এদিন বিকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মিয়া মোমতাজ দৌলতানা বললেন, 'দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আমরা মনে করি যে, কয়েক মিনিটের মধ্যে এসব আলোচনার শুভ পরিণতি হওয়া উচিত।' কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি এগিয়ে এসে সাংবাদিকদের বললেন, 'আসুন আমরা সবাই ভালোর জন্য প্রার্থনা করি; কিন্তু আমাদের সবাইকে একটা ভয়ঙ্কর কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।'

বিকালে ৩২ নম্বর ধানমণ্ডির বাসভবনের সামনে এক বিরাট গণসমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আমরা তা' বরদাশ্‌ত করবো না। আমাদের দাবি অত্যন্ত স্পষ্ট ন্যায়সংগত এবং ওদের তা মেনে নিতে হবে। কোনরকম 'রক্তচক্ষু' দেখিয়ে লাভ নেই। আমাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। আমরা কোন শক্তির কাছে মাথা নত করবো না। আমরা বাংলাদেশের জনগণকে মুক্ত করবোই। আমাদের কেউ কিনতে পারবে না। সংগ্রাম আরও তীব্রতর করার নির্দেশ দেয়ার জন্য অধিকার আদায়ের ভয়াবহ সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। সাত কোটি বাঙালি আর দাস হয়ে থাকবে না।'

২৩শে মার্চ আয়ামী লীগের উদ্যোগে 'প্রতিরোধ দিবস' হিসাবে উদ্‌যাপিত হলো। আওয়ামী লীগের উগ্র জাতীয়তাবাদী অংশের 'চাপে ও ধমকের চোটে' বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা' সংগীত পরিবেশিত হলো এবং প্রতিটি গৃহে বাংলাদেশের নতুন জাতীয় পতাকা ও কালো পতাকা প্রদর্শিত হলো। সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। মুক্তিযুদ্ধকালে এঁরা পৃথকভাবে 'মুজিব বাহিনী' গঠন করে লড়াই করেছিল। পরবর্তীকালে এঁদের অধিকাংশ 'জাসদের' পতাকাতলে নয় আদর্শে একত্র হয়েছিল। পাকিস্তানের পতাকা ছিঁড়ে ফেলা হলো আর জিন্নাহর ফটো হলো ভস্মীভূত। রাস্তায় অগণিত মানুষের মিছিল আর গগনবিদারী 'জয় বাংলা' স্লোগানের আওয়াজ।

২৪শে মার্চ, ১৯৭১। ঢাকা

সমস্ত দিনব্যাপী বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হলো। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তিনজন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ এবং ডা. কামাল হোসেন প্রেসিডেন্ট ভবনে ইয়াহিয়া খানের পরামর্শদাতাদের সঙ্গে সকালে ও সন্ধ্যায় দুই দফা বৈঠকে আলোচনা করলেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার পরামর্শদাতারা হচ্ছেন বিচারপতি এ. আর. কর্নেলিয়াস, এম. এম. আহম্মদ, লে. জেনারেল এস জি এম পীরজাদা এবং কর্নেল হাসান (গোয়েন্দা বিভাগ)। সাংবাদিকদের নিকট তাজউদ্দিন আহমদ শুধু বললেন, 'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মধ্যে যেসব কথাবার্তা হয়েছে তারই আলোকে বিস্তারিত আলোচনার সিদ্ধান্ত পৌঁছার লক্ষ্যে এসব বৈঠক।'

এদিকে জুলফিকার আলী ভুট্টো অস্থিরভাবে হোটেল কক্ষে প্রায় সমস্ত দিন দলীয় পরামর্শদাতাদের নিয়ে ইয়াহিয়া-মুজিবের কথাবার্তা সম্পর্কে পার্টির বক্তব্য নির্ধারণে ব্যস্ত রইলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের পাঁচজন নেতা মিয়া মোমতাজ দৌলতানা, খান আব্দুল ওয়ালী খান, মওলানা মুফতি মাহমুদ, মওলানা শাহ আহমদ নূরানী এবং সরদার শওকত হায়াৎ খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

২৫শে মার্চ, ১৯৭১। ঢাকা

আজ সকালে জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর পার্টির পরামর্শদাতা জে. এ. রহিম এবং মোস্তফা খানকে সঙ্গে করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা করলেন। ৪৫ মিনিটব্যাপী এই বৈঠকে লে. জেনারেল পীরজাদাও উপস্থিত ছিলেন। পরে সাংবাদিকদের কাছে ভুট্টো সাহেব 'গুরুত্বপূর্ণ' কথাবার্তা বললেন। তিনি বললেন, বিকেলে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে পিপলস্ পার্টির নেতৃবৃন্দের আবার বৈঠক হবে। কেননা প্রেসিডেন্ট ও শেখ মুজিবের পরামর্শদাতাদের মধ্যে গতকালের বৈঠকে 'নতুন অবস্থার' সৃষ্টি হয়েছে। এজন্যই তিনি প্রেসিডেন্ট ও পীরজাদার সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। সাংবাদিকরা প্রশ্ন রাখলেন, 'তাহলে কি আলোচনা ভেঙ্গে গেছে?' জবাবে ভুট্টো পাশ কাটিয়ে বললেন, 'আমরা কোন অসুবিধার সৃষ্টি করছি না।'

স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে ভুট্টো বললেন, 'আওয়ামী লীগ যে ধরনের স্বায়ত্তশাসন চাচ্ছে তাকে আর প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন বলা চলে না। ওদের দাবি তো স্বায়ত্তশাসনের চেয়েও বেশি– প্রায় সার্বভৌমত্বের কাছাকাছি।'

২৫শে মার্চ, ১৯৭১। লাহোর

কাউন্সিল মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মিয়া মোহাম্মদ মোমতাজ খান দৌলতানা বললেন, জাতীয় পরিষদকে দু'ভাগে ভাগ করা চলবে না। তাহলে পাকিস্তানই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাবে। প্রস্তাবিত পার্লামেন্টের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যরা পৃথক পৃথকভাবে বৈঠকে মিলিত হওয়ার জন্য কোন কোন মহল থেকে যে পরামর্শ দেয়া হয়েছে, মিয়া সাহেব তার তীব্র বিরোধিতা করলেন।

২৫শে মার্চ, ১৯৭১। ঢাকা

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ গতকাল এক বিবৃতিতে রংপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে 'সামরিক অ্যাকশনের' জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। বিবৃতিতে তিনি বললেন যে, রংপুরে সান্ধ্য আইন আবার বলবৎ করা

হয়েছে এবং গুলিবর্ষণে অনেক হতাহতের খবর এসে পৌঁছুচ্ছে। ঢাকার উপকণ্ঠে মীরপুরেও উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয়েছে। এর ফলে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। যখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনার প্রেক্ষাপটে একটা রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা চলছে, তখন এ ধরনের ঘটনাবলী দুঃখজনকভাবে পরিবেশকে আরও ঘোলাটে করে।

২৫শে মার্চ, ১৯৭১। ঢাকা

আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "বিশ্বের কোন শক্তিই পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ন্যায়সঙ্গত এবং আইনসঙ্গত দাবিকে নস্যাৎ রতে পারবে না। জনতার দাবিকে 'শক্তির দাপটে' দাবিয়ে রাখার জন্য যদি কে . 'রক্তচক্ষু' প্রদর্শন করে, আমরা তা বরদাশ্‌ত করবো না এবং তা নিশ্চিহ্ন করে দেবো।'

আজ সমস্ত দিন ধরে বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বরের বাসভবনে যে জনতার ঢল নেমেছিল, সেসব সমাবেশ তিনি সুস্পষ্টভাবে এই ঘোষণা করলেন।

এর মধ্যেই বঙ্গবন্ধু খবর পেলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘু পার্টিগুলোর নেতৃবৃন্দ মেসার্স ওয়ালী খান, বেজেন্‌জো এবং মিয়া মোমতাজ দৌলতানা ঢাকা ত্যাগ করেছেন। এঁদের ধারণা ছিল যে, 'ইয়াহিয়া-মুজিব ফর্মুলা' গৃহীত হয়েছে। যে ফর্মুলায় বলা হয়েছিল যে, ১. সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে এবং আপাতত কেন্দ্রে ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে বেসামরিক সরকার গঠিত হবে। ২. প্রদেশগুলোতে নির্বাচিত সংখ্যাগুরু দল সরকার গঠন করবে এবং ৩. পার্লামেন্টের বাইরে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যরা পৃথকভাবে মিলিত হয়ে ছ'দফার প্রেক্ষাপটে সংবিধানের জন্য সুপারিশ করবে।

বেনেজনজো-ওয়ালী-দৌলতানার মতে ফর্মুলার প্রথম দুটি শর্ত মেনে নেয়া যায়। কিন্তু তিন নম্বর শর্ত অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের সংসদ সদস্যরা পৃথকভাবে মিলিত হওয়ার অর্থই হচ্ছে পিপলস্ পার্টির (১৩১টি আসনের ৮৮টি) মতামত পশ্চিম পাকিস্তানের মতামত হিসাবে গৃহীত হবে। অথচ পিপলস্ পার্টি বেলুচিস্তান ও উপজাতীয় এলাকায় একটি আসনও পায়নি এবং সীমান্তে ১৮টি আসনের মধ্যে মাত্র একটি আসনে বিজয়ী হয়েছে। এদিকে ভুট্টোর কথা হচ্ছে এই ফর্মুলা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এর ফলে বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশে পিপলস্ পার্টিকে বিরোধী দলীয় আসনে বসতে হবে। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচিত একমাত্র নেতা হিসাবে তিনি যে এতদিন পর্যন্ত দাবি জানাচ্ছেন, তা আর বাস্তবে কার্যকরী হবে না। উপরন্তু পাকিস্তানে সামরিক আইনের ছত্রছায়ায় এতদিন পর্যন্ত তিনি যে 'রক্ষাকবচ' উপভোগ করেছেন তা বিনষ্ট হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, সামরিক আইন প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে গর্বিত বেসামরিক সরকারের আইনসঙ্গত বৈধতার প্রশ্ন দেখা দিবে। কেননা যেখানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি রয়েছেন এবং সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হয়েছে, সেখানে এ ধরনের একটা বেসামরিক সরকারের অস্তিত্ব বজায় রাখা মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে।

প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা এম. এম. আহমদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রেসিডেন্টকে জানালেন যে, আওয়ামী লীগের উত্থাপিত ছ'দফা দাবির বৈদেশিক বাণিজ্য, পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং দ্বিধাবিভক্ত করা সম্ভব। তবে এতে

পশ্চিম পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা জনাব এ. কে. ব্রোহী মত প্রকাশ করলেন যে, একটা প্রেসিডেন্সিয়াল ঘোষণায় ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায়। 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স অ্যাক্টে' এ ধরনের নজির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রেসিডেন্টের অন্যতম পরামর্শদাতা বিচারপতি এ. আর. কর্নেলিয়াসের মতামত জানা যায়নি। সম্ভবত তিনি মত দানে বিরত ছিলেন। ২৫শে মার্চ এঁরা সবাই করাচিতে ফিরে গেলেন।

নয়া ফর্মুলার প্রেক্ষাপটে ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত একটা প্রেসিডেন্সিয়াল ঘোষণার প্রণয়নের উদ্দেশ্য প্রস্তাবিত বৈঠকে যোগদানের জন্য ২৫শে মার্চ সমস্ত দিন ধরে বঙ্গবন্ধুর পরামর্শদাতার 'আমন্ত্রণের' জন্য প্রতীক্ষা করলেন। এঁদের ধারণা ছিল যে, আনুষ্ঠানিকভাবে যখন ইয়াহিয়া-মুজিব ব্যর্থ হয়নি এবং বিভিন্ন প্রশ্নে বিস্তারিত আলোচনার জন্য উভয় পক্ষের পরামর্শদাতাদের মধ্যে বৈঠক অব্যাহত রয়েছে তখন 'নয়া ফর্মুলার' ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ২৫শে মার্চ লে. জেনারেল পীরজাদার কাছ থেকে আর সেই 'প্রত্যাশিত ফোন' এলো না বরং দিবাগত রাতে ঢাকায় শুরু হলো ইতিহাসের সবচেয়ে বর্বরোচিত ও পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড।

২৫শে মার্চ, ১৯৭১। ঢাকা

আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদিন সন্ধ্যায় জারিকৃত এক বিবৃতিতে 'সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের' বিষয়টি বিলম্বিত হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, 'প্রেসিডেন্টের ঢাকায় আগমন ও আলোচনার ফলে জনমনে এরকম একটা ধারণা হয়েছিল যে, দেশের ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষে চেতনার সৃষ্টি হয়েছে এবং রাজনৈতিকভাবে তা সমাধান সম্ভব।'

এই কারণেই আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। প্রেসিডেন্টও এ মর্মে বক্তব্য রেখেছেন যে, একমাত্র রাজনৈতিভাবে সংকটের সমাধান সম্ভব। তাঁর এই প্রতিশ্রুতির আলোকে কয়েকটি নীতিগত বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে এবং প্রেসিডেন্টের এতে তাঁর সম্মতির কথা বলেছেন। এরই প্রেক্ষাপটে আমার সহকর্মীরা প্রেসিডেন্টের পরামর্শদাতাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়ে নীতিগত প্রশ্নের সমাধানের বিষয় আলোচনা করেছেন। আমরা আমাদের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছি এবং সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য সর্বাধিক প্রচেষ্টা করেছি।

এক্ষণে আর বিলম্বিত হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। যদি তাঁরা মনে করে থাকেন যে, সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধান হওয়া প্রয়োজন, তাঁদের বোঝা উচিত যে আর কোন বিলম্বের অবকাশ নেই। কেননা এখন বিলম্বের অর্থই হবে দেশ ও জাতিকে এক ভয়াবহ সংকটের মধ্যে নিক্ষেপ করা।

অথচ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় সামরিক তৎপরতা শুরু করে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটানো হচ্ছে বলে আমাদের কাছে সংবাদ এসে পৌঁছুচ্ছে। সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করা হবে বলে ঘোষণা দিয়ে যখন প্রেসিডেন্ট খোদ ঢাকায় রয়েছেন, তখন বিভিন্ন এলাকা থেকে এ ধরনের সামরিক তৎপরতার খবর খুবই উদ্বেগজনক। গত সপ্তাহে জয়দেবপুরে গুলিবর্ষণের পর রংপুর, সৈয়দপুর প্রভৃতি এলাকায় সান্ধ্য আইন জারি করে বর্বর হামলা হচ্ছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। এদিকে চট্টগ্রামেও নিরস্ত্র জনতার ওপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করা হয়েছে।

বিশ্ববাসীর কাছে আমার আবেদন, যখন আমরা রাজনৈতিকভাবে সমস্যার সমাধানের জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছি, তখন ক্ষমতাসীনরা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের জন্য শেষ আঘাত হানছে।

তাই আমি ক্ষমতাসীনদের ষড়যন্ত্রকারী মহলকে জানিয়ে দিতে চাই যে, আপনাদের ষড়যন্ত্র সফল হতে পারে না। সাড়ে সাত কোটি জনতা চরম আত্মত্যাগের মাধ্যমে আপনাদের ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রস্তুত হয়েছে।

আমি গুলিবর্ষণ ও বর্বরতার তীব্র নিন্দা করছি এবং এর প্রতিবাদে ২৭শে মার্চ সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতালের ঘোষণা করছি।

পরিশেষে শেখ মুজিব সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য বিবৃতিতে বাংলাদেশের বীর জনতার প্রতি আহ্বান জানালেন।

[২৫শে মার্চ দিবাগত রাতেই পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী গণহত্যা শুরু করে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে।]

'আমার কবরের ওপর দিয়েই সৃষ্টি হবে একটা স্বাধীন বাংলাদেশের' -শেখ মুজিব

২৫শে মার্চ, ১৯৭১। করাচি

২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় গণহত্যার নির্দেশ দিয়ে আকস্মিকভাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া করাচির পথে ঢাকা ত্যাগ করলেন। দিবাগত রাতেই ঢাকায় শুরু হলো ইতিহাসের সবচেয়ে বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড। ২৫শে মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতির উদ্দেশ্য ভাষণদান করলেন। ......"আপনারা জানেন যে, আওয়ামী লীগ সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং জাতীয় পরিষদের বৈঠকের পূর্বেই ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানিয়েছিল। আমাদের আলোচনা চলাকালে মুজিব এ মর্মে প্রস্তাব করেছিল যে, অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের ব্যাপারটা আমি একটা ঘোষণা দিয়ে নিয়মিত করতে পারি। এই ঘোষণায় সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে।...যদিও এই প্রস্তাবে আইনের দিক দিয়ে এবং অন্যান্য দিক থেকে বেশ ক্রটিপূর্ণ ছিল, তবুও আমি শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের স্বার্থে নীতিগতভাবে এই প্রস্তাব মেনে নিতে রাজি হয়েছিলাম। তবে আমার একটা শর্ত ছিল। তা হচ্ছে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে এ ব্যাপারে একমত হতে হবে।

এরপর আমি এই ব্যাপারে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করি। প্রত্যেকে এক বাক্যে বলেন যে, এ ধরনের প্রস্তাবিত ঘোষণা আইনসম্মত হবে না। ...মুজিব যে ঘোষণার প্রস্তাব দিয়েছিল তা একটা ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

....তাঁর একগুঁয়েমি, একরোখা মনোভাব এবং যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় অনীহা শুধু একটা কথাই প্রমাণিত করে যে, এই ভদ্রলোক এবং তাঁর দল হচ্ছে পাকিস্তানের শত্রু এবং এঁরা দেশের অন্য অংশ থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে চায়। মুজিব দেশের অখণ্ডতা এবং নিরাপত্তার ওপর আঘাত হেনেছে। এ অপরাধের জন্য তাঁকে শাস্তি পেতেই হবে।

কিছু সংখ্যক ক্ষমতালোভী এবং দেশদ্রোহী ব্যক্তি দেশকে ধ্বংস করুক এবং ১২ কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলুক– তা আমরা বরদাশ্‌ত করতে পারি না।

....দেশে. এই ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য আজকে আমি দেশব্যাপী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আর রাজনৈতিক দল হিসাবে আওয়ামী লীগকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। সংবাদপত্রের ওপর পূর্ণ সেন্সরশিপ আরোপ করা হলো। এতদসংক্রান্ত সামরিক আইনের বিধিগুলো শীঘ্র জারি করা হবে।

এ সম্পর্কে প্রখ্যাত ব্রিটিশ পত্রিকা গার্ডিয়ানে (৫ই জুন ১৯৭১) 'গণহত্যার নির্দেশ দানের অজুহাত', শীর্ষক প্রকাশিত এক নিবন্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অন্যতম পরামর্শদাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রেহমান সোবহানের মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

"....আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে না। কেননা ইয়াহিয়া ও তাঁর পরামর্শদাতারা কোন সময়েই চরমপত্র দেয়নি কিংবা মীমাংসার জন্য সর্বনিম্ন শর্তের কথাও বলেনি। পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোকে 'ফ্রিহ্যান্ড' দেয়া এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য কেন্দ্রে ইয়াহিয়া খানকে একটা বেসামরিক সরকার গঠনের ক্ষমতার প্রস্তাবে অন্তত মনে হচ্ছিল যে, ইয়াহিয়া খান একটা সমঝোতায় আসবে। অবশ্য এই ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবের কর্তৃত্বের কথাও রয়েছে।

....এখন একথা পরিষ্কার হলো যে, ইয়াহিয়া এই আলোচনাকে আরও সৈন্য আনার উদ্দেশ্যে আবরণ হিসাবে ব্যবহার করেছে। উপরন্তু এই আলোচনার বাহানায় পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ থেকে একঘরে করা হয়েছে। বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের সুস্পষ্ট প্রক্রিয়া ও শর্তাবলীর কথা কারো জনা নেই।

....একথা ঠিক যে, ছ'দফা দাবি পাকিস্তানের অখণ্ডতার বিরোধি এ ধরনের কোন বক্তব্য ইয়াহিয়া বলেননি। মুজিবের দাবির কোন সংশোধনের প্রশ্নই উথাপিত হয়নি। কেননা ইয়াহিয়া এ ধরনের সংশোধনের কথাবার্তাই বলেননি।

ইয়াহিয়ার জন্য এটা খুবই দুঃখজনক যে, ইয়াহিয়া যখন ঢাকায় ছিল, তখন নানা উস্কানির মুখে মুজিব শান্তি ও শৃংখলাজনিত পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। এতদসত্ত্বেও ইয়াহিয়া ঠাণ্ডা মাথায় গণহত্যা শুরুর জন্য টিক্কা খানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ইয়াহিয়া জানতেন যে, ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের শেষ আশাকে বিনষ্ট করছেন। ২৫শে মার্চ সন্ধ্যা রাতে মুজিব জনৈক পশ্চিম পাকিস্তানিকে বলেছেন, পাকিস্তানের দুই অংশকে একত্রে রাখার জন্য আমি আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেছি। কিন্তু ইয়াহিয়া খান সমস্যা সমাধানের জন্য সামরিক অ্যাকশনকে বেছে নিলেন এবং এখানেই পাকিস্তানের সমাপ্তি হলো। মুজিব আরও জানালেন যে, তাঁর মনে হচ্ছে তাঁকে হয়তো হত্যা করা হবে। কিন্তু তাঁর কবরের ওপর দিয়েই সৃষ্টি হবে একটা স্বাধীন বাংলাদেশের।"

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের অবস্থান ও মওলানা ভাসানীর কার্যক্রম

সংক্ষিপ্ত আকারে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের অবস্থান ও মওলানা ভাসানীর কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। তবে নানা ঘটনাপ্রবাহ ও উত্থান-পতনের মধ্যে পূর্ব বাংলায় বামপন্থী আন্দোলনের একটা রূপরেখা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে উপস্থাপনার প্রচেষ্টা করেছি। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে একদিকে মধ্যবিত্ত নেতৃত্বে মার্কসিস্ট পার্টিগুলো বহুধা বিভক্ত আর অন্যদিকে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদ তখন জনপ্রিয়তা চরম শিখরে। উপরন্তু পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি সামরিক হামলার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে যে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হলো তার নেতৃত্ব সম্পূর্ণভাবে আওয়ামী লীগের কব্জায়। ইয়াহিয়া খানের সামরিক বাহিনীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক বিজয়লাভের দরুন বিশ্ব জনমতের নিকট আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ তখন পূর্ব বাংলার আইনসঙ্গত জনপ্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল।

এই অবস্থায় বামপন্থী দলগুলোর নীতি ও অবস্থান নিচে দেয়া হলো :

১.	কমিউনিস্ট পার্টি (মণি সিং)	:	মুজিবনগর সরকারে সমর্থক
২.	ন্যাপ (মুজাফফর)	:	ঐ
৩.	ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)	:	ঐ
৪.	পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল)–তোয়াহা	:	বাংলাদেশের মাটিতে থেকে মুক্তিযুদ্ধ– ভারতের সাহায্যে নয়।
৫.	শ্রমিক আন্দোলন (সিরাজ শিকদার)	:	পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ– কিন্তু 'ভারতীয় দালাল মুক্তিযোদ্ধার' বিরুদ্ধে লড়াই।
৬.	পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্টপার্টি (এম এল)– আবদুল হক	:	মুক্তিযুদ্ধের নামে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় আগ্রাসন– অতএব মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই।
৭.	পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম এল)– মতিন-আলাউদ্দীন	:	চারু মজুমদারের লাইন সঠিক– সুতরাং বিপ্লবের স্তর হবে সমাজতান্ত্রিকা
৮.	কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি (জাফর-মেনন-হায়দার-রনো)	:	মওলানা ভাসানীকে চেয়ারম্যান ঘোষণা করে কোলকাতা মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি গঠন ও মুজিবনগর সরকারের নিকট অস্ত্রের আবেদন।

৯. পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি
(দেবেন-বাশার-আফতাব) ঐ

১০. কমিউনিস্ট সংহতি কেন্দ্র
(অমলসেন-নজরুল) ঐ

১১. কমিউনিস্ট কর্মী সংঘ
(সাইফুর-মারুফ-দাউদ) ঐ

১২. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি
(হাতিয়ার)– নাসিম অলি ঐ

১৩. ন্যাপ (ভাসানী) ঐ

১৪. পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন
(অচিন্ত্য-দিলীপ) : মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সমর্থক

১৫. পূর্ব বাংলার ছাত্র ইউনিয়ন
(মাহবুবউল্লাহ) ঐ

১৬. পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন
(হায়দার খান রনো : পূর্ব বাংলার মাটিতে থেকে মুক্তিযুদ্ধ।

এ থেকেই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বামপন্থী দলগুলোর অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করা সম্ভব। আলোচনার সুবিধার জন্য এ সময় বামপন্থীদের ভূমিকার ভিত্তিতে এঁদের তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

প্রথমত, রুশপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি : এঁরা সত্তরের নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েও নীতির প্রশ্নে ও কৌশলগত কারণে মুজিবনগর সরকারের সমর্থক। অনেকের মতে এটা হচ্ছে আওয়ামী লীগের 'লেজুড়বৃত্তি' নীতি! এতদসত্ত্বেও মুজিবনগর সরকার এঁদের হাতে অস্ত্র প্রদানে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এঁরা প্রয়োজনীয় অনুমতির পর পৃথকভাবে কিছু কর্মীদের গেরিলা ট্রেনিং প্রদানে সক্ষম হয়েছিলেন। মোটামুটিভাবে এদের সমর্থকরা মুক্তিযুদ্ধের ন'মাসকাল সময় স্বেচ্ছাসেবকমূলক কাজ এবং প্রচার ও প্রোপাগাণ্ডার কাজে লিপ্ত ছিলেন।

দ্বিতীয়ত, চীনা উগ্রপন্থী দল : চীন-পাকিস্তান মৈত্রী এবং পাকিস্তান সামরিক জান্তার পক্ষে চীনের সক্রিয় সহযোগিতার ফলে এঁরা (কিছুটা 'বিভ্রান্ত' হয়ে?) দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়াই পর্যন্ত করেছে। এরা ছিলেন মাওবাদীর অন্ধ সমর্থক এবং মেহনতী জনতার মুক্তির জন্য নিবেদিতপ্রাণ। কিন্তু এসব দলের নেতৃত্ব ছিল মধ্যবিত্তদের কুক্ষিগত এবং এদের কর্মকাণ্ডের এলাকা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অনেকের মতে দেশের অভ্যন্তরে অবস্থান করা সত্ত্বেও গণমানুষের কাছে এঁদের বক্তব্য দুর্বোধ্য এবং ভাষা বোধগম্য নয়। এদের পক্ষে উগ্র জাতীয়তাবাদী স্লোগানকে মোকাবেলা করা সম্ভব হয়নি।

তৃতীয়ত, চীনের নীতির প্রতি সহানুভূতিশীল দল : এঁরা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে কোলকাতায় 'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি' গঠন করে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মারফত নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে আগ্রহী ছিলেন। কোলকাতায় শিয়ালদা রেল স্টেশনের কাছে টাওয়ার হোটেলে একাত্তরের মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে এসব দলগুলোর নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা জমায়েত হয়ে প্রাথমিক আলোচনার পর একটা খসড়া কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। অন্যদের মধ্যে ন্যাপ-ভাসানীর সাধারণ সম্পাদক জনাব মশিউর রহমান যাদু মিয়াও এইসব আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মওলানা ভাসানী এ সময় মশিউর রহমানের সঙ্গে আলোচনা করা তো দূরের কথা সাক্ষাৎদানে পর্যন্ত অস্বীকার করেছিলেন। সম্ভবত একটা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মশিউর রহমান ২৪শে মে তারিখে আকস্মিকভাবে টাওয়ার হোটেল থেকে 'উধাও' হয়ে যান। পরদিন সকালে পুলিশ কেবলমাত্র তাকেই গ্রেফতার করতে এসেছিল। প্রখ্যাত দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের বাসগৃহ তল্লাশি করে।

পরে কোলকাতায় এ মর্মে সংবাদ এসে পৌছায় যে, জনাব মশিউর রহ: ান সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে সারেন্ডার করেছেন। দিন কয়েক পরে তাঁকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে মুক্তি দেয়া হলে তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেন এবং 'বিতর্কমূলক' বক্তব্য রাখেন। মওলানা ভাসানী ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমানকে পার্টি থেকে বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন।

যা হোক কোলকাতার বেলেঘাটার একটা স্কুল ভবনে ৩০শে মে তারিখে চীন-সমর্থক বাংলাদেশের বামপন্থী নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের একটা প্রকাশ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড ভরদা চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় 'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'। সিদ্ধান্ত অনুসারে কমিটির পক্ষ থেকে জনাব রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটা স্মারকলিপি প্রদান করেন। স্মরকলিপির প্রধান বক্তব্য ছিল 'মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে শর্তহীন অধিকারী।'

কিন্তু 'অর্থবহ' কারণে মুজিবনগর সরকার চীনা-সমর্থক বামপন্থীদের একাংশের এই দাবি অর্থাৎ সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া এবং অস্ত্র প্রদানের দাবি গ্রহণ করতে পারল না। জাতীয়তাবাদীদের মতে এর পিছনে বেশ কয়েকটা সুস্পষ্ট কারণ রয়েছে। প্রথমত, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর প্রতি চীনের প্রকাশ্য ও সক্রিয় সমর্থন। দ্বিতীয়ত, চীনা-সমর্থক বামপন্থীদের কতকগুলো গ্রুপ যেখানে প্রকাশ্যে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে নীতি ঘোষণা করে বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, সেখানে চীনা-সমর্থক বামপন্থীদের অন্য কয়েকটি গ্রুপকে সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ও অস্ত্র প্রদান সম্ভব নয়।

চতুর্থত মাওবাদীদের স্মারকলিপি : একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ যখন বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এবং লড়াইয়ের ময়দানে হাজার হাজার জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করছে ও বিভিন্ন ক্যাম্পে অসংখ্য যুবক ট্রেনিংয়ের প্রতীক্ষায় রয়েছে, সেখানে সমন্বয় কমিটির এ ধরনের প্রস্তাবের বাস্তবায়ন 'অযৌক্তিক' বলে বিবেচিত

হলো। চতুর্থত, যেখানে রুশ-সমর্থক বামপন্থীরা প্রথম থেকেই মুক্তিযুদ্ধ এবং আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে গঠিত মুজিবনগর সরকারের প্রতি সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করা সত্ত্বেও এঁদের কর্মীদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রশ্নে অঘোষিত বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে, সেখানে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি 'বৈরী মনোভাব পোষণকারী' মাওবাদীদের আকস্মিকভাবে দাখিলকৃত স্মারকলিপি বিবেচনা করা সম্ভব হলো না।

এখানে প্রাসংগিক হবে বিধায় একটা বিষয়ের উপস্থাপনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। নির্বাসিত মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়েছিল জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে। জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগ হচ্ছে একটা সংস্কারপন্থী মনোভাবাপন্ন পেটি-বুর্জোয়া পার্টি। এই পার্টি সব সময়েই পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু সত্তরের নির্বাচনে ঐতিহাসিক বিজয় আন্দোলনের নেতৃত্ব যখন উগ্র জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে তখন রাজনীতিতে অপরিপক্ব পাকিস্তানের সামরিক জান্তা পঁচিশে মার্চ সামরিক হামলার মাধ্যমে 'মুক্তিযুদ্ধকে চাপিয়ে দেয়ায়' আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে শুরু হলো এই মুক্তিযুদ্ধ।

ফলে নির্বাসিত আওয়ামী লীগ সরকার যথার্থভাবে দুটো নীতি গ্রহণ করেছিল। প্রথমত, মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বামপন্থীরা যাতে সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করতে না পারে এবং বামপন্থীদের নিকট যাতে অস্ত্র না যায়। কেননা পরবর্তীকালে বামপন্থীরা সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। দ্বিতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করা চলবে না। এতে করে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব জাতীয়তাবাদীদের হাত থেকে মার্কসিস্টদের কাছে চলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে অনেকের মতে মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে যাতে যুদ্ধের নেতৃত্ব বামপন্থীরা দখল না করতে পারে তার জন্যই মুক্তিবাহিনী ছাড়াও উন্নত ধরনের ট্রেনিং দিয়ে মুজিব বাহিনী তৈরি করা হয়েছিল।

তাই পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে চলাকালীন সময়ে শ্রেণী চরিত্র হিসাবে আওয়ামী লীগের মুজিবনগর সরকার অত্যন্ত দক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। বামপন্থীরা যাতে সামরিক প্রশিক্ষণ না পায় এবং বামপন্থীদের হাতে যাতে অস্ত্র না যায়, তার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল এই মুজিবনগর সরকার। সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের পূর্বে প্রতিটি যুবকের প্রকৃত পরিচয় গ্রহণ করা ছাড়াও এঁদের রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এ মর্মে একটা পরিচ্ছন্ন ঘোষণা হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল যে, 'মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের সমর্থন লাভে মুজিবনগর সরকার আগ্রহী থাকলেও কৌশলগত কারণে বামপন্থীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া সম্ভব ছিল না।'

মোদ্দা কথা, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বামপন্থী দলগুলোর অবস্থা পর্যালাচোনা করলে দেখা যায় যে, নীতির প্রশ্নে এদের প্রয়োজনীয় সম্পর্কের অভাব ছিল। এ সময় এঁদের সুষ্ঠু কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাব পরিলক্ষিত হয়। বামপন্থী দলগুলোর রুশপন্থীরা তখন মুজিনগর সরকারের সমর্থক। চীনপন্থীদের একাংশ প্রকাশ্যে মুক্তিযুদ্ধের ভূমিকা পালনের জন্য মুজিবনগর সরকারের কাছে সামরিক প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রের জন্য স্মারকলিপি পেশ করেছে।

একটা কথা প্রাসংগিক হবে বলে বিনীতভাবে উল্লেখ করা যায় যে, নীতিগত সংঘাত বিদ্যমান থাকলে সেখানে মার্কসিস্টদের পক্ষে অস্ত্র ভিক্ষা করাটা সমীচীন নয়।

মার্কসীয় পণ্ডিতদের মতে 'অস্ত্র দখল করতে হয়'। মার্কসীয় দলগুলোর নেতৃত্ব মধ্যবিত্তদের হাতে থাকায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে প্রবীণ জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ভূমিকা সম্পর্কে কিছুটা উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। এ সম্পর্কে কিছু বলার প্রাক্কালে দুটো বিষয় মনে রাখা দরকার। প্রথমত, মওলানা ভাসানী কোন সময়েই কমিউনিস্ট ছিলেন না। কিন্তু তিনি আজীবন মেহনতী মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে গেছেন এবং এই সংগ্রামকে উদারমনা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যথার্থ বলে দাবি করেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি মনেপ্রাণে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক ছিলেন।

উনসত্তরে তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারে পর থেকে দ্রুত ঘটনাপ্রবাহের (গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় আইয়ুবের পদত্যাগ, সাধারণ নির্বাচন, ঘূর্ণিঝড়, স্বাধিকার আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ) মাঝ দিয়ে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, দেশ ও জাতির নেতৃত্বে এখন তাঁরই হাতে সৃষ্ট পার্টি আওয়ামী লীগের হাতে এবং তাঁর এককালীন স্নেহভাজন শিষ্য শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা এখন চরম শিখরে রয়েছে।

এজন্যই তিনি একাত্তরের ৯ই মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভায় ভাষণদানকালে বলেছিলেন, "...প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকেও তাই বলি, অনেক হইয়াছে, আর নয়। তিক্ততা বাড়াইয়া আর লাভ নাই। 'লাকুম দ্বীনকুম্ অলইয়াদ্বীন'-এর (তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার।) নিয়মে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লও।–মুজিবের নির্দেশমতো আগামী ২৫ তারিখের মধ্যে কোন কিছু করা না হইলে, আমি শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত হাত মিলাইয়া ১৯৫২ সালের ন্যায় তুমুল আন্দোলন শুরু করিবো। খামকা কেহ মুজিবকে অবিশ্বাস করিবেন না, মুজিবকে আমি ভালো করিয়া চিনি।..."

আবার ১৯৭১ সালের ২৫শে জুন তারিখে মওলানা ভাসানী নিজের স্বাক্ষরিত একটা লিখিত ভাষণ প্রচারের উদ্দেশ্যে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে পাঠালেন। যথাসময়ে তার এই বিবৃতি স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত হলো। বিবৃতিতে তিনি বললেন, "...সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন সরকারের মনে রাখা উচিত আক্রমণকারী এহিয়া সরকারকে যতই অস্ত্রশস্ত্র তাহারা প্রদান করুক না কেন সাড়ে সাত কোটি স্বাধীন বাঙালির দেশকে আক্রমণকারীর হাত হইতে মুক্ত করার প্রাণের দাবি নস্যাৎ করিতে কখনই তাহারা পারিবে না।..."

তাই আশা করি, মানবতার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা, চীন জালেম সরকারকে স্বাধীন বাংলায় টিকাইয়া রাখার জন্য অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য প্রদান করিলে ইতিহাসের কাঠগড়ায় তাহাদিগকেও একদিন আসামি হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। তাই আমি দুনিয়ার সকল দেশের শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণ ও সরকারের নিকট আবেদন করি এহিয়া সরকারকে এই ধরনের মানবতাবিরোধী অস্ত্র ও অর্থ সাহায্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন ও প্রতিরোধ গড়িয়া তুলুন।

প্রসঙ্গত, আমি উল্লেখ করিতে চাই বাংলার স্বাধীনতার দাবিকে নস্যাৎ করিবার ষড়যন্ত্র যতই গভীর হউক না কেন তাহা ব্যর্থ হইবেই। মীমাংসার ধোঁকাবাজিতে জীবনের সকল সম্পদ হারাইয়া, নারীর ইজ্জত, ঘর-বাড়ি হারাইয়া, দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া এবং দশ লক্ষ অমূল্য প্রাণ দান করিয়া স্বাধীন বাংলার সংগ্রামী

জনসাধারণ আর কিছুই গ্রহণ করিবে না। তাদের একমাত্র পথ হয় পূর্ণ স্বাধীনতা, না হয় মৃত্যু। মাঝখানে গোঁজামিলের কোন স্থান নেই। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিকে নস্যাৎ করিয়া গোঁজামিল দিবার জন্য যে কোন দল এহিয়া খানের সহিত হাত মিলাইবে, তাহাদের অবস্থা গণবিরোধী মুসলিম লীগের চাইতেও ধিকৃত হইবে। তাহাদের রাজনৈতিক মৃত্যু দেহ রোধ করিতে পারিবে না।"

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী টাঙ্গাইলের সন্তোষে মওলানা ভাসানীর বাড়ি-ঘর ও সহায়সম্পত্তি ধ্বংস করায় তিনি আত্মগোপন করলেন। তিনি যমুনা নদীতে (ব্রহ্মপুত্র) নৌকার মধ্যে আশ্রয় নিলেন। এ সময় ন্যাপ-ভাসানীসহ বামপন্থী দলগুলোর নেতৃবৃন্দ নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেন। সম্ভবত নির্বাসিত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের সংবাদে তিনি সীমান্ত অতিক্রমের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত মওলানা সাহেব নৌকাযোগে তাঁর যৌবনের রাজনীতির এলাকা আসামে গিয়ে হাজির হন। এখানে গোয়ালপাড়া জেলার শিশুমারীতে তিনি আশ্রয় লাভ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিভাগপূর্ব যুগে মওলানা ভাসানী আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। তখন আসামের তরুণ আইনজীবী মইনুল হক কিছুদিনের জন্য মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। একাত্তরের সেই মইনুল হচ্ছেন কংগ্রেসী ইন্দিরা-মন্ত্রিভার সদস্য।

কার্যোপলক্ষে ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরী গোয়ালপাড়ার শিশুমারীতে এলে মওলানার সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়। স্বল্পকালীন ব্যবধানে মওলানা ভাসানীকে কোলকাতায় নিয়ে আসা হয়। পার্ক স্ট্রিটের কোহিনূর ম্যানশনের পাঁচতলায় একটা ফ্ল্যাটে নিরাপত্তার জন্য মওলানা সাহেবের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। এই বিল্ডিংয়ের আর একটা ফ্ল্যাটে থাকতেন নির্বাসিত মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের (প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন স্বয়ং থাকতেন থিয়েটার রোডে অবস্থিত অস্থায়ী সচিবালয়ের অফিস কক্ষের পার্শ্ববর্তী কামরায়) পরিবার। কোহিনূর ম্যানশনে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রীদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো।

এরপর মে মাসের শেষ সপ্তাহে কোলকাতায় চীনাপন্থী কয়েকটি বামপন্থী দলের সমর্থকদের কয়েক দিনব্যাপী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আগেই উল্লেখ করেছি যে, কোলকাতার বেলেঘাটায় কমরেড বরদা চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এসব বামপন্থীদের সম্মেলনে মওলানা ভাসানীকে চেয়ারম্যান করে বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। আশ্চর্যজনক হলেও একথা সত্য যে, মওলানা সাহেব স্বয়ং কোলকাতায় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এঁদের আয়োজিত কোন আলোচনা সভা কিংবা প্রকাশ্য অধিবেশনে যোগ দেননি। চীনাপন্থীদের মতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাকে এসব বৈঠকে যোগ দেয়ার অনুমতি দেয়নি। তাহলে কয়েকটা বিরাট প্রশ্ন থেকে যায় যে, ন্যাপ ভাসানীর সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান সমন্বয় কমিটি গঠন সংক্রান্ত ব্যাপারে পার্টির সভাপতি মওলানা ভাসানীর সঙ্গে আলোচনার জন্য সাক্ষাৎপ্রার্থী হলে মওলানা সাহেব তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কেন? আর কেনইবা ২৪শে মে তারিখে মশিউর রহমান কোলকাতা থেকে উধাও হয়ে সীমান্তের ওপারে পাকবাহিনীর কাছে 'সারেন্ডার' করলেন? কেন তাকে গ্রেফতার করার জন্য ভারতীয় পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছিল? কেন মওলানা সাহেব তাঁকে ন্যাপ ভাসানী থেকে বহিষ্কার করলেন? আর কেনইবা মওলানা সাহেব পরবর্তীতে মুজিবনগর সরকারের আয়োজিত সর্বদলীয় (চীনাপন্থীরা ছাড়া) উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে যোগ দিয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা

রেখেছিলেন। এতগুলো প্রশ্ন তো রহস্যের অন্তরালেই রয়ে গেলো।

এখানে আর একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, একাত্তরের এপ্রিল মাসে মওলানা ভাসানী যখন আত্মগোপন করে যমুনা নদীবক্ষে নৌকায় অবস্থান করছিলেন তখন থেকেই ন্যাপ-মুজাফফরের সিরাজগঞ্জ মহকুমার সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম তাঁর ব্যক্তিগত সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করে যাচ্ছিলেন। রুশপন্থী সাইফুল ইসলাম সব সময়ই ছায়ার মতো মওলানা সাহেবের সঙ্গী ছিলেন এবং জনাব ইসলাম ছিলেন মওলানা সাহেবের সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন। মওলানার পক্ষে সাইফুল ইসলাম এসময় কোলকাতার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিবৃতি পাঠ করলেন। এই বিবৃতিতে মওলানা সাহেব দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সোচ্চার হলেন।

মওলানা ভাসানী একাত্তরের মে মাসের শেষের দিকে আসামের ভাসানীরচরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। প্রায় তিন যুগ আগে আসামের গৌরীপুর এস্টেটের এই ভাসানীরচরে ছিল তাঁর আস্তানা। এখান থেকে সে যুগে আসামের তথা অবিভক্ত ভারতের রাজনীতির অংগনে তিনি বিচরণ করেছিলেন। তখন তিনি ছিলেন আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি। ভাসানীরচরে যাওয়ার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল তাঁর, এককালীন মুরিদদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। কিন্তু ভাসানীরচরে যাওয়ার পথে কুচবিহারের পুনডিবাড়িতে পৌছার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর অসুখ গুরুতর আকার ধারণ করলে তাঁকে চিকিৎসার জন্য বিমানযোগে জুন মাসে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়।

মওলানা ভাসানী কিছুটা সুস্থ হলে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে কোনরকম পরামর্শদাতা ছাড়াই ভাসানী-ইন্দিরা দেড় ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এরপর পূর্ণ সুস্থতার জন্য মওলানা ভাসানীকে দেরাদুনের শৈত্যাবাসে পাঠানো হয়। চীনাপন্থী কারো কারো মতে মওলানাকে প্রথম থেকেই ভারতীয় প্রহরায় রাখা হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট আওয়ামী লীগারদের মতে মুজিবনগর সরকারের অনুরোধেই বাংলাদেশের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিশেষত কোলকাতায় তখন বেশ কিছু সংখ্যক পাকিস্তানি গুপ্তচর অনুপ্রবেশ করেছিল।

মওলানা সাহেব যখন দেরাদুনে অবস্থান করছিলেন তখন মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে তার কাছে এক জরুরি বার্তা পৌছলো। বার্তায় বলা হলো যে, একদিকে আওয়ামী লীগ রা মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের জন্য প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে, অন্যদিকে ন্যাপ-মুজাফফর, কমরেড মণি সিংহের কমিউনিস্ট পার্টি আর মনোরঞ্জন ধরের কংগ্রেস থেকে দাবি করা হচ্ছে যে, মুজিবনগর সরকারের প্রতি সমর্থনের প্রেক্ষাপটে মন্ত্রিসভায় এসব দলের প্রতিনিধি নিয়ে সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করা হোক। এঁদের যুক্তি হচ্ছে, সমগ্র জাতি যেখানে মুক্তিযুদ্ধে জড়িত সেখানে মুজিবনগর মন্ত্রিসভা শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাটা অন্যায়। বার্তায় আরও বলা হলো যে, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বর্তমান অবস্থায় একবার মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করার কাজ শুরু হলে এর সমাপ্তি করা মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে এবং সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধের চেয়ে পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে বেশি জড়িত হয়ে পড়বেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ তাঁর বার্তায় বর্ষীয়ান নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সহযোগিতা কামনা করে অবিলম্বে কোলকাতায় আসার জরুরি অনুরোধ জানালেন।

মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। আবার তিনি জানতেন যে, এতদিন ধরে সমর্থনদানের পর রুশপন্থীরা মন্ত্রিসভায়

অন্তর্ভুক্ত হতে আগ্রহী। এছাড়া তিনি উপলব্ধি করলেন যে, এই সুযোগে মনোরঞ্জন ধরের কংগ্রেসও মুজিবনগর মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত হতে চায়। তিনি আরও জানতেন যে, প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের প্রতি আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির সংখ্যাগুরু অংশের সমর্থন নাই। সুতরাং একবার মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ অথবা পুনর্গঠনের কর্মকাণ্ড শুরু হলে উপদলীয় রাজনীতির ভয়াবহ বহিঃপ্রকাশ দেখা দিবে এবং তা মুক্তিযুদ্ধের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক হবে।

মওলানা সাহেব পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুভব করে পূর্ণ সুস্থ হওয়ার আগেই সাইফুল ইসলামকে সঙ্গে করে কোলকাতায় আগমন করলেন। এবার তাঁর থাকার ব্যবস্থা হলো হাজরা স্ট্রিটে। এ সময় একদিন কার্যোপলক্ষে সিলেট থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের বিশ্বাসভাজন আব্দুস সামাদ এলেন স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের বালীগঞ্জের রেকর্ডিং স্টুডিয়োতে। আমার স্ব কণ্ঠে প্রচারিত 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান তখন জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এছাড়া তখন আমি মুজিবনগর সরকারের প্রচার বিভাগের অধিকর্তা। বাহান্নোর ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে সামাদ সাহেব আমার বিশেষ পরিচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'জন একই সঙ্গে আইন অধ্যয়ন করতাম এবং দু'জনেই পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এমনকি একবার সলিমুল্লাহ হলের ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য সামাদ সাহেব প্রার্থী হলে আমিই ছিলাম তাঁর দলের চিফ হুইপ।

বালীগঞ্জের রেকর্ডিং স্টুডিয়োতে দেখা হতেই আমিই তাঁর কাছ থেকে সর্বশেষ রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলাম। জনাব সামাদ আমাকে একান্তে নিয়ে সব কিছু বলার পর পরামর্শ চাইলেন কিভাবে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের 'মুখ' বন্ধ করা যায়। অনেক আলাপ-আলোচনার পর আমি তাঁকে বললাম যে, মুক্তিযুদ্ধের বৃহত্তর স্বার্থে মুজিবনগর মন্ত্রিসভাকে সম্প্রসারণ কিংবা সর্বদলীয় করা সম্ভব নয়। এর কারণ হিসাবে বললাম যে, 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান ছাড়াও স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের সবগুলো 'প্রোপাগাণ্ডামূলক অনুষ্ঠানে' আমরা পূর্ব পাকিস্তানের তথাকথিত ডা. মালেকের মন্ত্রিসভার এই বলে তীব্র সমালোচনা করছি যে, সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থীদের সমবায়ে এই মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। ভোটের মাধ্যমে জনগণ যাদের প্রত্যাখ্যান করেছে, গভর্নর মালেক তাঁদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেছে। যেমন রংপুরে আবুল কাশেম, বরিশালের আখতারউদ্দিন, খুলনার মওলানা ইউসুফ, ঢাকার এ এস এম সোলায়মান প্রমুখ।

একইভাবে মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভাকে 'সর্বদলীয় চরিত্র' করার নামে যাঁরা মন্ত্রিসভার সদস্য হতে আগ্রহী হয়েছেন অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে তাঁরাও পরাজিত এবং জনগণ তাঁদের প্রত্যাখ্যান করেছেন। যেমন ন্যাপ-মোজাফফরের অধ্যাপক মোজাফফর থেকে সৈয়দ আলতাফ পর্যন্ত এবং কংগ্রেসের সভাপতি মনোরঞ্জন ধর প্রমুখ। সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির (মণি সিং) সমর্থিত ন্যাপ-মোজাফফর কেন্দ্রীয় পরিষদে ৪০টি এবং প্রাদেশিক পরিষদে ১১০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রাদেশিক পরিষদে একমাত্র সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ছাড়া বাকি সব আসনে পরাজিত হয়েছে। তাই কাদের নিয়ে সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করবেন? 'এঁরা সবাই তো' নির্বাচনে পরাজিত? সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ শতকরা ৯৮টি আসন দখল করায় এঁরাই হচ্ছে জনগণের বৈধ প্রতিনিধি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন

সময়ে মুজিবনগর সরকারকে সর্বদলীয় করার নামে সম্প্রসারিত করার প্রচেষ্টা গণতন্ত্রবিরোধী। এখানে সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হলে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে আমাদের পক্ষে আর হানাদার বাহিনীর দালাল ডা. মালেকের মন্ত্রিসভাকে সমালোচনা করা সম্ভব হবে না।

পরিশেষে সামাদ সাহেবকে বললাম, আপনি তো এককালে গণতন্ত্রী দল ও 'ন্যাপ' করার সময় মওলানা ভাসানীর খুবই স্নেহভাজন ছিলেন। তাই এখান থেকে সোজা হাজরা স্ট্রিটে হুজুরের কাছে চলে যান আর এই বক্তব্য পেশ করুন্ দেখবেন মওলানা সাহেব এ যাত্রায় আপনাদের রক্ষা করবেন।

দিন দুয়েক পরে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনকারী সমস্ত দল ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। মওলানা ভাসানী এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করলেন এবং ঘণ্টাধিককাল সময় ধরে সামগ্রিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যাদান করে বক্তৃতা করলে। তিনি পরিষ্কারভাবে বললেন, সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের কাছে অন্যান্য সমস্ত পার্টির প্রার্থীরা পরাজিত হয়েছে বলে সঙ্গত কারণেই এসব নেতাদের নিয়ে সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন সম্ভব নয়। 'হারু পার্টির দল তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। ইলেকশনে হারার পর এখন আবার মুজিবনগরে বসে মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখো। বুকে সাহস থাকে তো লড়াইয়ের ময়দানে যাও। পোলাপানগো পাশে দাঁড়ায়ে লড়াই করো।'

এই বৈঠকে মওলানা ভাসানীর প্রস্তাব অনুসারে মুজিবনগর সরকারের নীতিনির্ধারণ সংক্রান্ত একটা সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। অবশ্য মওলানা সাহেব এই কমিটিতে চীনা সমর্থক বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটিকে গ্রহণ করার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু বৈঠকে উপস্থিত প্রত্যেকটি দলের প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটিতে ভাসানী ন্যাপ থেকে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, মুজাফফর ন্যাপ থেকে অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ, বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেসের মনোরঞ্জন ধর, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড মণি সিং, মুজিবনগর সরকার থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।

আওয়ামী লীগের মুখপত্র 'সাপ্তাহিক জয় বাংলা' পত্রিকায় সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি সংক্রান্ত নিম্নোক্ত সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল :

"বর্তমান মুক্তিযুদ্ধকে সফল সমাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারকে উপদেশ দানের জন্য বাংলাদেশের চারটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে যে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে, তার খবর দেশ-বিদেশের সংবাদপত্রে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে এবং এ সম্পর্কে অনেক উৎসাহী আলোচনাও মুদ্রিত হয়েছে। বস্তুত এই সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হওয়ায় জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে জাতির যে নিবিড় ও অটুট ঐক্য আরেকবার প্রমাণিত হলো, তাতে বাংলাদেশের শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু দেশগুলোও উৎসাহিত হবেন। বস্তুত এই উপদেষ্টা কমিটি গঠনের গুরুত্ব এইখানেই যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনৈক্যের সৃষ্টির জন্য সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত এবং উগ্র তত্ত্বসর্বস্বদের সুবিধাবাদী ভেদনীতি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হলো এবং জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের লক্ষ্যে অবিচল চারটি প্রগতিশীল দল বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের প্রতি তাদের ঘোষিত সমর্থন আরো কার্যকর ও সক্রিয় করে তুললেন। এই ব্যাপারে এই দলগুলোর ভূমিকার

যেমন প্রশংসা করতে হয় তেমনি প্রশংসা করতে হয় আওয়ামী লীগেরও। আওয়ামী লীগ গত সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশে প্রায় শতকরা নিরানব্বইটি আসনে জয়লাভ করলে জাতিকে নেতৃত্বদানের অবিসম্বাদী অধিকার লাভ করা সত্ত্বেও মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনায় অন্যান্য প্রগতিশীল দলের সমর্থন ও উপদেশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত দ্বারা দলীয় স্বার্থের সঙ্গে জাতীয় স্বার্থের প্রতি তাদের আনুগত্য বলিষ্ঠভাবে প্রমাণ করেছেন।

"সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটিতে যারা রয়েছেন, তাদের রাজনৈতিক মত ও পথে পার্থক্য থাকলেও সকলেই দেশপ্রেমিক। কমিটিতে ভাসানী ন্যাপের প্রতিনিধিত্ব করছেন মওলানা ভাসানী, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিত্ব করছেন শ্রী মণি সিং, বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেসের মনোরঞ্জন ধর এবং মুজাফফর ন্যাপের অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই কমিটিতে রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী কমিটির বৈঠক আহ্বান ও পরিচালনা করবেন।

"মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা কমিটির প্রথম বৈঠকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারই যে বাংলাদেশের একমাত্র বৈধ সরকার এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের অবিসম্বাদী জাতীয় নেতা এ সত্যটির অকুণ্ঠ অভিব্যক্তি দেখা গেছে। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির এই সমঝোতা ও অভিন্নতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

"বাংলাদেশের গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার এবং এই সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির মধ্যে স্বাভাবিক চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু রয়েছে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগত ঐক্য। এই লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা। চরিত্রগত পার্থক্যের ক্ষেত্রে বলা চলে, গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত একমাত্র সংস্থা। জনগণের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা কার্যকর করার সম্পূর্ণ এখতিয়ার তার। অন্যদিকে জনগণের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর করার ব্যাপারে সাহায্য ও সুপরামর্শ দান হবে উপদেষ্টা কমিটির কাজ। তাই এই উপদেষ্টা কমিটি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ দ্বারা গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার মুক্তিযুদ্ধকে জোরদার করার কাজে একটি বলিষ্ঠ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিয়েছে বলা চলে। এই ব্যবস্থার ফলে বাংলাদেশের সকল এলাকায় স্বাধীনতা এবং হানাদার দস্যুদের চূড়ান্ত পরাজয়ের দিন অবশ্যই ত্বরান্বিত হবে।"

এরপরেও মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের প্রশ্নে আওয়ামী লীগ থেকে চাপ অব্যাহত থাকে। আওয়ামী লীগের একটি উপ-দল পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠক আহ্বানের দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে। পশ্চিম বাংলার জলপাইগুড়ি অঞ্চলে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির আহূত অধিবেশনে সৈয়দ নজরুল ও তাজউদ্দিন ঐক্যবদ্ধভাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন। মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করা হয়।

এদিকে সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠনের পর মওলানা ভাসানী এক স্বল্পকালীন সফরে আসামে গিয়ে হাজির হলেন। অসুস্থতার জন্য মে মাসে তিনি আসামের পথে কুচবিহার পর্যন্ত সে প্রস্তাবিত সফর বাতিল করেছিলেন। এবার আসামে গিয়ে তিনি সরাসরি ভাসানীরচরে তাঁর মুরিদদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এটাই ছিল আসামে তাঁর শেষ সফর।

আসাম সফর শেষে মওলানা ভাসানী পূর্ণ সুস্থতা লাভ এবং বিশ্রামের জন্য আবার গেলেন দেরাদুনের শৈত্যাবাসে। এবার তিনি দেরাদুনে ৬/৭ সপ্তাহকাল অবস্থান করেন। এখান থেকেই তিনি চীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুং-এর কাছে এক তারাবার্তা

প্রেরণ করেন। তারবার্তায় মওলানা সাহেব কমরেড মাওকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করার অনুরোধ জানান। চেয়ারম্যান মাও-এর কাছে প্রেরিত এই বার্তা দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর মওলানা সাহেব এই মর্মে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উথান্ট-এর কাছেও তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন। তবুও কোন কোন মহল থেকে মওলানা ভাসানী সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা অব্যাহত থাকে।

একাত্তরের সেপ্টেম্বর মাসে মুজিবনগর সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে যোগদানের জন্য মওলানা সাহেব কোলকাতায় আগমন করেন। এবার কমিটির বৈঠকের গুরুত্ব অনুধাবন করে মুজিবনগর সরকার ব্যাপক প্রচারের নির্দেশ দিলে সর্বদলীয় কমিটিতে ভাষণদানরত মওলানা ভাসানীর নিউজ ফটো তথ্য দফতর থেকে দেশ-বিদেশে প্রচারের ব্যবস্থা করা হলো। এমনকি জাতিসংঘের প্রতিনিধিদের মধ্যেও এই ফটো বিতরণের জন্য পাঠানো হলো। ফলে প্রমাণিত হলো যে, মওলানা ভাসানী বরাবরই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে রয়েছেন।

সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে যোগদানের পর মওলানা ভাসানী আবার বিশ্রামের জন্য দেরাদুনে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু দেরাদুনে আগমনের পর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তিনি মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ ও অধ্যাপক মুজাফফর আহমদের কাছে তারবার্তা পাঠালেন। সঙ্গে সঙ্গে মওলানা সাহেবের সুচিকিৎসার জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হলো। এতে ভারত সরকারও উদ্বিগ্ন হন এবং দিল্লি থেকে অবিলম্বে জনৈক বিশেষজ্ঞ-চিকিৎসাবিদকে দেরাদুনে হেলিকপ্টারে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। এই বিশেষজ্ঞের প্রেসক্রিপশন মোতাবেক জেনেভা থেকে বিমানযোগে ওষুধ আনার পর মওলানা ভাসানী সুস্থ হয়ে ওঠেন। তখন বাংলাদেশে লড়াইয়ের ময়দানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মোকাবেলায় মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়ের পালা শুরু হয়েছে।

এর অল্পদিনের মধ্যেই একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে সৃষ্টি হলো স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সর্বত্র 'জয় বাংলা' স্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এলেন। হৈচৈ আর ডামাডোলের মধ্যে বাংলাদেশের নয়া সরকার মওলানার জন্য প্রয়োজনীয় সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা কিংবা সম্মান প্রদর্শন কোনটাই করলো না। পাকিস্তানের সমর্থক দক্ষিণপন্থী দলগুলো ছাড়াও বাংলাদেশে তখন চীন-সমর্থক বামপন্থী দলগুলোর বেশ দুর্দিন। নেতৃবৃন্দরা যোগাযোগবিহীন আর কর্মীরা বিভ্রান্ত ও বিমূঢ়। প্রবীণ জননেতা মওলানা ভাসানী সন্তোষের অগ্নিদগ্ধ ভাঙ্গা বাড়িতে বসে নীরবে সবকিছু অবলোকন করলেন।

'দেয়ার ইজ নাথিং কল ফাউল ইন লাভ, ওয়ার এ্যান্ড পলিটিক্স'। অর্থাৎ প্রেম, যুদ্ধ আর রাজনীতিতে 'ফাউল' বলে কোন শব্দ নেই। যে মওলানা সাহেব পাকিস্তান অর্জিত হবার পর সর্বপ্রথম 'সেক্যুলার' রাজনীতি ও চিন্তাধারার জন্ম দিয়েছিলেন ও সংগ্রাম করেছিলেন, প্রায় ২৪ বছর পর সেই মওলানা সাহেব জনগণের ধর্মীয়বোধ আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করলেন। একই নিঃশ্বাসে তিনি ভারত-বিরোধী কথাবার্তাও বললেন। ছিন্নবিচ্ছিন্ন চরম দক্ষিণ ও চরম বামপন্থীরা আবার আশার আলো দেখতে পেলো।

এদিকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সঠিক পরিস্থিতি ও যুব সমাজের নতুন চিন্তাধারা দেখে 'বিমূঢ়' হয়ে রইলেন। এঁরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধার ভূমিকা পালনে আগ্রহী। এঁদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে সমাজে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা দরকার। তাই বঙ্গবন্ধু স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী হয়ে ক্ষমা প্রদর্শন আর মহানুভবতার নীতি গ্রহণ করলেন। পরাজিত প্রশাসনের অফিসাররা চাকরি ফিরে পাওয়া ছাড়া চাকরির ধারাবাহিকতা ও সিনিয়রিটি লাভ করলো। বেতার ও টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশে আবার শুরু হলো ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

অনেকের মতে রাজনৈতিক মঞ্চে মওলানা ভাসানীর নতুন ভূমিকা দেখে বঙ্গবন্ধু খুশিই হয়েছিলেন।

তাহলে কী বলতে হয় যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতা বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান আর মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী আজীবন একটা অঘোষিত গোপন সমঝোতার ভিত্তিতে রাজনীতি করে গেলেন?

১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানীর বিখ্যাত বক্তৃতা 'আসস্-সালামু আলাইকুম', আর ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ছ'দফা দাবির একটা যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় কেন?

১৯৬৮ সালে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধু আটক হলে মওলানা ভাসানী 'ডোন্ট ডিস্টার্ব আয়ুব' নীতি পরিহার করে চীনা-সমর্থক বামপন্থীদের নিয়ে জাতীয়তাবাদী শক্তির সঙ্গে একই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আইয়ুব-বিরোধী গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন কেন?

আর কেনইবা মওলানা সাহেব উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব সদ্য কারামুক্ত বঙ্গবন্ধুর হাতে ছেড়ে দিলেন?

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু যখন পাকিস্তানের কারাগারে, তখন কেনইবা মওলানা ভাসানী চীনাপন্থীদের বিদদনা করে মুজিবনগর সরকারের 'গার্জিয়ান' হয়ে ন'মাসকাল সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছিলেন?

আবার ১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠনের পর বঙ্গবন্ধু স্বয়ং কেন সন্তোষ গমন করেছিলেন আর কেনইবা সন্তোষে 'মুজিব তোরণ' নির্মাণ ছাড়াও বিপুল সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল?

আর কেনইবা বঙ্গবন্ধু সন্তোষের প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিরাট অংকের অর্থ সাহায্য করেছিলেন?

তাহলে কী বুঝতে হবে যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে মজলুম নেতা মওলানা ভাসানী আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একে অপরের সম্পূরক ছিলেন? দু'জনেই তো জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা? সত্যিই, রাজনীতির কী অপার মহিমা!

তৎকালীন পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলের কাগমারীতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৪৭ সালের আগস্ট থেকে শুরু করে দশ বছর পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে গঠিত দক্ষিণপন্থীদের মোকাবেলায় জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থীদের মধ্যে যে অঘোষিত মোর্চা হয়েছিল, কাগমারী সম্মেলনে তার পরিসমাপ্তি হলে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। পরবর্তী ১০/১২ বছরের মধ্যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী মহল সংগঠিত হয়ে রাজনৈতিক অংগনে নিজেদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করতে সক্ষম হলেও নানা কারণে বামপন্থীদের পক্ষে তা আর সম্ভব হয়নি।

কাগমারী সম্মেলনের ... বছর পরে সে আমলের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করলে একথা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয় যে, সেদিন পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নে বামপন্থীদের পক্ষে আওয়ামী লীগ পরিত্যাগ করা রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করে না। এ ধরনের একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করা উচিত ছিল বলে মনে হয়।

১৯৫৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি কাগমারীতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থীদের মধ্যে তুমুল বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। যদিও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, তবুও কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে তখন আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য ছিলেন মাত্র তেরোজন। পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নে তীব্র সমালোচনার মুখে প্রধানমন্ত্রী সোহ্‌রাওয়ার্দী পদত্যাগের কথা উচ্চারণ করে বললেন যে, কোয়ালিশন সরকারের সংখ্যালঘু অংশীদার হয়ে তাঁর পক্ষে আওয়ামী লীগ মেনিফেস্টোতে ঘোষিত পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করা আপাতত সম্ভব নয়। সম্মেলনে পার্টিকে আসন্ন ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য উভয় গ্রুপের 'মুখরক্ষা' করে একটা বিকল্প প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আওয়ামী লীগের বামপন্থী উপ-দল থেকে এই কাগমারী সম্মেলনে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে যে, পার্টির কর্মকর্তাদের কেউ মন্ত্রিত্বের শপথ গ্রহণ করলে তাঁকে পার্টির কর্মকর্তার দায়িত্ব পরিত্যাগ করতে হবে। আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। আবার তিনি একই সঙ্গে প্রাদেশিক আতাউর রহমান মন্ত্রিসভারও অন্যতম সদস্য ছিলেন। আওয়ামী লীগের বামপন্থী মহল মনে করেছিলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রিত্ব ও সাধারণ সম্পাদকের পদের মধ্যে মন্ত্রিত্বকেই বেছে নিলেন। সেক্ষেত্রে বামপন্থীদের নমিনি এবং পার্টির সাংগঠনিক সম্পাদক অলি আহাদ আওয়ামী লীগের নতুন সাধারণ সম্পাদক হতে সক্ষম হবেন। কিন্তু সবাইকে হতবাক করে শেখ মুজিবুর রহমান এই কাউন্সিল অধিবেশনে মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগের কথা ঘোষণা করলেন। পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে শেখের এই সিদ্ধান্ত এক যুগান্তকারী ঘটনা হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। পরবর্তীকালের ঘটনাপ্রবাহই এর জ্বলন্ত সাক্ষী।

এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বামপন্থীদের পরামর্শে ১৯৫৭ সালের ১৮ই মার্চ তারিখে পার্টি থেকে পদত্রাগ করলেন। পার্টিতে এই পদত্যাগের বিষয় আলোচনা হবার আগেই

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (১৯৪৮)
[ভাসানী-শামসুলহক-মুজিব]
১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে টাংগাইল-এর কাগমারীতে আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনের সময় পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নে সোহ্‌রাওয়ার্দী মুজিব এবং ভাসানী-অলি আহাদ গ্রুপের তীব্র মতবিরোধের ফলে মওলানা ভাসানী কর্তৃক ১৮ই মার্চ আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ এবং ৩১শে মার্চ ওয়ার্কিং কমিটি থেকে ৯ জন সদস্যের পার্টি ত্যাগ।
পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি
[জন্ম ঃ ২৬শে জুলাই ১৯৫৭, সভাপতি ঃ মওলানা ভাসানী]
ন্যাপ (সুধারামী)
ন্যাপ মশিয়ুর (১৯৭৭)
ন্যাপ গাজী (১৯৭৯)
ন্যাপ নাসের (১৯৭৯)
ন্যাপ জাহিদ (১৯৭৭)
ন্যাপ (মোজাফ্‌ফর)
জন্ম ঃ ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮
ইউ পি পি (১৯৭৪)
বি এন পি-তে বিলুপ্ত
জনদলে বিলুপ্ত
ইউ পি পি (জাফর)
ইউ পি পি (রনো-মেনন)
ন্যাপ হালিম
ন্যাপ আলতাফ (১৯৭৭)
ন্যাপ হারুন (১৯৭৯)
বিএনপি-তে বিলুপ্ত
একতা পার্টি

সাংগঠনিক সম্পাদক অলি আহাদ পদত্যাগপত্রটি সংবাদপত্রে প্রকশের জন্য দৈনিক সংবাদের তৎকালীন সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরীর নিকট প্রদান করেন। ফলে শেখ মুজিবুর রহমান পার্টির সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা না করেই ৩১শে মার্চ দলীয় শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগে আওয়ামী লীগ থেকে সাংগঠনিক সম্পাদক অলি আহাদের সাময়িকভাবে বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। ওয়ার্কিং কমিটির অনেকের মতে এ ধরনের বহিষ্কার অনুমোদন করলে কমিটির ৩১ জন সদস্যের ৯ জন পদত্যাগ করলেন। এটাই হচ্ছে ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ ভাঙ্গনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এখানে উল্লেখ্য যে, দেশীয় রাজনীতিতে পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে ১৯৫৭ সালে অসাম্প্রদায়িক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ থেকে একযোগে বামপন্থীদের দল ত্যাগের বিষয়টি কমিউনিস্ট পার্টির গোপন নেতৃত্ব কমরেড মণি সিং, কমরেড খোকা রায় এবং কমরেড সালাম (ছদ্ম নাম) প্রমুখের মনঃপূত ছিল না। এঁদের মতে বহু প্রচেষ্টার পর দেশের সর্ববৃহৎ জাতীয়তাবাদী পার্টি আওয়ামী লীগে যেভাবে বামপন্থীদের অনুপ্রবেশ হয়েছিল, তা আওয়ামী লীগকে গণমুখী নীতিতে অবিচল রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক ছিল। তাই সদলবলে বামপন্থীদের আওয়ামী লীগ ত্যাগ কৌশলগত কারণে সঠিক হবে না। কিন্তু পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এবং দ্রুত ঘটনাপ্রবাহের দরুন কমিউনিস্ট পার্টির গোপন নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের এই ভাঙ্গনকে রোধ করতে পারেনি। আওয়ামী লীগ ত্যাগ করার জন্য বামপন্থীরাই অগ্রণীর ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্র প্রদেশগুলোর সামন্তবাদের প্রতিভূ এবং ভূস্বামীরাও সমর্থনের হস্ত সম্প্রসারণ করে। কেননা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা ও প্রধানমন্ত্রী সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন এক ইউনিটের সমর্থক। পূর্ব বাংলায় এক ইউনিট বিরোধী সমর্থক সংগ্রহ করতে হলে আওয়ামী লীগকে দ্বি-খণ্ডিত করার পর বামপন্থীদের ভিন্ন একটা প্ল্যাটফরমে ঐক্যবদ্ধ করাটা লাভজনক হবে। পশ্চিম পাকিস্তানি এসব নেতৃবৃন্দের মধ্যে সিন্ধুর জিএম সৈয়দ, করাচির মাহমুদুল হক উসমানী, বেলুচিস্তানের আবদুস সামাদ আচাক্‌জাই এবং সীমান্তের আবদুল গফ্‌ফার খান অন্যতম। অনেকের মতে পশ্চিম পাকিস্তানের মেহনতী জনতার মুক্তির চেয়েও এক ইউনিট ভেঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশে ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার প্রশ্নটি এঁদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পশ্চিম পাকিস্তানের ভূস্বামীরা তখন নব্যশিল্পপতিদের কাছে পরাজিত। ব্যুরোক্র্যাটরা ও সামরিক কর্তৃপক্ষও নব্য শিল্পপতিদের সমর্থকে পরিণত হয়েছে। তাই পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ বিভক্ত হওয়ার পর বামপন্থীদের সমন্বয়ে পৃথক 'ন্যাপ' গঠন না পাওয়া পর্যন্ত এইসব নেতৃবৃন্দ ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন। আর আওয়ামী লীগের সমর্থকরা রূপমহল সিনেমা হলে প্রস্তাবিত ন্যাপের অধিবেশন ছাড়াও জনসভায় হামলা করায় 'সমঝোতার' সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গেলো। গণতান্ত্রিক শিবির হলো দ্বি-খণ্ডিত।

পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠনের প্রাক্কালে এতে সদলবলে যোগ দিলেন সিলেটের মাহমুদ আলীর (একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিরোধিতার পর বর্তমানে পাকিস্তানে অবস্থানরত) নেতৃত্বে পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল। নব্য গঠিত ন্যাপের সভাপতি ও সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হলেন যথাক্রমে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও মাহমুদ আলী। অন্যতম সহ-সভাপতির দায়িত্ব পেলেন প্রখ্যাত কৃষক নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশ। পার্টি গঠনের মাত্র ১৫ মাস সময়ের মধ্যে পাকিস্তানে প্রথম সামরিক আইন জারি হওয়ায় পার্টির পক্ষে উল্লেযোগ্য রাজনৈতিক তৎপরতা প্রদর্শন সম্ভব হয়নি।

১৯৫৮ সালের শেষার্ধ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত বছরগুলোতে সামরিক কর্তৃপক্ষ আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ উভয় দলের হাজার হাজার কর্মী ও নেতৃবৃন্দের ওপর দমনীতি অব্যাহত রাখে। আইয়ুবের সামরিক শাসন জারির পর ১২ই অক্টোবর মওলানা ভাসানীকে গ্রেফতার করে ঢাকার বনানীতে একটি গৃহে ১৯৬২ সালের ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত অন্তরীণবদ্ধ করে রাখা হয়। অন্যদিকে একই দিনে শেখ মুজিব গ্রেফতার হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন এবং তাঁর বিরুদ্ধে ছ'টি ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়। এইসব মামলা থেকে মুজিব বেকসুর খালাশ লাভ করেন।

আইয়ুবের 'মৌলিক গণতেন্ত্রর' শাসনতন্ত্র চালু হবার প্রাক্কালে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর উদ্যোগে আইয়ুব-বিরোধী ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট গঠন করা হয়। এই ফ্রন্টে দক্ষিপন্থী নাজিমউদ্দীন-নুরুল আমীন-নসরুল্লা থেকে শুরু করে বামপন্থীরা পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হন। সোহ্‌রাওয়ার্দীর আকস্মিক মৃত্যুর কিছুদিন পর শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৬৫ সাল নাগাদ এন.ডি.এফ. থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শেখের বক্তব্য ছিল, এই ফ্রন্টের নেতৃত্ব পুরোপুরিভাবে দক্ষিণপন্থীদের কুক্ষিগত। সুতরাং আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করতেই হবে। সে আমলে শেখের এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক পণ্ডিতদের মতে অত্যন্ত উপযোগী ও যথার্থ ছিল। পুনরুজ্জীবিত আওয়ামী লীগে বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের প্রভাব পরিলক্ষিত হলো। ঢাকার তাজউদ্দিন আহমদ, পাবনার এম মনসুর আলী, রাজশাহীর কামরুজ্জামান, দিনাজপুরের অধ্যাপক ইউসুফ আলী, যশোরের মুশিউর রহমান, চট্টগ্রামের এম এ হান্নান, ফরিদপুরের ফণী মজুমদার, ময়মনসিংহের আবদুল মোমিন, সিলেটের আবদুস সামাদ, নোয়াখালীর খাজা আহম্মদ, কুমিল্লার জহিরুল কাইয়ুম, চাঁদপুরের মিজানুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ পার্টির কতৃত্ব গ্রহণ করলেন। শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দিন আহমেদ যথাক্রমে আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হলেন।

এদিকে আন্তর্জাতিক বিশ্বের কমিউনিস্ট শিবিরে নীতির প্রশ্নে তখন শুরু হয়েছে ব্যাপক সংঘাত ও দ্বন্দ্ব। ১৯৬১ সালে চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের সময় সোভিয়েত রাশিয়া প্রকাশ্যে ভারতকে সমর্থন করলে বিশ্বের কমিউনিস্ট শিবির দ্বিধাবিভক্ত হয়। পূর্ব বাংলাতেও তীব্রভাবে এর প্রভাব দেখা দেয়। কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নে নীতির প্রশ্নে শুরু হয় তুমুল বাক-বিতণ্ডা। মস্কো ও পিকিংপন্থী নামে দুটো গ্রুপের উন্মেষ ঘটলো। পরবর্তী বছরগুলো পূর্ব বাংলায় বামপন্থীদের মধ্যে শুরু হয় মেরুকরণ। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে দেখা দিলো তীব্র মতবিরোধ।

১৯৬৫ সালের সম্মেলনে ন্যাপের সভাপতি মওলানা ভাসানী পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য রুশপন্থী বলে পরিচিত সৈয়দ আলতাফ হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক এবং পিকিংপন্থী মোহাম্মদ সুলতান ও রুশপন্থী আবদুল হালিমকে পার্টির যুগ্ম-সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত করেন। আবার পার্টির অভ্যন্তরে ভারসাম্য রক্ষার জন্য পার্টির সভাপতি হিসাবে ওয়ার্কিং কমিটিতে পিকিংপন্থীদের প্রাধান্য প্রদান করেন। কিন্তু এ ধরনের কমিটির প্রতি রুশপন্থীরা বৈরী মনোভাব প্রকাশ করলো এবং 'তলবি' কাউন্সিল বৈঠকের জন্য চাপ দিল। মওলানা ভাসানী ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে রংপুরে ন্যাপের তলবি কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করলেন। কিন্তু এর আগেই পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হওয়ায় রুশ সমর্থকরা ন্যাপের রংপুর সম্মেলনকে বয়কট করলো। ফলে মওলানা সাহেব ন্যাপের রুশ-সমর্থক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেনসহ

আরও কয়েকজনকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করলেন এবং মোহাম্মদ সুলতানকে অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিলেন। পরে কমরেড তোয়াহা নয়া সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর এর মূল্যায়ন করতে গিয়ে ন্যাপের একাংশ ভারতকে এবং অপরাংশ পাকিস্তানকে আগ্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করলো। অনেকের মতে চীন-পাকিস্তান ক্রমবর্ধমান বন্ধুত্বের প্রেক্ষাপটে মওলানা ভাসানী এ সময় 'ডোন্ট ডিসটার্ব আইয়ুব' নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৬৮ সালের ১০ই ও ১১ই ফেব্রুয়ারি ন্যাপের রুশপন্থীরা পৃথক সম্মেলন আহ্বান করে অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদের নেতৃত্বে নতুন কমিটি গঠন করলেন। নীতির প্রশ্নে ন্যাপ-ভাসানী ও ন্যাপ-মোজাফ্ফরের মধ্যে দারুণ ফারাকের সৃষ্টি হলো। অচিরেই ন্যাপ-মোজাফ্ফর জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগের ছ'দফা দাবির প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে 'লেজুড়বৃত্তি' নীতি গ্রহণ করলো। ন্যাপ-মোজাফ্ফরের মতে ছ'দপা আন্দোলন হচ্ছে 'জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম'। কিন্তু ন্যাপ-ভাসানী ছ'দফা আন্দোলনকে 'মার্কিনী সমর্থনপুষ্ট' বলে আখ্যায়িত করলো।

এদিকে ১৯৬৯ সালের ৫ই জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্র সমাজ ছ'দফার সম্পূরক হিসাবে ১১ দফা দাবি নির্ধারণ করে 'কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করলে পিকিংপন্থী ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত হলো। পূর্ব বাংলায় গড়ে উঠলো আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন। প্রবীণ জননেতা মওলানা ভাসানী অবস্থার প্রেক্ষাপটে আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করার সময়োচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ও বহুসংখ্যক কর্মী কারান্তরালে আটক থাকায় মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ-ভাসানী ও ন্যাপ-মোজাফ্ফরের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে সৃষ্টি হলো ভয়াবহ গণ-অভ্যুত্থান।

শেষ রক্ষার প্রচেষ্টায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ১৯৭৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব দিলে শেখ মুজিব প্রমুখ সামরিক হেফাজত থেকে বেরিয়ে এলেন। পূর্ব বাংলায় মওলানা ভাসানী ও পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক বয়কট করলেন। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে শ্লোগান উচ্চারিত হলো 'গোলটেবিল না রাজপথ– রাজপথ, রাজপথ'। কিন্তু শেখ মুজিব পূর্ব ঘোষণা মতো আইয়ুব খানের প্রস্তাবিত রাওয়ালপিন্ডির গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিয়ে ছ'দফা দাবির প্রতি অটল রইলেন। ফলে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলো এবং শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পেলো। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের তখন পুরো নেতৃত্বই শেখের কব্জায়। জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগের শ্লোগান হচ্ছে, 'পিন্ডি না ঢাকা? ঢাকা-ঢাকা'। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পদত্যাগ করে সামরিক বাহিনীর ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করে ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে 'খোলা রাজনীতি' এবং 'এক মাথা এক ভোটের' ভিত্তিতে ৭ই ডিসেম্বর সমগ্র পাকিস্তানব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করলেন।

চীনাপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে আবার মতবিরোধ দেখা দিল। ১৯৭০ সালে 'খোলা রাজনীতির' অনুমতি পাওয়ার পর মওলানা ভাসানী ১৯শে জানুয়ারি সন্তোষে পার্টি সম্মেলন আহ্বান করলেন। কমরেড তোয়াহা প্রমুখ কতিপয় নেতা এই সম্মেলনে 'বিপ্লব

আসন্ন' বলে বক্তব্য উপস্থাপিত করলেন। অপরদিকে কমরেড মতিন-কমরেড আলাউদ্দীনের গ্রুপ এক 'চাঞ্চল্যকর দলিল' প্রচার করে অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, মোহাম্মদ তোয়াহা হচ্ছেন 'সি.আই.এ. এজেন্ট'। ফলে সত্তর সালের মাঝামাঝি সময়ে কমরেড তোয়াহা দলবলসহ ন্যাপ (ভাসানী) ত্যাগ করেন। ১৯৭০ সলের আগস্ট মাসে খুলনায় আহূত হলো ন্যাপ-ভাসানীর কাউন্সিল অধিবেশন। এতে রংপুরের মশিউর রহমান যাদু মিয়া নয়া সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। সম্ভবত ন্যাপে কমিউনিস্টদের প্রভাব হ্রাস করার উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানী এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে যেসব নেতৃবৃন্দ সরাসরি দক্ষিণপন্থী থেকে বামপন্থী আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে রংপুর ও বরিশাল মুসলিম লীগের এককালীন নেতা মশিউর রহমান ও মহিউদ্দীন আহমদ অন্যতম। তেভাগা আন্দোলনে জনাব মশিউর রহমানের এবং পঞ্চাশের দাঙ্গায় জনাব মহিউদ্দীনের বিরুদ্ধে বিতর্কমূলক ভূমিকার অভিযোগ রয়েছে। মাত্র দশ বছরের মধ্যে মশিউর রহমানের উদ্যোগে জিয়ার বি.এন.পি দল ন্যাপ-ভাসানীর মূল স্রোতের বিলুপ্তি ঘটেছে। এ সময় ন্যাপ-ভাসানী পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়। এরা হচ্ছে ন্যাপ (সুধারামী), ন্যাপ (মশিউর), ন্যাপ (গাজী), ন্যাপ (নাসের) এবং ন্যাপ (নুরু-জাহিদ)।

১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে ন্যাপ-ভাসানী ইয়াহিয়ার নির্বাচন বর্জন করে শ্লোগান দিলো 'ভোটের আগে ভাত চাই।' কিন্তু পূর্ব বাংলায় জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগ ও রুশপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করায় ন্যাপ-ভাসানীর নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারলো না। ১৯৭০ সালের দ্রুত প্রবাহমান ঘটনাবলী, বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় ও সাধারণ নির্বাচনের ডামাডোলের পর পর্যবেক্ষক মহল একটা বিষয় অনুধাবন করতে সক্ষম হলো যে, ন্যাপের সুদীর্ঘকালের সংগ্রাম ঐতিহ্য, ত্যাগ-তিতিক্ষা সবকিছুই ছ'দফার উগ্র জাতীয়তাবাদের উত্তাল তরঙ্গের বক্ষে হারিয়ে গেলো। আপাতত শ্রেণী সংগ্রামের রাজনীতি বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের কাছে পরাস্ত হলো। জনগণ আওয়ামী লীগের পক্ষে সোচ্চার হলো। শুরু হলো আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ।

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মহাচীনের মধ্যে নীতিগতভাবে প্রথম মতবিরোধের সূত্রপাত হয় ষাট দশকের গোড়ার দিকে। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসে এ মর্মে মত প্রকাশ করা হয় যে, 'নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট ও উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের সমন্বয়ে গঠিত নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক পন্থায় সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব'। উপরন্তু এই কংগ্রেসে আরও বলা হলো যে, 'যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে শ্রেণী সমন্বয় ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক করা যায়।' সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির এই কংগ্রেসে শ্রমিক নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কায়েমের তত্ত্ব বাতিল করে দেয়া হয়।

চেয়ারম্যান মাও সে তুং এতত্ত্ব গ্রহণ করতে পারেননি।। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী সদস্যরা তখন দেশব্যাপী 'শুদ্ধি অভিযান' অর্থাৎ 'সাংস্কৃতিক' বিপ্লবের কথা চিন্তা করছিলেন। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধ শুরু হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন নয়া নীতি ও তত্ত্বের প্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদী ভারতকে সমর্থন করে। কমরেড নিকিতা

ক্রুশ্চেভ শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি ঘোষণা করেন। এদিকে ১৯৪৮ সালে স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও কমিউনিস্ট চীন তখনও পর্যন্ত মার্কিনী ভেটোর ফলে জাতিসংঘের সদস্যপদে বঞ্চিত এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বে একঘরে হয়ে রয়েছে। তাই চীনা কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরিস্থিতি অবলোকন করতে থাকে। সোভিয়েত রাশিয়ার নয়া নীতির প্রতি এঁরা উষ্মা প্রকাশ করেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলনে নীতির প্রশ্নে মস্কো ও পিকিং বিভক্ত হয়ে পড়ে। চেয়ারম্যান মাও-এর নেতৃত্বে চীনা নেতৃবৃন্দ দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, আন্তর্জাতিক বিশ্বে রাশিয়া নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করার পর এখন সংশোধনবাদের প্রবক্তা। সাম্রাজ্যবাদীর উদ্যোগে মহাযুদ্ধকে রাশিয়া এড়াতে চায়। 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হিংস্র ব্যাঘ্র নয়– কাগুজে ব্যাঘ্র মাত্র'।

বিশ্বের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ এই প্রথম উপলব্ধি করলেন যে, 'অবস্থার প্রেক্ষাপটে জাতীয়তাবাদী কম্যুনিজমের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।' এরই ফল হিসাবে কৌশলগত কারণে মাত্র সাত বছর সময়কালের মধ্যে চীন-মার্কিন-পাকিস্তান সখ্য সৃষ্টি হলো। আর অন্যদিকে স্বাক্ষরিত হলো রুশ-ভারত প্রতিরক্ষা ও মৈত্রী চুক্তি।

১৯৬২ সলে চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের সময় সোভিয়েত রাশিয়া প্রকাশ্যে জাতীয়তাবাদী ভারতকে সমর্থন করলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং পূর্ব বাংলাতেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে মস্কো ও পিকিংপন্থী নামে দুটো গ্রুপের উন্মেষ ঘটে। কমিউনিস্ট প্রভাবান্বিত অংশ দলগুলো বিশেষ রূপে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের অভ্যন্তরে নীতির প্রশ্নে শুরু হয় মারাত্মক সংঘাত।

১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙ্গন সম্পূর্ণ হয়। রুশ-সমর্থক কমিউনিস্টরা কমরেড মণি সিং-এর নেতৃত্বে এবং পিকিং সমর্থক কমিউনিস্টরা কমরেড তোয়াহার নেতৃত্বে পথক কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে। কমরেড তোয়াহার নেতৃত্বে গঠিত কমিউনিস্ট পার্টি পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) নামে পরিচিত হয়।

ষাট দশকের শেষের দিকে পিকিংপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি আবার দ্বিধাবিভক্ত হলো। কমরেড তোয়াহার নেতৃত্বে পার্টির বক্তব্য হচ্ছে 'পূর্ব পাকিস্তানের সমাজ ব্যবস্থা আধা-ঔপনিবেশিক এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক। তাই বিপ্লবের স্তর হবে জন-গণতান্ত্রিক।' কিন্তু পিকিংপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির একাংশ এই মতবাদ সমর্থন করলেন না। তাঁরা নতুন থিসিস্ উপস্থাপনা করে বললেন, 'পূর্ব পাকিস্তানে বিপ্লবের স্তর হবে সমাজতান্ত্রিক।' এঁদের নেতৃত্বে ছিলেন কমরেড আবদুল মতিন, কমরেড আলাউদ্দীন, কমরেড দেবেন শিকদার, কমরেড আবুল বাশার প্রমুখ। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'অগ্নিপ্রবাহ' পত্রিকায় এই নয়া থিসিস্ প্রকাশিত হলো। ১৯৬৮ সালে কমরেড মতিন-আলাউদ্দীনের নেতৃত্বে সৃষ্টি হলো 'পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি'। এঁরা মোটামুটিভাবে পশ্চিম বাংলার চারু মজুমদারের মতবাদের প্রতি সমর্থন জানালেন। আর পিকিংপন্থী তরুণ বিপ্লবীরা গঠন করলেন 'পূর্ব বাংলার বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন।'

এটা এমন একটা সময় ছিল যখন ছ'দফার দাবিতে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে উগ্র জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছে। সবকিছুর ওপরে তখন আঞ্চলিক দাবি-দাওয়ার অগ্রাধিকার স্থাপিত হয়েছে। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দরুন বাঙালি জাতীয়তাবাদের নেতৃত্বের জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রাম পরিষদ এ

সময় ছ'দফা আন্দোলনের সম্পূরক হিসাবে ১১ দফা আন্দোলন সৃষ্টি করে নেতৃত্ব দানে এগিয়ে এসেছে। চারদিকে তখন আইয়ুব-বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের প্রস্তুতি।

স্বল্পদিনের ব্যবধানে 'পূর্ব বাংলার বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনে' তরুণ বিপ্লবীরা মতিন-আল্লাউদ্দীনের নেতৃত্ব গঠিত পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও বিশেষ করে মফস্বল এলাকায় মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে তখন দেখা দিয়েছে মারাত্মক বিভ্রান্তি। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার প্রেক্ষাপটে পূর্ব বাংলার জনপ্রিয় বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতি সাচ্চা কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি কি রকম হওয়া বাঞ্ছনীয় এটাই তখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

এদিকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে নীতির প্রশ্নে পিকিংপন্থী কমিউনিস্টদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। কমরেড চারু মজুমদারের নেতৃত্বে পার্টির একাংশ জোতদার ও মহাজনদের নিধনের জন্য সশস্ত্র কর্মসূচি গ্রহণ করে। এর মূল ঘাঁটি স্থাপিত হয় উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি এলাকায়। এঁরাই 'নক্‌শালপন্থী' হিসাবে পরিচিত হন। তৎকালীন পূর্ব বাংলাতেও এই নীতি মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী কিছু কর্মীর প্রভাব বিস্তার করে। এ সময় পিকিংপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য ছিল 'পূর্ব পাকিস্তানের সমাজ ব্যবস্থা আধা-ঔপনিবেশিক এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক। সুতরাং বিপ্লবের স্তর হবে জনগণতান্ত্রিক।' কিন্তু এঁদের একাংশ ভিন্ন মত প্রকাশ করলেন। এঁদের বক্তব্য হচ্ছে, 'বিপ্লবের স্তর হবে সমাজতান্ত্রিক'। এঁরা নতুন থিসিসে নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে ব্যাখ্যা দান করলেন। ফলে ইপিসিসি (এম এল) থেকে এঁরা হলেন বহিষ্কৃত। আগেই উল্লেখ করেছি যে, ১৯৬৮ সালে মতিন-আলাউদ্দীনের নেতৃত্বে সৃষ্টি হলো পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি। পিকিংপন্থী পূর্ব বাংলার বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্মীরা নয়া নেতৃত্ব মেনে নিয়ে একত্রীভূত হলেন।

এর পাশাপাশি পিকিংপন্থী কমিউনিস্ট পার্টিগুলো মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আস্থা প্রকাশ করলেও সামগ্রিকভাবে একই সঙ্গে ভারতের সিপিএম এবং কমরেড চারু মজুমদারের নীতির প্রতি সহানুভূতিশীল। অথচ পশ্চিম বাংলায় তখন সিপিএম আর নকশালপন্থীদের মধ্যে শুরু হয়েছে চরম বিবাদ। তাই পূর্ব বাংলায় এঁরা বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত। ফলে কর্মীদের মধ্যে দেখা দিল ব্যাপক বিভ্রান্ত। এটা এমন একটা সময় যখন মার্কসীয় তত্ত্ব, নীতি আর 'থিসিসের' দুর্বোধ্য সংঘাতে এঁরা বহুধাবিভক্ত। পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে সঠিক পথনির্দেশ এক দুরূহ কাজ।

অথচ তখন শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মতো বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তি পূর্ব বাংলার ওপর আছড়ে পড়েছে এবং বিরাট জনগোষ্ঠীকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো ছ'দফা দাবির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করেছে। আর অন্যদিকে পাক-চীন আঁতাত সমর্থনের অর্থই হচ্ছে সামরিক নেতৃত্ব পাকিস্তানের উপনিবেশবাদ তথা প্রকারান্তরে মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করা। আবার রুশ-ভারত আঁতাতের পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করার অর্থই হচ্ছে সংশোধনবাদ ও সম্প্রসারণবাদের পক্ষে সোচ্চার হওয়া। আজ সুদীর্ঘ বিশ বছর ধরে লাল বনাম লালের এই দ্বন্দ্ব অব্যাহত রয়েছে। আর এরই জের হিসাবে তৃতীয় বিশ্বের বামপন্থী আন্দোলনের গতি কখনও মন্থর আবার কখনওবা বিভ্রান্ত কিংবা হঠকারী।

পিকিংপন্থী কমিউনিস্টদের মধ্যে নীতির প্রশ্নে এ রকম বিভ্রান্তিকর অবস্থায় সমসাময়িককালে প্রাক্তন ছাত্র নেতা কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন ও হায়দার

আকবর খান রনোর নেতৃত্বে গড়ে উঠলো 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি'। এঁরা পিকিংপন্থী কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের নিয়ে একটা ঐক্যবদ্ধ পার্টি গঠনে আগ্রহী ছিলেন। এঁদের আন্তরিক নিষ্ঠার ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপিত না হলেও সম্ভবত নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা ও পরিপক্কতার প্রশ্নে অনেকে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে এঁরা 'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে সমন্বয় কমিটির' অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে এঁরা মওলানা ভাসানীর ছত্রছায়ায় মওলানা সুধারামীর নেতৃত্বে বামপন্থী ন্যাপ উপদল গঠন করেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে জাফর-মেনন-রনো ইউনাইটেড পিপলস্ পার্টি গঠন করে জিয়াউর রহমানের সামরিক সরকারের প্রতি সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণ করেন। এমনকি কাজী জাফর আহমদ জিয়ার মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। ফলে ইউপিপিতে মত বিরোধ দেখা দেয় এবং মেনন-রনো পৃথক ইউপিপি গঠন করে দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শরিক হন। আর জিয়া হত্যার পর কাজী জাফর আহমদ দক্ষিণপন্থীদের মোর্চার অন্তর্ভুক্ত হন।

ষাট দশকের শেষার্ধে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে আবির্ভূত হয় মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী কমরেড সিরাজ শিকদার। এঁর নেতৃত্বে ঢাকায় একটি 'মাও সে তুং গবেষণা কেন্দ্র' খোলা হয়। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে কমরেড সিরাজ শিকদার কর্মীদের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন। ১৯৬৮ সালে তিনি গড়ে তোলেন 'পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন'। পরবর্তীতে কমরেড শিকদার তাঁর কর্মস্থল গ্রামাঞ্চলে স্থানান্তরিত করেন এবং কমরেড চারু মজুমদারের নকশালপন্থী নীতি সমর্থন করেন। কমিউনিস্ট কর্মীদের মুখে তখন স্লোগান উচ্চারিত হলো, 'জোতদারদের গলাকাটা চলছে– চলবে'। মুক্তির একই পথ– নকশালবাড়ির সেই পথ'। কমরেড সিরাজ শিকদারের নীতি ছিল, 'জাতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীন গণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েম করা'। অল্প কিছুদিনের মধ্যে এঁরা পশ্চিম বাংলার কমরেড চারু মজুমদারের নকশালবাড়ী আন্দোলনের সমর্থকে পরিণত হন এবং পূর্ব বাংলার কয়েকটি স্থানে 'অপারেশন' করেন।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে কমরেড সিরাজ শিকদারের পার্টি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। বরিশালের পেয়ারাবাগানে এ ধরনের একটা রক্তাক্ত সংঘর্ষও হয়েছে। আবার এঁরা একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধেও লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। কেননা এঁদের বিশ্বাস ছিল যে, মুক্তিযোদ্ধারা হচ্ছে 'ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের দালাল'। এটাই হচ্ছে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মফস্বল অঞ্চলে এঁরা কিছুদিনের মধ্যে ব্যাপকভাবে সংগঠিত হয়ে জনমনে বিশেষ করে অবস্থাপন্নদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিল। সম্ভবত একদিকে সরকারি দমননীতি এবং অন্যদিকে উপ-দলীয় কোন্দলে এঁদের কার্যকলাপ প্রশমিত হয়। অনেকের মতে উপ-দলীয় 'বিশ্বাসঘাতকতার' ফলে ১৯৭৫ সালের ১লা জানুয়ারি চট্টগ্রামে কমরেড শিকদার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন। কিন্তু ২রা জানুয়ারি এই বিপ্লবী নেতা পুলিশের হেফাজতে নিহত হন। সরকারি কর্তৃপক্ষের মতে 'পুলিশ হেফাজত থেকে পলায়নের প্রচেষ্টাকালে সংঘর্ষে ইনি নিহত হন।' অনেকের মতে 'তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবের মহানুভবতায় নরহত্যায় অভিযুক্ত কমরেড শিকদার ক্ষমা লাভ করতে পারেন আশংকায় তাঁকে আগেই হত্যা করা হয়।' আবার অনেকের বক্তব্য হচ্ছে, 'শেখের নির্দেশেই সিরাজ শিকদারকে হত্যা করা হয়'। যা হোক, বিচারের পূর্বেই এই হত্যার জন্য বঙ্গবন্ধুকে গ্লানি বহন করতে

হয়। অবশ্য এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে কমরেড মণি সিংহের নেতৃত্বে রুশপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি এবং এর অংগদলগুলো মুজিবনগর সরকারের প্রতি সহযোগিতা প্রদান করার 'লেজুড়াবৃত্তি' নীতি গ্রহণ করে।

এদিকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কমরেড তোয়াহার নেতৃত্বে গঠিত পিকিংপন্থী 'পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল) আবার দ্বিধাবিভক্ত হলো। নোয়াখালী এলাকায় কমরেড তোয়াহার নেতৃত্বে একটা উপদল 'মুক্তিযুদ্ধকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম' হিসাবে ঘোষণা করলো। তবে একই সঙ্গে এঁরা 'ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের' তীব্র বিরোধিতার কথা বললো। এঁদের বক্তব্য ছিল, 'ভারতীয় সহযোগিতার বাইরে এবং ভারতের মাটিতে না গিয়ে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে'। অন্যথায় 'ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ' মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতার অছিলায় ফায়দা হাসিল করবে।

পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির (এমএল) আর একটা উপদল কমরেড অমল সেন ও কমরেড ইসলাম কোলকাতায় 'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটিতে' যোগ দিলেন।

পিকিংপন্থী পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল) তৃতীয় উপদল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে পূর্ব পাকিস্তানে 'ভারতীয় আগ্রাসন' বলে আখ্যায়িত করলো। যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলে এঁদের নেতৃত্ব দান করেন কমরেড আবদুল হক, কমরেড সত্যেন মিত্র, কমরেড বিমল বিশ্বাস ও কমরেড জীবন [illegible] প্রমুখ। এতদঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের সময় পিকিংপন্থী হক গ্রুপের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর বেশ কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও পিকিংপন্থী কমিউনিস্টদের মধ্যে নীতির প্রশ্নে বিভ্রান্তি অব্যাহত থাকে। কমরেড হকের নেতৃত্বে একটা উপদল স্বাধীনতার পরেও কিছুদিন পর্যন্ত যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন অব্যাহত রাখে। কেননা পাকিস্তানে পাশাপাশি মহাচীন তখনও পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করেনি এবং বাংলাদেশকে 'ঢাকা প্রশাসন' বলে আখ্যায়িত করছিল।

পিকিংপন্থীদের কেউ কেউ স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করেন। হক গ্রুপের নেতৃত্বে এঁদের বিশ্বাস ছিল যে, 'ভারত এই যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নিয়েছে।' সুতরাং 'পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির (এমএল) নাম পরিবর্তনের প্রশ্নই উঠতে পারে না।' উপরন্তু একটি সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে শেখ মুজিবের সরকারকে উৎখাত করতে হবে। তাহলেই 'ভারতীয় আধিপত্যবাদের' অবসান হবে।

নয়া পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ১৯৭২ সালে পিকিংপন্থী কমিউনিস্টদের কমরেড তোয়াহা, কমরেড সুখেন্দু দস্তিদার, কমরেড বিমল দত্ত প্রমুখ পার্টির নাম পরিবর্তন করলেন। পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল)-এর নতুন নামকরণ হলো 'কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল) পূর্ব বাংলা'। ১৯৭৩ সালে পার্টি কংগ্রেসে এঁরা আবার দলের নয়া নাম দিলেন 'পূর্ব বাংলার সাম্যবাদী দল।' এঁদের বক্তব্য হচ্ছে, 'ষোলই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়নি। সোভিয়েত ইউনিয়নের উপনিবেশ কায়েম হয়েছে মাত্র। মুজিব সরকার সোভিয়েত রাশিয়ার পুতুল সরকার।' সাম্যবাদী দল সামগ্রিকভাবে পশ্চিম বাংলার কমরেড চারু মজুমদারের নীতির প্রতি সমর্থনের কথা বললো এবং সীমিত আকারে তৎপরতা শুরু করলো।

পূর্ব পাকিস্তান কম্যুনিষ্ট পার্টি (১৯৪৮)
পূর্ব পাকিস্তান কম্যুনিষ্ট পার্টি (এম এল) (চীনা পন্থী)
পূর্ব পাকিস্তান কম্যুনিষ্ট পার্টি (১৯৬৬) (রুশপন্থী)
বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টি (মণি সিং-ফরহাদ)
পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন (কমরেড সিরাজ শিকদার)
পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি
পূর্ব বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি (১৯৬৮) (মতিন-আলাউদ্দীন)
পূর্ব বাংলার বিপ্লবী কম্যুনিষ্ট আন্দোলন পরবর্তীকাল মতিন-আলাউদ্দীনের সংগে একীভূত
পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিষ্ট পার্টি (এম এল) (কমরেড তোয়াহা)
কম্যুনিষ্ট বিপ্লবীদের কমিটি (জাফর-মেনন-রণো)
পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিষ্ট পার্টি (এম এল) (কমরেড তোয়াহা-১৯৭১)
পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিষ্ট পার্টি (এম এল) (কমরেড নজরুল-অমল-১৯৭১)
পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিষ্ট পার্টি (এম এল) (হক-সত্যেন-বিমল-জীবন-১৯৭১)
ইউনাইটেড পিপলস্ পার্টি (১৯৭৩)
ইউ পি পি (জাফর)
ইউ পি পি (মেনন)
ওয়ার্কার্স পার্টি
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তীকালে চীনাপন্থী আরও কয়েকটি কম্যুনিষ্ট পার্টির নাম
কম্যুনিষ্ট পার্টি (এম এল) (কমরেড নগেন বিশ্বাস)
কম্যুনিষ্ট সহিত কেন্দ্র (অমল সেন-নজরুল)
পূর্ব বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি (দেবেন-বাশার-আফতাব)
কম্যুনিষ্ট কর্মী সংঘ (সাইফুল-মারুফ-দাউদ)
বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি (হাতিয়ার নাসিম আলি)

আগেই উল্লেখ করেছি যে, ১৯৬৮ সালে নীতির প্রশ্নে পিকিংপন্থী কমিউনিস্ট পার্টিতে বিভেদ দেখা দিলে মতিন-আলাউদ্দীন ও দেবেন-বাশারকে গ্রুপ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এঁদের থিসিস্ ছিল, 'বিপ্লবের শর্ত হবে সমাজতান্ত্রিক... জনগণতান্ত্রিক নয়।' এঁরা 'পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি' (এম এল) নামে নতুন পার্টি গঠন করে পৃথকভাবে কাজ করছিলেন। ১৯৭২-'৭৩ সালে এঁরা রাজশাহী অঞ্চলে সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন। ফলে এঁরা আত্রাই-নাটোর এলাকায় কিছুসংখ্যক জোতদার হত্যা করে। ১৯৭৩ সাল এতদঞ্চলে সৈন্য বাহিনীর অপারেশন চলাকালে আত্রাই-এ একটা ছোটখাটো লড়াই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড মতিন, কমরেড আলাউদ্দীন, কমরেড ওয়াহিদুল রহমান ও কমরেড টিপু বিশ্বাস প্রমুখ গ্রেফতার হলে ঐ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

অনেকের মতে এতদঞ্চলে ৩৫ বছরের কমিউনিস্ট আন্দোলনের গতিধারা লক্ষ্য করলে উপলব্ধি করা যায় যে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে সংগ্রামী পথে এ আন্দোলন অগ্রসর হলেও কোন দিনই এর একটা সুনির্দিষ্ট অবয়ব সৃষ্টি হয়নি। বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর অন্যতম হওয়া সত্ত্বেও এখানে কমিউনিস্ট আন্দোলন পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর অতিক্রম করতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় নষ্ট করছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে এঁরা তত্ত্ব, রণকৌশল আর আন্তর্জাতিক প্রশ্নে এতো বেশি ব্যস্ত রয়েছেন যে, গণমানুষের চিন্তাধারা এবং দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়নে ক্রমাগতভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। অথচ কমিউনিস্ট আন্দোলনে জড়িত হয়ে এদেশে বহু নিবেদিতকর্মী জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন আর বহু সংসার অজান্তে ছারখার হয়ে গেছে। আত্মকলহে জর্জরিত কমিউনিস্ট আন্দোলন অতীতে বারবার হয়েছে বিভক্ত। ফলে জনগণের সঙ্গে এঁদের একাত্মবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। সম্ভবত এজন্যই এঁদের নীতি কখনও 'হঠকারী' আর কখনও বা 'লেজুড়বৃত্তিমূলক'।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে পার্টির নেতৃত্ব। দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে, কমিউনিস্ট দলগুলোর নেতৃত্ব শহরবাসী এক শ্রেণীর মধ্যবিত্তের 'কুক্ষিগত' হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে আর শিল্প এলাকাগুলোতে সাচ্চা কর্মীদের নেতৃত্ব পার্টিতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন সফল হতে পারলো না।

একথা মনে রাখা দরকার যে, সর্বহারাদের আন্দোলন কোন দিনই মধ্যবিত্ত নেতৃত্বে সম্ভব নয়। উপরন্তু বাংলাদেশ এমন একটা এলাকা যেখানে আজও পর্যন্ত জাতীয়তাবাদীদের ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়নি। তাই আন্দোলনের স্তর নির্ধারণ এবং নেতৃত্ব সৃষ্টি আজ সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯৫২ সালের শেষ নাগাদ প্রগতিশীল ছাত্রদের সমর্থনে সৃষ্টি হয় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন। এর প্রথম সভাপতি ছিলেন দিনাজপুরের মরহুম মোহাম্মদ সুলতান (১৯৫২-'৫৪)। তৎকালীন পূর্ব বাংলার অন্যতম বৃহৎ ছাত্র প্রতিষ্ঠান এই ছাত্র ইউনিয়নের মহান ঐতিহ্য রয়েছে এবং এর পূর্বসূরি ছাত্র ফেডারেশনের মতো এঁরা কমিউনিস্ট প্রভাবান্বিত। আওয়ামী লীগের সমর্থক জাতীয়তাবাদী পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এবং প্রগতিশীল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন

সম্মিলিতভাবে এদেশে বহু গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। এদেরই মিলিত প্রচেষ্টায় তৎকালীন পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয়েছিল এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জঙ্গি মতাবলম্বী হয়েছিল।

কিন্তু ষাট দশকের গোড়ার দিকে আন্তর্জাতিক বিশ্বে নীতির প্রশ্নে (গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমাজতন্ত্রে উত্তরণ এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান) রুশ-চীন তীব্র মতবিরোধ দেখা দিলে পূর্ব বাংলায় তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কমিউনিস্ট পার্টি কমরেড মণি সিং ও কমরেড তোয়াহার নেতৃত্বে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং রুশপন্থীরা ১৯৬৫ সালে ন্যাপের রংপুর কাউন্সিল অধিবেশন 'বয়কট' করে। পরবর্তীতে রুশপন্থীরা অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বে পৃথক 'ন্যাপ' গঠন করে।

প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক ১৯৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নে প্রথম 'ফাটল' সৃষ্টি হয়। একটা সমঝোতার মাধ্যমে প্রগতিশীল এই ছাত্র প্রতিষ্ঠানের ভাঙ্গন রোধের প্রচেষ্টা করা হয় কিন্তু ১৯৬৫ সালে ছাত্র ইউনিয়ন সম্পূর্ণভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়। এ সম্পর্কে তৎকালীন মাওপন্থী ছাত্র নেতা রাশেদ খান মেননের বক্তব্য হচ্ছে–

"এই সময় বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের বিকৃত ব্যাখ্যা, শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের তত্ত্ব হাজির করা হয়। তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এই সংশোধনকারী তত্ত্বকে পার্টির লাইন হিসাবে গ্রহণ করায় ছাত্র ইউনিয়নের অভ্যন্তরে ওই লাইনের অনুসারীরা সংগঠনকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করে। ফলে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা, সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা এবং অভ্যন্তরীণ ছাত্র ও গণ-আন্দোলনকে জঙ্গি রূপদানের প্রশ্নে ছাত্র ইউনিয়নের সদস্যদের মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে পার্থক্য ও সংঘাত সৃষ্টি হয়। ....১৯৬৪ সালের প্রথম ভাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনকে কেন্দ্র করে ছাত্র ইউনিয়নের ওপর যে আক্রমণ আসে, তাতে ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের অধিকাংশকে জেলে যেতে হয়। এ সময় ইউনিয়নের আপসকামী লাইনের অনুসারীরা মূল নেতৃত্বের অবর্তমানে সংগঠনের নেতৃত্বে চলে আসে এবং এই সুযোগে সংগঠনের অভ্যন্তরে তাঁদের অনুসৃত রাজনৈতিক লাইন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। এই সময় সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা তাদের লাইন সংগঠনের ওপর চাপিয়ে দিতে তৎপর...সম্মেলন সর্বসম্মতিক্রমে আমাকে সভাপতি ও সাইফুদ্দিন মানিককে সাধারণ সম্পাদক করে কমিটি গঠন করে। পরদিন সকল দৈনিকে এই কমিটির খবর ছাপা হয়। কিন্তু দৈনিক সংবাদের এক খবরে জানা যায় যে, সম্মেলনে শেষ হয়ে যাবার পর বহু রাত্রে ইকবাল হলের ছাদে তথাকথিত এক সভায় আর একটি কমিটি গঠিত হয়েছে, যার সভানেত্রী হলেন বেগম মতিয়া চৌধুরী। আগেই বলা হয়েছে এই ঘটনার সময় ছাত্র ইউনিয়নের মূল নেতারা ছিলেন জেলে। এঁদের মধ্যে আমি ছাড়াও কাজী জাফর আহমদ, হায়দার আকবর খান রনো, বদরুল হক, মহিউদ্দীন আহমদ ও আইউব রেজা চৌধুরী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।"

"১৯৬৪-৬৫ সালে ছাত্র ইউনিয়নের একাংশের মধ্যে মাওবাদের প্রভাব সৃষ্টি হয়। বেশ কিছুসংখ্যক নেতা সেদিন মাওবাদের গরম বুলির আড়ালে ছাত্র ইউনিয়নকে তার গণসংগঠনের চরিত্র হতে বিচ্যুতিকরণের প্রয়াস পান। একদিকে সংগঠনের মধ্যে উপদলীয় কার্যকলাপ, অন্যদিকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রধান ধারাকে বাদ দিয়ে সংগঠনকে আপসকামিতা ও বিভ্রান্তির কবলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা চলে।"

শেষ পর্যন্ত ১৯৬৫ সাল নাগাদ কমিউনিস্ট পার্টির অন্যান্য অঙ্গ দলগুলোর অনুকরণে ছাত্র ইউনিয়ন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। পিকিংপন্থীদের নেতৃত্ব দেন বেগম মতিয়া চৌধুরী। এর স্বল্প দিনের ব্যবধানে পূর্ব বাংলার বুকে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগের প্ল্যাটফরম থেকে ছ'দফার দাবি উত্থাপন করলে তা পূর্ব বাংলায় অত্যন্ত দ্রুত ব্যাপক গণ-সমর্থন লাভ করে। কিন্তু ছ'দফা প্রশ্নে মার্কসিস্টদের মধ্যে তুমুল বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। মস্কোপন্থীরা 'জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম' হিসাবে এর প্রতি সমর্থন জানালে মতিয়া গ্রুপ ছাত্র ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের প্রতি সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণ করে।

কিন্তু পিকিং কম্যুনিস্টরা পরোক্ষভাবে ছ'দফা 'সিআইএ' প্রণীত বলে আখ্যায়িত করলে মেনন গ্রুপ ছাত্র ইউনিয়ন ছ'দফার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। এ সময় ছ'দফা আন্দোলনকে ম্লান করার লক্ষ্যে 'ডলারের বন্ধন ছিন্ন করো' শ্লোগান উচ্চারণ করে আন্দোলন সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এটা এমন একটা সময় যখন ছ'দফার আন্দোলনে অধিকাংশ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও শত শত কর্মী কারাগারে আটক। হাজার হাজার আওয়ামী লীগ কর্মী দুর্বিষহ পলাতকের জীবনযাপন করছে। আর কমিউনিস্ট সমর্থকরা রয়েছেন কারাগারের বাইরে। এ সময়ে আইয়ুব খান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, 'অস্ত্রের ভাষায় ছ'দফার জবাব দেয়া হবে।' তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিক্রিয়া হিসাবে শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে আর পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারণ ছ'দফার দাবির সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ।

মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন। চীন-পাকিস্তান বন্ধুত্বের প্রেক্ষাপটে তিনি 'ডোন্ট ডিস্টার্ব আইয়ুব' নীতি পরিহার করলেন। ছাত্র আন্দোলনের সাথে একাত্মবোধ ঘোষণা করে মওলানা ভাসানী ১৯৬৮ সালে ৬ই ডিসেম্বর পল্টনে জনসভা করলেন। ফলে পিকিংপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে শরিক হয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হলো।

১৯৭০ সালে পিকিংপন্থী ছাত্র ইউনিয়নে আবার ভাঙ্গন দেখা দিলো। হায়দার আকবর খান রনোর নেতৃত্বে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, মাহবুবউল্লার নেতৃত্বে পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন এবং অচিন্ত্য-দিলীপ বড়ুয়ার নেতৃত্বে গঠিত হলো পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, এতো বড় একটা মুক্তিযুদ্ধের 'সুযোগ গ্রহণে' এঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। মধ্যবিত্ত নেতৃত্বই এর অন্যতম কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়। মুক্তিযুদ্ধের ন'মাসকাল সময়ে এঁদের অধিকাংশই সীমান্তের ওপারে স্বেচ্ছাসেবামূলক এবং ময়দানে তখন মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী কর্মীদের এ ধরনের কার্যকলাপের বিশ্লেষণ হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। অবশ্য মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে এঁরা কিছুসংখ্যক গেরিলা যোদ্ধা সৃষ্টির প্রচেষ্টা করেছিল। সীমান্তের ওপারে মুজিবনগর সরকারের প্রতি প্রদত্ত সহযোগিতাকে 'মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ' হিসাবে চিহ্নিত করা হলে মস্কোপন্থীদের মুক্তিযোদ্ধা বলা যথার্থ হবে। তবে অনেকের মতে এই ভূমিকা অক্ষরে অক্ষরে আওয়ামী লীগের 'লেজুড়বৃত্তি' ছাড়া আর কিছুই নয়। মস্কোপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন এই মোর্চার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্যদিকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পিকিংপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে চরম বিভ্রান্তি দেখা দেয়। মধ্যবিত্ত নেতৃত্বে পিকিংপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি তখন বহুধাবিভক্ত। অন্যদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের ক্রমবর্ধমান মৈত্রী এবং চীন-পাকিস্তান-যুক্তরাষ্ট্রের সখ্য পরিস্থিতিকে আরো ঘোলাটে করে তোলে। পিকিংপন্থী তোয়াহা গ্রুপ মত প্রকাশ করলো

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন
ডিসেম্বর ১৯৫২
(সভাপতি ঃ মোহাম্মদ সুলতানা)
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মস্কোপন্থী) ঃ ১৯৬৫
(সভানেত্রী : মতিয়া চৌধুরী)
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (পিকিংপন্থী) ঃ ১৯৬৫
(সভাপতি : রাশেদ খান মেনন)
বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন
(হায়দার আকবর খান রনো)
পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন
(মাহবুবউল্লাহ)
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন
(অচিন্ত্য-দিলীপ)
বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন
(মেনন সমর্থক)
বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন
(জাফর সমর্থক)
জাতীয় ছাত্রদল
(নূর মোহাম্মদ খান)
জাতীয় ছাত্রদল
(নূর মোহাম্মদ কাজী)
বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন
(ইসরারুল হক)
বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন
(আশরাফ গিরাণী)
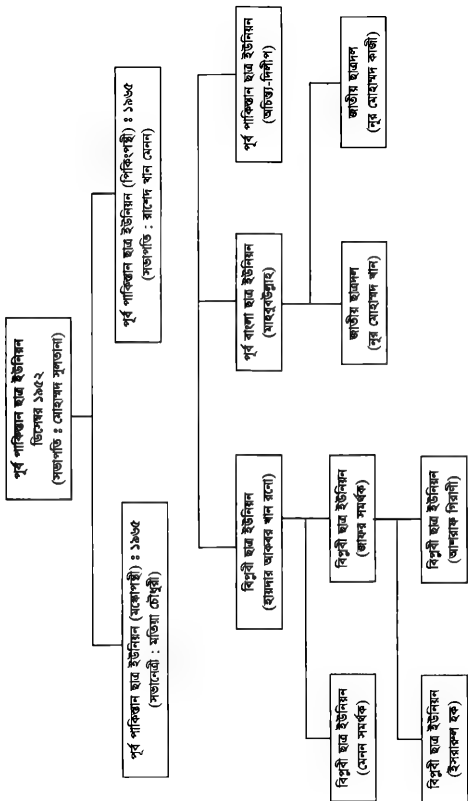
যে, 'মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম। তবে ভারতীয় সহযোগিতার বাইরে এবং ভারতের মাটিতে না গিয়ে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।' পিকিংপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির আর একটা গ্রুপের নেতৃত্বে কমরেড আবদুল হক ও কমরেড সত্যেন মিত্র ঘোষণা করলেন যে, 'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় আগ্রাসন।' তাই একে প্রতিহত করতে হবে। যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলে এঁদের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর কয়েক দফা সংঘর্ষ পর্যন্ত হয়েছে। পিকিংপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় গ্রুপ কমরেড অমল সেন ও কমরেড নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে কোলকাতায় মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটিতে যোগ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখতে সক্ষম হয়। পিকিং সমর্থক চতুর্থ গ্রুপ কমরেড সিরাজ শিকদারের 'শ্রমিক আন্দোলন' একদিকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, আবার অন্যদিকে 'ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের দালাল' মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধেও লড়াই করেছে।

এরই প্রেক্ষপটে পিকিংপন্থী কমিউনিস্ট পার্টিগুলো অঙ্গদল হিসাবে ছাত্র ইউনিয়নের সাচ্চা কর্মীরা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বিভ্রান্তির সম্মুখীন হয় দিশেহারা হয়ে পড়ে। এ সময় আকস্মিকভাবে ন্যাপ নেতা মশিউর রহমান কোলকাতা থেকে ঢাকায় আগমন করে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইয়াহিয়া খানের তথাকথিত উপ-নির্বাচনে অংশগ্রহণের কথা ঘোষণা করলে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি মারাত্মক আকার ধারণ করে। মোদ্দা কথায় বলতে গেলে সঠিক নেতৃত্বের অভাবে পিকিংপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের একনিষ্ঠ ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা একটি পরিচ্ছন্ন আদর্শের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে অপারগ হয়েছেন বলা চলে।

বামপন্থী আন্দোলন সম্পর্কে ১৪ জন বামপন্থী নেতার বক্তব্য

বাংলাদেশের গত ২৬ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসে বামপন্থী আন্দোলনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। এই পার্টির ছত্রছায়ায় জন্ম হয়েছে বহু নিবেদিতপ্রাণ প্রগতিশীল কর্মী ও নেতৃবৃন্দের।

এদেশের প্রগতিশীল ও মার্কসীয় আন্দোলনের সঙ্গে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এতোগুলো বছর পরে অনেকের মনে কয়েকটা বিরাট প্রশ্ন রয়েছে। তা হচ্ছে, কেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি তথা বামপন্থীরা আজ পর্যন্ত আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারছে না? কেন বামপন্থী মহল সঠিক পথনির্দেশ করতে ব্যর্থ হচ্ছে? কেন আজ এঁরা বহুধাবিভক্ত?

এ সম্পর্কে ১৪ জন বামপন্থী নেতা যেসব বক্তব্য রেখেছেন তা এখানে সংযোজিত হলো।–লেখক

'জাতীয়তাবাদ শোষণ করতে পারে, মুক্তিও এনে দিতে পারে'

–অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ

'৫৪০এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন প্রায়

এক যুগ। বললেন, 'যা শিখেছি মওলানার কাছেই, একাডেমিক শিক্ষার বাইরে তার সাথে মিশে পেয়েছি রাজনীতির অনেক বিচিত্র ও সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা।'

অবিভক্ত ন্যাপের যুগ্ম-সম্পাদক মোজাফফর আহমদ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক লাইনের মতাদর্শে মওলানার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও ব্যক্তি ভাসানীর সাথে তার সম্পর্ক কখনো বিচ্ছিন্ন হয়নি।

১৯৬৭-র বিভক্ত 'ন্যাপ'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মোজাফফর ন্যাপ (ওয়ালী) পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। আজো তিনি সংগঠনের (বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) সভাপতি। ন্যাপ-এর বহুধাবিভক্তি সম্পর্কে তিনি বলেন: যাঁরা আইয়ুব খানকে সমর্থন ও সহযোগিতা দিল, চীনা আদর্শ পছন্দ করলো ও ৬-দফার বিরোধিতা করলো, তাদের বিপরীত মতাদর্শ নিয়ে আমরা অবিভক্ত ন্যাপ থেকে বেরিয়ে আসি। বলা যায় দেশে আওয়ামী লীগের ৬-দফা এবং তদানীন্তন বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই ন্যাপের বিভক্তি ঘটে।

অধ্যাপক মোজাফফরের মতে, স্বাধীনতার পর ন্যাপ ভেঙ্গেছে তিনটি কারণে। ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা, আন্দোলন ও জাতীয়তাবোধ। আমরা ধর্মের সপক্ষে, হটকারী আন্দোলনের বিপক্ষে। জাতীয়তাবোধের বিশ্লেষণ নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। আমি মনে করি, বিদেশীদের বিতাড়নের পর জাতীয়তাবাদের ভূমিকা পাল্টে যায়। প্রগ্রেসিভ রোল অব ন্যাশনালিজম বা প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদ আর শুধু জাতীয়তাবাদ এক জিনিস নয়। জাতীয়তাবাদ শোষণও করতে পারে, মুক্তিও এনে দিতে পারে।

পার্টির অতীত-বর্তমান মূল্যায়নে ন্যাপ (মো) প্রধান বলেন, ন্যাপ ব্যর্থ হয়নি। স্বাধীনতার পর রাতারাতি ৭ লাখ সদস্য আমাদের ভিতকে নাড়িয়ে দেয়। আমি পার্টিতে ক্যুদেতাও করলাম ভিতকে রক্ষার জন্য। আমাদের নেতৃবৃন্দের মাঝে তখন একটি প্রশ্নই দেখা দিলো, ন্যাপ কি আওয়ামী লীগের মতো 'বুর্জোয়া' পার্টি হবে, না ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটদের দল হবে। 'ন্যাপ' কনফারেন্সের আগের দিনই পেলাম আমরা ৭০ হাজার টাকা। যারা চাঁদা দিল, রাতারাতি সদস্য হলো, তারা ব্যর্থ হলো, ন্যাপের সম্মেলনে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরতে, নিজেদের প্রতিনিধিত্বও পেলো না। যেভাবে জোয়ারের টানে ন্যাপে এসেছিল, তেমনি তাসের ঘরের মতোই চলে গেলো। বুর্জোয়ারা ভাবলো, এটা তাদের পার্টি নয়। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হলো ন্যাপ প্রগতিশীল বুর্জোয়ার পার্টি হবে, না মধ্যবিত্তের পার্টি হবে? ন্যাপে যারা উদ্দেশ্য সফল করতে পারলো না তারাই গিয়ে গঠন করলো 'জাসদ'।

পার্টির লাইন ভুল ছিল আমি এটাও স্বীকার করি না। তবে এটা ঠিক যে, আওয়ামী লীগের সাথে সদ্য স্বাধীন দেশের পুনর্গঠনের সহযোগিতা ঠেলে দিলো বিরোধিতার দিকে। আমার অবর্তমানে হয়ে গেলো ১লা জানুয়ারি '৭৩-এ বড় দুর্ঘটনা। ছাত্র ইউনিয়নের বিক্ষোভ মিছিলে দু'জন প্রাণ দিলো। এটা ছিল আসলে কমিউনিস্ট পার্টির হঠকারী সিদ্ধান্ত। অথচ জড়িয়ে গেলো 'ন্যাপ'।

আমি মনে করি, এখনো আমাদের পার্টির কর্মসূচি বাস্তবায়নটাই হচ্ছে বড় ব্যাপার।

আমরা 'জাতীয়তাবাদী' না হয়ে, 'আন্তর্জাতিকবাদী' হয়ে পড়েছি
–নুরুল রহমান

তৎকালীন প্রগতিশীলরা, এমনকি মওলানা ভাসানী পর্যন্ত মনে করতেন আওয়ামী লীগকে ছেড়ে দিয়ে প্রগতিশীলদের চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না। আমি ছিলাম সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে এবং তাঁর মতাদর্শের অনুসারী। ১৯৫৬'র নির্বাচনে পরিষদ সদস্য এবং '৫৭তে যুক্তফ্রন্টের আওয়ামী লীগ মন্ত্রী এবং ফিরোজ খান নুন মন্ত্রিসভায় স্বাস্থ্য ও শিক্ষামন্ত্রী নুরুর রহমান বর্তমান ন্যাপ (নুরু) অংশের সভাপতি। কমিউনিস্ট পার্টির সিলেট শাখার উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করার দায়ে ৯২ (ক) ধারায় জেলে যান। এন পি এফ নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলে 'ন্যাপে' যোগ দেন। প্রথমে কোষাধ্যক্ষ পরে ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন দীর্ঘদিন। স্বাধীনতার পরও তিনি ন্যাপের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

ন্যাপের বহুধাবিভক্তি সম্পর্কে তিনি বলেন, কমিউনিস্ট আন্দোলনের আন্তর্জাতিক প্রভাব বলয়ে 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' 'ন্যাশনাল' না হয়ে ইন্টারন্যাশনাল তথা চীনা-সোভিয়েত রাজনীতির তাত্ত্বিক প্রয়োগে জড়িয়ে পড়ে। আমরা জাতীয়তাবাদী হলাম না– আন্তর্জাতিকতাবাদী হয়ে গেলাম। অথচ মওলানা সব সময় চাইতেন ন্যাপ জাতীয়তাবাদী চরিত্র নিক।

ভাঙ্গা গড়ার রাজনীতির পর্যালোচনায় তিনি বলেন, 'আমি প্রচণ্ড সম্ভাবনা দেখি। ন্যাপের অতীত নেতৃত্ব কাটিয়ে ঐক্যবদ্ধ দল গঠনে এগিয়ে আসবেন। ন্যাপের বৃহৎ অংশ বিএনপিতে যোগ দিলেও জিয়া-মশিউরের পরে এখন তারা অসহায়। বিকল্প নেতৃত্বের জন্যেই সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার।

'নেতৃত্বে দুর্বলতা আর নেতাদের গাড়ি বাড়ির লোভ দলকে বিপর্যস্ত করে'–মোহাম্মদ সুলতান

'ন্যাপ সমর্থিত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি পরে যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হিসাবেও যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। ১৯৬৫-তে ন্যাপে যোগ দিয়ে যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। এরপর মওলানা ভাসানীর নির্দেশে প্রো-মস্কো প্রার্থীদের হটিয়ে ন্যাপ নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন। কিছুদিন ন্যাপের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

দু'বার স্ট্রোকে আক্রান্ত এবং দু'বার অপারেশনের ধকল কাটিয়ে সুস্থ না হতেই আমরা তাঁর মুখোমুখি হই। পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করে বলেন : আমি তখন সম্পাদক, কাপ্তানবাজারে পার্টি অফিসে এসে মহীউদ্দিন আহমদ বললো, কি অপমানজক কথা– আমেরিকান কনস্যুলেট আমাকে ডেকে নিয়ে বললো, '৬-দফা সমর্থন কর'। এর প্রতিবাদে আমরা পল্টনে জনসভা করলাম। সেই মহীউদ্দিন সাহেবই টাঙ্গাইল সম্মেলনে যখন আমি রিপোর্ট পড়ছি তখন মওলানাকে বললেন, আমরা রিকুইজিশন ডাকবো। মওলানা অনুমতি দিলেন (পার্টির গণতান্ত্রিক নিয়মে)। রংপুরে কাউন্সিল ডাকা হলো। কিন্তু তারা সেখানে গেলেন না।

'৬৪তে মওলানা চীন সফর থেকে ফিরে কৃষক সংগঠনে জোর দিলেন। মাও সে তুং বললেন, 'মওলানা তুমি কি বিপ্লব করবে? বিপ্লবের জন্য দরকার কৃষক সংগঠন। তোমার

দেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষকদের সংগঠিত কর'। -একথা মওলানার কাছে শোনা। এরপর আবদুল হককে কৃষক সংগঠনের দায়িত্ব দিলেন। আমাকে বললেন, তুমি ন্যাপ কর। তোয়াহা সাহেবকে বললেন, তুমি শ্রমিক সংগঠন কর। সবাইকে বললেন : দেখো আমি অশিক্ষিত মওলানা, আমি কি বুঝবো বিপ্লবের, আমার লেখাপড়া নেই। তোমরা শিক্ষিত। তোমরা এসব কর।' কমিউনিস্টদের প্রভাব ছিল খুব বেশি। '৬৭তে কমিউনিস্ট পার্টি ভুল সিদ্ধান্ত নেন 'জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা'। আমরা বললাম, জনগণতান্ত্রিক আন্দোলন তো কৃষকরা করবে। কৃষক সংগঠন কই। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা সিদ্ধান্ত দিলো তারা আর গণসংগঠন করবে না। ছাত্র-শ্রমিকসহ সকল সংগঠনের সাথে এমনকি জনবিচ্ছিন্ন আন্দোলন শুরু করে। আমি কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে দিলাম তখনই। আমরা বললাম, যারা পার্টি ছেড়ে দিয়েছি তারা সিরিয়াসলি 'ন্যাপ' করবো। এরপর ন্যাপ ভাঙ্গবো, আইয়ুব বিদায় নিলো, ইয়াহিয়া আসলো। ভাসানী ইয়াহিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করে পূর্ব পাকিস্তানের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা জানালো। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন চাইলো।

ছাত্র ইউনিয়ন, যুবগীল, ন্যাপ নেতা বলেন : কমিউনিস্ট পার্টির ভুল প্রভাব যেমন কাজ করেছে তেমনি ছাত্র ইউনিয়ন ও যুবলীগের অবদানও ছিল ন্যাপ ভাঙ্গার পেছনে। ন্যাপ গড়ার পেছনেও ছিল এদের অবদান। পরবর্তীতে নেতৃত্বে দুর্বলতা, নেতাদের গাড়ি-বাড়ির শখ দলকে বিপর্যস্ত করে।

'চারু মজুমদারের লাইন ভুল ছিল'

-মোহাম্মদ তোয়াহা

পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন সভাপতি মোহাম্মদ তোয়াদ '৬৮তে ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। যুবলীগেরও তিনি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ন্যাপের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, '৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে যুবলীগ ছিল একটা প্যারালাল পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভাবিত এই দলই পরবর্তীতে ন্যাপের নেতৃত্ব দখল করে। আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টিতে থেকেই ওপেন নেতৃত্বে ছিলেন অনেক ন্যাপ নেতা। এদের মধ্যে আমি, মোহাম্মদ সুলতান, অধ্যাপক মোজাফফর চৌধুরী, হারুনর রশীদ, অনিল মুখার্জী, ভারতীয় কংগ্রেস সরকারের ছত্রছায়ায় ১৯৫৬ সালে কোলকাতায় পার্টি কংগ্রেসেও যোগ দিই।

তাঁর মতে ন্যাপ ছিল পেটি বুর্জোয়ার পার্টি, পেটি বুর্জোয়াদের লেজুড়বৃত্তি করে পার্টি হবে না। কমিউনিস্ট পার্টিকে স্বতন্ত্র হতে হবে। তাই পার্টির সিদ্ধান্তে ন্যাপ থেকে সরে যাই। এই সরে যাওয়াটাও তিনি সঠিক বলে মনে করেন। তবে এতে ন্যাপের ক্ষতি হয়েছে। এটা স্বীকার করেন বর্তমান বাংলাদেশ সাম্যবাদী দলের সভাপতি মোহাম্মদ তোয়াহা।

কমিউনিস্ট পার্টির '৬৯ সালের লাইনকে সঠিক আখ্যায়িত করে তিনি বলেন : পরে চারু মজুমদারের লাইনে (গলাকাটা) এসে ভুল হয়ে গেলো।

ন্যাপের প্রথম ঘোষণাপত্রের রচয়িতা তোয়াহা মনে করেন '৭০-এর নির্বাচন বর্জন ছিল একটি ভুল সিদ্ধান্ত।

'চীনা প্রীতির নামে আইয়ুবকে সমর্থন'

-সৈয়দ আলতাফ হোসেন

১৯৬৫ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন ১৯৬৮তে ওয়ালী ন্যাপে যোগ দেন। এর আগে

কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় নেতা ছিলেন। তখন থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত তিনি ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। আইয়ুবের বৈদেশিক নীতি নিয়ে মওলানা ভাসানীর সাথে তাঁর বিরোধ দেখা দেয়। অবশ্য ন্যাপ বিভক্তির ক্রান্তিকালে তিনি ছিলেন কারাগারে।

তিনি বলেন, মওলানার সঙ্গীরা কৌশলে আইয়ুবকে ক্ষমতায় রাখার চেষ্টা করেছেন। মশিউর রহমান (যাদু মিয়া) চীনের সাথে পাটের ব্যবসা করে রাতারাতি কাঁচা টাকা আয় করেছে। ন্যাপকে বিপথগামী করার পেছনে তার ভূমিকাও কম নয়। আর আমরা তখন ৬-দফার পক্ষে সংগ্রাম করছি। সারাদেশ যখন ৬-দফার পক্ষে আমরা চুপ করে থাকতে পারি না। আন্তর্জাতিক রাজনীতি যে সব সময় প্রাধান্য পাবে তার কোন মানে হয় না। চীনা প্রীতির নামে আইয়ুবকে সমর্থন ও বিরোধিতাকে কেন্দ্র করেই বৃহত্তম দল ভেঙ্গে গেলো। ন্যাপ রাইজিং পার্টি ছিল, আমরা আশা করেছিলাম এই সময়ে ন্যাপ গ্লোরিয়াস রোল প্লে করবে। ন্যাপের রাজনীতি করতে গিয়ে সারাজীবন জেল খেটে কাটিয়েছি। সাবেক 'ন্যাপ' নেতা বলেন, '৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত আমাকে ন্যাপের কোন প্রোগ্রাম দেয়া হয়নি। দেশের কোথাও কোন সভা বা দলীয় অনুষ্ঠানে আমাকে যেতে দেয়া হয়নি। এই একনায়কত্বের কারণেই '৭২-এ সে ন্যাপের অবস্থান হয় ভুতুড়ে। তখন পার্টির প্রতি হাজার হাজার কর্মীর আকর্ষণ কমে যায়। জানুয়ারিতে বাকশাল হলো (১৯৭৫)। শেখ মুজিব নিজেই করলেন বাকশাল। আমার কোন কথা হয়নি। এটা তাঁর একক সিদ্ধান্ত। তিনি বললেন, বাকশাল ফাংশান না করলে আবারো বহুদলীয় গণতন্ত্রে যাবো।

'আন্দোলন আর মার খাওয়ার মধ্য দিয়েই ন্যাপের জন্ম'

–কাজী জাফর আহমদ

'৫৭তে আমার মতো অনেক কাউন্সিলরকে নিউ পিকচার প্যালেসে ঢুকতে দেয়নি শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগের 'গুণ্ডা বাহিনী'। ছাত্রলীগের ছেলেরা ভাসানীর ফাঁসি দাবি করলো, আমতলায় (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্রলীগকে বাধা দিতে গিয়ে মার খায়। এই মার খাওয়া আর আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ন্যাপের জন্ম। জন্মের পর তিনটি উপ-নির্বাচনেই আওয়ামী লীগের সাথে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়।

৬ দফা'র বিরুদ্ধে ন্যাপ যে ১৪ দফা পেশ করলো তা ঠিক বিকল্প দাবি হলো না। ১৪ দফা নিয়েও ন্যাপ এগুতে পারেনি। তা সত্ত্বেও '৬৮-৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্ব তো ন্যাপের হাতেই ছিল।

'ন্যাপ ত্যাগ না করলেও পারতাম'

–ব্যারিস্টার শওকত আলী

'রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলাম না। মওলানা ভাসানীর সাথে আমার পরিচয় ১৯৪৯ থেকে। ১৯৫৭ সালে আমাকে ন্যাপের কোষাধ্যক্ষ করা হয়।

১৯৬৯ সালে ব্যারিস্টার শওকত আলী ন্যাপ ত্যাগ করে আওয়ামী লীগে যোগ দেন– যেদিন শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়ে কারামুক্তির পর তার বাসায় আসেন। ১৯৭০ ও '৭৩-এ জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত

হন। ন্যাপ ত্যাগের কারণ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত, আদর্শগত ব্যাপারে নয়– একথা জানিয়ে ব্যারিস্টার শওকত আলী বলেন, 'এখন মনে হচ্ছে, যে কারণে ন্যাপ ত্যাগ করেছি সেটা না করলেও পারতাম।'

'মওলানা ভাসানী আইয়ুবের সাথে আঁতাত করে চীনে যান'– এই অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন আখ্যায়িত করে ব্যারিস্টার শওকত আলী বলেন : সেই সফর ছিল চীন সফরের আমন্ত্রণে ও তাদের খরচে। এমনকি বিমানের টিকিটও দিয়েছেন চীনের পূর্ব পাকিস্তানস্থ কন্স্যুলেট থেকে। একইভাবে '৬৩তে ভাসানীর মুক্তির সমঝোতার মধ্য দিয়ে হয়নি। ভাসানী অনশন করেন, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী রিট মুভ করেন, মীর্জা গোলাম হাফিজের ড্রাফট, আমি হুজুরের স্ত্রী আলেমা ভাসানীর স্বাক্ষর নিই আবেদনপত্রে। এর সাত মাস পর তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়। অপপ্রচার যাই হোক না কেন– একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, ন্যাপের জন্মলগ্নে মওলানা ভাসানী ছিলেন সারা পাকিস্তানের নেতা এবং শুধু ন্যাপই ছিল নিখিল পাকিস্তানভিত্তিক একমাত্র পার্টি। এরকম দ্বিতীয় কোন দল ছিল না।

'৬৭তে ন্যাপ ভেঙ্গেছে চীন-রাশিয়া বিরোধে

–মহিউদ্দিন আহম্মেদ

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রস্তুতি কমিটির সম্পাদক মহিউদ্দীন আহমদ এ দলের সহ-সভাপতি ছিলেন। পরে ১৯৬৮ সালে ওয়ালী ন্যাপের কোষাধ্যক্ষ ও রিকুইজিশন ন্যাপ আহবায়ক ছিলেন। '৭৩-এ তিনি ন্যাপ (মোজাফফর) ত্যাগ করেন। বর্তমানে তিনি বাকশালের সভাপতি।

ন্যাপের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি বলেন, '৬৭তে ন্যাপ ভেঙ্গেছে চীন-রাশিয়া বিরোধে। স্বাধীনতার পর ন্যাপ ভেঙ্গেছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অবাধ রাখতে না দেয়ার ফলশ্রুতিতে। আবার কিছু দল ন্যাপের জনপ্রিয়তা এবং এই বৈশিষ্ট্য কাজে লাগিয়ে দক্ষিণপন্থী মিলিয়ে শতাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব এখানে রয়েছে। গভীর মনোনিবেশ সহকারে যদি এদের কর্মসূচি এবং উদ্দেশ্য অবলোকন করা যায় তাহলে মোটামুটিভাবে এ দলগুলোকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। বামপন্থী প্রগতিশীল, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক শক্তি। এই মূল অবস্থানগুলো যতই দৃঢ় হবে ততই ছোটখাটো দলগুলি আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে কখনো যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে, কখনো বহুদলীয় ঐক্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজ নিজ অবস্থান গ্রহণ করবে এবং জনগণের চোখেও এই দলের অপ্রয়োজনীয়তা যেমন পরিস্ফুট হয়ে উঠবে তেমনি এই দলগুলোতে একই কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে নিজেদের প্রচারাভিযান চালানো অসম্ভব বলে মনে হবে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে দলের সংখ্যাই বেড়েছে। এগুলোর পেছনে কোন আদর্শগত কিছু আছে বলে আমার জানা নেই।

'১৯৭৭-এ দল পুনর্গঠিত হলো জিয়া-মোশতাককে সমর্থন দিয়ে'

–চৌধুরী হারুন-অর-রশীদ

১৯৭৯-র জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিরোধে মতানৈক্যের কারণে ন্যাপ থেকে বেরিয়ে এলেন যারা তাদের নিয়ে একই নামে গঠিত হলো আরেকটি ন্যাপ। এই অংশের সভাপতি হলেন চৌধুরী হারুন-অর-রশীদ। ন্যাপের জন্ম

থেকেই তিনি দলের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। '৫২তে জেলে গিয়ে ছাড়া পেয়েছেন ন্যাপ জন্মের এক বছর পর। '৫৭-তে ন্যাপ প্রাদেশিক কমিটির সদস্য ও চট্টগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। '৬৭-তে যখন দল বিভক্ত হয় তখনো তিনি জেলে। ওয়ালী ন্যাপের প্রতি সমর্থন জানান জেল থেকে। জীবনে খুব কম সময় প্রকাশ্যে ছিলেন। প্রায়ই থাকতে হতো হয় জেলে নতুবা হুলিয়া কাঁধে নিয়ে পর্দার অন্তরালে।

পক্ষাঘাতে আক্রান্ত জনাব হারুন অসুস্থতা সত্ত্বেও ন্যাপের রাজনীতি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছেন।

ভাসানী চীন থেকে এলেন বার্মা হয়ে। আমার বিরুদ্ধে তখনো ওয়ারেন্ট। রেঙ্গুন হয়ে চট্টগ্রাম এলেন। ব্যারিস্টার মিলকীর বাসায় উঠলেন। গোপনে সাক্ষাৎ করলাম। অনেক কথাবার্তার মাঝে শুধু একটুকুই খেয়াল আছে– 'যদি মিসরের জামাল আবু নাসেরের মতো লোক মিলিটারি হয়েও সমাজ প্রগতির কাজ করতে পারে আইয়ুব খান পারবে না কেন? গোটা বিশ্বে এখন মিলিটারির ভূমিকা তলিয়ে দেখতে হবে– চীন সফরে আমি এটা বুঝেছি। তোমরা এসব বুঝবে না। তর্ক করিনি তাঁর সাথে, ভক্তি শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল, আদরও করতেন।

স্বাধীনতার পর ক্ষমতাসীন দলের কর্মকাণ্ডে ন্যাপের ত্যাগী ও সংগ্রামী কর্মীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

৬ হাজার গেরিলা ছাড়াও ১৯ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে আমরা পৃথকভাবে ট্রেনিং ও অস্ত্র দিয়ে বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। এরা ছিল শুধু ন্যাপ কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী। ৪/৫ মাস মুজিবনগর সরকারও এ খবর জানতো না।

এত বড় কর্মী বাহিনী থাকা সত্ত্বেও ন্যাপ ভেঙ্গে গেলো কেন? এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন : ঐক্য প্রচেষ্টার স্বার্থেই আমরা অনেক সত্য ঘটনা চেপে যাবো। তবুও বলা যায় বাকশালের পর ১৯৭৭-এ দল পুনর্গঠিত হলো জিয়া-মোশতাককে সমর্থন দিয়ে। ৬ জন নেতাকে সভাপতি তার ব্যক্তিগত ক্ষমতা বলে বহিষ্কার করলে দলের সদস্যরা বিক্ষুব্ধ হন। বহিষ্কারের পদ্ধতিগত ত্রুটি নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরেধের জের হিসাবে আমরা দলের কাউন্সিলের একতরফা সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ওয়াকআউট করি এবং ১৯৭৯ সালে পৃথক ন্যাপ গঠন করি। অবশ্য ৭৭-এ বহিষ্কৃতদের নেতৃত্বে আগেই অন্য দল গঠিত হয়। ৭৯-র নির্বাচনে একমাত্র দলীয় সভাপতি মোজাফফর সাহেব ব্যতীত প্রায় সদস্য বিক্ষুব্ধ হন, প্রার্থীরাও। নির্বাচন পর্যালোচনা বৈঠকে সভাপতি স্বীয় সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলে কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা ও নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীরা অধিবেশন বর্জন করেন এবং এর ১২ ঘণ্টা অতিক্রান্ত না হতেই পংকজ ও মতিয়াকে বহিষ্কারসহ ১১ জনকে কারণ দর্শাতে বলা হয়। এ সকল কারণেই আমরা বেরিয়ে আসি। ন্যাপের ঐক্য প্রচেষ্টা সম্পর্কে তিনি বলেন : একীভূত হতে হবে সম্মানজনক। তবে কিছু বাধা এখনো রয়ে গেছে।

'চীন-সোভিয়েত বিরোধকে প্রাধান্য না দিয়ে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে'

–পীর হাবিবুর রহমান

'৬৮-র বিভক্ত ন্যাপের যুগ্ম-সম্পাদক পীর হাবিবুর রহমান '৮২-র কাউন্সিলে দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

ন্যাপের ঐক্য প্রচেষ্টা সম্পর্কে তিনি বলেন : ১৫ দল বা ৭ দল যাদের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে- এদের নিয়ে শোষণহীন সমাজ কায়েম হবে কিভাবে? ঐক্যদলে মাইনাস বিএনপি বা মাইনাস আওয়ামী লীগ হলে বাকিদের দিয়ে কিছুই হবে না। মাইনাসকে প্লাস করতে হলে আজকে বামপন্থী প্রগতিশীল শক্তিকে চীন-সোভিয়েত বিরোধকে প্রাধান্য না দিয়ে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে।

'ভুল সিদ্ধান্তই দলের অবস্থান দুর্বল করে'

-আনোয়ার জাহিদ

পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার জাহিদ '৬৮তে টাঙ্গাইল সম্মেলনে নির্বাচিত হন ন্যাপের যুগ্ম-সম্পাদক। '৭০-এ পুনরায় ন্যাপে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি গণতান্ত্রিক পার্টির সাধারণ সম্পাদক। তাঁর মতে '৭০-এ ন্যাপ নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত না নিলে গোটা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটই হয়তো বদলে যেতো। বিভিন্ন সময়ে এই দলের ভুল সিদ্ধান্তই পরবর্তীতে রাজনৈতিক অঙ্গনে দলের অবস্থান দুর্বল করে দেয়।

তিনি বলেন, আজকে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের সপক্ষের রাজনীতিকদের কোন অর্থবহ নেতৃত্ব নেই, সংগঠন নেই। অথচ মার্কিন-রুশ-ভারত শক্তি এবং ডানপন্থীরা ঐক্যবদ্ধ।

ন্যাপের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি বলেন, ন্যাপ থাকতে পারে সাইন বোর্ড হিসাবে। বিএনপি একটি দল হতে পারে না। বিএনপিতে যারা ন্যাপের সহযাত্রী আছেন তাদের নিয়ে অন্য সকল বাম প্রগতিশীলরা এগিয়ে এলে একটি শক্তির দল গঠন করা যায়। এই সম্ভাবনার কথা সবাইকে চিন্তা করতে হবে।

'আমরা একটি শক্তিশালী দলের উত্তরসূরি'

-সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের পার্লামেন্টে বিরোধীদলীয় সদস্য হিসাবে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেন। '৬৯-এ ন্যাপ-এ যোগ দিয়ে ৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন ওয়ালী ন্যাপের প্রাদেশিক পরিষদের একমাত্র সদস্য। '৭৪-এ ন্যাপ কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। প্রায় তিন বছর পর হাইকোর্টের এক আদেশে তার নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করা হয়।

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, আমাদের খোলাখুলিভাবে নিজেদের অনুশোচনা করে মেটাতে হবে আগামী দিনে এ ধরনের বাম-প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল গড়া দরকার, গড়ার প্রয়োজনও আছে। আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, ক্ষমতা ও নেতৃত্বকে তুচ্ছ করে জাতীয় স্বার্থে আদর্শের প্রশ্নে ১৯৫৭ সালে সারা পাকিস্তানব্যাপী যে শক্তিশালী দলটি গঠিত হয়েছিল তার নাম 'ন্যাপ'। আমরা সেই সংগঠনেরই উত্তরসূরি।

'সমাজতন্ত্রের আগে জাতীয়তাবাদী চেতনা'

-আবু নাসের খান ভাসানী

আমার বাবার জন্যে আমি বা আমার মায়ের কোন ত্যাগ নেই। আমার রক্তে ত্যাগের মানসিকতা যা আছে সেটা বাবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই। আমার মা এমন এক বংশের যাঁদের ত্যাগ শব্দের সাথেই পরিচয় নেই। ননা হাজী সামিরউদ্দিন ছিলেন

একজন অত্যাচারী জমিদার– সামন্ত ভূস্বামী।

অবলীলায় মওলানা ভাসানী সম্পর্কে একথাগুলো বললেন তাঁর পুত্র নাসের খান ভাসানী। তিনি বর্তমানে ন্যাপের সভাপতি (নাসের)।

ন্যাপের দুর্দশা দেখে ভাসানী নিজেও জীবিত অবস্থায় বলতেন, সমাজতন্ত্রের আগে জাতীয়তাবাদী চেতনায় জনগণকে জাগ্রত করতে হবে, না হলে দেশকে রক্ষা করা যাবে না। '৭৬-এ ফারাক্কা লং মার্চের পরে ন্যাপ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় জাতীয়ভিত্তিক একটি জাতীয়তাবাদী পার্টি গঠন করতে বলেছেন অন্যান্য বামপন্থী প্রগতিশীল শক্তিকে নিয়ে। তিনি নামও দিয়েছিলেন 'জাতীয়তাবাদী দল'।

'প্রবীণ বামপন্থীরা সঠিক পথনির্দেশে ব্যর্থ'

–তারেক আলী

রুশ-চীনের শত্রুতার ফলে অন্যান্য দেশের মতো পাকিস্তানেও বামপন্থীরা বিভক্ত হয়ে পড়লো। ঐতিহ্যবাহী স্ট্যালিন-চিন্তাধারার সমর্থক প্রবীণ কমিউনিস্টরা কৌশলগত পর্যায়েও মস্কো কর্তৃক নির্ধারিত লাইন অনুসরণ করতে শুরু করলো এবং নীতিগত ক্ষেত্রে সময় বিশেষ মস্কো মোচড় খাওয়া পর্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসরণ করলো। মস্কো ও পিকিং-এর এই বিভেদ উপমহাদেশে স্ট্যালিনপন্থীদের জন্য এক মারাত্মক বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ালো। আগেই উল্লেখ করেছি যে, পাকিস্তানে কমিউনিস্টরা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অভ্যন্তরে বেশ [illegible] হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬২ সালে মিয়া ইফতেখার উদ্দীনের মৃত্যুর পর পাঞ্জাবে ন্যাপের প্রভাব হ্রাস পায়। এ সময় বেলুচিস্তান, সীমান্ত প্রদেশ ও পূর্ব পাকিস্তানে ন্যাপের প্রধান ঘাঁটি পরিলক্ষিত হয়। এই পার্টির মূল্য নেতৃবৃন্দ সবাই অ-কমিউনিস্ট (গুটি কয়েক কমিউনিস্ট সমর্থক)। এঁরা হচ্ছেন, ওয়ামী খান (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ), গাউস বক্স বেজেনজো, আতাউল্লাহ মেঙ্গল ও খায়ের বকস্ মারী (বেলুচিস্তান), মুজাফফর আহমদ এবং মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (পূর্ব পাকিস্তান)। অবশ্য পূর্বাঞ্চলে মণি সিং ও সুখেন্দু দস্তিদারের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি গোপনে পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখে।

১৯৬৪ সালে চীন-রুশ বিভেদের প্রেক্ষাপটে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির (ইপিসিপি) অভ্যন্তরে মারাত্মক তিক্ততার সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তী দু'বছরকাল সময়ের মধ্যে পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানেও হাতেগোনা কমিউনিস্টদের একদল সি-আর আসলাম, মির্জা ইব্রাহিম ও সরদার শওকতের নেতৃত্বে পিকিং সমর্থক-এ এবং বাকিরা রুশ সমর্থক-এ বিভক্ত হয়। কমিউনিস্ট পার্টিতে বিভক্তির ফল হিসাবে প্রায় একই সময়ে পেটি বুর্জোয়া পার্টি ন্যাপের অভ্যন্তরেও এর প্রতিফলন হয়। মওলানা ভাসানী ও মশিউর রহমান ছাড়া বাকি নেতৃবৃন্দ মস্কো-সমর্থক কমিউনিস্টদের পক্ষ গ্রহণ করে। এ অবস্থা থেকেই অনুধাবন করা যায় যে, পূর্ব-পশ্চিমে (পাকিস্তান) কিভাবে বিভিক্তিকরণ হয়েছিল। পশ্চিমে কমিউনিস্টরা হচ্ছে একটা নগণ্য শক্তি– যা পরগাছার মতো অকমিউনিস্ট ন্যাপ ঘাঁটি ও নেতৃত্বের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থাটা ভিন্নতর। ন্যাপ ঘাঁটিগুলোতে কমিউনিস্টরা হচ্ছে উল্লেখযোগ্য অংশ বিশেষ। এখানে শুরুতে মস্কো ঘেঁষা পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (ইবিসিপি) প্রাক্তন ইপিসিবির অধিকাংশ নেতৃবৃন্দকে দলে আনতে সক্ষম হলো এবং পিকিং ঘেঁষা ইপিসিপি (মার্কসিস্ট-লেলিনিস্ট) দল নগণ্য সংখ্যককে দলে ভিড়াতে পারলো। অবশ্য

মওলানা ভাসানী পিকিংপন্থীদের পক্ষ গ্রহণ করলো এবং পিকিং-এর ফর্মুলাতে ন্যাপ বিভক্ত হলো। এই ফর্মুলা হচ্ছে, 'একতা–সংগ্রাম অথবা এমনকি বিভক্তি–নতুন ভিত্তিতে নতুন একতা'।

মিসর থেকে প্রত্যাবর্তনের পরেই আইয়ুব সরকার মওলানা ভাসানীকে আটক করলো। মওলানা সাহেব ১৯৬১ সালে এই মিসর সফরকালে প্রেসিডেন্ট নাসেরের মেহমান ছিলেন। ১৯৬৩ সালে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর মওলানা সাহেব সরকারি উদ্যোগে চীনে প্রেরিত প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বদানে সম্মত হলেন।

চৌ এন লাই এবং মাও সে তুং-এর সঙ্গে মওলানা ভাসানীর আলোচনাকালে পিকিং-এ পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত জেনারেল রাজা উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীকালে জেনারেল রাজা এ মর্মে তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, বৈঠকে মাও সে তুং সরাসরিভাবে মওলানাকে বলেছিলেন আইয়ুব সরকারের প্রতি ন্যাপের সমর্থনকে চীন অভিনন্দিত করবে।

১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে আমি (তারেক আলী) যখন পূর্ব পাকিস্তান সফর করি, তখন দীর্ঘ টেপ রেকর্ড করা সাক্ষাৎকারে মওলানা সাহেব চেয়ারম্যান মাও-এর সঙ্গে তাঁদের উল্লিখিত কথাবার্তা স্বীকার করেন।

তারেক আলী : চীন সফরকালে আপনার সঙ্গে মাও-এর সাক্ষাৎ হলে কি আলাপ করলেন?

মওলানা ভাসানী : মাও আমাকে বললেন, এখনও পর্যন্ত পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক নাজুক স্তরে রয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ভারত এই সম্পর্ক বিনষ্টের জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাবে। তিনি আরও বললেন, 'আইয়ুব আমাদের বন্ধু এবং বর্তমান মুহূর্তে যদি আপনি আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন, তাহলে রাশিয়া, আমেরিকা আর ভারতের হাত শক্তিশালী হবে। আপনাদের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করা আমাদের নীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু আমরা আপনাদের এ মর্মে পরামর্শ দেবো যে, মন্থরভাবে এবং সাবধানতার সঙ্গে অগ্রসর হোন। আপনাদের সরকারের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিবিড় করার জন্য একটা সুযোগ দিন।"

মওলানা ভাসানীর দেশে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী দেড় বছরের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিধাবিভক্ত হলো। পিকিং-ঘেঁষা কমিউনিস্টরা প্রথমে আইয়ুবের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে বিরোধিতার সুর নরম করলো এবং পরবর্তীতে আইয়ুব সরকারকে 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সরকার' হিসাবে সমর্থন করলো। আর মস্কো-সমর্থক ন্যাপ আইয়ুব সরকারের বিরোধিতা অব্যাহত রাখলেও তার ধরনটা পুরোপুরিভাবে সাংবিধানিক। এই বিভক্তির ফলে ন্যাপের কার্যক্ষমতা দুর্বল হলো এবং রাজনৈতিক বিকল্প হিসাবে বিবেচিত হওয়ার সক্ষমতা বিনষ্ট করলো। মাওপন্থীরা এ সময় আরও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করলো। এর ফল হিসাবে দেখা গেলো যে, ১৯৬৮-'৬৯-র গণঅভ্যুত্থানের জন্য বামপন্থী কর্মীরা মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

… … …এঁদের কোন অংশেরই স্বতন্ত্র চিন্তাধারা ছিল না। এবং চীন ও রাশিয়ার অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তানের কমিউনিস্টরা স্ব স্ব দেশের

ক্ষমতাসীন সরকার সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করেছে। তাই ভারতে মাওপন্থীরা কংগ্রেস সরকারের তীব্র বিরোধিতার ভূমিকায় আত্মঘাতী 'সশস্ত্র সংগ্রামের' নীতি গ্রহণ করে, আর মস্কোপন্থী প্রবীণ নেতৃবৃন্দ ক্ষমতাসীন দলের বামহস্ত হিসাবে সক্রিয় হয়।

পাকিস্তানে এঁদের অবস্থা পুরোপুরি উল্টো। এখানে মাও পন্থীরা দমননীতির অনুসরণকারী একটা সামরিক সরকারকে সমর্থন করে এবং মস্কো সমর্থকরা গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুক্তি উপস্থাপন করে। সামগ্রিকভাবে এই প্রেক্ষাপটে পশ্চিম পাকিস্তানে দল নিজেদের পুনঃসংগঠিত করতে সক্ষম হলো।

ন্যাপের ব্যর্থতা এবং বিভক্তির ফলে ১৯৬৮ সালের নভেম্বরে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে ভুট্টো সোচ্চার কণ্ঠস্বর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলো। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আর সমাজতন্ত্রের কথাবার্তা তাঁর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হলো। এর মোকাবেলায় আইয়ুব প্রশাসন ভুট্টোর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কুৎসা রটনা ও চরিত্র হননের প্রচারণা শুরু করলে ভুট্টোর জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধি পেলো। আইয়ুব সরকার গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করলে ভুট্টোর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠলো। পিপলস্ পার্টিকে প্রাথমিকভাবে তেমন একটা রাজনৈতিক পার্টি বলা সমীচীন নয়। এই পার্টিকে একনায়কত্বের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলনের প্রতীক হিসাবে আখ্যায়িত করা যায় এবং এজন্য এর দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে ঐতিহ্যবাহী বামপন্থীদের পাশ কাটানো সম্ভব হয়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তান কলোনিতে রাজনীতি আরও প্রচণ্ড আকারে বিদ্যমান ছিল। দশ বছরের একনায়কত্বের ফল হিসাবে সম্ভাব্য সমস্ত বিতর্কমূলক জাতীয় প্রশ্নগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। সবারই দৃষ্টি তখন এসব জাতীয় প্রশ্নগুলোর ওপর। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, বামপন্থীরা তখনও পর্যন্ত এসব প্রশ্নে নীরব। অথচ বিদ্যালয় আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমগ্র ছাত্রসমাজ আইয়ুব-সরকারের তীব্র বিরোধী। সরকার সমর্থক গুণ্ডা বাহিনী শিক্ষাঙ্গনগুলোতে এ সময় ভীতির রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল। বামপন্থীরা ১৯৬৮ সালের নভেম্বরে পাল্টা আঘাতের উদ্দেশ্যে সংগঠনের সূচনা করলো। এ সময় আওয়ামী লীগ ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ছ'দফা প্রণয়নের জন্য আইয়ুব প্রশাসন শেখ মুজিবকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল।

... ...পশ্চিম পাকিস্তানিদের মূলধন বিনিয়োগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য পূর্ব পাকিস্তানকে একটা শৃংখলিত বাজারে পরিণত করা হয়েছিল। ছ'দফা দাবি ছিল এ ধরনের অবস্থার প্রতি একটা চ্যালেঞ্জস্বরূপ। যে দল এই ছ'দফা প্রণয়ন করেছিল, তাঁরাই জনসাধারণের মনের মুকুরে স্থান লাভ করলো এবং সবাই বুঝতে পারলো যে, এই একটা মাত্র শক্তিই বাঙালিদের সম-অধিকারের জন্য সংগ্রাম করতে সমক্ষম।... ... ...বাঙালি জাতীয়তাবাদের গুরুত্ব অনুধাবনের ক্ষেত্রে ন্যাপের ব্যর্থতা এবং আইয়ুবের স্বৈরতন্ত্রের প্রতি সমর্থনের মধ্যে একটা যোগসূত্র বিদ্যমান ছিল। বৃদ্ধ মওলানা ভাসানীই সর্বপ্রথম এই দুর্বলতা উপলব্ধি করেন এবং গতি পরিবর্তনের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন। কিন্তু আওয়ামী লীগের ব্যাপক প্রভাব বিনষ্ট করার জন্য এই ব্যাপক প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে।

১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আইয়ুব পূর্ব পাকিস্তানে শেষ সফর করেন। তিনি আওয়ামী লীগকে 'রাষ্ট্রদ্রোহীদের' পার্টি হিসাবে আখ্যায়িত করেন এবং বিরোধীদলীয়

অন্য পার্টিগুলো 'পাকিস্তানের শত্রু'। এ সময় 'ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেফতারকৃত জনা কয়েক বাঙালি সামরিক অফিসারের বিরুদ্ধে একটা ভুয়া মামলা দায়ের করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় আন্দোলনের সুনাম বিনষ্ট করাই ছিল এই মামলার মূল উদ্দেশ্যে। এছাড়া কর্তৃপক্ষ এ মর্মে বোঝাতে চাচ্ছিলেন যে, সামরিক বাহিনীর মধ্যে বাঙালিদের অনুগত হিসাবে গণ্য করা উচিত হবে না। উপরন্তু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। রাজনীতিবিদরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এসব পদক্ষেপকে প্রহসনমূলক আখ্যায়িত করে নিন্দা জ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষণা করলো যে এ সবই হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানিদের নৃশংসতার জ্বলন্ত প্রমাণ।

আইয়ুব শাসনের সমাপ্তি নিকটবর্তী হলে সামগ্রিক পরিস্থিতিকে নিম্নোক্তভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যায় :

পশ্চিম পাকিস্তানে পাঞ্জাব ও সিন্ধু এলাকার গণসমর্থনের ভিত্তিতে জুলফিকার আলী ভুট্টোর একক রাজনীতিবিদ হিসাবে অভ্যুদয়।

পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় প্রশ্নগুলোর গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক এবং শেখ মুজিবুর রহমান তখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে।

দেশের উভয় অংশে প্রবীণ বামপন্থীরা সঠিক পথনির্দেশের এমনকি ওয়াদা উচ্চারণে ব্যর্থ। এভাবেই কর্তৃত্বব্যঞ্জক স্বভাবের দু'জন সর্বাধিক জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ সর্বাত্মক আন্দোলনের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হলেন। এই সর্বাত্মক আন্দোলনের জোয়ার তখন দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে।

[বামপন্থী নেতৃবৃন্দের এসব মন্তব্য সাপ্তাহিক স্বদেশ থেকে পুনঃমুদ্রিত হলো এবং ব্রিটেনে অবস্থানরত মার্কসিস্ট লেখক তারিক আলীর বক্তব্য তাঁর প্রণীত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। –লেখক]

নিরাপত্তা পরিষদে চীনা প্রতিনিধি হুয়াং হুয়া

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৭১ : সম্প্রতি ভারত সরকার প্রকাশ্যভাবে পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণের জন্য সৈন্য পাঠিয়েছে। ফলে ব্যাপকভাবে সামগ্রিক লড়াই শুরু হয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে এশিয়ায় ও বিশেষ করে পাক-ভারত উপমহাদেশে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে।

চীনের জনসাধারণ ও সরকার এ ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং পরিস্থিতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রশ্নটি সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এ ব্যাপারে কারো হস্তক্ষেপের অধিকার নেই। ভারত সরকার পূর্ব পাকিস্তানের প্রশ্নটি একটা বাহানা করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে। এটা ঘটতে দেয়া বাঞ্ছনীয় নয়। ভারত সরকার বলেছে যে, সম্পূর্ণভাবে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ভারত পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য পাঠিয়েছে। এটা জংগলের বিধি। ঘটনাপ্রবাহে প্রমাণ করে যে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতই আগ্রাসন করেছে। পাকিস্তান কখনই ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেনি।

ভারত সরকার এ মর্মে যুক্তি দেখিয়েছে যে, কোন দেশ আত্মরক্ষার অছিলায় অন্য দেশ আক্রমণ করতে পারে। তাহলে একটা দেশের সার্বভৌমত্ব আর অখণ্ডতার জন্য কী গ্যারান্টি রয়েছে? ভারত সরকারের বক্তব্য হচ্ছে, তারা পূর্ব পাকিস্তানী শরণার্থীদের দেশে প্রত্যাবর্তনের সাহায্যের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য পাঠাচ্ছে। এটা কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। এই মুহূর্তে ভারতে বিরাটসংখ্যক তথাকথিত চীনা-তিব্বতীয় শরণার্থী রয়েছে। ভারত সরকার এদের গোষ্ঠী-সর্দার ও পাল্টা বিপ্লবের বিদ্রোহী নেতা দালাইলামাকে লালন-পালন করছে। ভারতীয় যুক্তিতে বলতে হয়, এটা কি চীন আক্রমণের বাহানা হিসাবে ব্যবহার করা হবে?

পাকিস্তান সরকার এ মর্মে প্রস্তাব করেছে যে, সংঘর্ষ বন্ধ করে ফ্রন্ট থেকে উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করা হোক এবং পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের প্রশ্নটি উভয় পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হোক। এটা খুবই যুক্তিসম্মত। কিন্তু ভারত সরকার অযৌক্তিকভাবে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, ভারত সরকার পূর্ব পাকিস্তানি শরণার্থীদের প্রশ্নটি সমাধান করতে ইচ্ছুক নয়। বরং এই প্রশ্নের বাহানা করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আরও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ এবং আগ্রাসন করতে আগ্রহী।

চীনা প্রতিনিধি দলের মতে জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ নিশ্চিতভাবে ভারত সরকারের এই আগ্রাসনকে নিন্দা করবে। প্রতিনিধি দল আরও দাবি জানাচ্ছে যে, ভারত সরকার অবিলম্বে এবং শর্তহীনভাবে পাকিস্তান থেকে তার সমস্ত সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার করবে।

পরিশেষে চীনা সরকারের পক্ষ থেকে আমি বলতে চাই যে, চীন সরকার এবং চীনের জনসাধারণ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পাকিস্তান সরকার ও জনগণের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে। ভারত সরকারের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামে চীনের সমর্থন অব্যাহত রয়েছে।

আমি নিরাপত্তা পরিষদের, জাতিসংঘ এবং সমগ্র বিশ্বের জনগণের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে, ভারত সরকারের এই আগ্রাসন সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী সোভিয়েতের সমর্থনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বহু ঘটনাই একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করবে।

এখনকার মতো আমি একটুই বলতে চাই। পরবর্তী সময়ে অধিকার মোতাবেক আরও বক্তব্য রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করছি।

৫ই ডিসেম্বর চীন কর্তৃক উত্থাপিত খসড়া প্রস্তাব : নিরাপত্তা পরিষদ পাকিস্তান ও ভারতের প্রতিনিধিদের বিবৃতি শ্রবণ করেছে,

এবং যেহেতু লক্ষ্য করেছে যে, ভারত ব্যাপক আকারে পাকিস্তানের ওপর সামরিক হামলা পরিচালনা করে পাক-ভারত উপমহাদেশের শান্তি মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করেছে,

সেহেতু ধ্বংসাত্মক, বিচ্ছিন্নকরণ ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক হামলা এবং একটা তথাকথিত 'বাংলাদেশ' সৃষ্টির জন্য ভারতীয় কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করছে,

এবং অবিলম্বে শর্তহীনভাবে ভারত সরকারকে পাকিস্তানি এলাকায় প্রেরিত তার লোকজন ও সৈন্য বাহিনীকে প্রত্যাহার এবং পাল্টা আক্রমণের জন্য ভারতীয় এলাকায় পাকিস্তান যে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছে তারও প্রত্যাহারের আহ্বান জানাচ্ছে,

এবং ভারত ও পাকিস্তানকে শত্রুতা বন্ধ এবং উভয় পক্ষকে আন্তর্জাতিক সীমারেখার অপর পার থেকে সৈন্য প্রত্যাহার এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিদ্যমান বিরোধসমূহের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার লক্ষ্যে পরিবেশ সৃষ্টির আহ্বান জানাচ্ছে,

এবং ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি জনসাধারণের ন্যায়সংগত সংগ্রামের পক্ষে সমর্থনের জন্য বিশ্বের সকল দেশের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে,

এবং সেক্রেটারি জেনারেল এই প্রস্তাবকে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব শীঘ্র নিরাপত্তা পরিষদে রিপোর্ট দাখিলের অনুরোধ জানাচ্ছে।

৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ : জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে দিনব্যাপী পাক-ভারত যুদ্ধের প্রশ্নে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন সর্বমোট ৬০ জন প্রতিনিধি বক্তৃতা দান করেন। (ইতিপূর্বে পাঁচ জন পূর্ণ সদস্যবিশিষ্ট নিরাপত্তা পরিষদে দু'বার যুদ্ধবিরতি খসড়া প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়া ভেটো দান করে এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্স ভোটদানে বিরত থাকে। ফলে চীন ও মার্কিন সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রশ্নটি সাধারণ পরিষদে উত্থাপিত হয়।) জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে চীনের প্রতিনিধি দলের নেতা মি. চিয়াও প্রায় দেড় হাজার শব্দ বিশিষ্ট বক্তব্য উপস্থাপন করেন। চীনা প্রতিনিধির বক্তৃতা প্রসঙ্গে মি. চিয়াও বলেন যে, নিরাপত্তা পরিষদের ৪ঠা, ৫ই এবং ৬ই ডিসেম্বরের বৈঠকগুলোতে সোভিয়েত প্রতিনিধি মি. মালিক এবং ভারতীয় প্রতিনিধি বারংবার তথাকথিত 'বাংলাদেশের' প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তির দাবি জানিয়েছেন। পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েত প্রতিনিধি দুটো খসড়া প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যুক্তিহীনভাবে ভেটো প্রদান করছে।

[বর্তমানে চীন-বাংলাদেশ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু ১৯৭১ সালে চীনের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করার উদ্দেশ্যেই কোনরকম মন্তব্য ছাড়াই উপরোক্ত উদ্ধৃতি দুটি উপস্থাপনা করা হলো। —লেখক]

গ্রন্থপঞ্জি

Bangladesh Documents	Vol I & II
Witness to Surrender	Siddque Salik
The Liberation of Bangladesh	Maj. Gen. Sukhwant Singh
Can Pakistan Survive	Tariq Ali
Bangladesh	Govt. of Bangladesh
Bangladesh, My Bangladesh	Ramendu Majumder
Massacre	Robert Payne
সাপ্তাহিক জয় বাংলা (১৯৭১)	আবদুল মান্নান
শব্দ সৈনিক	সম্পাদনা শহীদুল ইসলাম
একাত্তরের রণাঙ্গন	শামসুল হুদা চৌধুরী
লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে	মেজর (অবঃ) মোঃ রফিক
মধ্যরাতের অশ্বারোহী	ফয়েজ আহমদ
মুজিবের রক্ত লাল	এম আর আখতার মুকুল

উনিশশো একাত্তরের পাকিস্তানের সমরনায়কবৃন্দ

এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে

পোস্টার অংকন ঃ কামরুল হাসান

প্রকাশনায় মুজিবনগর সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতর

জেনারেল আবদুল হামি খান
সেনা বাহিনীর চীফ অব ষ্টাফ

লেঃ জেনারেল এস জি এম পীরজাদা
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার পিএসও

লেঃ জেঃ টিক্কা খান
গণহত্যার সময় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর

মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা
পূর্ব পাকিস্তানের জি ও সি

লেঃ জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ্‌ খান নিয়াজী
ইষ্টার্ণ কমাণ্ডের প্রধান

মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী
পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের পরামর্শদাতা

জুলফিকার আলী ভূট্টো
পিপলস্‌ পার্টির চেয়ারম্যান

ডাঃ আব্দুল মোত্তালেব মালেক
পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে সত্তরের নির্বাচনী ফলাফল

রাজনৈতিক দলের নাম	বিজয়ী আসন	উপজাতীয় এলাকা	মহিলা	মোট আসন
আওয়ামী লীগ	১৬০	×	৭	১৬৭
পিপলস্ পাটি	৮৩	×	৫	৮৮
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	৯	×	×	৯
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	৭	×	×	৭
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	২	×	×	২
ন্যাপ (ওয়ালী)	৬	×	×	৭
জামাত-ই-ইসলামী	৪	×	×	৪
জমিওতে ওলেমা (হাজারভি)	৭	×	×	৭
জমিয়তে ওলেমা (থানৃভী)	৭	×	×	৭
পি ডি পি	১	×	×	১
স্বতন্ত্র	৭	৭	×	১৪
			মোট	৩১৩

পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে সত্তরের নির্বাচনী ফলাফল

রাজনৈতিক দলের নাম	সাধারণ আসন	পরোক্ষ ভোটে মহিলা সদস্য	মোট সংখ্যা
আওয়ামী লীগ			
পিডিপি	২৮৮	১০	২৯৮
ন্যাপ (ওয়ালী)	২	—	২
জামাত-ই-ইসলামী	১	—	১
নেজামে ইসলাম	১	—	১
পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি	১	—	১
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	—	—	—
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	—	—	—
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	—	—	—
কৃষক শ্রমিক পার্টি	—	—	—
স্বতন্ত্র	—	—	—
	৭		৭
	মোট ৩০০	১০	৩১০

২৬শে মার্চের গণহত্যা

শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ
একাত্তরের রণাংগন

যশোর সেক্‌টর

এলাকা ঃ কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা

সমরনায়কবৃন্দ ঃ

ঃ মেঃ জেনারেল এম এইচ আনসারী (নবম ডিভিশন)

ঃ ব্রিগেডিয়ার মনজুর (৫৭ ব্রিগেড)

ঃ ব্রিগেডিয়ার এম হায়াত (১০৭ ব্রিগেড)

ঃ কর্ণেল ফজলে হামিদ (খুলনায় এ্যাডহক ব্রিগেড)

ঃ কমান্ডার গুল জরীণ খান (খুলনায় নৌ-ঘাঁটি)

ট্যাংক বাহিনী

ঃ এক স্কোয়াড্রন এম-২৪ ট্যাংক

আট নম্বর সেক্টর

এলাকা : সমগ্র কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা, ফরিদপুরের অধিকাংশ এলাকা এবং দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়কের উত্তরাংশ ।

সেক্টর কমাণ্ডার :

মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (এপ্রিল-আগষ্ট পর্যন্ত)

মেজর এম এ মনজুর (ডিসেম্বর পর্যন্ত)

নয় নম্বর সেক্টর

এলাকা : দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক থেকে খুলনার দক্ষিণাঞ্চল এবং সমগ্র বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা

সেক্টর কমাণ্ডার :

(ক) মেজর এ জলিল (ডিসেম্বরের প্রথমার্ধ পর্যন্ত)

(খ) মেজর জয়নুল আবেদীন (ডিসেম্বরের অবশিষ্ট দিন)

(গ) মেজর এম এ মনজুর (ডিসেম্বরের অবশিষ্ট দিনের জন্য অতিরিক্ত সার্বিক দায়িত্ব)
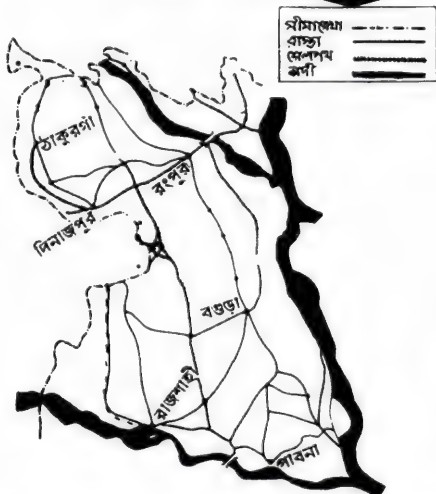
উত্তর বঙ্গ সেক্টর

এলাকাঃ দিনাজপুর, রংপুর বগুড়া, পাবনা
ও রাজশাহী জেলা

সমরনায়কবৃন্দ ঃ

ঃ মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহ্
(১৬তম ডিভিশন)
ঃ ব্রিগেডিয়ার তোজাম্মল
(২০৫ ব্রিগেড)
ঃ ব্রিগেডিয়ার আনসারী
(২৩ ব্রিগেড)
ঃ ব্রিগেডিয়ার নঈম
(৩৪ ব্রিগেড)
রাজশাহীতে এ্যাডহক ব্রিগেড
ট্যাংক বাহিনী
ঃ চার স্কোয়াড্রন ম-২৪ ট্যাংক

মুক্তিবাহিনী

সংকেত

বিভাগীয় হেড কোয়ার্টার ■
জেলা হেড কোয়ার্টার ●
সেক্টর নম্বর ⊙
সেক্টর সীমানা

৬
রংপুর
দিনাজপুর
৭
বগুড়া
রাজশাহী
পাবনা
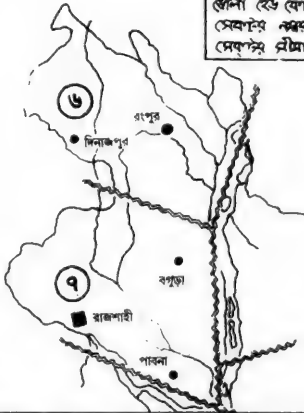
ছয় নম্বর সেক্টর

এলাকা ঃ সমগ্র রংপুর জেলা
এবং দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও মহকুমা

সেক্টর কমাণ্ডার ঃ উইং কমাণ্ডার এম কে বাশার

সাত নম্বর সেক্টর

এলাকা ঃ দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চল,
বগুড়া, রাজশাহী এবং পাবনা জেলা

সেক্টর কমাণ্ডার ঃ মেজর কাজী নূরুজ্জামান
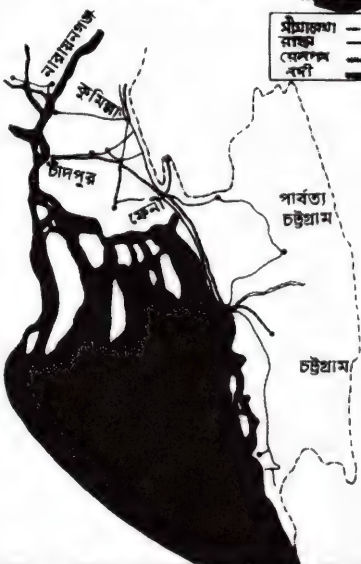
চাঁদপুর সেক্টর

এলাকাঃ দাইদকান্দি থেকে ফেনী-বিলোনিয়া এবং সমগ্র চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা

পাকিস্তান নৌবাহিনী ঃ চট্টগ্রাম রিয়ার এডমিরাল শরীফ

১৫০০ জন নৌ-সেনা এবং ৪০/৬০ এম এম কামান বসানো ২১টি গানবোট (যুদ্ধে বহু হতাহত এবং সমস্ত গানবোট বিধ্বস্ত)

সমরনায়কবৃন্দ ঃ

ঃ উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেঃ জেনারেল রহিম খান (৩৯তম ডিভিশন)

ঃ ব্রিগেডিয়ার আতাউল্লাহ (৯৭ বিগ্রেড, ২ কমাণ্ডো এবং ২১ আজাদ কাশ্মীর)

ঃ ব্রিগেডিয়ার আতিফ (১১৭ ব্রিগেড)

ঃ ব্রিগেডিয়ার আসলাম নিয়াজী (৫৩ ব্রিগেড)

ঃ ব্রিগেডিয়ার তাসকিন (৯১ ব্রিগেড)

মুক্তিবাহিনী

ঢাকা
কুমিল্লা
২
নোয়াখালি
১
রাংগামাটি
চট্টগ্রাম
কক্সবাজার

সংকেত

বিভাগীয় হেড কোয়ার্টার
জেলা হেড কোয়ার্টার
সেক্টর নম্বর
সেক্টর সীমানা
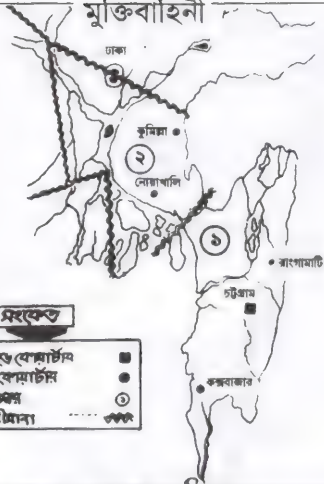
এক নম্বর সেক্টর

এলাকা : চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ফেনী নদী পর্যন্ত

সেক্টর কমাণ্ডার :
মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল-জুন পর্যন্ত) মেজর মোহাম্মদ রফিক (ডিসেম্বর পর্যন্ত)

দুই নম্বর সেক্টর

এলাকা : নোয়াখালী জেলা, কুমিল্লা জেলার আখাউড়া-ভৈরব রেল লাইন পর্যন্ত এবং ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার অংশ বিশেষ

সেক্টর কমাণ্ডার :
মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) মেজর এ টি এম হায়দার (ডিসেম্বর পর্যন্ত)

হানাদার বাহিনী

ঢাকা সেক্টর

এলাকাঃ উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদের পুর্ব থেকে সিলেট জেলার সীমানা, সমগ্র ময়মনসিংহ ও টাংগাইল জেলা এবং মানিকগঞ্জের যমুনা নদীর পূর্ব থেকে সমগ্র ঢাকা জেলা

ট্যাংকবাহিনী

দুই স্কোয়াড্রন এম-২৪ ট্যাংক

পাকিস্তান বিমানবাহিনী

এয়ার কমোডর এনাম আহমদ

ঃ ১৪টি এফ-৮৬ স্যাবার জংগী বিমান ৩টা টি-৩৩ ও ৪টা হেলিকপ্টার (লড়াই-এর মেয়াদ মাত্র ৬২ ঘন্টা)

সমরনায়কবৃন্দ

ঃ মেজর জেনারেল জমসেদ (৩৬তম ডিভিশন)

ঃ ব্রিগেডিয়ার কাদির (৯৩তম ব্রিগেড)

ঃ ব্রিগেডিয়ার কাসিম (টংগী এলাকা)

ঃ ব্রিগেডিয়ার মনজুর (নারায়ণগঞ্জ এলাকা)

ঃ ব্রিগেডিয়ার বশীর (ঢাকা মহানগরী)

ঃ কর্ণেল ফজলে হামিদ (মীরপুর ব্রিজ)

সিলেট সেক্টর

সিলেট সেক্টর

এলাকা ঃ কুমিল্লা সালদানদী থেকে আখাউড়া থেকে ব্রাহ্মনবাড়িয়া-ভৈরববাজার এবং সিলেট জেলার শেষ সীমান্ত পর্যন্ত

সমরনায়কবৃন্দ

ঃ মেঃ জেনারেল মজিদ কাজী (১৪তম ডিভিশন)

ঃ ব্রিগেডিয়ার সা'দুল্লাহ্ (২৭ ব্রিগেড)

ঃ ব্রিগেডিয়ার সলিমুল্লাহ (২০২ ব্রিগেড)

ঃ ব্রিগেডিয়ার রাণা এবং ব্রিগেডিয়ার হাসান (৩১৩ ব্রিগেড এবং ১২ আজাদ কাশ্মীর)

মুক্তিবাহিনী

৫

সিলেট

৪

সংকেত

বিভাগীয় হেড কোয়ার্টার
জেলা হেড কোয়ার্টার
সেক্টর নম্বর
সেক্টর সীমানা
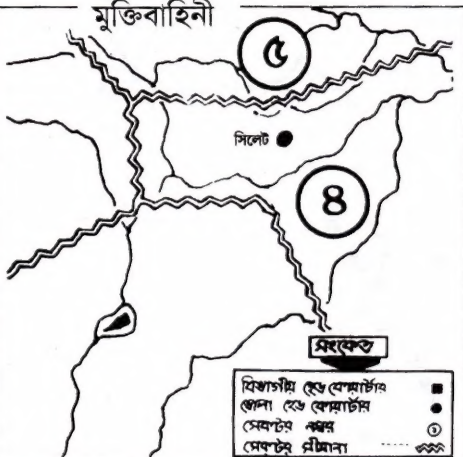
চার নম্বর সেক্টর

এলাকা ঃ সিলেট জেলার পুর্বাঞ্চল এবং খোয়াই-শায়েস্তাগঞ্জ রেল লাইন বাদে পূর্ব ও উত্তর দিকে সিলেট ডাউকি সড়ক পর্যন্ত

সেক্টর কমাণ্ডার ঃ মেজর সি আর দত্ত

পাঁচ নম্বর সেক্টর

এলাকা ঃ সিলেট-ডাউকি সড়ক থেকে সিলেট জেলার সমগ্র উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল

সেক্টর কমাণ্ডার ঃ মেজর মীর শওকত আলী

মুক্তিবাহিনী

সংকেত

বিভাগীয় হেড কোয়ার্টার
জেলা হেড কোয়ার্টার
সেক্টর নম্বর ৩
সেক্টর সীমানা

১১

সিলেট

বগুড়া

ময়মনসিংহ

টাংগাইল

৩

পাবনা

ঢাকা
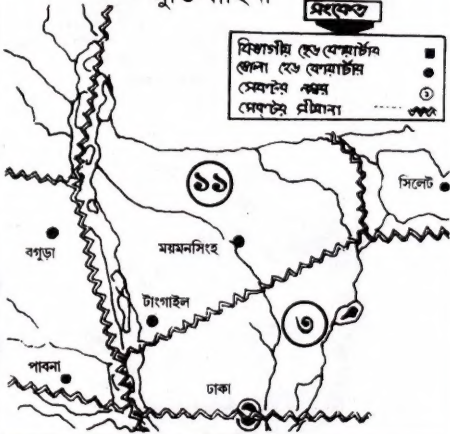
তিন নম্বর সেক্টর

এলাকা ঃ সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা, কিশোরগঞ্জ মহকুমা, আখাউড়া-ভৈরব রেল লাইন থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে কুমিল্লা জেলা এবং ঢাকা জেলার অংশ বিশেষ

সেক্টর কমাণ্ডার ঃ
মেজর কে এম শফিউল্লাহ্ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) মেজর এ এন এম নূরুজ্জামান (ডিসেম্বর পর্যন্ত)

এগারো নম্বর সেক্টর

এলাকা ঃ কিশোরগঞ্জ মহকুমা বাদে সমগ্র ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা এবং নগরবাড়ী-আরিচা থেকে ফুলছড়ি বাহাদুরাবাদ পর্যন্ত যমুনা নদী ও তীরাঞ্চল

সেক্টর কমাণ্ডার ঃ
মেজর আবু তাহের (আগষ্ট-নভেম্বর) ফ্লাইট লেঃ এম হামিদুল্লাহ্ (নভেম্বর- ডিসেম্বর)

মুক্তিবাহিনী

সংকেত

বিভাগীয় হেড কোয়ার্টার ■
জেলা হেড কোয়ার্টার ●
সেক্টর নম্বর ①
সেক্টর সীমানা

১১

বগুড়া
ময়মনসিংহ
সিলেট
টাংগাইল
পাবনা
ঢাকা
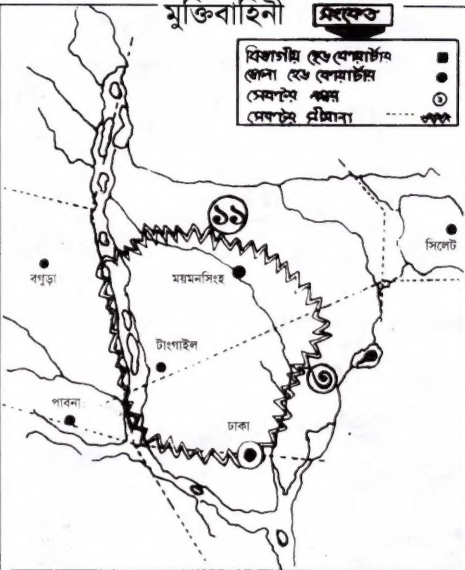
কাদেরিয়া বাহিনীর অতিরিক্ত সেকটর

এলাকা ঃ ময়মনসিংহের দক্ষিণাঞ্চল, সমগ্র টাঙ্গাইল জেলা, রাজধানী ঢাকাসহ ঢাকা জেলার অংশ বিশেষ এবং যমুনা নদীপথ

কাদের সিদ্দিকী